প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'কথা-গুচ্ছ' প্রকাশ করার সঙ্কল্প অনেক দিনের হলেও নানা বাধা বিপত্তির পর এত দিনে প্রকাশিত হোল। বাঙলার শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের একটা চয়নিকা এতদিন ছিল না—এর অভাব যে পূর্ণ হোল—এটা খুব সুখের বিষয়।

শুনতে পাই ফরাসী সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন পাওয়া যায় তার নাটকে ও ছোট গল্পে। বাঙলা সাহিত্যেরও প্রাণ-স্পন্দন পাওয়া যায় তার গীতি-কবিতা আর ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে। বাঙলা গল্প সাহিত্যের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা, স্নিগ্ধ-মাধুর্য আমাদের সাহিত্যকে যে অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত করেছে, তা প্রত্যেকেই এই বই পড়লে অনুভব করবেন। ঝর্ণার মত এই গল্পধারা আমাদের বাঙ্গালী জীবন সরস ও স্নিগ্ধ করে তুলেছে।

কথা-গুচ্ছের চয়ন সম্বন্ধে আমি কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করি নি। যে গল্পটি সব চেয়ে সুন্দর ও তাঁর styleএর বিশেষত্বটুকু যে গল্পে ফুটে উঠেছে, সেই আমি নির্বাচন করেছি। অবশ্য লেখকের মতামতও নিয়েছি, কিন্তু সব লেখকের সঙ্গে একমত হয় ত হতে পারিনি। অনেক সময় লেখকের কাছে যে গল্পের দাব বেশী সম্পাদকের কাছে তার মূল্য ততটা নয়।

আমার বিশ্বাস, কোন নির্বাচনই সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, সকলের মাপ-কাঠি এক সূত্রে বাঁধা নয়। এবং হয়তো শ্রেষ্ঠ গল্প-গুচ্ছের তালিকা এখানেই শেষ হয় নাই। তবুও আমি বিশ্বাস করি যে, কথা-গুচ্ছ বাঙলা গল্প-সাহিত্যের নিদর্শন। সমালোচকের নিক্তিতে এর মূল্য কম হবেনা। এবং মোটের উপর এই কথা-গ্রথিত গল্পগুলি ব্যাপক-রূপে বাঙলা ছোট গল্পের আদর্শ করে থোকার করে নেওয়া পারে।

যে সব লেখক লেখিকারা তাঁদের গল্প প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যে সব বন্ধু-বান্ধব এই ব্যাপারে আমাকে নানারূপে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছেও আমার ঋণ জানাচ্ছি। দুই একজন মৃত লেখকের লেখা ছাপবার অনুমতি তাঁদের আত্মীয়দের কাছ থেকে নেবার সুযোগ ও সুবিধা পাইনি। এই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অনেক প্রকাশকগণও আমাকে অনুমতি দানে সাহায্য করেছেন—সেই জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আশা করি এই কথা-গুচ্ছ বাংলা সাহিত্যের একটা প্রকৃত অভাব দূর করবে, এবং পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।

ভাদ্র, ১৩৪০
কলিকাতা

সুধীরচন্দ্র সরকার

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রায় ১৩ বৎসর পরে কথা-গুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল। অথচ ৭ বৎসর আগেই সমস্ত বই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে ঠিক সময়ে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। এই কয়েক বৎসরে বাংলার গল্প সাহিত্যের ধারা যে দিকে প্রবাহিত হয়েছে, তারই ছবি এই সংস্করণে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই জন্যে পাঠক পাঠিকারা অনেক নূতন লেখকের লেখা এতে দেখতে পাবেন। তারপর, পূর্ব সংস্করণের কয়েকটি গল্পের মধ্যেও নানা রকম অদল-বদল হয়েছে। আশা করি এতে এই সংস্করণের উৎকর্ষতা আরও বেড়ে গেছে।

এ সংস্করণের আর একটা বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে—প্রত্যেক লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এই পরিচয় লিখে দিয়েছেন সুসাহিত্যিক [illegible] মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

১লা বৈশাখ
১৩৫৩

সুধীরচন্দ্র [illegible]

অতীতের

বর্ত্তমানের

ও

ভবিষ্যতের

গল্প-লেখকদের

উদ্দেশে

Only the fastidious is able to savour the excellence of a short story, while the gluttonous devour novels indifferently, good middling or bad. The short story is sufficient for all ends. A great deal of meaning can be contained in a few words. A well-constructed short-story is the delight of the connossieur. It is an elixir, a quintessence, a precious ointment—

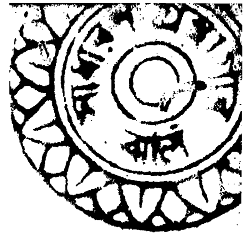
—ANATOLE FRANCE.

সংখ্যা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
আদরিণী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১
তীর্থের পথে	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৫
য হেতু ও সে হেতু	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৪
পোড়ার মুখী	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৪
মুক্তি	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৮
নিধিরামের বেসাতি	রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৩
অভাগীর স্বর্গ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬০
আহুতি	প্রমথ চৌধুরী	৭৩
বাতাসী	জলধর সেন	৮৮
ভূশণ্ডীর মাঠে	পরশুরাম	৯৮
হীরাকুণি	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৮
গৃহহীন	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১১০
বিশ্বনাথ	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	১২০
দিনের আলো	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১২৮
কালীপূজোর রাত্রি	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	১৩৫
কেরাণী	হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৪৭
বেদেনী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৯
ফসিল	সুবোধ ঘোষ	১৭৪
অসমাপ্ত	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৮৬
মোটবারো	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২০২
হতাশা	বুদ্ধদেব বসু	২১৩

ৎসব	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২২
ড়ওয়ালা	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৩
মেয়ে	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	...	২৪
অরুণ	মণীন্দ্রলাল বসু	...	...	২৫
পুঁইমাচা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৬
ভয়ঙ্কর	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	২৮০
মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	...	২৯০
ব্যাঘ্র-দেবতা	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	...	৩০৫
সৈনিক	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	৩
গভীর	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	...	৩
বন্দে মাতরম্	মনোজ বসু	...	...	৩৪
নাস্তিক	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	৩
তিলোত্তমা	"বনফুল"	...	...	৩৭৩
বাঁশবাজি	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	...	৩৮১
দেবদাসী	অনুরূপা দেবী	...	...	৩৮৮
ফুটকী	শান্তা দেবী	...	...	৪০
বনিয়াদী ঘর	সীতা দেবী	...	...	৪১৫
দুরাশা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৪৩১
ক্ষুধিত পাষাণ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	...	৪৪৫
লেখক পরিচিতি	বিশু মুখোপাধ্যায়	...	...	৪৫৭



ছোট গল্প

[শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত]

...ট-গল্প, ভাষান্তরে উপকথা, হচ্ছে পৃথিবীর আদি গল্প। এই উপকথাই ...র মুখে রূপকথা আকার ধারণ করেছে। আর রূপকথাই যে আদি ছোট-...তা' কে না জানে? এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই হচ্ছে উপকথার জন্মভূমি; ...এ কথা অবিসংবাদী যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে যত উপকথা আছে, বীর অপর কোন সাহিত্যে তার শতাংশের এক অংশও নেই।

বৌদ্ধ-জাতক অসংখ্য। মহাভারত আর পুরাণেও অসংখ্য উপকথা আছে। ...লি যদি সব একত্র সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে বৌদ্ধ-জাতকের চাইতেও ...ণে বেশি হবে। আর এই উপকথার ভিত্তির উপরেই সংস্কৃত কাব্য-...ত্য গ'ড়ে উঠেছে। তারপর 'কথাসরিৎসাগরে'র নামেই পরিচয় যে, তাতে কথা সংগৃহীত হয়েছে। আর পশুপক্ষীর চরিত্র ও ব্যবহার অবলম্বন ক'রে ...ত উপকথার সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় 'পঞ্চতন্ত্রে'।

এই অসংখ্য উপকথার সৃষ্টি করেছে নিরক্ষর লোক-সমাজ, শিক্ষিত সাহিত্য ...জ নয়। দণ্ডী বলেছেন যে, "কথা হি সর্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।" থেকে অনুমান করা যায় যে, দণ্ডীর কালে বেশির ভাগ উপকথাই মানুষের শুনে সেকালের কবিরা তা' লোক-ভাষায়, আর কোন কোন গল্প সংস্কৃত ...য় লিপিবদ্ধ করতেন। এই বিপুল সাহিত্যের জন্ম লেখনী দেয়নি, দিয়েছে ...।

বৌদ্ধ-জাতক মূলতঃ পালি ভাষাতেই লিখিত, পরে তা' সংস্কৃত ভাষাতেও ...শান পেয়েছে। 'বৃহৎ-কথা' পৈশাচী নামক কোনও অনির্দিষ্ট-প্রাকৃতে নাকি ...ম রচিত হয়েছিল, তারপর তা' 'কথাসরিৎসাগরে' রূপান্তরিত হয়েছে। থেকে মনে হয় ভারতবর্ষই হচ্ছে যথার্থ ছোটগল্পের দেশ।

[২]

সেকালের সাহিত্যিকগণ এ-সব উপকথা নিজের মাথা থেকে বার করেন নি, কেবলমাত্র লোক-কথা সংগ্রহ করেছিলেন. এবং অল্পবিস্তর রূপান্তরিত করেছিলেন। মহাভারত-পুরাণের উপাখ্যানাবলী, 'বৃহৎ কথার' উপকথাসমূহ, জাতকের ও 'পঞ্চতন্ত্রের' গল্পগুলি সবই লোক-কথার সাহিত্যিক সংস্করণ মাত্র।

এই জনসমাজের সৃষ্ট উপকথাগুলি মানব-সমাজের যে চির আনন্দের সামগ্রী, সেকালের সাহিত্যিকগণ তা' বুঝতে পেরেছিলেন ; আর ঐ সব উপকথা অবলম্বন করে যে লোক-সমাজকে শিক্ষাদান করা যেতে পারে, তা' তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায় নি। তাই জাতকের গল্পগুলি বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত text-book ; 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পগুলি রাজধর্মের text-book ; এবং মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলি হিন্দু ধর্ম ও আচারের প্রচারের কার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

কিন্তু এ-সব ধর্ম সম্বন্ধে যাঁরা উদাসীন, আজ পর্যন্ত এর অধিকাংশ গল্প তাঁদেরও আনন্দের সামগ্রী—কারণ "কথারস অবিঘাতেন" এ শিক্ষা দান করা হয়েছে।

এর পর আরব্য ভাষায় একটি অপূর্ব গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। এবং আরব্য-উপন্যাস যে বিশ্বমানবের অতি প্রিয় বস্তু, তা' কে না জানে? অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, আরব্য-উপন্যাসের গল্পসমূহ ভারতীয় উপকথার ভাণ্ডার হতে সংগৃহীত। এ অনুমান আমি সহজেই গ্রাহ্য করি। কেননা, 'কথাসরিৎ সাগরে' এমন গুটিকতক গল্প আছে, যা' আরব্য-উপন্যাসে বেমালুম পুরে দেওয়া যায়। আর 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্প যে ইউরোপে অনুবাদের মারফৎ ছড়িয়ে পড়ে, তার প্রমাণ আছে। সুতরাং আমাদের জাতিই যে ছোটগল্পের প্রধান কর্তা ও ভোক্তা —সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

[৩]

এখন ইউরোপের দিকে তাকানো যাক্। গ্রীসের বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্য এ-ক্ষেত্রে অনুর্বর। গ্রীক্ ভাষা আমি জানিনে কিন্তু গ্রীক্ সাহিত্য যদি উপকথায় সমৃদ্ধ হ'ত তবে সে সংবাদ আমাদের কাছেও পৌছত। গ্রীসেও দেবদেবীর বহু উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেগুলি ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত নয়। ভাষায় 'পঞ্চতন্ত্রে'র অনুরূপ 'Æsop's Fables' আছে, যা' 'কথামালা'র প্রসা

ামরা সকলেই জানি। এ 'কথামালা'র রূপ অতি চমৎকার। এত অল্প
থায় এমন সুগঠিত এ-জাতীয় গল্প আর কেউ বলতে পেরেছেন ব'লে জানিনে।
বং এই artistic গুণেই এ গল্পগুলি বিশ্ব-মানবের কাছে এত প্রিয় হয়েছে।
গল্পগুলির স্রষ্টা লোক-সমাজই হ'ক আর যিনিই হন, তিনি সাহিত্য-জগতের
একটি প্রধান গুণী।

ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই, সুতরাং যে-সব গল্প
লেখকের নাম আমরা সকলেই শুনেছি, তাঁদেরই নাম করব।

গ্রীকো-রোমান সভ্যতার অধঃপতনের পর ইউরোপে কোনও অমর
সাহিত্য জন্মলাভ করেনি, সম্ভবতঃ এক রূপকথা ব্যতীত—যে-সব রূপকথা
imm অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংগ্রহ ক'রে, সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এর পূর্বে Renaissanceএর যুগে ইতালিতে আবার নব-উপকথা-সাহিত্য
ন্মলাভ করে। ঐ যুগে ইতালির কথা-শিল্পীদের মধ্যে Boccaccio সর্বশ্রেষ্ঠ।
occaccio-র রচিত গল্পের ভিতর সুরুচিও নেই, সুনীতিও নেই—এবং তিনি
কানরূপ ধর্মপ্রচারের উপকরণস্বরূপ এ-সব গল্প লেখননি। কিন্তু এ-সব গল্পের
ভিতর ধর্ম ও নীতি না থাক, আর্ট আছে। সর্বপ্রকার ideality-র দিকে পিঠ
ফিরিয়েও যে রক্তমাংসে গড়া মানুষ নিয়ে চমৎকার গল্প লেখা যায়—এ সত্যের
আবিষ্কার বোধ হয় Boccaccio প্রথম করেন। এর ফলে ইউরোপের সকল
ভাষায় এর গল্পগুলি অনূদিত হয়েছে, আর সেগুলি বহুলোকের নিকট পরিচিত।
মানুষের হাসি-কান্নার মূল যে তার অন্তর্নিহিত, এবং কোনও দৈবশক্তির অনুগ্রহ
। নিগ্রহের উপর নির্ভর করে না—এই হচ্ছে বকাচিওর ফিলজফি। আর
ই ফিলজফিই ইউরোপের নব-উপকথার অন্তরে রয়েছে।

[৪]

এর পর ইউরোপে নানা ভাষায় অবশ্য Boccaccio-র অনুকরণে নানা গল্প
লিখিত হয়েছে, কিন্তু সে-সব লেখকরা প্রতিভায় বঞ্চিত ছিলেন বলে তাঁরা কেউই
সাহিত্য-সমাজে Boccaccio-র ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন-নি; সুতরাং তাঁরা
সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত নন্।

তারপর ইউরোপে নভেল নামক নব-কথা-সাহিত্য জন্মলাভ করলে—এবং
ন দিন এই নব সাহিত্য এমন বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল যে, আজকের দিনে এ-জাতীয়

সাহিত্যের তুল্য বিপুল সাহিত্য আর দ্বিতীয় নেই। সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ফসলের চাষ মামুলী হ'য়ে ওঠে।

এর ফলে উপকথা আওতায় প'ড়ে গেল; লেখক ও পাঠক এ-জাতীয় সাহিত্যকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। ফলে ছোটগল্প ছোট-সাহিত্য ব'লে গণ্য হ'তে লাগল।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রধান গল্প-লেখকেরা প্রায় সকলেই নভেল-লেখক। Scott, Dickens, Thackeray, George Eliot, Balzac, Tolstoyএর নাম কে না জানেন?

উপরোক্ত বড় ইংরাজ নভেলিষ্টরা কেউ ভাল ছোট গল্প লেখেননি; কিংবা লিখিতে পারেননি। অবশ্য নভেলের ভিতরও একটি গল্প থাকে; কিন্তু সে গল্প নভেলের প্রাণ নয়। অপর পক্ষে গল্পই হচ্ছে ছোটগল্প ওরফে উপকথার প্রাণ। সুতরাং যাঁরা নভেল-লেখক, তাঁরা ছোটগল্প লেখায় মনোনিবেশ করতে পারেন না।

অবশ্য এমন লেখকও আছেন, যাঁরা এ উভয় জাতীয় সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত—যথা ফরাসী দেশে Balzac এবং রুশিয়ায় Tolstoy। কিন্তু সচরাচর এ দুই শক্তি একই লেখকের দেহে থাকে না।

[৫]

আমি পূর্বে বলেছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ হচ্ছে উপকথার দেশ, আর বর্তমান ইউরোপ হচ্ছে উপন্যাসের দেশ। সুধু তাই নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে উপকথা একরকম উপ-সাহিত্য হ'য়ে পড়েছিল।

হঠাৎ Maupassant নামক জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক ছোটগল্পকে আবার সাহিত্য-রাজ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর কারণ, Maupassant-র গল্পের নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য, তাঁর ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য, ইউরোপের পাঠক-সমাজকে যুগপৎ মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। ইউরোপের সাধারণ পাঠক-সমাজ এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা একবাক্যে Maupassant-কে একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক ব'লে অবিলম্বে স্বীকার করেন। স্বয়ং Tolstoy ত' তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পী বলেন। এর ফলে তাঁর গল্পসমূহ নানা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন গল্প-সাহিত্যে Maupassant রাজা। এবং আমরা যা'রা সেকালে ইউরোপীয় সাহিত্য চর্চা করতুম, অনেকেই তাঁর

গল্প-সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলুম। ফলে, এ-যুগের বা ছোটগল্প Maupassant-র ছোটগল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কি হিসেবে, তা' পরে বল্‌ছি। এখানে শুধু একটি কথা বল্‌তে চাই। ইংলণ্ডের এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পলেখক Kiplingএর কোনরূপ প্রভাব বঙ্গ-সাহিত্যের উপর নেই। এর কারণ, Kipling-এর কথা-সাহিত্য আমাদের কাছে প্রিয়ও নয়, অতএব পরিচিতও নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা ইংরাজী সাহিত্যের কাছে ঋণী নই।

[৬]

তখনকার অনেক লেখক যে Maupassant-র কথাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, আর সে সাহিত্য যে তাঁদের প্রিয় ছিল,—তার প্রমাণ Maupassant-র কতকগুলি গল্প বাঙলা ভাষায় বহুবার অনূদিত হয়েছে। কিন্তু কেউ তাঁর গল্পের অনুকরণ করেছেন কিংবা তাঁর গল্প চুরি করেছেন ব'লে ত' জানিনে। কারণ তাঁর গল্পের বিষয় চুরি করা যায়, কিন্তু তার রূপ চুরি করা যায় না। আর Maupassant-র অনেক কথার রূপ বাদ দিলে—তার বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অপ্রিয় হ'য়ে পড়ে।

তবে তাঁর গল্প-সাহিত্যের দ্বারা আমাদের গল্প-সাহিত্য যে অনুপ্রাণিত, এ কথার মানে কি? Maupassant-র উপকথা প্রাচীন উপকথার স্বজাত নয়। তাঁর কথা রূপকথাও নয়, 'একাধিক সহস্র রজনীর' কথাও নয়, 'পঞ্চতন্ত্রের' কথাও নয়। এ-সব কথা, লোক-কথার সাহিত্যিক সংস্করণও নয়, অনুকরণও নয়। তাঁর সকল কথার স্রষ্টাই তিনি নিজে। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজের প্রকৃতি থেকেই এ-সব গল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করেছেন।

এর থেকে এই ভরসা পাওয়া যায় যে, এ-যুগে আমরা নিজের অভিজ্ঞতা ও নিজের প্রকৃতির সাহায্যেই নব-কথা সৃষ্টি করতে পারি। উপরন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ছোটগল্পও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে গণ্য; গল্পের মর্যাদা, তার পরিমাণ নয়, তার গুণের উপর নির্ভর করে। আমরা যদি যথার্থ ই গুণী হই ত' আমাদের গুণপনার পরিচয় ছোটগল্প রচনা ক'রেও দিতে পারি। আর ছোট-গল্পেরও কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই; যে-কোন বিষয় হ'ক্ না কেন, গুণীর হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে তা' জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। 'আর্টে' Content-এর মূল্যের চাইতে Form-এর মূল্য ঢের বেশি।

[৭]

বাঙলার এ-যুগের গল্প-লেখকরা কেউই রূপকথা লেখেন না, আরব্য-উপন্যাসও লেখেন না ; সকলেই গল্প লেখবার নব পন্থা অবলম্বন করেছেন। কারও কারও বিশ্বাস, এ-পথ প্রথমে আমিই দেখাই। কিন্তু তাঁদের সে ধারণা ভুল।

আমি প্রথমে কলম ধ'রেই, "ফুলদানী" নামক একটি গল্প ফরাসী থেকে অনুবাদ করি। সে গল্প যে পুনর্মুদ্রিত করিনি, তার কারণ, গল্পটি একটি প্রসিদ্ধ গল্প হ'লেও, আমার কাঁচা হাতের স্পর্শে তার যথার্থ রূপ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। গল্পটির লেখক Maupassant নন্—Merimee নামক তাঁর পূর্ববর্তী জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

এর পর বাঙালী লেখকরা Maupassant-র বহু গল্প বাঙলায় অনুবাদ করেন। আমি যদি এ-ক্ষেত্রে কোনও পথ দেখিয়ে থাকি, তবে তা' অনুবাদের পথ। কিন্তু এই অনূদিত বিলেতি গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ ব'লে গ্রাহ্য হয়নি।

বঙ্গসাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আদি লেখক। আমার বিশ্বাস, তিনি সর্বপ্রথম "হিতবাদী" পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখতে সুরু করেন ; তারপর "সাধনায়" তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। তিনিই হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের আদিস্রষ্টা ; এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি অফুরন্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথের গল্প Maupassant-র প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙলার অধিকাংশ লেখকের গল্পে স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এর কারণ, কি ভাবে, কি ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া এ-যুগের বাঙালী লেখকদের পক্ষে একরকম অসম্ভব।

[৮]

আমি পূর্বে যা' লিখেছি, তা' ছোট গল্পের ইভলিউসানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নয় ; কারণ সে ইতিহাস লেখা আমার স্বল্প বিদ্যায় কুলোয় না। সেকেলে ও একেলে অনেক গল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে একমাত্র পাঠক হিসেবে—ঐতিহাসিক হিসেবে নয়। এই সূত্রে আমার এই জ্ঞান জন্মেছে যে, ভারতবর্ষ হচ্ছে ছোট গল্পের আদি জন্মভূমি। এবং সেকালে এ-দেশে গল্প জন্মেছে ঢের—অথচ সে-সব গল্প সকালে জন্মে বিকেলে মরেনি। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক গল্প অমর। ভারতবর্ষের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। এ ইতিহাসের

রিবর্তন ইভলিউশানের কোঠায় ফেলা যায় না; কারণ, ভারতবর্ষের সভ্যতার তিহাস মূল থেকে ফুল পর্যন্ত ক্রমঃবিকাশের ইতিহাস নয়,—যুগে যুগে উত্থান-পতনের ইতিহাস।

আমরা আজও বেঁচে আছি, এবং মন নামক জিনিষটি আজও আমাদের দেহে আছে। আর মানুষে যা'কে সাহিত্য বলে,—তা এই মনেরই সৃষ্টি অথবা লীলা। আমার বিশ্বাস যে, এ-যুগে এই সাহিত্যিক মনের স্পষ্ট প্রকাশ বাঙলা-দেশেই বিশেষ ক'রে দেখা যায়।

ছোটগল্প যখন সাহিত্যের একটি সনাতন ও প্রধান অঙ্গ—তখন বর্তমান বাঙলায় যে তা' ফুটে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কি?

আর একটি কথা ব'লেই ছোঠগল্পের এই পরিচয়-পত্র শেষ করি। ছোটগল্প বল্‌বারও একটা আর্ট আছে, এবং আমার বিশ্বাস এ আর্ট নভেল লেখার আর্টের চাইতেও কঠিন। কারণ এ-জাতীয় গল্পের উপাদানকে আগে মনে সাকার ক'রে নিতে হয়, পরে ভাষায় মূর্ত করতে হয়। নভেলের মত এতে নানা কথা বল্‌বার অবসর নেই।

তবে এ আর্ট কেউ কাউকেও শেখাতে পারে না। নিজের কল্পনাকে কি উপায়ে সাকার করা যায়, তা' লেখক স্বয়ংই আবিষ্কার করবেন। ছোটগল্পের বিষয়ও যেমন বিচিত্র, তার আর্টও তেমনি বিভিন্ন।

ছোটগল্প যে গানও হ'তে পারে, ছবিও হ'তে পারে, তার পরিচয় আমাদের এই গল্প-সংগ্রহেই পাবেন; এবং বলা বাহুল্য যে, গান গাইবার আর্ট ও ছবি আঁক্‌বার আর্ট সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উপকথা সম্বন্ধে প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। উপকথা মাত্রেই রূপকথা—ও-শব্দের সংস্কৃত অর্থে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আদরিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকীল কুঞ্জবিহারী বাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন—"মুখুয্যে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি না কি ভারি ধূমধাম হবে। বেনারস থেকে বাই আস্‌ছে, কলকতা থেকে খেম্‌টা আস্‌ছে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি ?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"কি রকম ? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম ? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধ'রে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার ?—আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর ?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে বন্ধুবাৎসল্যে কুসুমের মত কোমল, ইহা যে তাঁহার সঙ্গে কিছু দিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই জানিয়াছে। উকীলবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুয্যে মশায় ? আমরা কি সে ভাবে বলছি ? এ জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে ? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জে যাবেন কি।"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন—বলিলেন, "ভায়ারা, ব'স।"—বলিয়া সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।—উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল

দুটো দিন কাছারী কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অতদূর যাওয়া ত সোজা নয়! ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী ক'রে যেতে হ'লে যেতে দু'দিন আসতে দু'দিন। পাল্কী ক'রে যাওয়া—সেও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দু'জনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই, মুখুয্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতী-টাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দু'জনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন—"এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই ?—মহারাজ নরেশচন্দ্র ত আমার আজকের মক্কেল নন—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।"

কুঞ্জবাবু বলিলেন—"দেখলে হে ডাক্তার, আমি ত বলেই ছিলাম—অত ভাবছ কেন, মুখুয্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুয্যে মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। না গেলে ছাড়ছিনে।"

"যাব বৈ কি ভায়া—আমিও যাব। তবে আমার ত বাই-খেমটা শোনবার বয়স নেই—তোমরা শুনো। আমি মাথায় এক পগগ বেঁধে, একটি খেলো হুঁকো হাতে ক'রে লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে, কে না খেলে, দেখব—তদারক ক'রে বেড়াব। আর তোমরা ব'সে শুনবে—'পেয়ালা মুঝে ভর দে'—কেমন ?"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতে আহ্নিক পূজাটা মুখুয্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা-সমাপন করিয়া, জলযোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ-কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, "প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল

শ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিন দিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বেও আবশ্যক হইলে তিনি কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। মানুষটি লম্বা ছাঁদের—রংটি আর একটু পরিষ্কার হইলেই গৌরবর্ণ বলা যাইতে পারিত। গোঁপগুলি মোটা মোটা—কাঁচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সম্মুখভাগে টাক আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভাসা ভাসা। হৃদয়ের কোমলতা যেন হৃদয় ছাপাইয়া, এই চক্ষু দুইটি দিয়া উছলিয়া পড়িতেছে।

ইঁহার আদিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারী করিতে আসেন, তখন এ দিকে রেল খোলে নাই। পদ্মা পার হইয়া কতক নৌকাপথে, কতক গরুর গাড়ীতে, কতক পদব্রজে আসিতে হইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটি ছিল। সহায়-সম্পত্তি কিছুই ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ হাতে খাইয়া মোক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। এখন সেই জয়রাম পাকা দালানকোঠা করিয়াছেন, বাগান করিয়াছেন, পুকুরের হস্তী ছিল অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজও কিনিয়াছেন। যে সময়ের কহ হস্তী বিক্রয় তখন এ জেলায় ইংরাজীওয়ালা মোক্তারের আবির্ভাব হইয়া ফিরিয়া আসিয়া জয়রাম মুখুয্যেকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। তখনও ইাছে—এখনও প্রধান মোক্তার বলিয়া গণ্য।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্র মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছি রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। সেকালে হাকিমেরা একটু অত্যাচার করিলেই মুখুয্যে মহাশয় রাগিয়া চেঁচাইয়া অনর্থপাত তুলিতেন। এক দিন এজলাসে এক ডেপুটীর সহিত ইঁহার বিলক্ষণ বচস লেই যায়। বিকালে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মঙ্গলা গাই বালো, হাতীর প্রসব করিয়াছে। তখন আদর করিয়া উক্ত ডেপ র টাকা নিয়ে যাবে?" নামকরণ করিলেন। ডেপুটীবাবু লোক পরম্পরা। তাহার নাম—আদরিণী।

লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ম্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্প-কাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক-বালিকা আসিয়া বৈঠকখানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল—"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক—তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটিতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দুরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল…শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে রাজ-হস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

* * * * * *

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালে মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরের অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকর্দ্দমা ও বিষয়-সংক্রান্ত দুই চারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুখুয্যে মশায়, ও হাতীটি কার?"

মুখুয্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমার হাতী! কৈ, ও হাতী ত কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন—"আপনি কিনেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে বল্লেন, আমার হাতী ?"

বিনয় কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি, আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপনার বৈ আর কার ?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল! কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নূতন নিয়মে পাশ করা শিক্ষিত মোক্তারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। শিথিল নিয়মে আইনব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে যত উপার্জ্জন করিতেন, এখন তাহার অর্দ্ধেক হয় কি না সন্দেহ। অথচ ব্যয় প্রতি বৎসর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তাঁহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ—বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কর্ম্ম করিবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে—সেটি যদি কালক্রমে মানুষ হয়, এইমাত্র ভরসা।

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আর সে অনুরাগ নাই—বড় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকরা মোক্তারগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামলা মাথায় দিয়া (মুখোপাধ্যায় মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন, সেকালে মোক্তারগণ শামলা ব্যবহার করিতেন না) তাঁহার প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া ফর্-ফর্ করিয়া ইংরাজিতে হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। পার্শ্বস্থিত ইংরাজিজানা জুনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন,—"উনি কি বলছেন ?"—জুনিয়ার তর্জ্জমা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের

জবাব মুখেই রহিয়া যায়—নিষ্ফল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বে হাকিমগণ মুখুয্যে মহাশয়কে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাকিমগণ আর তাহা করেন না। ইহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজী জানে না, সে মনুষ্যপদবাচ্যই নহে। এই সকল কারণে মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছিলেন, কর্ম্ম হইতে এখন অবসর গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সুদ হইতে কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। প্রায় ষাট বৎসর হইল চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি যদি মানুষ হইত—দুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত—তাহা হইলে এত দিন কোন্ কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়ীতে বসিয়া হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশী দিন চলে না। তথাপি আজিকালি করিয়া আরও এক বৎসর কটিল।

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দ্দমার আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। একজন নূতন ইংরাজ জজ আসিয়াছেন—তাঁহারই এজলাসে বিচার।

তিন দিন যাবৎ মোকর্দ্দমা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া "জজ-সাহেব বাহাদুর ও এসেসার মহোদয়গণ" বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতাশেষে এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিলেন—জজসাহেবও তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি দিলেন।

জজ সাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র বাঁধিতেছেন, এমন সময় জজ সাহেব পেস্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ উকিলটির নাম কি?"

পেস্কার বলিল—"উঁহার নাম জয়রাম মুখার্জ্জি। উনি উকীল নহেন, মোক্তার।"

প্রসন্নহাস্যের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"আপনি মোক্তার?"

জয়রাম বলিলেন—"হাঁ হুজুর, আমি আপনার তাঁবেদার।"

জজ সাহেব পূর্ব্ববৎ বলিলেন—"আপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়াছিলাম আপনি উকীল। যেরূপ দক্ষতার সহিত আপনি মোকর্দ্দমা চালাইয়াছেন আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানকার একজন ভাল উকীল।"

এই কথাগুলি শুনিয়া মুখোপাধ্যায়ের সেই ডাগর চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া

গেল। হাত দুটি জোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"না হুজুর, আমি উকীল নহি—আমি এক জন মোক্তার মাত্র। তাও সেকালের শিথিল নিয়মের এক জন মূর্খ মোক্তার। আমি ইংরাজী জানি না, হুজুর। আপনি আজ আমার যে প্রশংসা করিলেন, আমি জীবনের শেষ দিন অবধি তাহা ভুলিতে পারিব না। এই বুড়া ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোর্টের জজ হউন"—বলিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া মোক্তার মহাশয় এজলাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ইহার পর আর তিনি কাছারী যান নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্যবসায় ছাড়িয়া কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। ব্যয় যে পরিমাণে সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া উঠে না। সুদে সঙ্কুলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

এক দিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইঁহাকে বলিতেছিল—"হাতীটি আর কেন, ওকে বিক্রী ক'রে ফেলুন। মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেঁচে যাবে।" কিন্তু মুখুয্যে মহাশয় উত্তর করিয়া থাকেন—"তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী ক'রে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন :—

হস্তী ভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তরে গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩৲ টাকা মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১৲ এবং মাহুতের খোরাকী ৷৷০ একুনে ৪৷৷০ ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার), চৌরার ফরাস

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে, এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে ১৫।২০ টাকার বেশী আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫৲।৭৲ টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল।

বড়বধূ মেজবধূ অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাস পরেই আর দুইটি জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে।

এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। নানা স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে, কিন্তু ঘরবর মনের মত হয় না; যদি ঘর-বর মনের মত হইল, তবে তাহাদের খাঁই শুনিয়া চক্ষুস্থির হইয়া যায়। কন্যার পিতা এ সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করিয়া তাস-পাশা খেলিয়া, ফুলুট বাজাইয়া বেড়াইতেছে। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়োরই ঘাড়ে।

অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল-এ পড়িতেছে, খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা দুই হাজার টাকা চাহে; নিজেদের খরচ পাঁচশত—আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়।

কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর শুধু ত একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে?

এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি এ পরীক্ষা দিয়াছিল, সেও ফেল হইয়াছে।

বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন—"মুখুয্যে মহাশয়, হাতীটাকে বিক্রী ক'রে ফেলুন—ক'রে নাতনীর বিবাহ দিন। কি করবেন, বলুন। অবস্থা বুঝে ত কাজ করতে হয়! আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করুন।"

আমি মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন না। মাটীর পানে চাহিয়া ম্লানমুখে এই কেবল চিন্তা করেন আর মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

চৈত্রসংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু বাছুর, ঘোড়া, হাতী, উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন—"হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রী হয়ে যাবে এখন। দুহাজারে কিনেছিলেন এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"কি ক'রে তোমরা এমন কথা বল্‌ছ ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন—"আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা মেয়েই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায় ? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যায়, তার আর উপায় কি ? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে, মায়া হয়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রয় করলেই হয়। যে বেশ আদরযত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন—"তোমরা যখন সবাই বলছ, তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভাল খদ্দের ঠিক কর—তাতে দামে যদি দু'পাঁচশ টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই জম-জমাট বেশী। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটি সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন অতি প্রত্যূষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে হস্তী আহার করিতেছে। বাটীর মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজল-নেত্রে বাগানে হস্তীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়াছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ী হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলি খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা তুলিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে, তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস।"—প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল দুঃখে এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতী চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শূন্যমনে বৈঠকখানার ফরাস

বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইল, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্ন-ব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভকার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইবে। হস্তি-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্ মস্ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

বাড়ীর লোকে বলিতে লাগিল—"আহা, আদর রোগা হয়ে গেছে। বোধ হয়, এ ক'দিন সেখানে ভাল ক'রে খেতে পায়নি ওকে দিনকতক এখন বেশ ক'রে খাওয়াতে হবে।"

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল—কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে?

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। একজন বলিলেন—ঐ যে আবার মুখুয্যে মশায় বল্লেন—'আদর, যাও মা, মেলা দেখে এস'—তাই বিক্রী হ'ল না! উনি ত আর আজকালকার ভুঁইফোঁড় ব্রাহ্মণ নন। ওঁর মুখ দিয়ে যে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে, সে কথা কি নিষ্ফল হবার যো আছে! কথায় বলে—ব্রহ্মবাক্য বেদবাক্য।"

বামুনহাটের মেলা ভাঙ্গিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রয় হয় নাই—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেইখানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল—"দাদামশায়, আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন—"কি বল্লি? কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ দাদামশায়। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগল।"

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন—"জান্‌তে পেরেছে। ওরা অন্তর্য্যামী কি না। এ বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর ক'রে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তর্য্যামী—তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিস নি?—খুকীর বিয়েটা হয়ে যাক। তার পর, তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব—রসগোল্লা নিয়ে যাব, যত দিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন বিকালে একটি চাষী লোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দিল।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যমপুত্র লিখিয়াছে—"বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎসা করিয়াছে—কিন্তু কোনও ফল হয় নাই—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায়, তা আবেগ,

শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটু জমী বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা আবশ্যক।"

বাড়ীর মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"আমার গাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছটফট করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"

তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী ছাড়িল। জ্যেষ্ঠপুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাষী লোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন—সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতর পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ।

বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হাস্তনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন—"অভিমান ক'রে চ'লে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম ব'লে—তুই অভিমান ক'রে চ'লে গেলি?"

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।



সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

তীর্থের পথে

[১]

মহামায়া বলিল, "তুমি মর!"

যোগমায়া বলিল, "আমি ত অনেক দিন মরিয়াছি। আজ তোর কথায় নূতন করিয়া মরিতে পারিব না।"

মহামায়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর কন্যা। সে তাহার স্বামী রামদয়াল ঘোষালের সহিত রুগ্ন পিতাকে দেখিতে আসিয়াছিল। যোগমায়া বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সে বিধবা। বিশ্বেশ্বরের পরিবারে থাকিয়াই সে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতেছিল।

মহামায়ার বয়স উনিশ, যোগমায়া তাহার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় হইবে। মহামায়া সুন্দরী, যৌবনের উচ্ছলিত তরঙ্গে তাহার রূপরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। মহামায়ার রূপের গাঙ্গে ভরা জোয়ার। আর বালবিধবা যোগমায়াকে রূপসী বলিলে হয় ত সঙ্গত হইবে না। কিন্তু তাহার চঞ্চল নয়নের দিকে চাহিলে দৃষ্টি সহজে ফিরিতে চাহিত না। যোগমায়ার যৌবনে খনও ভাঁটা পড়ে নাই। কিন্তু মহামায়ার মত তাহার ভরা জোয়ারও নয়; বরং তটপ্লাবিনী খর-বাহিনী বন্যার সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য ছিল।

আকৃতির ন্যায় উভয়ের প্রকৃতিও অত্যন্ত বিভিন্ন ছিল। মহামায়া গম্ভীর স্থির, ধীর, আপনাতে আপনি নিমগ্ন। যোগমায়া চঞ্চল, অস্থির, অধীর, আপনার বিফলতায় আপনি অসন্তুষ্ট। বৈধব্যচিহ্নের সহিত, তাহার রূপের সহিত, এই চাঞ্চল্য শোভা পাইত না। পক্ষান্তরে মহামায়ার সৌন্দর্য্য যেন এই যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্যের অভাবে প্রাণ-হীন হইয়া থাকিত। মহামায়ার সৌন্দর্য্য মলিন; যোগমায়ার রূপেও বিশেষত্ব ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের কোনও আবেগ,

উচ্ছ্বাস যখন সহসা যোগমায়ার মুখে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে সূর্য্যকরসমুজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মত মনোহর শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

দুই ভগিনীতে কথা হইতেছিল। মহামায়া স্থির, অচঞ্চল। অপরা অস্থির চঞ্চল,—সমীরসংক্ষুব্ধ তটিনীর মত আপনার চাঞ্চল্যে আপনি কম্পিত তরঙ্গিত হইতেছিল।

মহামায়া বলিল, "আমার জন্য বলিতেছি না; এখনও বুঝিয়া দেখ।"

যোগমায়া বলিল, "আমি তোমার নিধি কাড়িয়া লইব না!"

মহামায়ার মুখে তাহার হৃদয়ভাব অনুসন্ধান করিলে কেহ বুঝিতে পারিত না সে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ, না বিরক্ত। কিন্তু যোগমায়ার হাস্যকিরণদীপ্ত মুখে চোখে কৌতুক উচ্ছলিত হইতেছিল।

যোগমায়া বলিল, "তুই সাবধানে পাহারা দিস, নহিলে আমি চুরি করিব।"

মহামায়া বলিল, "চুরি করিয়া কোথায় বমাল রাখিবি? আমার জিনিস আমারই থাকিবে, তোর অদৃষ্টে কেবল চোর অপবাদ—"

যোগমায়া বলিল, "সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে।"

অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া যোগমায়া চাহিয়া দেখিল, রামদয়াল সেই দিকে আসিতেছেন। সে ছুটিয়া পলাইল।

রামদয়াল সন্নিহিত হইলে মহামায়া বলিল, "তুমি বাড়ী যাও।" রামদয়াল দেখিল, মেঘমেদুর অম্বরে সন্ধ্যার অন্ধকারের মত মহামায়ার গম্ভীর মুখে কিসের ছায়া;—তাহা উদ্বেগের না আশঙ্কার, তাহা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। কখনও সে তা পারিত না। রামদয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মহামায়া বলিল, "দু'জনে ঘর সংসার ছাড়িয়া কত দিন এখানে থাকিব? বাবাকে ফেলিয়া আমি ত যাইতে পারিব না, তুমি যাও।"

রামদয়াল বলিল, "তা কি হয়? তোমাকে রাখিয়া রুগ্ন শ্বশুরকে ফেলিয়া চলিয়া গেলে লোকে কি বলিবে?"

মহামায়ার মুখে চোখে একটু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি শরতের শুভ্র মেঘের বিদ্যুতের মত ক্ষণিক ও ক্ষীণ, কিন্তু বর্ষার বিদ্যুতের মত তীব্র। রামদয়াল কিছু বুঝিতে পারিল না। সে গত কয়েক দিবস হইতে কেমন অন্যমনস্ক হইয়াছিল, আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার

পর, মহামায়ার এই প্রহেলিকা দেখিয়া একটু অবাক হইয়া আবার অন্যমনস্ক হইতেছিল। এমন সময় সে মহামায়ার কণ্ঠ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল।

মহামায়ার কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল, "লোকে কি বলিবে—তাই ভাবিয়া চ তোমার ঘুম হয় না; যোগমায়া কি বলিবে,—তাই—"

ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্য্যোগে ঘোর নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে মুক্ত প্রান্তরে দূরে হসা বজ্রপাত হইলে পথিক যেমন বজ্রশব্দে চমকিয়া উঠে, আর চপলার চকিত আলোকে পলকের মধ্যে তাহার উদ্‌ভ্রান্ত নয়নের সমক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়, মহামায়ার এই ক'টি কথা শুনিয়া রামদয়াল তেমনই চকিত হইয়া উঠিল, মহামায়ার কণ্ঠোচ্চারিত যোগমায়ার নামে সহসা তাহার জীবনপথের সম্মুখে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অস্পষ্ট ছবির আভাস দেখিতে পাইল।

রামদয়াল আত্মস্থ হইবার পূর্ব্বেই মহামায়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। রামদয়াল চাহিয়া দেখিল মহামায়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার চর্ম্মচক্ষুর উপর এই প্রকৃত দৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রজালমুগ্ধের ন্যায় সে অ... এক নূতন ছবি দেখিতেছিল! তাহাকে আসিতে দেখিয়া যোগমায়া যখন ছুটিয়া পলায়, তখন রামদয়াল তাহাকে দেখিয়াও দেখে নাই; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য, তাহা যে দেখিবার মত তাহাও রামদয়ালের মনে হয় নাই। কিন্তু এখন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পলায়মানা অসম্বৃতকেশবাসা যোগমায়ার চিরপরিচিত মূর্ত্তি নিতান্ত নবপরিচিতের মত, নিত্যনূতনের মত, তাহার নয়নপটে অনবরত প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

[২]

রামদয়াল, ইতিপূর্ব্বে, মহামায়ার সহিত এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এখন তাহা নিতান্ত কঠোর সত্যে পরিণত হইল। মহামায়ার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বরে জাগিয়া সে দেখিল, তাহার হৃদয়ের সিংহাসন শূন্য, সেখানে মহামায়া নাই। আর একজন বিনা আহ্বানে, অজ্ঞাতসারে, মহামায়ার শূন্য সিংহাসন কখন অধিকার করিয়াছে। সে বিস্মিত বিরক্ত বিচলিত হইল বটে, কিন্তু কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না।

একবার মনে করিল, চলিয়া যাই। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হইল না। পীড়িত শ্বশুরকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের আর কেহ ছিল না; বিষয়আশয়ের কি বন্দোবস্ত হয়, তাহাও দ্রষ্টব্য বটে।

কিন্তু এ দিকে? রামদয়াল ভাবিল, এ হয় ত স্বপ্ন। এ হয় ত ক্ষণিক। এই মরীচিকায় আমি কি সত্যই মুগ্ধ হইব?

রামদয়াল আপনার মনে আপনার মনের মত বিবিধ যুক্তির রচনা করিল; শেষে সিদ্ধান্ত করিল, এক দিকে সম্ভাবনা, অন্যদিকে কর্ত্তব্য। সম্ভাবনার ভয়ে কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব কেন? মন কি এত লঘু? জীবন কি এত অসার? সংযম কি এত কঠোর? মানসিক ব্যাধি কি এত দুঃসাধ্য? তাই যদি হয়, আজ না হয় পলাইয়া বাঁচিলাম; কাল? পৃথিবীতে কোথায় প্রলোভন নাই? কোথায় গিয়া নিশ্চিন্ত হইব।

এই সব তর্কজালের অন্তরালে যে যোগমায়া লুকাইয়াছিল, তাহার কামনা তাহার দর্শনলালসাই যে রামদয়ালের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে এতটা উৎসাহিত করিতেছিল; যে আত্মসংযমের ভরসায় নির্ভর করিয়া সে আত্মজয়ের আশা করিতেছিল, তাহাই যে অসংযমের নামান্তর, তাহা রামদয়াল বুঝিতে পারিল না।

মহামায়া বুঝিল, কিন্তু উপায় ছিল না। যোগমায়া বুঝিল, কিন্তু ফিরিতে পারিল না। রামদয়াল বুঝিয়াও বুঝিল না, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিল। ফলে কিন্তু মরিল মহামায়া।

মুমূর্ষুর অন্তিম-শয্যায়, মৃত্যুচ্ছায়ার আলো-আঁধারে, পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিন জনের কেহ অবসন্ন হইত না। আশায় নিরাশায়, সংশয়ে যাতনায় শঙ্কায় ভাবনায় তিন জনের হৃদয় মথিত হইতেছিল; তিন জনেই নীরবে স্রোতে ভাসিয়া চলিল, কেহ আর কিছু ভাবিল না।

[৩]

যোগমায়ার চঞ্চলতা কোথায় গেল? তাহার কামনাপূর্ণ হৃদয় এখন নিস্তরঙ্গ। সেই চঞ্চল নয়ন এখন প্রশান্ত, তাহাতে আর কৌতুকের রশ্মি নাই। সে হাস্যদ্যুতি কোথায় অন্তর্হিত হইল? অতৃপ্তির চাঞ্চল্য গেল, কিন্তু তৃপ্তির সে সান্ত্বনা, সে শান্তি কই? তবু এই পরিবর্ত্তনে যোগমায়া যেন সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

মহামায়াও স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য হারাইল। তাহার সৌন্দর্য্যের সহিত গাম্ভীর্য্যের যে অসঙ্গতি ছিল, তাহা দূর হইল। মহামায়া এখন প্রায় হাসে, সময়ে সময়ে হাসিয়া আকুল হয়, কেন? জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হারাইয়া সে চঞ্চল হইতেছিল। জীবনের নিষ্ঠুরতায় দলিত পিষ্ট ব্যথিত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা করিল, সুখ যায় যাক, শান্তি ছাড়িব না।

আপনার ঘর পুড়িতে দেখিয়া যে নিকটে দাঁড়াইয়া হাসে, সে জানে, দু'দশ কলসী জলে এ আগুন নিভিবে না! তবু না কাঁদিয়া হাসে কেন? হায় বিড়ম্বনা।

[৪]

এক দিন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া মহামায়া ঢুলিতেছিল।— আর জাগিয়া থাকিতে পারে না। মনে করিল, হয় রামদয়ালকে নয় যোগমায়াকে ডাকিয়া দিয়া নিজে একটু ঘুমাইবে। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় গেল। রামদয়ালের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল, গৃহমধ্যে অন্ধকার। কথোপকথনের মৃদু অস্পষ্ট শব্দ মহামায়ার কানে আসিতেছিল। নীরবে দ্বারে হাত দিল। বুঝিল, দ্বার মুক্ত। দরজা একটু মুক্ত করিয়া দেখিল, ঘোর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ক্রমে সেই অন্ধকারে দেখিল, গৃহমধ্যে যোগমায়া ও রামদয়াল। মহামায়া না দেখিলেও তাহা বুঝিতে পারিত। তবু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। সেই গাঢ় অন্ধকার তাহার চক্ষে গাঢ়তম হইয়া আসিতেছিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল মহামায়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। সহসা মহামায়ার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "বেশ!"

গৃহমধ্যে কণ্ঠস্বর নীরব হইল। মহামায়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া পিতার শয্যাতলে আসিয়া বসিল। তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছিল;— নয়নের সমস্ত অশ্রু ঢালিয়াও তাহার জ্বালা ভুলিতে পারিল না।

মহামায়া সুপ্ত না জাগরিত, তাহা আপনিই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার একবার মনে হইল, সোপানে কাহার পদশব্দ! তাহার পর যেন শুনিতে পাইল, কে ধীরে ধীরে সদর-দরজা উন্মুক্ত করিল! সে স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া

বসিল ; ধীরে ধীরে প্রদীপ হইতে একটি শলিতা জ্বালিয়া লইয়া পার্শ্বের গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল, দ্বার মুক্ত। কম্পিত হস্তে শলিতাটি ধরিয়া ভিতরে চাহিল, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত সোপানমূলে আসিয়া দাঁড়াইল ; এই সময়ে তমোময়ী যামিনীর দীর্ঘনিশ্বাসের মত সহসাগত পবন-বেগে শলিতাটি নিভিয়া গেল। অন্ধকারে প্রাচীর ধরিয়া সে নীচে নামিল ;—অন্ধকারে বাহির-দরজার দিকে যাইতে লাগিল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া উন্মুক্ত-দ্বারপথে একাদশীর চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়াছে, সম্মুখে অনন্তপ্রসারিত নক্ষত্রভূষিত গগনের কিয়দংশ, আর তাহার নিম্নে আলোক ও আঁধারে অস্পষ্ট গ্রামপথ। মহামায়া আর দাঁড়াইতে পারিল না, ছিন্ন ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একবার মনে করিল 'এ যাতনা সহি কেন ? মরিলে ত জুড়াইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে পীড়িত পিতার কি হইবে ? আবার ভাবিল, আর একবার না দেখিয়া মরিব ? কিন্তু আর কি দেখা পাব ?'

তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল,—কৃতাঞ্জলি হইয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিল, "যাও,—মরিবার আগে একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে !"

[৫]

এগার বৎসর অতীত হইয়াছে। স্বামিপরিত্যক্তা পিতৃহীনা মহামায়া এই কয় বৎসর শোকে দগ্ধ ও দুঃখে জীর্ণ হইয়াও বাঁচিয়া আছে। সংসারে তাহার কোনও অবলম্বন ছিল না, বন্ধন ছিল না। কেবল এক আশাবৃন্তে তাহার জীবনকুসুম সম্বদ্ধ হইয়াছিল ;—মরিবার আগে অভাগীর অদৃষ্টে কি একবার তাঁহার চরণ-দর্শন ঘটিবে না ?

এই সময়ে গ্রামে একজন পুরুষোত্তমের সেথো উপস্থিত হইল। গ্রামে গ্রামে কোলাহল পড়িয়া গেল। সন্নিহিত সাত আটখানি গ্রামের নরনারী মিলিয়া পুরুষোত্তমতীর্থে দারুব্রহ্ম-দর্শনে যাত্রা করিল।

মহামায়াও তাহাদের সঙ্গী হইল। মনে মনে ভাবিল, তাঁহার দর্শন পাইলাম না, ঠাকুরের চরণ পাইব কি ?

[৬]

দূর পথ। যাত্রীর দল পদব্রজে যাত্রা করিল ক্রমে তাহারা মেদিনীপুর পার হইয়া উৎকলের সীমায় প্রবেশ করিল।

যাত্রার দশ দিন পরে যাত্রীর দল একটি চটীতে উপস্থিত হইল। রথের যাত্রী চলিয়াছে; পথে জনতার সংখ্যা হয় না। মহামায়ার গ্রামস্থ যাত্রীর দল যখন রাসপুরের চটীতে পঁহুছিল, তখন সেখানে বিসূচিকা বড় প্রবল। তীর্থ-যাত্রীর মৃতদেহে ক্ষুদ্র গ্রাম পরিপূর্ণ। পথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে, সরোবরতীরে, সর্ব্বত্র মৃতদেহ। কেহ বা অর্দ্ধমৃত, সঙ্গীরা ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ পথে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। দলের কেহ পীড়িত হইলে ফেলিয়া রাখিয়া যায়। পরিত্যক্ত হতভাগ্য অভীষ্ট তীর্থের পথেই পরম ও চরম তীর্থে চলিয়া যায়।

চটীতে স্থানাভাব। অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পর একটি দোকানে মহামায়ার গ্রামস্থ সকলে আশ্রয় লইলেন।

সেই দিন মধ্যরাত্রে সেই দোকানে পূর্ব্বাগত যাত্রীর দলের এক জন পুরুষ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইল। মহামায়ার গ্রামের দল ভয়ে চটী পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।

সকলে বাহিরে সমবেত হইলে দেখা গেল, মহামায়া দলে নাই।

বৃদ্ধ রামহরি চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "মহামায়া কই? মহামায়া!"

একজন বলিল,—"সে চটিতে পড়িয়া আছে, তাহার উঠিবার শক্তিও নাই। তাহাকেও রোগে ধরিয়াছে।"

এ পথের এই দস্তুর। কোন্ পথেই বা নয়? আপনাকে বিপন্ন করিয়া কে পরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবে? যাত্রীর দল চলিয়া গেল। মহামায়া একাকিনী অসহায়া, মরণাহতা, সেই চটীতে পড়িয়া রহিল।

চটীর এক প্রান্তে মহামায়া ও অন্য প্রান্তে অপর দলের সেই রুগ্ন যাত্রী—উভয়েরই জীবন বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মহামায়াকে দেখিবার কেহ ছিল না, কিন্তু এক বর্ষীয়সী রমণী রোগাক্রান্ত পুরুষের সুশ্রূষায় নিরত ছিল। অপরিচিতার কি প্রাণের ভয় নাই? অথবা যে মৃত্যুশয্যায়, সে ইহার প্রাণাধিক?

মহামায়া যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার

কাতর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া অপরিচিতা প্রদীপ হস্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল, মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তোমার অদৃষ্টে জগন্নাথ দর্শন নাই।"

মহামায়া বলিল, "তাহাতে দুঃখ নাই। মরণেও দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া—"

অপরিচিতা বলিল—"কাহাকে? মরণেও যদি দুঃখ নাই, তবে তোমার এ দুঃখ কিসের?"

"বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম, মরিবার আগে তাঁহার পদধূলি লইয়া মরিব। মরি, তাতে দুঃখ নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মরিলাম কই?"

অপরিচিতা প্রদীপ রাখিয়া মহামায়াকে তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে মহামায়ার শয্যা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

মহামায়া মনে করিল, এই শেষ—বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইতেছে।

সেই গৃহের অপর প্রান্তে, আর একজন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে মহামায়ার শয্যা রাখিয়া, অপরিচিতা প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। তারপর মহামায়াকে বলিল, "দেখ!"

মহামায়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "কি?"

সে বলিল "তোমার স্বামী।"

মহামায়া চমকিয়া উঠিয়া বসিতে গেল, পারিল না। আবার শয্যায় পড়িয়া সবিস্ময়ে সাগ্রহে বলিল, "সে কি?"

অপরিচিতা কহিল, "তোমার স্বামী রামদয়াল ঐ মৃত্যুশয্যায়। দেখ।"

মহামায়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "আমি যে আর দেখিতে পাই না,—দেখাও, দেখাও—তুমি কে?"

অপরিচিতা মহামায়াকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—"দেখ। তোমার স্বামীকে দেখ—আমি যোগমায়া—"

মহামায়া চীৎকার করিয়া উঠিল;—যোগমায়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় অবিচল। সে মহামায়াকে শয্যায় শায়িত করিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।

মহামায়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "তাঁর পদধূলি দাও, মরিবার আগে দাও দিদি, আমি সুখে মরি।"

যোগমায়া মুমূর্ষু রামদয়ালের পদধূলি আনিয়া তাহার মাথায় দিল।

রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?—কে ?"

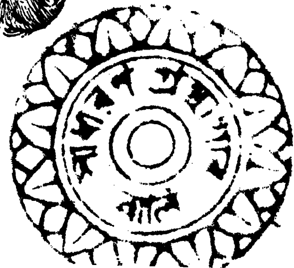
মহামায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, নয়নদ্বয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ইঙ্গিতে বুঝাইল, রামদয়ালের শয্যার কাছে লইয়া যাও।

যোগমায়া তাহার শয্যা আরও নিকটে টানিয়া আনিল,—মুমূর্ষুকে বলিল, —"চিনিতে পার ? মহামায়া—"

রোগী একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রোগী হস্ত প্রসারিত করিল। যোগমায়া মহামায়ার শীতল হাতখানি লইয়া মুমূর্ষুর শীতল হস্তে সমর্পণ করিল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া অনন্ত পথে যাত্রা করিল।

তাহার পর বহুকাল সেই চটির পথের ধারে একটা পাগলী বেড়াইত। তাহার মুখে আর অন্য কথা ছিল না। যাত্রীর দল সবিস্ময়ে শুনিত,—পাগলী বিড় বিড় করিয়া বকিতেছে, "বড় সুখ ! বড় সুখ !"





সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

যে হেতু ও সে হেতু

[১]

দীনু সরকারের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সংসারের ঘটনাবলীর সচরাচর একটা কারণ থাকে। কোন ঘটনার একটার অধিক কারণও থাকে, এবং কোনটার বিশেষ কারণ আপাততঃ থাকে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পায়।

যে হেতু বিবাহ করিলে প্রায় পুত্র কন্যা জন্মিয়া থাকে, অতএব দীনুর পিতার ভাগ্যে দীনু জন্মিয়াছিল। এবং সে হেতু দীনুর মাতার পুত্রসাধ মিটিয়াছিল। অতএব স্ত্রীর আহ্লাদ দেখিয়া দীনুর পিতাও অপর্য্যাপ্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

সে হেতু মাতৃস্নেহ হইতে গাঢ়তর স্নেহ জগতে বিরল, অতএব দীনু আদরে বাড়িয়া 'বুদ্ধিতে খাট' হইয়াছিল। দীনু দেখিতে অতি সুশ্রী, কিন্তু তাহার পিতা মাতা কেহই সুশ্রী ছিল না। ইহার কারণ আপাততঃ কিছুই বুঝা যাইবে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইবে।

দীনুর পিতার, দীনুর মাতার ও স্বয়ং দীনু সরকারের ও পাওনাদার প্রভৃতির যুক্ত অদৃষ্টক্রমে দীনুর পিতার হঠাৎ কাল হইয়া গেল। যে হেতু স্বামী মানব-লীলা-সংবরণ করিলে স্ত্রী বিধবা হইতে বাধ্য, সে হেতু দীনুর মাতা বিধবা হইল।

সামান্যমাত্র অন্নের সংস্থান রাখিয়া দীনুর পিতা ভবধাম হইতে স্বর্গধামে গিয়াছিলেন। অতএব দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া অনাথা বিধবাকে দীনুর ভরণপোষণ ও অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিক্ষা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দীনু বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত উর্দ্ধগতি অবলম্বন করিয়া দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিল, "দীনু, লেখা পড়া ছাড়িয়া দাও।" অতএব দীনু সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিল।

দীনুকে সকলেই ভালবাসিত।

[২]

যে হেতু অতি বৃদ্ধ হইলে প্রায় বাঁচে না, সে হেতু দীনুর মাতা মরিয়া গেল। নুর মাতা মৃত্যুকালে দীনুকে দীনুরই হাতে সঁপিয়া গেল, যে হেতু আর কেহ ছল না।

মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া দীনু সন্ধ্যাকালে ভগ্ন বাটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কাঁদিল। য হেতু দীনুর বুদ্ধি নিতান্ত প্রখর ছিল না, এবং পূর্ব্ব হইতে দুঃখে, যত্নে, স্নেহে ালিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার অধিকমাত্রায় কাঁদিবারই কথা।

দীনুর যে গ্রামে বাস, সেই গ্রামের জমিদার অটল বসু ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ায়স্থ। দীনুর পিতার জীবদ্দশায় বসুজা মহাশয় অনেকবার দীনুকে ঘরজামাতা" করিবার অভিপ্রায়ে তস্য পিতার নিকট প্রস্তাবনা উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

ক্রন্দনাদি সমাধান করিয়া ও সংসারের শূন্যতা প্রভৃতি অনুভব করিয়া দীনু সরকার নত ও দুঃখ সন্তপ্ত-বদনে বসুজা মহাশয়ের বহির্বাটীতে মুণ্ডিত-স্তকে উপনীত হইল। যে হেতু অনেক বাকী খাজনা জমিদারের প্রাপ্য ছিল।

অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর-মুখশ্রী-যুক্ত যুবকের পরিচিত মস্তকে ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কশের অভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বসুজা মহাশয় দুঃখিত হইলেন; যে হেতু স্বার্থ ও নিঃস্বার্থস্বভাব উভয়ই দুঃখস্রোত-পরিচালনার উপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল।

[৩]

অতএব বসুজা মহাশয় বলিলেন, "দীনু, তোমার এই দুরবস্থার সময় আমি াকি খাজনার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না।"

দীনু যে হেতু করযোড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বসুজা মহাশয় পুনর্ব্বার ালিলেন, "দীনু, তোমার মাথার উপর এমন কেহই নাই, এবং সংসার বড় ভীষণ হান। তোমার বুদ্ধি কম, কিন্তু তুমি সুন্দর, সুশীল ও সচ্চরিত্র। এমন অবস্থায় তামাকে পুত্রপদে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছি।"

"যে হেতু আমার পুত্রসন্তান নাই, অতএব পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে সকলে ারামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে আমার একমাত্র আদরের কন্যা াতঙ্গিনীর ভবিষ্যতের অবস্থা ভাল না হইতে পারে। সে হেতু আমার ইচ্ছা

তোমাকে গৃহজামাতা করতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদিগের পুত্রসন্তানের মুখ দেখিয়া আমি মনের আনন্দে সংসার হইতে অপসৃত হই।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া বসুজা মহাশয় গোমস্তাকে বলিলেন, "দেখ, দীনু সরকার অদ্য হইতে আমার গৃহজামাতা, এবং বিষয়ের উত্তরাধিকারী ; যে হেতু তিন কুলে আমার কোন আত্মীয় স্বজন নাই। সে হেতু দীনুর পুরাতন বাটী ভূমিসাৎ করতঃ অচিরাৎ তাহার মাল মশলা সংগ্রহ করহ। উহা দ্বারা বাকি খাজনা শোধ হইবে। দীনুর স্থাবর সম্পত্তি দুই এক টাকা মূল্যের যাহা আছে, বেচিয়া খাতায় জমা কর।"

"যে হেতু দীনু এখন আমার উইল অনুসারে অত্রস্থ জমিদারীর মালিক হইবে এবং আমার গৃহজামাতা হইবে, সে হেতু তাহার পূর্ব্বপুরুষের পূর্ব্ব বাস-স্থানের চিহ্ন রাখা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

[৪]

গোমস্তা হুকুম পালন করিতে গেল। পিতৃ-মাতৃ-ভিটা-হীন দীনু স্বীয় অবস্থার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া বসুজার পুষ্করিণীর পাড়ে জল খাইতে গেল। যে হেতু এবংবিধ ব্যাপারে তাহার দারুণ তৃষ্ণা লাগিয়াছিল। দীনু বাল্যসখী মাতঙ্গিনীকে বড় ভয় করিত ; কারণ, মাতঙ্গিনী বয়সে দীনু অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট হইলেও, আয়তনে ও বলবুদ্ধিতে দীনু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সময় পাইলে সেই দীনুকে চড়টা, চাপড়টা, ইট পাট্‌কেলটা মারিত। যে হেতু তাহার স্মৃতি দীনুর মানসপটে অঙ্কিত ছিল, সে হেতু দীনুর অদ্য আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল।

সে হেতুই দীনু গাভীর ন্যায় অপর্য্যাপ্ত জলপান করিয়া গ্রাম্য স্কুলের দিকে গেল, এবং ভূতপূর্ব্ব শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বেশ্বরদা, বিবাহ হইলে স্ত্রী কি মারিয়া থাকে ?"

বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক তাবৎ বৃত্তান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে দীনুকে সম্বোধনকরিয়া বলিলেন, "দীনু বাবু, আপনার অদৃষ্ট ভাল। তামাক ইচ্ছা করুন।"

দীনু সরকার সে হেতু ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের সম্মুখে সভয়ে তামাকু পান করিল, এবং আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মাষ্টার পুনরপি বলিলেন, "যে হেতু আপনি ভবিষ্যতে পরগণা শিবহাটীর

নার মালিক, আপনার স্ত্রীর নিকট মারি খাইতে কোন আপত্তি থাপন করা উচিত হয় না, সে হেতু অধিক বলা বাহুল্য—"

দীনু আশ্বস্ত হইতে চেষ্টা করিল, যে হেতু অন্য কোনও উপায় ছিল না।

[৫]

বহু আড়ম্বরে, ঘোরতর বাদ্যভাণ্ডের সহিত একদা রাত্রিকালে দীনুর বিবাহ হইয়া গেল। যে হেতু বিবাহ রাত্রিকালে হইয়া থাকে।

সকলে সে হেতু বলিল, "দীনুর কপাল ভাল। পথের ভিখারী হঠাৎ এত বড় উচ্চপদস্থ হওয়া, ইহা কি আমার তোমার পক্ষে সম্ভব? এই জন্যই দীনুকে এত সুন্দর করিয়া বিধাতা গড়িয়াছিলেন; এই জন্যই দীনু এত সুধীর শান্ত; ওঃ! সেই হেতু।"

ইহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে দীনবন্ধুর শরণাগত হইল, এবং সে হেতু দীনু সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনাদি করিয়া চা খাওয়াইল। যে হেতু (ইহাও জানা থাকে যে) দীনু পূর্ব্বে অনেকের বাটীতে সকালে বিকালে চা খাইয়া আসিত।

বিবাহের কিছুদিন পরেই আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি দীনুকে বুঝাইয়া এবং কন্যা মাতঙ্গিনী দেবীকে দীনুর ভার সমর্পন করিয়া, এবং গোমস্তা পরমবৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দ দাসকে সাক্ষী রাখিয়া, বৃদ্ধ বসুজা বৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দীনুর মুখ শুখাইয়া গেল, যে হেতু তাহা বলা বাহুল্য। দীনু বলিল, "প্রতিপালক! এ সময়ে তীর্থে না গিয়া—"

মাতঙ্গিনী সরোষে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "চোপ্! বাবা তীর্থে যাবেন না আমাদের আঁচল ধ'রে বসে থাক্‌বেন?"

দীনু বলিল, "অবশ্য—সে কথা ঠিক—"

জামাতার উপর পুত্রীর প্রতাপ অন্তরে লক্ষ্য করিয়া বসুজা মহাশয় সানন্দে মালা জপ করিলেন, এবং বলিলেন, "দেখ নিতাই, আমাদের দীনু কি শান্ত ছেলে!"

নিত্যানন্দ সে হেতু বলিল, "প্রভুর ইচ্ছা—সকলই প্রভুর ইচ্ছা!" এবং চক্ষু উঠাইয়া স্বর্গের দিকে আরোপিত করিল।

সেইদিন বসুজা মহাশয় বৃন্দাবনে গেলেন, এবং যাইবার সময় কন্যাকে বলিলেন,—"মা, দীনুকে দেখো; তোমার পুত্রসন্তান হইলে আবার আসিব; দীনুকে দেখো, তার মাথার উপর কেহই নাই।"

কন্যা বলিল, "কোনও ভয় নাই, বাবা, তুমি যাও।"

সে হেতু বসুজা মহাশয় গেলেন।

[৬]

ক্ষীর, সর, নবনী, রোহিত মৎস্যাদি প্রচুরপরিমাণে সেবা করিয়াও দীনু ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। যে হেতু—কেবল খাইলেই যে সকলে হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা নহে।

সেইদিন মাতঙ্গিনী দীনুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ, তুমি রোগা হইতেছে, ইহার কারণ কি ?"

দীনু। বোধ হয়—যে হেতু আমার রোগা ধাত।

মাতঙ্গিনী। দেখ, আমার সঙ্গে চালাকী খাটিবে না,—তুমি চা ছাড়িয়া দাও; আর এত রাত্রি জাগিয়া ইহাদের সঙ্গে পাশা খেলিও না। ফের যদি কথা না শুন, তবে বুঝা যাইবে।

বাটীর মধ্যে চা বন্ধ হইয়া গেল, এবং সেইদিন হইতে আজ্ঞাধীন পরম-বৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ দাসের তদ্বিরে ইয়ারগণ সন্ধ্যার সময় ভদ্রাসনে আর প্রবেশ করিতে পারিল না।

সে হেতু দীনবন্ধু সন্ধ্যার সময় এবং পুনর্ব্বার সকালে, উপর্য্যুপরি নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিল। যে হেতু চা না খাইলে একটা কিছু খাওয়া চাহি, এবং তাহা না খাইলে নিদ্রাভিভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এ দস্তুর বন্ধ হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের পর মাতঙ্গিনী দাসীর রোষ বর্দ্ধিত দেখিয়া দীনু পূর্ব্বাপেক্ষা ভয় পাইল। এবং একদিন নিদ্রার আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া দীনু দুইটা কঠিন চাপড় খাইল।

এবং মাতঙ্গিনী রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিল, "তুমি নিতান্ত অকর্ম্মা এবং অলস। তোমার হাতে পড়িয়া আমার ইহকাল পরকাল গেল। হায়! হায়! বাবা কি অন্য পাত্র খুঁজিয়া পান নাই ?"

যে হেতু মাতঙ্গিনী এবম্প্রকারে ঘোররবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে হেতু দীনুকে তাহার পদযুগল স্পর্শ করিয়া কাতর স্বরে বলিতে হইল, "ওগো! তুমি কেঁদ না; আমি দরিদ্র, অভাগা, পথের ভিখারী; ইহার উপর অশান্তি ও ক্রন্দন প্রভৃতির যন্ত্রণা সহ্য করিতে আর পারি না, ওগো! থাম।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "তবে তুমি অত ঘুমাইও না। বরঞ্চ আমি ঘুমাইলে মাথায় বাতাস করিও।"

[৭]

সে হেতু দীনু প্রতিদিন মাতঙ্গিনী শুইলে তাহার মাথায় বাতাস করিত, এবং বাতাস করিয়া বিশ্রান্ত হইয়া পড়িত।

তাহারই মধ্যে একদিন মাতঙ্গিনীর ঘোর নিদ্রাবস্থা লক্ষ্য করিয়া দীনু বিমল বাতাস খাইতে খিড়কী পুষ্করিণীর দিকে গেল। তখন দ্বিপ্রহর।

দীনু একটা কামিনীগাছের সুশীতল ছায়া দেখিয়া সেখানে গিয়া বসিয়া পড়িল, এবং যে হেতু তাহার মনের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল, সে হেতু আকাশ পাতাল ভাবিয়া দীনু কাঁদিতে লাগিল।

দারুণ রৌদ্র, তাহার উপর জ্যৈষ্ঠ মাস। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই সন্তপ্ত। এমন সময় কামিনী বৃক্ষের তলে একটা লোককে কাঁদিতে দেখিয়া পুষ্করিণীর জলে অর্দ্ধমগ্না ও অর্দ্ধনগ্না একটি বালিকা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লুকায়িতভাবে বৃক্ষের দিকে গেল।

কিন্তু বিধির লিখন! দীনু তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং বালিকাও তাহা বুঝিল।

দীনু ডাকিল, "কে ও, সরলা!"

সরলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল, "আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?"

দীনু বলিল, "যে হেতু আমি অভাগা।" সে হেতু কি ভাবিয়া সরলাও কাঁদিল।

অনেক দিনের কথা—দীনুর মাতা বলিয়াছিল, "বাবা, আমাদের যদি অবস্থা হয়, তবে তোমার সঙ্গে সরলার বিবাহ দিব।"

সরলা মিত্রদিগের কন্যা। লাবণ্যভরা—সুন্দরী, স্নেহের আধার। তিন বৎসর পূর্ব্বে শিবহাটীর হাটে মাছ কিনিতে গিয়া সরলা বর্ষাকালে কর্দ্দমে আছাড় খাইয়াছিল, এবং দীনু তাহাকে স্কন্ধে করিয়া খাল পার করিয়া দিয়াছিল। সেই দিন হইতে দীনুর সুন্দর মুখ ও কোমল হৃদয়ের স্মৃতি মধ্যে মধ্যে সরলার মনে জাগিত। সে হেতু বোধ হয় দীনুরও জাগিত।

দীনু বলিল, "সরলা! মাতঙ্গিনী আমাকে ধরিয়া মারে।"

সরলা বলিল, "তুমি পলাইয়া যাও না কেন?"

দীনু। "কোথায় যাব ?"

সরলা ভাবিল, "তাই ত !"

সরলার কচিমুখ ম্লান হইয়া গেল। দীনু সে হেতু চক্ষের জল মুছিল। অর্থাৎ—জগতে কেহ ভালবাসিলে কাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা করে না।—

[৮]

সরলা দুই তিনবার অনিমেষ নয়নে দীনুর মুখ পানে চাহিয়া চলিয়া গেল।

তাহা ঊর্দ্ধ হইতে মাতঙ্গিনী দেখিয়াছিল। যেহেতু মাতঙ্গিনী নিদ্রাভঙ্গের পর বিস্ফারিত নয়নে ত্রিতল ছাতে আরোহণপূর্ব্বক দীনুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

মাতঙ্গিনী কম্পিতা হইয়া পড়িল। যে হেতু দৃশ্যটা কিছু অভাবনীয়, স্বপ্নের এবং চিন্তার অগোচর।

দীনু ফিরিয়া আসিলে মাতঙ্গিনী বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?"

দীনু। ঘাটের ধারে।

মাতঙ্গিনী। কেন ?

দীনু। ঘুম পাইয়াছিল, সে হেতু রৌদ্রে বেড়াইতেছিলাম।

মাতঙ্গিনী। আর কে ছিল ?

দীনু। কৈ, তা আমি দেখি নাই।

এই অভুতপূর্ব্ব মিথ্যা কথায় মাতঙ্গিনীর আর সন্দেহ রহিল না। মাতঙ্গিনী ঘোর রবে বলিয়া উঠিল, "তোমার এই কাজ, ওঃ বিশ্বাসঘাতক— !"

এবং মূর্চ্ছা সংবরণ করিয়া মাতঙ্গিনী ডাকিল, "নিত্যানন্দ ! এস ত !"

পরম বৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ মালা হাতে করিয়া আসিল। যে হেতু বিপৎকালে জপ করাই উত্তম কল্প।

মাতঙ্গিনী বলিল, "উহাকে দড়ি দিয়া বাঁধ।"

দীনু সে হেতু একটু অপমানিত বিবেচনা করিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "কেন, আমার দোষ কি ?"

"দোষ কি ?" বলিয়াই মাতঙ্গিনী একটা প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল, এবং সেই মুষ্ট্যাঘাত নিবারণ করিতে গিয়া নিত্যানন্দ দীনুর উপর পড়িয়া গেল, এবং পুনর্ব্বার উঠিয়া মাতঙ্গিনীর আজ্ঞাক্রমে দীনুর হাত পা বাঁধিল, এবং

ামসিংহ দরওয়ানের সাহায্যে সকলে তাহাকে ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে শিমূল বৃক্ষের গোড়ায় বাঁধিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, "সকলে দেখুক, পরনারীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্বামীর কি শাস্তি হইয়া থাকে।—"

দীনু কাতরস্বরে বলিল, "ওগো আমি দৃষ্টিপাত করি নাই, আমি অশ্রুপাত করিতেছিলাম, তাহা দেখিয়া সরলা কাঁদিয়াছিল।"

মাতঙ্গিনী বলিল "আচ্ছা, সরলা আবার কাঁদুক, এবং তুমি আবার কাঁদ। দেখি কে কত কাঁদিতে পার!"

এইরূপে শিবহাটীর ষোল আনা জমিদারীর মালিক শিমূল বৃক্ষের তলায় বন্ধনদশায় পড়িয়া রহিলেন।

[৯]

কেন যে এই দশা ঘটিল, তাহা সকলের জানা সম্ভবপর নহে। রামসিংহ বলিল, "উঁহার মেষরাশি, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে মেষের বন্ধন-ভয় এইরূপ পঞ্জিকায় প্রকাশ, সেই হেতু।"

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ বলিল "ওঃ শাস্ত্র কি সত্য! এবং পঞ্জিকায় ইহাও প্রকাশ যে, আষাঢ় মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, সে হেতু বিবেচনা করহ?"

ঘোরা রজনী। মাতঙ্গিনী পরিশ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তা, এবং দ্বারবান রামসিংহ পুষ্করিণীর পাড়ে প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত।

দীনু বলিল, "রামসিং! একটু চা খাওয়াইতে পার?" যে হেতু দীনুর তৃষ্ণা পাইয়াছিল।

রামসিংহ বিশ টাকায় রফা করিয়া দীনুর জন্য চা আনিতে গেল। উদ্যান পার হইতে না হইতে একটি বালিকা আসিয়া রামসিংহের পদযুগল জড়াইয়া ধরিল।

সরলা বলিল, "রামসিং! দীনুকে ছাড়িয়া দে, আমি তোর জন্যে এই ্সোনার মালা এনেছি।"

রামসিংহ বহু চিন্তাপূর্ব্বক কহিল, "আচ্ছা, কিন্তু বাবুকে গ্রাম হইতে পলায়ন করিতে হইবে।"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল "বেশ।"

রামসিংহ চা আনিতে গেল, এবং সোণার মালা পাগড়ীর মধ্যে রক্ষা করিল; যে হেতু তাহার কোর্ত্তায় পকেট ছিল না।

ইত্যবসরে সরলা ধীরে ধীরে দীনুর নিকট গিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং একবার কম্পিতস্বরে বলিল "পালাও।"

দীনু বলিল, "আমি এখনও চা খাই নাই।"

সরলা। আমাদের বাড়ীতে চা আছে, খাবে চল।

দীনু সরলাদের বাড়ী গেল। সরলা তাহার অগ্রজ সুধীর মিত্রের পোর্ট-ম্যাণ্টো হইতে চা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি জল গরম করিল, এবং রন্ধনশালা হইতে চিনি আনিয়া একবার হতাশভাবে বলিল, "দুধ নাই।" যে হেতু অত রাত্রিতে দুধ পাওয়া যায় না।

[১০]

দীনু বলিল, "দুধের আবশ্যক নাই!" অতঃপর দীনুর চা খাইয়া মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রায় দুই মাস ধরিয়া দীনু চা খায় নাই।

দীনু বলিল, "সরলা, তুমি আজ আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছ। আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু মনে রেখো—আমি সংসার হইতে চলিলাম—যেখানেই যাই. তোমার স্নেহ সহৃদয়তা অনুক্ষণ ধ্যান করিব।"

ইহার পর সেই রাত্রিকালে নব্য উকীল সুধীর মিত্রজা মহাশয়ের সহিত দীনুর কি পরামর্শ হইল, এবং পরদিন প্রভাতে শিবহাটীর ষোল আনা মালিক নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িলেন।

রামসিংহ চীৎকার করিয়া সকলকে বলিল, "কি প্রতাপ! বাবু দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছেন, এবং গ্রামশুদ্ধ লোক কি হারামজাদা! কেহ আমার আর্ত্তনাদ শুনিল না?"

সকলে বলিল, "বাকি খাজনার দায়ে লোকটা ঘরজামতা হইয়াছিল, এখন যথাসর্ব্বস্ব স্বুবর্ণ ও জহরাৎ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।"

কেবল ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক বলিল, "না।"

যে হেতু সে সকল কথা জানিত।

[১১]

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ মাতঙ্গিনীর সহিত বৃন্দাবনে গেল, এবং যথাক্রমে অন্যে তাবৎ বৃত্তান্ত বসুজা মহাশয়কে জানাইল।

বসুজা মহাশয় মালা জপিতে জপিতে বলিলেন, "ব্যাটা কি হারামজাদা। উহার পেটে এত বুদ্ধি ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।"

নিত্যানন্দ। সে হেতুই এই ঘটনা।

বসুজা মহাশয় সরোষে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "কুছ পরওয়া নাহি, উহার নামে বাকি খাজনার নালীশ করহ, এখনও তামাদি হয় নাই।"

বসুজা মহাশয় তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এবং সে হেতু মাতঙ্গিনীও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিল ; এবং বাকি খাজনার নালিশও হইল।

কিন্তু এ দিকে সুধীরচন্দ্র মিত্র অন্যায় উৎখাতের বর্ণনা করিয়া দীনুর তরফে বসুজা মহাশয়ের নামে নালিশ ঠুকিয়া দিল।

উভয় পক্ষের সমান অবস্থা সে হেতু সকলে পরস্পর রফা করিতে বাধ্য হইলেন।

রফার সর্ত্ত এই,—দীনু মাতঙ্গিনীকে বৈষ্ণধর্ম্মানুসারে খালাস দিবে, এবং মাতঙ্গিনী ইচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

অতএব আষাঢ় মাসে দীনু বৈষ্ণব হইল, এবং খালাস পাইয়া কলিকাতায় গেল। সেখানে কোন সাহেব দীনুর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বলিল, "যে হেতু তুমি নিরেট মূর্খ, অথচ সৎ, সে হেতু তোমাকে আমার হাউসের মুৎসুদ্দি করিয়া দিলাম।"

শুনা গিয়াছে, সুধীর মিত্র দীনুর জামিন স্বরূপ দশ হাজার টাকা হাউসে আমানত রাখিয়া দীনুকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। সে হেতু কৃতজ্ঞতার আবেগে দীনু সরলাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত করিল। এই বিবাহের পর দীনুর ক্ষুধা বাড়িয়াছে, এবং সুন্দর মুখের চাপা অংশগুলি পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। দীনুর বুদ্ধিও খুলিয়াছে, এবং প্রায় বিশ জন লোক প্রত্যহ দীনুর বাটীতে চা খায় ; যে হেতু উদারচরিত্র, সৎ ও সহৃদয় লোকের বাটীতেই সকলে চা খাইয়া থাকে।

এই সব ঘটনা হেতু দীনুও সুখী, এবং পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দের সহিত কণ্ঠীবদল করিয়া মাতঙ্গিনীও সুখী। বসুজার বিস্তীর্ণ জমিদারী এখন ঠাকুরের সেবায় লাগে, এবং সে হেতু অনেক দীনদুঃখী প্রতিপালিত হয়। যে হেতু সকলই ভগবানের ইচ্ছা!

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পোড়ার মুখী

[১]

যামিনীনাথের স্ত্রী দামিনীলতার অষ্টম গর্ভের সন্তান স্নেহলতা ওরফে পোড়ারমুখী।

পোড়ারমুখী বড় অসময়ে আসিয়াছিল। যামিনীনাথ পাঁচটি কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঋণদায়ে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুইটি পুত্র; তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কোন্ দিক রক্ষা করিবেন যামিনীনাথ ভাবিয়া কূল পাইতেন না।

অষ্টম গর্ভে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। যামিনীনাথ মনের কষ্ট মনে চাপিয়া কন্যার নাম রাখিলেন স্নেহলতা, মা নাম রাখিল, পোড়ারমুখী।

পোড়ারমুখীর যত বয়স বাড়িতে লাগিল তার রূপ বয়সকে দ্বিগুণ ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল; বারো বৎসর বয়সে পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী বালিকার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার বিবাহের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া বাপমা'র চোখের জল আর শুকাইতে পাইত না।

[২]

মা তরকারি কুটিতে কুটিতে আঙুল কাটিয়া ফেলিল। মেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আঙুলে জলপটি বাঁধিয়া দিল; শেষে দুই হাতে মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা রাতদিন এত কি ভাবিস্? মা বলিল, যা' তুই খেলা করগে যা'। মেয়ে ছাড়িল না, বলিল, বল্‌না মা বল্‌না। মা হাত উঠাইয়া মেয়েকে চড় মারিতে গেল, হাতখানা কিন্তু গালে না পড়িয়া গলায় জড়াইয়া পড়িল। মা মেয়েকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, পোড়ারমুখী মেয়ে! আর জায়গা পেলিনে, মরতে আমার পেটে এলি—পোড়ারমুখ একেবারে পুড়িয়ে এলি! মেয়ে হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টিয়ে পাখীটা কি বল্‌ছে শোন্ মা। টিয়ে পাখী তখন বলিতেছিল, লক্ষ্মী মা আয়, লক্ষ্মী মা।

মায়ের চোখে জল আসিল, বলিল, যা টিয়ে পাখীকে খাবার দিয়ে আয়, আমি রান্না চড়াব।

মেয়ে টিয়ে পাখীর কাছে না গিয়া আস্তে আস্তে বাবার কাছে গেল। বাবা তখন পঞ্চাশটি টাকা লইয়া হিসাবে ব্যস্ত ছিলেন। নূতন মাস পড়িয়াছে, পাওনাদারেরা একে একে আসিয়া জুটিবে;—বাড়িওয়ালা ভাড়া চাহিবে, গোয়ালা দুধের দাম নিতে আসিবে, মুদী ময়রা স্যাকরা সকলকেই কিছু কিছু দিতে হইবে। কোন্ দিক্ সামলাইবেন যামিনীনাথ ভাবিয়া কূল পাইতেছিলেন না। এমন সময় পোড়ারমুখী ডাকিল; বাবা! সে ডাক যামিনীনাথের কানে পৌঁছিল না। আর একটু বড় গলায় মেয়ে আবার ডাকিল, বাবা! যামিনীনাথ এইবার শুনিতে পাইলেন, উত্তর করিলেন, মা লক্ষ্মী! পোড়ারমুখী মনে করিয়াছিল, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবে, মা রাতদিন কেন এত ভাবে, কিন্তু বাবার মুখ দেখিয়া তাহার আর কোন কথা বাহির হইল না। যামিনীনাথ বলিলেন, পয়সা নেবে মা লক্ষ্মী, এই নাও, একটা পয়সা নাও। পোড়ারমুখী পয়সাটি আঁচলে বাঁধিয়া উঠিয়া আসিল এবং রাস্তার ধারে জানালার কাছে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বাবা, মা কেন এত ভাবে।

[৩]

গোয়ালার অনেক পাওনা, সে শাসাইয়া গেল, আর দুধ দিবে না; মুদী বলিয়া গেল, ধারে আর চাল ডাল দিবে না; স্যাক্‌রা বলিয়া গেল, তিন দিনের ভিতর টাকা না পাইলে সে নালিশ করিবে। যে আসে সেই টাকা চায়—কেউ আসিয়া ডাকিলে যামিনীনাথের মুখখানা শুকাইয়া যায়।

পোড়ারমুখী সবই বুঝিল। সে সারাক্ষণ বাবার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় দরজার পাশে, জানালার নীচে, আনাচে কানাচে যেখানে বসিলে তার বাবাকে দেখিতে পাওয়া যায়, বাবার মুখের দিকে ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া সেখানে গিয়া সে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে। আজ বাবার মুখখানা বড় শুকনো, বাবার বুকের হাড় ক'খানা গোণা যায়, বাবা দিন দিন বড় রোগা হয়ে যাচ্ছেন,—পোড়ারমুখী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে থাকিত।

সেদিন সন্ধ্যাকালে যামিনীনাথ আফিস হইতে বাড়ী ফিরেন নাই। দুইটা দারোয়ান লাঠি হাতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—যামিনীবাবু, যামিনীবাবু বাড়ি আছেন? পোড়ারমুখী দরজার ফাঁক

দিয়া যমদূতের ন্যায় দুই মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল বাবাকে এরা মারবে নাকি! সে আস্তে আস্তে তাহাদের কাছে গিয়া বলিল, তোমরা বাবাকে কিছু বলোনা—তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমাদের অনেক ফুল দেব। তাহারা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি বলছ মায়ি? পোড়ারমুখী বলিল, তোমরা বাবাকে কিছু বোলো না, আমি আস্‌ছি। সে অপরাহ্ণে মালা গাঁথিবার জন্য অনেক ফুল তুলিয়া রাখিয়াছিল—কোঁচোড়ে করিয়া সবগুলি দরোয়ানের কাপড়ে ঢালিয়া দিল, কাতরকণ্ঠে বলিল, যাও লক্ষ্মীটি তোমরা যা । দরোয়ানরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আর এক সময় আসিবে ঠিক করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। পোড়ারমুখী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

[৪]

সন্ধ্যাকালে ছাতের উপর শুইয়া পোড়ারমুখী ভাবিতে লাগিল, আহা, যদি শিউলি ফুলগুলো টাকা হ'ত, ভোর বেলায় কুড়িয়ে এনে মা'র হাতে দিতাম! মা বলত, পোড়ারমুখী সোনামুখী; বাবা বলত, স্নেহলক্ষ্মী বড় লক্ষ্মী। গোয়ালার টাকা সব শোধ হয়ে যেত, প্যাকরা আর বাবাকে শাসাত না, মা রাজরাণীর মত গহনা পরে' বসে থাকতেন—চাকরাণীরা সেবা করতো, বাবা গাড়ি করে' বেড়াতে যেতেন,—ভাবিতে ভাবিতে পোড়ারমুখী ঘুমাইয়া পড়িল

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া পোড়ারমুখী শুনিল, ওপাড়ার মোক্ষদা-মাসী মা'র সঙ্গে গল্প করিতেছে; মাসী বলিল, শোননি বোন, মা কালী জমীদার-বউকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদের নূতন পুকুরে আছি, শীগ্‌গির একটি অষ্টম গর্ভের সন্তান এনে আমার কাছে উচ্ছুগ্‌গো কর্—তবে তোদের পুকুর উথলে উঠ্‌বে, গোলা ধানে ভরে' যাবে, নাতির নাতির মুখ দেখতে পাবি, নইলে তোর ভিটে-মাঠি সব উচ্ছন্নে যাবে। তা' জমিদার বৌ একলক্ষ টাকা দেবে বলেছে—একটি অষ্টম গর্ভের সন্তান কেউ যদি দেয়। পোড়ারমুখী কানখাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল! মা বলিল, থাক্ দিদি ওসব কথায় কাজ নেই ওকথা শুন্‌লেও পাপ হয়। মাসী বলিল বোন, তাই কি বল্‌ছি, আমি তোমাকেই কি দিতে বলছি! মানুষে কি তাই পারে।

প্রতিবেশিনী চলিয়া গেলে মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলিল। তাহার পর মেয়েকে তুলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে নীচে নামিয়া আসিল।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পোড়ারমুখী একদিন বাবার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা এক লক্ষ কত টাকা? বাবা বলিলেন, অনেক টাকা। পোড়ারমুখী বলিল, গোয়ালার টাকা শোধ যায়? বাবা বলিল, যায়। পোড়ারমুখী বলিল, াকরার টাকা শোধ যায়? বাবা বলিল, যায়। পোড়ারমুখী বলিল, সব টাকা শোধ যায়? বাবা হাসিতে হাসিতে বলিল, কেনরে তুই কি এক লক্ষ টাকা দবি? পোড়ারমুখী আর কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

দেওয়ালীর দিনে সকলে বাড়ীতে প্রদীপ সাজাইতে লাগিল। পোড়ারমুখী বলিল, মা, আমি ঘাটে প্রদীপ দিয়ে আস্‌ব। মা বলিল, শীগ্‌গির ফিরে আসিস, কিন্তু নতুন পুকুরে যাস্‌নে যেন।

একখানি ছোট ডুরে সাড়ী পরিয়া, ছোট একখানি থালায় মাটি প্রদীপগুলি সাজাইয়া পোড়ারমুখী ঘাটের দিকে চলিল। সে নতুন পুকুরে দিকেই চলিল। পুকুরে তখনও সিঁড়ি কাটা হয় নাই, মাটির উপর মাটি জমি পুকুরের পাড় পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; তাহার চারিধারে পোড়ারমুখী প্রদীপগুলি সাজাইয়া দিল। পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, পুকুরে জল থই থই করিতেছে—কালো জল, রাত্রে আরও কালো দেখাইতেছে। পোড়ারমুখী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ জলের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে আঁচলখানি গলায় দিয়া ধীরে ধীরে জলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল —যোড়করে 'মা কালী!' বলিয়া চীৎকার করিয়া একেবারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। এই শব্দে বনের পাখীরা পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, ত্রস্ত পশুর পদক্ষেপে শুক্‌নো পাতা মর্‌মর্‌ করিয়া উঠিল—তাহার পর সমস্ত নীরব। ক্রমে প্রদীপগুলি একে একে সব নিবিয়া গেল, চারিদিকে কেবল অন্ধকার—কালীর মত কালো অন্ধকার।



মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মুক্তি

আমি একটি সামান্য জীবনের ছেঁড়া-একটুকরা ইতিহাস বলিতে বসিয়াছি ;
হয়-তো গল্পের আসর ইহাতে জমিবে না।

মুক্তি গৃহস্থ-ঘরের বৌ হইয়া যে-দিন কলিকাতা সহরের সদর-রাস্তায় পানের খিলি বেচিতে বসিল, সে-দিন তার সঙ্কোচ ততটা হয় নাই যতটা সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। বারো বৎসর বয়েসে বিবাহিত হইয়া আসিয়া, স্বামীর সহিত কলিকাতার একটা সাঁৎসেতে গলির মধ্যে সেই-যে প্রবেশ করিয়াছিল, তার পর ছয়-বৎসরের মধ্যে একটিবারও আর বাহির হইতে পায় নাই। সেই ছোট অন্ধকার ঝুপসী ঘরটির মধ্যে দিনরাত আবদ্ধ থাকিয়া তার এম্‌নি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, জগতের কোথাও যে আলো আছে, বাতাস আছে, তা তার মনেই পড়িত না। আজ হঠাৎ একেবারে এতটা আলোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে যেন দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল ;—তার অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখ, আলোর পানে সে ভালো করিয়া মেলিতেই পারিতেছিল না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গৃহস্থ-ঘরের অন্তঃপুরিকা হইয়া মুক্তির পক্ষে বাজারের পান-ওয়ালি হওয়া কেমন করিয়া সম্ভব হইল ? অনেকে কথাটাকে হয়ত আজগুবি মনে করিবেন, কিন্তু তা নয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আমি সাক্ষী ডাকিতে রাজি আছি ;—মুক্তিকে কলিকাতা সহরের অনেকেই পান বেচিতে দেখিয়াছে।

অত্যন্ত অনাদরে ও অবহেলায় মুক্তি মানুষ হইয়াছিল। এক গরিবের ঘরের মেয়ে, তার উপরে সে যখন খুব কচি, তখন তার মা মারা যায়—কাজেই আদর তার ভাগ্যে জোটে নাই।

কচি মেয়ের দোহাই দিয়া মুক্তির বাপ আবার বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মেয়ের তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই। কারণ সতীনের মেয়েকে ভালোবাসিতে পারে এতটা উদারতা মুক্তির সৎমায়ের ছিল না।

মুক্তি ভয়ে-ভয়েই দিন কাটাইত,—যতদূর সম্ভব আপনাকে গোপন করিয়া চলিত—কারণ যেখানে যতটুকু সে সৎমায়ের চোখে পড়িত, সেইখানেই তার

শাসন ছিল,—আদর ছিল না। নিজেকে এই গোপন করিয়া চলাটা মুক্তির এমন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল যে স্বামীর কাছে সে নিজের হৃদয়টিকে মেলিয়া ধরিতে পারে নাই, স্বামীও তাহাকে পাইবার জন্য কোনো-দিন তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে-জিনিষটা তার ধাতেই ছিল না।

মুক্তির স্বামী কলিকাতায় কোন অপিসে অল্প-মাহিনায় সামান্য চাকরি করিত। সে এ সংসারে বেশি-কিছু চাহিত না, অল্পতেই খুসি ছিল, এবং সেই অল্প-টুকুও না পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠিবার মতো তেজ তাহার ভিতরে ছিল না। সে ছিল নিরীহ ভালোমানুষ। তার এই নিরীহতা এতটা বিরাট ছিল যে কোনোরূপ উত্তেজনাই তাহাকে আদপেই চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিত না। তার উপরে সে ছিল নকলচাঁদ বাবাজীর শিষ্য, এমন গুরুভক্ত শিষ্য কলিকালে দুর্লভ। সে চিত্ত স্থির করিবার জন্য গুরুর উপদেশে প্রতিদিন ঘন-ঘন গঞ্জিকা সেবন করিত। তার গাঁজার মাত্রা ক্রমেই এমন বাড়িয়া উঠিতেছিল যে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, কোন্ দিন বা চিত্ত-স্থির-রাখা বিষয়ে অতবড় মহাত্মা নকলচাঁদ বাবাজীকেই সে ছাড়াইয়া উঠে।

নকলচাঁদ বাবাজী চক্ষু-মুদিয়া উপদেশ দিতেন—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ বড় ভয়ঙ্কর! মাছ যেমন জালে আটকায় এবং তাহাতেই মরে, মানুষ তেমনি এই কামিনী-কাঞ্চনের মায়াজালে পড়িয়া নরকে ডুবিয়া মরিতেছে!

মুক্তির স্বামী গুরুর এই অমূল্য উপদেশ গদগদচিত্তে জোড়হাত করিয়া বসিয়া শুনিত এবং তাহা পালন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিত। কাঞ্চন-সম্বন্ধে সে একরূপ নিশ্চিন্ত ছিল,—তার দায় বড় ছিল না, কারণ সে-জিনিষটা আসিবার পথেই অন্তর্দ্ধান করিত, এবং অধিকাংশ সময়েই তার আসিবার বালাইও ছিল না। কিন্তু কামিনী তো তেমন নয়—সে যে দিনরাত্রি চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হইয়া আছে। সেই মুক্তির স্বামী যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত চিত্ত স্থির-রাখিবার মহৌষধ ভক্তিভরে সেবন করিত। সে মনে-মনে তারিফ করিত —কি আশ্চর্য্য দ্রব্যগুণ! মানুষের এত-বড় শত্রু যে কামিনী, তাও এই দ্রব্যগুণে একমুহূর্ত্তে চোখের সাম্‌নে হইতে সাফ্ পরিষ্কার হইয়া যায়,—তার চিহ্নমাত্রও থাকে না! এমন সুলভ জিনিষ থাকিতে মানুষ কেন যে সংসারের পাঁকে ডুবিয়া মরে সে ভাবিয়া পাইত না। এ কি সামান্য কথা! যোগ-সাধনের চরম অবস্থা যে সমাধি তাহাই এই দ্রব্যগুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে করায়ত্ত হয়। কোনো

সাড়া নাই, শব্দ নাই—এত বড় জগৎখানাই কোথায় তলাইয়া যায়। ভাগ্যে সে নকলচাঁদ বাবাজীকে পাইয়াছিল, তাই তো এ-যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল; নয়-ত তার কি দুর্দ্দশাই হইত; সে ভাবিত মানুষগুলো কী বোকা! এমন সাধু মহাত্মা জলজ্যান্ত থাকিতে লোকে কিনা হা-অন্ন হা-বস্ত্র করিয়া কাঁদিয়া মরে! নকলচাঁদ বাবাজীর পায়ে আসিয়া পড়িলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়।

এই-সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তার মন যখন বিশ্বসংসারের মানব-জাতির দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া উঠিত, সে তখন দূর-হোক্-গে ছাই বলিয়া বেশী করিয়া চিত্তস্থির করিবার আয়োজনে বসিয়া যাইত।

এমনিতর ছায়ার মানুষ লইয়া মুক্তিকে ঘর করিতে হইত। স্বামীর যে একটা অস্তিত্ব আছে তাহা সে অনুভব করিবারই সুযোগ পাইত না। স্বামীর আদর তো ছিলই না, অত্যাচারটাও যদি থাকিত, তা হইলেও না-হয় সেই অত্যাচারের আঘাতে স্বামীর একটা ছাপ তার উপরে পড়িবার অবসর পাইত। কিন্তু যেখানে কেবল অবহেলা, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্বন্ধই জমিয়া উঠিতে পায় না! তা ছাড়া মুক্তি ছিল একলা ঘরের একলা মানুষ। আর-পাঁচ জনকে লইয়া যে তার হৃদয়ের ছন্দ উঠিবে পড়িবে তারও জো ছিল না! কাজেই সে আপনার মধ্যে আপনি এতটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া থাকিত যে তার সেই দুঃখী-ঘরের আসবাবহীন ফাঁকা জায়গাও সে বেশি-করিয়া জুড়িতে পারিত না। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত, প্রতিদিনের কর্ত্তব্যগুলি সে একটির-পর একটি-করিয়া সারিয়া রাখিত, তাহাতে তার আনন্দও ছিল না, দুঃখও ছিল না। সে যেন কলের পুতুলের মতন চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইত।

হঠাৎ একদিন একটি সামান্য মানুষের হৃদয় তার লাভ হইয়া গেল। সে বামার মা। সে ছিল ঠিকা দাসী। যে দুঃখী-পাড়ায় মুক্তিরা থাকিত, এই বামার মা ছিল সেই পাড়ার একমাত্র দাসী। সে সকাল-বিকাল দু-বেলা সদর রাস্তার ধারে বসিয়া পান বেচিত, দুপুর-বেলা ঝড়ের মতো পাড়ার মধ্যে আসিয়া ঘরে ঘরে নির্দ্দিষ্ট মতো কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত; কেউ যদি একটুখানি অতিরিক্ত ফরমাস করিত তো অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিত। তার সেই মারমূর্ত্তি দেখিয়া কেউ-আর দ্বিরুক্তি করিবার সাহস পাইত না।

বামার মার সঙ্গে পাড়ার কারুরিই আর-কোনো সম্পর্ক ছিল না, এক কাজের সম্পর্ক ছাড়া। কাজ সারা হইলেই সে ছুটিয়া পলাইত, কাহারো পানে ফিরিয়া তাকাইত না—দুদণ্ড দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অবসর পর্য্যন্ত তার ছিল

।। কাজেই বহুদিন ধরিয়া মুক্তির নিঃসঙ্গ জীবনের উপর বামার মাও নিজের ায়াটুকু পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

মুক্তির জ্বর হইয়াছিল। সে একলাটি পড়িয়া ছিল। সেদিন তার স্বামীর ুটির দিন; কিন্তু গুরুজীর আড্ডায় ভারি এক মোচ্ছব, কাজেই সে তাড়াতাড়ি লিয়া গিয়াছিল, মুক্তির দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সময় হয় নাই। তার পর দুইদিন একেবারে অদৃশ্য। উৎসবের উল্লাসে বাবাজীর শিষ্যেরা এতটা চিত্ত স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া আশপাশের লোকেদের চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইয়াছিল;—দুদিন মাটি ছাড়িয়া উঠিবার সামর্থ্য কাহারো ছিল না।

মুক্তি অন্ধকার ঘরের মধ্যে মলিন বিছানায় একা চুপটি-করিয়া পড়িয়াছিল। তৃষ্ণায় তার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া জল খাইবে এমন শক্তি ছিল না। সে নীরবে, শুষ্ক কণ্ঠ ও শুষ্ক আঁখি-পল্লব তুলিয়া উপর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া ছিল। ... তার

বামার মা কাজ করিতে আসিয়া অনেক ডাকাডাকির পর যখন একটা সাড়া পাইল না, তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মুক্তি ...এয় সময় এমন কিন্তু জল-দিবার ফরমাসটুকু করিতে সাহস করিল ন...কে ভাঙিত। মিটাইবার জন্য কাহারো নিকট কিছু চাহিবার অধিক...ছিল। সে চুল বাঁধিবার সে ভাবিতে পারিত না। সে হয়-ত মৃত্যুকাল প...ত, এতটা নীচে অবধি করিয়া থাকিত; কিন্তু বামার মার একটি ব্যবহারে সে...ধিত যে ইহার কোনটাই

বামার মা মুক্তির শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—"ভালো লাগিত। চুল বুঝি!" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি নিজের ভিজে হাতখানা ...ড় করিয়া বাঁধিয়া মুছিয়া মুক্তির কপালের উপর পাতিয়া দিল। ...াই, কিন্তু সেই-

মুক্তির বোধ হইল সেই স্পর্শটিতে তার সমস্ত দেহটি যেন জুড়াইয়া গেল। কী স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ! মুক্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া চোখ বুজিয়া রহিল। ... মনে হইতে লাগিল, অই স্পর্শের মধ্য দিয়া সে এমন-একটি জিনিষ পাই... যার স্বাদ সে জীবনে কখনো পায় নাই। বামার মা হাত তুলিয়া লইবার পর অনেকক্ষণ মুক্তির কপালের উপর সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ টুকু লেপিয়া রহিল।

মুক্তি এতক্ষণে বামার মার কাছে জল চাহিল; কিন্তু কণ্ঠ এত শুষ্ক হই... আসিয়াছিল যে কথা বাহির হইল না,—শুধু ঠোঁটের একটি আকুল কম্পন ... শীর্ণ মুখখানির উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

বামার মা বুঝিতে পারিল ; বলিল—"জল খাবে বাছা ?"

মুক্তি একটু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বামার মা তাড়াতাড়ি জল গড়াইয়া আনিল। তার হাত হইতে ঘটি লইবার যেন তর-সহিতেছে না—এমনি ভাবে মুক্তি উঠিয়া বসিল ; এক নিশ্বাসে সমস্ত জলটা খাইয়া, শুইয়া পড়িল। বামার মা একটা জোর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—"বাছারে আমার ! মুখে একটু জল-দেবারও কেউ নেই গা !"

সেইদিন হইতে আর বামার মা মুক্তির বাড়ির কাজ সারা হইলেই ছুটিয়া পালাইতে পারিত না ; কাজের পর দু-দণ্ড সময়ের বৃথা অপব্যয় তার নিত্যই ঘটিতে লাগিল।

বামার সঙ্গে মুক্তির চেহারার কোনোই সাদৃশ্য ছিলনা, কিন্তু তবুও বামার মার কেমন মনে হইতে লাগিল যেন মুক্তি ঠিক বামারই মতন। ভারি আশ্চর্য্য ত্য।। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা,—সেই সব ! বামা আজ কতকাল হল যে হাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেছে, তার চেহারা এখন ভালো করিয়া মনেই মিয়া উ৹মুক্তিকে সে কতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, এতদিন চার-পাঁচ জনকে পড়ে নাই যে মুক্তি তার বামারই মতন ! হঠাৎ সেই অসুখের া !, কাজেই সে অ... কাছে কেমন করিয়া এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিল কে ব তার সেই দুঃখী-ঘরের ...পরের চেহারার মধ্যে যে একটু আধটু অনৈক্যের ারিত না। দিনের প; ক্রমে মুছিয়া যাইতে লাগিল। মুক্তিকে যতই দেখে কটির-পর একটি-করি হয়—বামা তো আমার এত বড়টাই গো ! এমনিই ঃখও ছিল না। সে ভাবিতে ভাবিতে বামা যে তার নাই একথা বামার মা

হঠাৎ একদিন ...ল।

বামার মা। সে. পাইয়া মুক্তির হৃদয়-কুঁড়িটি একটু-একটু করিয়া বিকশিত বামার মা দিতে লাগিল এবং তারই সৌরভ তার অন্তরের অলিগলির ভিতর ঘুরে-ঘুরিয়া তার সমস্তটাকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। বামার মার কাছে মুক্তির এখন আর কোনো সঙ্কোচ নাই—সে যা খুসি তাই আবদার করে, কাজের সময় বহিয়া গেলেও তার আঁচল টানিয়া বসাইয়া রাখে, দেরী করিয়া আসিলে রাগ করে, এবং চলিয়া যাইতে চাহিলে অভিমান করে।

বামার মাও মুক্তির কাছে একেবারে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যে মুক্তিকে লইয়া কি করিবে খুঁজিয়া পাইত না। তার কেবলই ইচ্ছা হইত মুক্তিকে তার বুকের ভিতরে করিয়া রাখে। তার নিজের সেই সামান্য সমস্তটুকু

উপুড় করিয়া দিয়াও তার তৃপ্তি হইতেছিল না। সে আরও দিতে চাহিত, আরও দিতে চাহিত। যে কথাটি কানে শুনিত, মুক্তিকে না বলিলে তার প্রাণ ঠাণ্ডা হইত না; যে জিনিষটি চোখে লাগিত, সেটি মুক্তির জন্য না আনিতে পারিলে ভারি দুঃখ থাকিয়া যাইত।

হারানো ধন ফিরিয়া পাইলে তার যত্ন বাড়ে। বামার জন্য যতটা না করিতে পারিয়াছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি সে মুক্তির জন্য করিতে লাগিল। এমন কি, মুক্তির কাছে বেশিক্ষণ থাকিতে পায় না বলিয়া সে দু-এক ঘরের কাজ ছাড়িয়া দিল এবং যে কয়েক ঘরের কাজ বজায় রহিল তাহাতেও শৈথিল্য পড়িয়া গেল। কারণ মুক্তির উপরই তার মন পড়িয়া থাকিত। যখনই সময় পাইত একবার মুক্তিকে না দেখিয়া গেলে তার চলিত না, এবং যাই যাই করিয়া উঠিতে উঠিতে এতটা কাজের সময় বহিয়া যাইত যে তার জন্য তাহাকে ঘরে ঘরে তিরস্কার সহিতে হইত। বিকাল বেলার দিকটায় তার অনেক কাজ ছিল, তবু সে যেমন করিয়া পারে একটু সময় করিয়া মুক্তির চুলটা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। এবং তার পানের দোকানে যখন খরিদ্দার থাকিত না, তখন পায়ের বুড়া আঙুলে একটা দড়ি বাঁধিয়া মুক্তির জন্য চুলের গুছি তৈরি করিত;—তাহাতে সময় সময় এমন তন্ময় হইয়া থাকিত যে খরিদ্দার হাঁকাহাঁকি করিলে তবে চমক ভাঙিত।

মুক্তির উপর বামার মার ভালোবাসার অত্যাচারও ছিল। সে চুল বাঁধিবার সময় মুক্তির মাথা এতটা তেল-জ্যাব্‌জেবে করিয়া দিত, এতটা নীচে অবধি পেটো পাড়িয়া দিত, চুলের গোড়া এতটা শক্ত করিয়া বাঁধিত যে ইহার কোনটাই সুখের ছিল না। কিন্তু এইগুলাই মুক্তির বিশেষ করিয়া ভালো লাগিত। চুল ভালো থাকিবে বলিয়া বামার মা যখন চুলের গোড়া কড়্‌কড়ে করিয়া বাঁধিয়া দিত, তখন মুক্তির সমস্ত মাথাটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই-টাতেই সে আনন্দ বোধ করিত। এবং এইরূপ আনন্দের প্রতি একটা লোভ মুক্তির মনে মনে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল।

সন্ধ্যাবেলাটি ভারি চমৎকার কাটিত। বামার মা অনেক রূপকথা জানে; মুক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তার কাছে বসিয়া সেই সকল কথা শুনিত। স্বপ্নপুরীর সেই সব কাহিনী সন্ধ্যার আবছায়ার উপরে একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিত। সেখানকার ভয় ভাবনা, আশা-ভালোবাসা মুক্তির হৃদয়টাকে লইয়া দোলের পর দোল খাওয়াইতে থাকিত। নানা বিপদের পর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় করিয়া, তরুণ রাজকুমার তার প্রিয়তমা রাজকুমারীকে লইয়া পলাইতেছে—

পক্ষিরাজের উদ্দাম গতিতে ভীত রাজকুমারী দুই বাহু দিয়া রাজপুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে—এই সব কথা যখন শুনিত তখন মুক্তি তাহাতে এমনি ডুবিয়া যাইত যে তার মনে হইত যেন সে নিজেই সেই রাজকুমারী। তার কল্পনার রাজকুমারের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতে গিয়া তার বুক দুরুদুরু করিতে থাকিত। আবার রাজকুমারী যখন রাজকুমারের বিরহে বনে বনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তখন সেই রাজকুমারীর কান্না মুক্তির বুকের ভিতর হইতে আপনি গুমরিয়া উঠিত। তার পর সব শেষে, মিলনের দিনে রাজপুত্র রথে করিয়া আসিয়া যখন বলিত—রাজকুমারী এস ! তখন মুক্তির হৃদয় আগেভাগে সেই রাজপুত্রের রথের উপরে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। মুক্তি যখন একলাটি থাকিত, এই সমস্ত কাহিনী মনের পৃষ্ঠা হইতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বার বার করিয়া পড়িত—এর নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচিত না।

এমনি করিয়া সুখে দুঃখে মুক্তির দিন একরকম কাটিতেছিল ; কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে সব ওলটপালট হইয়া গেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না—এই প্রবাদটা যখন নকলচাঁদ বাবাজীকেও বাদ দিল না, তখন বাবাজীর বড় বিপদ হইল। প্রতিদিন তার আয় কমিতেছিল। শেষে এমন হইল যে যে-সব ভক্তেরা রোজ কেবল প্রসাদটুকু পাইয়া কৃতার্থ হইবার জন্য আসিত, তাদেরও গাঁজার বরাদ্দের উপর টান পড়িল। চিত্ত আর তেমন স্থির হইতেছেনা, ভজন-সাধনের ব্যাঘাত হইতেছে—এই বলিয়া ভক্তেরা দলে দলে অন্য মহাপুরুষের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। নূতন খরিদ্দারও জোটে না, পুরাতন খরিদ্দারও ভাঙিয়া যাইতেছে—এমন করিয়া আর ক' দিন চলে ? কাজেই নকলচাঁদ বাবাজী জাল গুটাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুক্তির স্বামী কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছিল,—সে বাবাজীর পা কিছুতেই ছাড়ে নাই। চিত্তস্থির হইবার ব্যাঘাত ঘটিতেছে বলিয়া তারও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিত বটে কিন্তু বাবাজীকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিত না। ইহকাল তো কিছুই নয়—পরকালের জন্যই তো ভাবনা ! সেইজন্য এই পরকালের গতি-সম্বন্ধে তার ভারি একটা লোভ ছিল। সে ভাবিত, বাবাজীর কৃপায় যখন স্বর্গের অর্দ্ধেক পথ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে ;—বাবাজীকে ছাড়া নয়।

বাবাজীরও তাহাকে না হইলে চলিত না। সে বাজার হইতে ঘি আটা

আনিয়া দেয়, ধুনীর আগুন জ্বালে, ফাইফরমাসটা খাটে, সকাল সন্ধ্যা পদ-সেবাটাও বেশ করে। এই সব আরাম বাবাজী অনেক দিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে, চট করিয়া তাহা ত্যাগ করা তার পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এই চেলাটি যাহাতে হাত-ছাড়া না হয় সে দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সে একদিন এই ভক্তটির কাঁধের উপর বার দুই তিন থাপ্পড় দিয়া বলিল—"বাচ্ছা, আমি দেখচি তোরই ভিতর খাঁটি চিজ আছে; ভিও যারা তারা সব ভেগেছে। এখন চল তোর উপায় করে দি।"

মুক্তির স্বামী গুরুজীর এই কথায় একেবারে গদগদ হইয়া গেল। সে তো আগে হইতেই জানিত যে মহাপুরুষেরা কঠোর পরীক্ষার পর তবে স্বর্গে যাইবার গুপ্ত পথের সন্ধানটি ফাঁস করেন; সেই জন্যই তো সে এমন-করিয়া এতদিন বাবাজীর পা-ধরিয়া পড়িয়াছিল। এখন এই মহা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে মনে করিয়া তার গর্ব্ব হইতেছিল। গুরুজীর কৃপা হইয়াছে —এই আনন্দে সে অনেকক্ষণ-ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া দুই হাত দিয়া গুরুজীর পা জড়াইয়া রহিল।

তার পর একদিন গা-ময় ভস্ম মাখিয়া, গুরুদেবের তল্পিতল্পা ঘাড়ে করিয়া, সে গুরুজীর পিছন পিছন কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মুক্তির কথাটা হঠাৎ একবার মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে যে তার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক—মুক্তিলাভের অন্তরায়! এই জন্য তার কথাটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ গাঁজার কলিকায় কষিয়া একটা দম দিতে বসিয়া গেল। যাইবার খবর মুক্তির কাছে নিজে দিতে গেলে পাছে কোনো ফ্যাসাদে জড়াইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে যাইবার সময় মুক্তির সহিত দেখা করিতে গেল না,—একটা উড়ো লোক দিয়া খবরটা পাঠাইয়া দিল।

মুক্তির স্বামী আছে, বামার মা শুধু এইটুকুই জানিত; এ-পর্য্যন্ত তার সহিত কোনো পরিচয় হয় নাই। সে যখন মুক্তির কাছে আসিত তখন প্রায়ই তার স্বামী বাড়ি থাকিত না; দৈবাৎ কখনো দেখা হইলে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত। কাজেই মুক্তির স্বামী যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এ সন্দেহটিপর্য্যন্ত বামার মার মনে আসিতে পারে নাই।

মুক্তিও কিছু বলে নাই—বলিবার কোনো তাগিদও তার মন হইতে উঠে নাই। তার মনটি ছিল এমনি ভীরু যে সকল রকম অবস্থাকে নিঃশব্দে মানিয়া লওয়াই তার ধর্ম্ম ছিল। কোনো দুঃখ যখন তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত

সে জড়সড় হইয়া তার পানে কেবল চাহিয়া থাকিত ;—তার পর সেটা যখন তার মাথার ঝুঁটি ধরিয়া নাড়া দিতে থাকিত তখনও সে এমনি ভয়ে-ভয়ে থাকিত যে একটা আর্ত্তনাদও করিতে পারিত না। সমস্ত দুঃখকে বুকের মধ্যে চাপিয়া সে কাঠ হইয়া থাকিত।

স্বামী যে তার একটা সহায় এমনভাবে স্বামীকে দেখিবার অবকাশ মুক্তির কখনো হয় নাই, কাজেই স্বামী যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সে নিজেকে যে খুব নিঃসহায় মনে করিল তা নয় ;—বামার মার সঙ্গে তার যেমন দিন কাটিতেছিল তেমনি কাটিতে লাগিল। কিন্তু একজায়গায় একটু বাধিল। স্বামী চলিয়া যাইবার দিন দুই-চার পরে বামার মা বাজারের পয়সা চাহিলে মুক্তি বলিল—"বাজার করবার দরকার নেই।"

বামার মা অবাক্ হইয়া মুক্তির পানে চাহিয়া রহিল।

মুক্তি আর কথাটি কহিল না। তার বলিবার কথা সমস্ত যেন ঐ-খানেই শেষ হইয়া গেছে। পয়সা নাই তাই বাজার হইবেনা—এর আগে কিম্বা এর পরে যে কোনো কথা আছে তাহা তার মন ভাবিতেই ছিল না।

বামার মা কিন্তু এত সহজে ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে পারিল না—সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আসল কথাটা জানিয়া লইল।

কিন্তু বামার মার মনে কেমন খট্‌কা লাগিতেছিল—খাম্‌কা একটা মানুষ নিজের স্ত্রীকে এমন করিয়া ফেলিয়া পালায় কেন? তাই সে বারবার মুক্তিকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—"বলনা, কিছু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে বুঝি?"

মুক্তি যতই বলে—"না", বামার মা কিছুতেই সে কথা কানে তুলিতে চাহে না। সে চাহিতেছিল, মুক্তি বলুক—"হাঁ"। নইলে সে যে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না।

তারপর দিনের পর দিন চলিয়া গেলে বামার মার আপনা হইতেই যখন দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, মানুষ ঝগড়া করিয়া কখনো এতদিন ঘর-ছাড়িয়া থাকে না, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তির পাশে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে সময়ে তার নিজের জীবনের কথাই মনে পড়িতেছিল। সে যে ভুক্তভোগী, তার বামাকে বুকে ধরিয়া সে যে-দিন একা নিঃসহায় অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিনকার কথা তার মনে পড়িতে লাগিল ;—সে কী ভীষণ অসহায়তা!—কোনো দিকে যেন কূল নাই! আজ যে মুক্তিরও সেই অবস্থা ;—এই কথা মনে করিয়া তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। একটা মিথ্যা সন্দেহে তার

স্বামী যখন তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, তখন স্বামীর উপর সে তেমন করিয়া রাগ করিতে পারে নাই—হাজার হউক স্বামী তো বটে! সে-দিন সে স্বামীকে ধিক্কার দেয় নাই, নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়াছিল। কিন্তু আজ মুক্তির এই অবস্থা দেখিয়া সে পৃথিবীর সমস্ত স্বামীর উপরে হাড়ে চটিয়া গেল এবং তাহাদের সকালকার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিল।

বিবাহ হইয়া গেলে মুক্তির বাপের বাড়ি হইতে কেউ আর তার কোনো খবর লয় নাই। মুক্তির সৎমা নূতন সংসার বেশ-করিয়া জমাইয়া বসিয়াছিল। নিজের ছেলেমেয়েদের লইয়া সে সমস্ত-সংসারটা এমন করিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল যে মুক্তির জন্য এতটুকু স্থান পড়িয়া থাকে নাই। তার উপরে অনটনের সংসার! যাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখা যায়, এমন লোককে ডাকিয়া নিজের ভাতের ভাগ দেবার মতো উদারতা সাধু-সমাজেই দুর্ল্লভ—মুক্তির সৎমা তো কোন্ ছার।

বাপের বাড়ির দিকে মুক্তির কোনো টান ছিল না। সেখানে তার এমন-কিছুই ছিল না যাহাকে সে আপনার বলিতে পারে। সেই জন্য বামার মা যখন সেখানকার কথা তুলিল তখন মুক্তি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিল—"সেখানে আমার কেউ নেই বামার মা।"

বাপের বাড়ীর কথা উঠিতেই মুক্তির ব্যাকুল হাতখানা বামার মার আঁচলটা জোরমুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল।

মুক্তির ঘরে সঞ্চয়ও ছিল না, গায়ে অলঙ্কারও ছিল না,—এয়োতি-মান রক্ষা করিবার জন্য হাতে দুগাছি পিতলের চুড়ি ছিল মাত্র। বামার মারও যে আয় ছিল তাতে তার একলার পেটটি কষ্টে চলিত। তার উপর ইদানিং মুক্তির জন্য তাহাকে আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইয়াছিল। কাজেই তার একার উপর নির্ভর করিয়া দুজনের দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। বামার মা মনে-মনে বলিত, আমি তো অনেক উপবাস করিয়াছি—উপবাস আমার খুব গা-সহা। এই বলিয়া সে মাঝে মাঝে উপবাস দিতে লাগিল। মুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—"আজ যে মা অন্ন খেতে নেই।" তার পর হঠাৎ একদিন মুক্তি আবিষ্কার করিল যে, পাঁজিতে যেদিন উপবাসের বিধান নাই সে-দিনও বামার মা উপোস করিয়াছে। তখন সে ভারি আপত্তি করিতে লাগিল। সে বলিল—"তুমি যদি অমন করে উপোস কর তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে উপোস করব।"

বামার মা জিব কাটিয়া বলিল—"ওমা সেকি হয়! তুমি হলে এয়োস্ত্রী! আমার যে উপোস করা দরকার মা। তাতে শরীর ভালো থাকে। বুড়ো-মানুষ বেশী খেলে গতর মাটি হবে।"

বামার মার অন্ন খাইতে হইতেছে বলিয়া পাছে মুক্তি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় সেই জন্য বামার মা মুক্তিকে শুনাইয়া রাখিত যে, সে যাহা দিতেছে তাহা ধার বলিয়াই দিতেছে—জামাই যখন ফিরিয়া আসিবে তখন সুদশুদ্ধ আদায় করিয়া তবে ছাড়িবে।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সঙিন্ হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু পেটের অন্ন লইয়া যদি কথা হইত তাহা হইলে না হয় এক-রকম-করিয়া চলিয়া যাইত—কিন্তু তা তো নয় অভাব যে চারিদিকে। মুক্তির পরণের কাপড় সেলাই করিয়া, তালি দিয়া নানা-রকমে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ছেঁড়া-বাঁচাইয়া কোনো রকমে লজ্জা নিবারণ হইতেছিল, শেষে তাও আর চলে না; ঘরের ভাড়ার জন্য তাগাদার পর তাগাদা আসিতেছে; স্বামীর হাত-চিঠায় মুদির দোকানে যে দেনা আছে তার জন্য মুদি আসিয়া মুক্তিকে যাচ্ছেতাই শোনাইয়া যায়; কলের জল অশুচি বলিয়া তার স্বামী গঙ্গাজল খাইত, তার ধার আছে বলিয়া একদিন একটা উড়ে ভারী ঘর হইতে জলের ঘড়াটা জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। এমনিতর কতদিকে যে কত উৎপাত তার ঠিক নাই;—নিরুপায় বলিয়া কেহ তাহাকে ক্ষমা করিত না। মুক্তি মুখটি বুজিয়া সমস্ত সহ্য করিত।

—শেষে আর উপায় না দেখিয়া বামার মা একদিন মুক্তিকে বলিল—"মা, এক কাজ করবি, আমার সঙ্গে পান-বেচতে যাবি?"

সকালে অপিসের সময় বামার মার পানের দোকানে ভারি ভিড় হইত। সে একলা সকলকে পান জোগাইয়া উঠিতে পারিত না। তাড়াতাড়ির সময়,—বাবুরা যে দুদণ্ড দাঁড়াইয়া পান লইবে তা হইত না, কাজেই অনেক খরিদ্দার ফিরিয়া যাইত। সেই জন্য বামার মার মনে হইতেছিল যদি এই সময়ে মুক্তি আসিয়া একটু সাহায্য করে তো অনেকটা সুসার হয়।

যে লোক ডুবিতেছে সে যেমন-করিয়া কুটাকে আশ্রয় করে, মুক্তি পান বেচিবার প্রস্তাবটি তেমনি করিয়া গ্রহণ করিল।

বড় রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ির গায়ে ছোট্ট একটু রক—তারই এক-কোণে ছিল বামার মার পানের দোকান। দোকানের সরঞ্জাম বিশেষ কিছু ছিল না;—একটি দড়ি-দিয়া বাঁধা ভাঙা টিনের বাক্স এবং তার ভিতরে

কয়েকটি গোল-গোল টিনের কৌটা। বামার মার পাশে একটুখানি জায়গা করিয়া মুক্তি সেই দোকানে আসিয়া বসিল। মুক্তির ছিন্ন মলিন বস্ত্র, কপাল অবধি ঘোমটাটুকু টানা। তার সেই শুষ্ক করুণ মুখখানির উপরে টানা-টানা দুইটি চোখ স্থির হইয়া ভাসিতেছে—শুধু এইটুকুই দেখা যাইতেছিল।

মুক্তি স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। তার মনটা চারিদিককার নূতন জিনিস দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তার অনভ্যস্ত চোখ মনের সেই ঔৎসুক্যকে নিজের মধ্যে কিছুতেই জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না;—তার চোখ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল; এবং তার অলস দৃষ্টির সেই নীরব করুণ নীরবতার উপরে তার বোবা হৃদয়টির আভাস থাকিয়া-থাকিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল।

মুক্তি এমন জড়সড় হইয়া ছোট্টটি হইয়া বসিয়াছিল যে রাজ-পথের চারিদিকের ব্যস্ততা ও বিশালতার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কিন্তু তাহাতেই আশেপাশে চারিদিকে একটা চঞ্চলতার ঢেউ বহিয়া গেল। অনেকের উৎসুক দৃষ্টি তার উপরে বারে বারে পড়িতে লাগিল। অপিসের বাবুরা দোকানের ধারে এমন ভিড় করিয়া দাঁড়াইল যে, সেই ভিড় দেখিবার জন্যই লোকের ভিড় জমিয়া গেল। মুক্তির হাত হইতে পান লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সে দিন বাবুদের আপিস যাইবার তাড়াতেও একটু শৈথিল্য দেখা গেল! পান না লইয়া কেহ নড়িল না, এবং পান হাতে লইয়াও বন্ধুর জন্য অপেক্ষার অছিলায় অনেক দাঁড়াইয়া রহিল। এমনও হইল যে অপেক্ষা করিতে করিতে হাতের পান ফুরাইয়া গেলে আবার পান লইতে হইল। তাহাতে সময়ের এবং অর্থের যে অপব্যয় হইল তার জন্য তাহাদের এতটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখা গেল না।

মুক্তি এত জনসমাগমে একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই যে তারই জন্য এই কাণ্ড;—সে ভাবিতেছিল বুঝি এমনি ধারাই রোজ হয়।

দোকানের সমুখে দাঁড়াইয়া খরিদ্দাররা নানারূপ জল্পনা করিতেছিল; মুক্তির কানে তার গুঞ্জন ধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। সে মুখ নীচু করিয়া পান সাজিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ একটা উচ্চকণ্ঠের হাসি বা কথার শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়া তার সেই টানাটানা অস্ফুট চোখ তুলিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিতে-

ছিল। তার সেই দৃষ্টিটুকুকে সকলে এমনিভাবে গ্রহণ করিতেছিল যেন সেটি তাদের পরম আরাধনার ধন!

তারপর মুক্তির হাতে যখন কাজ রহিল না, সে অলস দৃষ্টিতে রাস্তার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। একটি মানুষের সঙ্গ ধরিয়া যতদূর পারে সে তার দৃষ্টিটিকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল, তার পর সে মানুষটি অদৃশ্য হইয়া গেলে আবার নূতন মানুষের সঙ্গে দৃষ্টিকে বাঁধিয়া দিতেছিল। এমনি-করিয়া সে মানুষের পর কেবল মানুষই দেখিয়া যাইতেছিল। তার পর সে-রাত্রে সে যখন নিদ্রা গেল তখন তার মাথার ভিতরে কেবল মানুষের মুখ বিজ্‌বিজ্‌ করিতেছে।

পথের লোক যে তার পানে ফিরিয়া-ফিরিয়া চাহিয়া যায় এটা অল্প দিনের মধ্যেই মুক্তির নিকট ধরা পড়িল। যে-দিন এই খবরটি একটি মানুষের চোখ দিয়া তার মনের মধ্যে প্রথম পৌঁছিল সেই দিন হইতে দেখিল তার দিকে লোকের চাহিবার যেন আর অন্ত নাই! সে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু যে-লোকটির দ্বারা এই খবর সে প্রথম পাইল, স্মরণ-পথে সে অক্ষয় হইয়া রহিল।

তার সঙ্গে মুক্তির যখন প্রথম চোখের মিলন হয় তখন ঠিক্‌-দুপুর বেলা। রাস্তার গোলমাল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে, দু-একটিমাত্র লোক চলাচল করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড অলসতা রাস্তার এধার-ওধার জুড়িয়া গা-মেলিবার আয়োজন করিতেছে। মুক্তির মনের ভিতরেও এতটা অলসতা ধোঁয়ার আকারে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সে আপনার-মনে বসিয়া ধীরে ধীরে পান সাজিতেছিল। হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখে দূরে একটি অনিমেষ দৃষ্টি তার মুখের উপরে পড়িয়া আছে। মুক্তি প্রথমে কোনো খেয়াল করিল না, সে চোখ নামাইয়া লইল। খানিকক্ষণ পরে তার চোখ যখন অন্যমনস্কভাবে আবার সেই দিকে গিয়া পড়িল তখনও দেখিল সেই দৃষ্টি সেই এক-ভাবেই রহিয়াছে। তার মনে হইতে লাগিল যেন এই দৃষ্টিটি কতদূর হইতে কতদিন ধরিয়া তারই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া আজ এইমাত্র তার হৃদয়ের তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আপিসের বাবুরা যখন পানের দোকানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত তখন মুক্তি চোখ তুলিবার বড় অবসর পাইত না;—যেটুকু উপর দিকে চাহিত তাহাতে শুধু ভিড়টাই নজরে পড়িত—আলাদা-করিয়া মানুষ চোখে পড়িত না। কিন্তু

দুপুরবেলাকার সমস্ত অলসতা ও নির্জ্জনতার উপরে সেই যে একটিমাত্র দৃষ্টি জাগিয়া থাকিত তাহাই মুক্তির কাছে তখন বিশ্বের মাঝে একমাত্র দৃষ্টি বলিয়া মনে হইত। রাস্তায় সে এত-লোক দেখিত যে কাহাকেও মনে রাখা সম্ভব নয় —কিন্তু এই-যে-একটি-লোক সমস্ত মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতিদিন একলা আসিয়া দাঁড়াইত তাহাকে ভুলিবার অবসর কোথায়? আর-সমস্তকে ছাড়াইয়া সে মুক্তির নির্জ্জন মনের উপরে দিন দিন চাপিয়া বসিতে লাগিল।

মুক্তির দুবেলা দু-মুঠা জুটিতেছে, পরণের কাপড় মিলিয়াছে, ইহাতে বামার মা খুসী ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুক্তিকে দেখিয়া তার ভাবনা হইত—এমনি করিয়াই কি মেয়েটা ঘরছাড়া ছন্নছাড়া হইয়া থাকিবে। এক-একসময় তার মনে ভারি ক্ষোভ হইত—হয়ত বা তারই অদৃষ্টে মেয়েটার এমন দশা হইল। সে হতভাগিনী যেখানে গিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মুক্তির কথা ভাবিয়া তার চোখে জল আসিত।

বামার মা চুপ-করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে গোপনে মুক্তির স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। নকলচাঁদ বাবাজীর যে-সব শিষ্য ছিল তাহাদের বাড়ি হাঁটাহাটি করিয়া অনেকবার বিফলমনোরথের পর সে নকলচাঁদ বাবাজীর ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছিল; তার পর আধা-লেখা-পড়া-জানা একটা লোককে ধরিয়া অনেক খোসামোদের পর মুক্তির স্বামীকে একখানা চিঠি লেখাইয়া সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন সে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।

মুক্তির সেই মনের মানুষটি মনের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছিল। সে যে কোনো দিন আসিয়া মুক্তির সামনে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে তাহা মুক্তি কল্পনাও করিতে পারে নাই।

একদিন দুপুরবেলা বামার মা বাজারে পান কিনিতে না কি-করিতে গিয়াছিল মুক্তি একলাটি বসিয়াছিল, সে হঠাৎ আসিয়া বলিল—"মুক্তি এস!"

মুক্তি মুখ তুলিয়া চাহিল।

তার মনে হইল "মুক্তি এস!"—এই কথাটি সে যেন স্বপ্নে শুনিল—একটি সহজ সরল পরিচিত ডাকের মতন। স্বপ্নে মানুষ যেমন অসহায় হইয়া যায়,—ঘটনাস্রোত কোথায় লইয়া চলিয়াছে তার যেমন হিসাব থাকেনা, মুক্তির ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। কোথায় যাইতে হইবে—কেন যাইতে হইবে—এই সকল প্রশ্নের সংশয় তার সেই স্বপ্নাবিষ্ট কাঁচা মনের জড়তার উপরে কোনো আঘাত দিতে পারিল না। তার কানে গেল শুধু সেই আহ্বানের সুর; সে-

সুরের নেশা তার মনে গিয়া লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল এই ডাক যেন বামার মার মুখে শোনা সেই রূপকথার রাজপুত্রের ডাকের মতন—"রাজকুমারী এস!" অনেক দিনের বিরহের পর, অনেক দুঃখের পর, রাজপুত্র তো এমনি করিয়া আসিয়া অভাগিনী রাজকন্যাকে ডাক দিয়াছিল! মুক্তির চোখের সামনে জল্‌জল্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল সেই রাজপুত্র—সেই রাজপুত্রের রথ! তার মন আর বিলম্ব সহিতে পারিল না; তার দুরুদুরু হৃদয় রাজপুত্রের রথের উপরে গিয়া বসিল—মুক্তি দোকান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল।

তার পর বৈকালে যখন চৌ-রাস্তার মাথায় একলা দাঁড়াইয়া চারিদিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, তখন কোথায় তার সেই রাজপুত্র, কোথায় বা তার রথ! তার চোখের উপরে পৃথিবীর আলো ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রাজপুত্রের রূপ-ধরিয়া এ কোন্ মায়াবী রাক্ষস তাহাকে ভুলাইয়া গেল। তার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।

তারপর যখন বামার মার দোকানে আসিয়া পৌঁছিল তখন যেন বাণবিদ্ধ পাখীর মতো সে লুটাইতেছে।

বামার মা একলাটি দোকানে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। আজ সে মুক্তির স্বামীর চিঠি পাইয়াছে; সে লিখিয়াছে—তীর্থধর্ম্ম-করা তার আর পোষাইতেছে না, বাড়ি ফিরিবার মন আছে, কিন্তু হাতে পয়সা নাই, ভিক্ষা করিয়া-করিয়া পথ-খরচের জোগাড় করিতেছে, টিকিটের দামটা জমিলেই সে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে। বামার মা ভাবিতেছিল টিকিটের দামটা কত? এবং কষ্টেসৃষ্টে কোনোরকমে সেটা এখান হইতে পাঠানো যায় কি না। এমন-সময় মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বামার মা তার দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল —"কোথায় গিয়েছিলি মা?"

মুক্তি তার সেই বড়-বড় চোখ-দুটা হইতে আগুন-ঠিকরাইয়া বলিয়া উঠিল —"যমের বাড়ি!"

বামার মা হতভম্ব হইয়া মুক্তির সেই জ্বলন্ত চোখের পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তির স্বামীর চিঠি তার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল।

এমন সময় একজন খরিদ্দার জোর-গলায় হাঁকিল—"এক পয়সার পান!"

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

নিধিরামের বেসাতি

[১]

চৈতালীর আবাদ শেষ করিয়া নিধিরাম কলিকাতা আসিত, তাহার পর বর্ষা নামিতেই দেশে ফিরিত, এই ছয়টি মাস প্রত্যহ দেখিতাম একচক্ষু নিধিরাম পাঠক মাথায় একটি ছোট লাল টিনের বাক্স চাপাইয়া হাঁকিয়া যাইতেছে "চাই—ই—চীনা-আ—সিঁদুর।" আর তাহার পশ্চাতে নগ্নকায় শিশুর দল বাদল মিত্রের গলির তন্দ্রালস মধ্যাহ্নকে সচকিত করিয়া চীৎকার করিতেছে, "চাই—ই কাণা ইঁদুর।" কবে ছন্দরসিক কোন্ শিশুকবি সিন্দুরওয়ালা নিধিরামের এই অপূর্ব্ব স্তববাণী প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানেনা সম্ভবতঃ স্বয়ং কবিরও সে কথা মনে নাই, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতি বৎসর নব নব শিশুকণ্ঠ একই ভাষায় নিধিরামকে অভ্যর্থনা করিয়া আসিতেছিল। এই বিরূপ সম্বর্দ্ধনায় নিধিরাম কোনও দিন রাগ করে নাই, প্রত্যুত্তরে মূষিকের অনুকরণে শব্দ করিয়া তাহার শিশুবন্ধুগণকে খুসী করিয়াছে, দেখিয়াছি।

বিশ বৎসর ধরিয়া এইরূপেই চলিতেছিল, সহসা একদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া নিধিরাম আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গলির মধ্যে ঐকস্থানে গুটিকয়েক শিশু জটলা করিতেছিল, নিধিরাম সেখানে আসিয়া গলার স্বর উঁচু করিয়া হাঁকিল, "চাই-ই-চীনা-আ সিঁদুর!" দূর হইতে দুই একটি কণ্ঠে পরিচিত প্রতিধ্বনি শোনা গেল বটে, কিন্তু প্রত্যহের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিল না।

শিশুর দল নীরবে পরম সম্ভ্রমের সহিত একজনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। নিধিরাম নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা কহিতেছিল একটী বালিকা। কোমরে নীলাম্বরী শাড়ীর অঞ্চল জড়াইয়া হাত নাড়িয়া সে প্রতিপন্ন করিতেছিল যে, কাণাকে কাণা এবং খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই এবং যদি কেহ বলে তবে তাহার সহিত বক্তার জন্মের মত আড়ি এবং পুতুলের বিবাহে সে তাহাকে কদাচ নিমন্ত্রণ করিবে না। সমাজ-চ্যুতির এই নিদারুণ শাস্তির ভয়ে পরিচিত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াও শিশুর দল আজ নীরব হইয়াছিল,

নিধিরাম তাহা বুঝিল এবং বক্তাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যায় ফিরিবার পথে গলির মোড়ে নীলবাড়ীর দরজায় দ্বিপ্রহরের শিশুসভার এই নেত্রীটির সহিত নিধিরামের সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। নিধিরামকে দেখিয়াই বিনা ভূমিকায় বালিকা কহিল "তুমি আর জন্মে কাণাকে কাণা ব'লছিলে, সিঁদুরওয়ালা?" বলা বাহুল্য জন্মান্তরের কথা নিধিরামের স্মরণ ছিল না, শুধু এই নবাগতার সহিত আলাপ জমাইবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "হ্যাঁ মা লক্ষ্মী।"

"মা বলেছে তাই এ জন্মে তুমি কাণা হ'য়েছ না?" বলিয়াই সে এক প্রচণ্ড অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করিল, "যদু মধু ছোট্‌কু নিমাই সবাই আর-জন্মে কাণা হবে। তোমায় খেপায় কিনা!"

নিধিরাম দাঁতে জিভ কাটিয়া কহিল, "ওসব কথা বলতে নাই মা লক্ষ্মী।" 'মা লক্ষ্মী' এইবার রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "বল্‌ব, একশো বার বল্‌ব। তারা কেন তোমাকে কাণা বলবে?" বলিয়াই একটু থামিয়া সে প্রশ্ন করিল, "তুমি বামুন?"

নিধিরাম কহিল "হ্যাঁ।"

প্রশ্নকর্ত্রীর চক্ষে সংশয় ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল "দেখি পৈতে?"

নিধিরাম ছিন্ন মেরজাইয়ের মধ্য হইতে মলিন উপবীত গুচ্ছ বাহির করিয়া দেখাইল। বালিকা কহিল, "কাল রাধুর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে। তুমি মন্তর পড়াবে?"

নিধিরাম তৎক্ষণাৎ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া কহিল, "পড়াব।"

"আমরা কিন্তু গরীব মানুষ, দক্ষিণে দিতে পারব না, বুঝলে?" বলিয়া পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত বালিকা কহিল, "এইটি পার হ'লেই বাঁচি। আর দুটীকে এক রকমে বিয়ে দিইছি। মাগো, ছেলেমানুষ করা যে কি কষ্ট!" এই বলিয়া পুতুলের ডালাখানি নিধিরামের হাতে দিয়া সে কহিল, "দেখ্‌ছ, মেয়ের আমার মুখখানা রোদে একেবারে শুকিয়ে গেছে। এখন আবার জল দিয়ে রাখ্‌তে হবে নৈলে পাড়ার লোকে বৌ দেখবার সময় খোঁটা দিয়ে বল্‌বে, বৌ কুচ্ছিৎ।" এমন সময় ভেতর হইতে আহ্বান আসিল "সুরু?"

"মাগো মা! দেখ্‌ছ? দু-দণ্ড আপন ছেলেমেয়ের কথা কইবার যো নেই!"

বলিয়া বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। পুতুলের ডালা তাহার হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল, "তবে আসি মা লক্ষ্মী!"

"আমি লক্ষ্মী নইগো, সরস্বতী। আমাকে মা সরস্বতী ব'লে ডাকবে বুঝ্‌লে? এই বলিয়া বালিকা ভিতরে ঢুকিল। নিধিরামের সহিত সরস্বতীর পরিচয়ের সূত্রপাত হইল এই প্রকারে।

[২]

এই মুখরা মেয়েটীকে সহসা নিধিরামের অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে কালীঘাটের পুতুল, গালার চুড়ী দু-এক টুক্‌রা জরির কাপড় নিধিরামের সিঁদুরের বাক্সে আশ্রয় পাইয়া অবশেষে সরস্বতীর খেলাঘরে স্থানলাভ করিতে লাগিল। প্রত্যহের আনন্দহীন একঘেয়ে কেনাবেচার মধ্যে এই মেয়েটির সঙ্গে দু-দণ্ড কথা কহিয়া নিধিরাম আনন্দ পাইত; সময় সময় নীলবাড়ীর জানালার রোয়াকে সিন্দুরের পেটরা কোলের উপর রাখিয়া নিধিরাম সরস্বতীর সহিত তাহার মাটীর ছেলেমেয়েদের সুখদুঃখের কথা কহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছে; ভিন্ন পল্লীতে গিয়া বেসাতি বেচিলে দশটা পয়সা রোজগার হয়, একথা মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে বটে, তথাপি তাহার প্রগল্‌ভা বান্ধবীর কথার মোহ সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ সে কথাগুলি একান্তই নিরর্থক এবং কোনো দিন নিধিরামের কোনও কাজে লাগিবার ছিল না।

বর্ষা নামিলে নিধিরাম দেশে গেল।

সেবার দেশে মারাত্মক রকমের একটা ব্যাধির উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার আক্রমণ হইতে নিধিরামও নিষ্কৃতি পাইল না। মাস ছয় জ্বরে ভুগিয়া একদিন মাঘের দ্বিপ্রহরে নিধিরাম তাহার সিন্দুরের লাল বাক্সটি মাথায় করিয়া সরস্বতীর বাড়ীর দরজায় আসিয়া হাঁকিল "চাই-ই-চীনা আ সিঁদুর।" আগেকার মত আর কেহ দুড় দাড় করিয়া নামিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল না, দ্বিতীয়-বার হাঁকিতে নীচের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া গেল। জানালায় সরস্বতীকে দেখিয়াই এক গাল হাসিয়া নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ো বেটার কথা মনে ছিল সরু মা?" সরস্বতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। নিধিরাম আশ্চর্য্য হইল, সরস্বতী না বলিয়া থাকিবার পাত্রী নহে। জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ছেলেমেয়ে ভাল আছে তো, সরুমা?" এইবার সরস্বতী কথা কহিল "সে সব আমি রাধুকে বিলিয়ে দিইছি।" ইহার পর তার কোনও প্রশ্ন করিবার সূত্র নিধিরাম খুঁজিয়া

পাইল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অনেক ভাবিয়া সে কহিল, "একবার বাইরে আস্‌বে মা ?" সরু কথা কহিল না, পিছন হইতে সরস্বতীর কনিষ্ঠ ভাইটি কহিয়া উঠিল, "মা বলেছে দিদি আর বাইরে যাবে না। দিদি বড় হয়েছে কি না।" ওঃ, তাই ! এই বার নিধিরামের চক্ষে সরস্বতীর পরিবর্ত্তন ধরা পড়িল। এক বৎসর সে সরস্বতীকে দেখে নাই। কিন্তু বর্ষ পূর্ব্বে গৃহযাত্রার দিন সে যে মুখরা চঞ্চলা বালিকার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছিল তাহার সহিত এ মেয়েটির প্রভেদ বিস্তর। ইহার সহিত কি ভাষায়, কোন উপলক্ষে কথা কহিবে তাহা সহসা নিধিরাম স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ী হইতে যে পাটালী গুড় আনিয়াছিল তাহার পুঁটুলিটা জানালা গলাইয়া সরস্বতীর হাতে দিয়া নিধিরাম কহিল "বাড়ী থেকে এনেছি সরু-মা, নিয়ে যাও।" তাহার পর নিজ গৃহ সম্বন্ধে দুই একটী অসম্বদ্ধ কথা কহিয়া নিধিরাম চলিয়া গেল ; গ্রামের কারিকরের দ্বারা যে বিচিত্র বর্ণের কাঠের পুতুলগুলি গড়িয়া আনিয়াছিল সেগুলি আর বাক্স হইতে বাহির করিবার অবকাশ হইল না।

পরদিন নিধিরাম প্রত্যহের বেসাতি লইয়া নীলবাড়ীর জানালায় দাঁড়াইল ; নীচের ঘরের তক্তপোষের উপর বসিয়া সরস্বতী লেখাপড়া করিতে ছিল ; নিধিরাম মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল "কি পড়্‌ছ সরু-মা ?" সরস্বতী মুখ তুলিয়া নিধিরামকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল "কথামালা।" পরক্ষণেই প্রশ্ন করিল, "মা জিজ্ঞাসা করেছে গুড়ের দাম কত ?" প্রশ্ন শুনিয়া নিধিরাম থমকিয়া গেল ; তাহার পর শুষ্কমুখে কহিল "দিদিমাকে বোলো সরু-মা, আমার ঘরের তৈরী গুড়, পয়সা লাগেনি।" সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা।"

ইহার পর আর দুই দিন সে পথে নিধিরাম আসিল না। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নে নিধিরাম যথারীতি নীলবাড়ীর জানালায় দাঁড়াইয়া ডাকিল "সরু-মা !" সরস্বতী শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে প্রশ্ন করিল, "দুদিন কেন আসনি ?" নিধিরামের মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা হইলে সরু-মা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে। অনুপস্থিতির একটী মিথ্যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া নিধিরাম অতি সতর্ক মৃদুস্বরে কহিল, "সরু-মা ! একখানা বই এনেছি পড়বে ?" বলিয়া জানালা দিয়া একখানা বটতলার কৃত্তিবাসী বাঁধানো রামায়ণ চারিদিক চাহিয়া সরস্বতীর চৌকীর উপর রাখিয়া দিল। সরস্বতী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি আছে ?"

নিধিরাম হাসিয়া কহিল, "অনেক! রাম, রাবণ হনুমান সবার ছবি। আমি পড়্‌তে জানিনে সরু-মা তুমি আগে প'ড়ে নাও, তারপর আমাকে প'ড়ে শোনাবে।"

সরস্বতী কহিল, "আচ্ছা। তুমি আবার কাল আসবে?" নিধিরাম একটি সমুজ্জ্বল আনন্দ হাস্যের সহিত সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী রামায়ণ পড়িত আর নিধিরাম সিন্দুরের পেটরা কোলের উপর রাখিয়া জানালার রোয়াকে বসিয়া শুনিত। মধ্যে যে ইটের দেওয়ালের ব্যবধান ছিল শ্রোতা ও পাঠিকার কাহারও তাহা মনে ছিল না; সহসা একদিন ব্যবধান বাড়িয়া গেল।

পাঠ যখন অযোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন একদিন নিধিরাম আসিয়া দেখিল যে, সরস্বতীর পরিবর্ত্তে নীচের ঘরে তক্তপোষের উপর দুইটি ভদ্রলোক পরিষ্কার বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন। নিধিরাম ডাকিল, "চাই-ই—চীনা-আ সিঁদুর।" দোতালায় একটা জানালা খুলিয়া গেল, সরস্বতী জানালায় দাঁড়াইয়া বাম হাত মুখে দিয়া ডান হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে আজ পড়িবে না। নিধিরাম যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া গেল। গলির মোড়ে সরস্বতীর সখী রাধারাণী ওরফে রাধু নিধিরামকে সংবাদ জানাইল যে, সরস্বতীর বিবাহ আসন্ন এবং পাত্র পক্ষ দেখিতে আসিয়াছেন। সরু-মার বিবাহ! তারপর শ্বশুরবাড়ী! সে কতদূর! নিধিরাম একবার ফিরিয়া নীলবাড়ীর দোতালার রুদ্ধ বাতায়নের দিকে চাহিয়া মন্থরপদে চলিয়া গেল।

তিন চার-দিন ঘরে কাটাইয়া আবার সেই পেটরা মাথায় করিয়া নিধিরাম গলির মোড়ে আসিয়া একদিন হাঁকিল, "চাই-ই-চীনা-সিঁদুর।"

সেদিন নীলবাড়ীতে নহবৎ বাজিতেছে, নিধিরাম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, উপরের খোলা জানালার ধারে আজ আর আসিয়া কেহ দাঁড়াইল না।

পর দিন হইতে পুনরায় যথারীতি নিধিরামের কণ্ঠস্বর গলির সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল, শুধু নীলবাড়ীর সম্মুখ দিয়া নীরবে সে চলিয়া যাইত, শত চেষ্টাতেও কণ্ঠে কথা ফুটিতে চাহিত না।

[৩]

নিত্যকার মত সেদিনও নিধিরাম নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়

নীলবাড়ীর জানালা হইতে একটি শিশু ডাকিল "দাঁড়াও সিঁদুরওয়ালা। দিদি তোমাকে ডাক্‌ছে।" নিধিরামের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ফিরিতেই সে দেখিল নীচের ঘরের জানালায় সরস্বতী দাঁড়াইয়া। নিধিরাম আনন্দ গদগদ স্বরে কহিয়া উঠিল "কবে এলে সরু-মা? আমি তো জানিনে, তাই—"

সরস্বতী সংক্ষেপে কহিল, "আজ।" ইহার পর নিধিরাম ঘণ্টা খানেক ধরিয়া নিজেই অক্লান্ত কথা কহিয়া গেল। শেষে কহিল, "তোমার সিঁদুরের কৌটোটা আনতো সরুমা খুব ভাল উজ্‌লি সিঁদুর আছে।"

সরস্বতীর সোনার কৌটা সিঁদুরে ভরিয়া নিধিরাম সেদিনকার মত চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র বর্ণের কাঠের কৌটায় সিঁদুরের উপঢৌকন আসিতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে তরল আলতা হইতে সুরু করিয়া শাঁখের কঙ্কণ পর্য্যন্ত এয়োতির কোনও সরঞ্জাম বাদ রহিল না।

সে বার বর্ষায় নিধিরাম দেশে গেল না।

আশ্বিনে পূজার পূর্ব্বে সরস্বতী যেদিন শ্বশুর-গৃহে যাত্রা করিল, নিধিরামও সেই দিন দেশে গেল। বর্ষায় বাড়ীতে উপস্থিত না থাকিবার জন্য আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে এই বলিয়া স্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পর্য্যন্ত নিধিরামকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল কিন্তু আর্থিক ক্ষতির প্রকাণ্ড অঙ্কটি তাহাকে মোটেই বিচলিত করিল না।

ফাল্গুনের বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডালে রং ধরিয়াছে। নিধিরাম কলিকাতায় ফিরিল।

সরস্বতী শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়াছে কি না সে জানিত না। নীলবাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "চাই—ই-চীনা-আ সিঁদুর।" কোনো সাড়া আসিল না। নিধিরাম গলির পথে ফিরিয়া গেল কিন্তু কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া ডাকিল, "চাই-ই-চীনা-আ সিঁদুর!"

অতি ক্ষীণ পদধ্বনি শোনা গেল। নিধিরাম কম্পিত বক্ষে জানালার ধারে আসিয়া প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। জানালা খুলিয়া সরস্বতীর ছোট ভাইটী কহিল, "তোমাকে এ পথে আস্‌তে মা বারণ ক'রে দিয়েছে, সিঁদুরওয়ালা।"

অজ্ঞাতে কোনও অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া নিধিরামের মুখ শুকাইল। আমতা আমতা করিয়া সে কহিল, "কেন?"

এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল ম্লানমুখী শুভ্রবেশা নিরাভরণা সরস্বতী। নিধিরাম চমকিয়া উঠিল। তাহার পর মাথার পেট্‌রা মাটিতে নামাইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল।

নীলবাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

সম্বিৎ পাইয়া যখন নিধিরাম ফিরিয়া চলিল তখন তাহার মাথায় সিঁদুরের পেট্‌রা বিশ মণ ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর আর সাত দিন সে গলিতে কেহ নিধিরামকে দেখে নাই। শেষে একদিন হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানালা খুলিলাম। নিধিরামের মূর্ত্তি দেখা গেল। সিঁদুরের পেট্‌রার পরিবর্ত্তে তাহার মাথায় একটি প্রকাণ্ড ফলের ঝাঁকা। তাহার গুরুভারে অবনত হইয়া বৃদ্ধ নিধিরাম পাঠক ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নীলবাড়ীর সম্মুখ দিয়া গলির পথে হাঁকিয়া যাইতেছে—"ফল চাই মা, পাকা ফল।"



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভাগীর স্বর্গ

[১]

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাত দিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সঙ্গতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলেপুলে হইয়াছে, জামাইরা—প্রতিবেশীর দল, চাকর বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধূমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আলতা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দূর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার,—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্তা কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটী প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর-মা। সে তাহার কুটীর প্রাঙ্গণের গোটা কয়েক বেগুণ তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা,—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান, সেখানে পূর্ব্বাহ্নেই কাঠের ভার, চন্দনের টুক্‌রা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধূনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল, কাঙালীর-মা ছোট জাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত

চিতার প'রে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আল্তা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারম্বার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্চো,—আমাকেও আশীর্ব্বাদ করে যাও আমিও যেন এমনি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে তো সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন,—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ,—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল,—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্য প্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। পায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছে,—মুখ তাহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আল্তায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, 'হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস মা, ভাত রাঁধবিনে?'

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, 'রাঁধ্‌বো'খন রে।' হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, 'ছাখ্‌ ছাখ্‌ বাবা,—বামুন মা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্চে!'

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, 'কই?' ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, 'তুই ক্ষেপেছিস্। ও ত ধুঁয়া!' রাগ করিয়া কহিল, 'বেলা দুপুর বাজে আমার ক্ষিদে পায়না বুঝি?' এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'বামুনদের গিন্নী মরেচে, তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?'

কাঙালীর-মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'কাঁদব কিসের জন্যে রে,—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়!'

'হাঁঃ-ধোঁ লেগেছে বই ত না! তুই কাঁদ্‌তেছিলি!'

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকে স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল,—শ্মশান সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

[২]

সন্তানের নামকরণ কালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলোকেই যেন আমরণ ভ্যাঙ্‌চাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর-মার জীবনের ইতিহাস ছোট কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালী জীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহাদের না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর-মা হইয়া বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনেরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই খেলিনে মা ?'

'বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।'

ছেলে বিশ্বাস করিল না, 'বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি। কই, দেখি তোর হাঁড়ি ?'

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ

করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সঙ্গী-সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধূলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, 'মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়ানো দেখ্‌তে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া-পোড়ানো কি তুই—'

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, 'ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বলতে নেই, পাপ হয়। সতী-লক্ষ্মী মা-ঠাকরুণ রথে করে সগ্যে গেলেন।'

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, 'তোর এক কথা মা। রথে চড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়।'

মা বলিল, 'আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুন-মা রথের ওপরে বি, অমনি তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখলে রে!' ায়ে আল্‌তা,

'সবাই দেখলে?' না রে ক্যাঙালী?

'সব্বাই দেখ্‌লে।' বলিতে বলিতে সে

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে লল। বিভূতি বেশী তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসি ছে কি হয় নাই, ক্যাঙ্‌লার মা'র মত সতী-লক্ষ্মী আর দুলে পাড়ায় কেউ নেই।' গায়ে তাঁহার

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল; কাঙালী তেমনি ধীরে ধীরে বাঁধা লাগিল, 'বাবা যখন তোরে ছেড়ে দিলে, তখন তোরে কত লোকে ত রক করতে সাধাসাধি করলে। কিন্তু তুই বললি, না। বল্‌লি, ক্যাঙালী বাঁচলে আমার দুঃখু ঘুচবে, আবার নিকে করতে যাবো কিসের জন্যে? হাঁ মা, তুই নিকে করলে আমি কোথায় থাকতুম? আমি হয়ত না খেতে পেয়ে এতদিনে কবে মরে যেতুম।'

মা ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। বস্তুতঃ, সেদিন তাহাকে এ রামর্শ কম লোকে দেয় নাই, এবং যখন সে কিছুতেই রাজী হইল না, তখন উৎপাত, উপদ্রবও তাহার প্রতি সামান্য হয় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া

অভাগীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?'

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে ছোট বালিশটী পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, 'আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।'

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, 'জলপানির পয়সা দুটোত তা'হলে দেবে না মা!'

'না দিগ্‌গে আয় তোকে রূপকথা বলি।'

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, 'বল্ তাহ'লে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই নাম িরাজ ঘোড়া—'

আছে দিন,ী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা গল্প আরম্ভ মা হইয়া বাঁচি৲সকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের তাহার নাম রসিক ৎকিন্তু মুহূর্ত্ত কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, উঠিয়া গেল, অভাল তাহার কোটালপুত্র,—সে এমন উপকথা সুরু করিল পড়িয়া রহিল। হ তাহার শেখা নয়,—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত . তাহার সেই ;ষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই বেতের কাজ শিখিথোর ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম বছরখানেক তাহাহ,—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। যে কি, যিনি দ্বিপুলকে, সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে . কাঙালীয়া যাইতে চাহিল।

মা এক্যাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া 'ত্চরাচর ব্যপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশান যাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন। সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই

ত হরি! তার আকাশ জোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা,—সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালী চরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুন-মার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বলতে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোট জাত বলে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না করতে পারবে না। দুঃখী বলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্ ছেলের হাতের আগুন,—রথকে যে আসতেই হবে!

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্‌নে মা, বলিস্‌নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধরে আনবি, অম্‌নি যেন পায়ের ধূলো আমায় দিয়ে আমায় বিদায় দেয়। অম্‌নি পায়ে আল্‌তা, মাথায় সিঁদুর দিয়ে,—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি না রে ক্যাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

[৩]

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্তি হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশী নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেমনি সামান্য ভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদা-কাটি করিল, হাতে পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে এক টাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটাচারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন। খল, মধু, আদার স্বত্ব, তুলসী পাতার রস,—কাঙালীর মা ছেলের প্রতি রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না বলে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না।

দিন দুই তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে

যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্ ঘষা জল, গেঁটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোব্‌রেজের বড়িতে কিছু হল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হবে? আমি এম্‌নি ভাল হব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলিনে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফ্যান ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না,—ভিতরে জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; মায়ের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। নিজে একেবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামে ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর-মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না। সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাঁকে ডেকে আন্‌তে পারিস্‌ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে,—ও-গাঁয়ে যে উঠে গেছে—

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আস্‌বে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বল্‌বি মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধূলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস, বাবা, বলিস্ মা যাচ্চে।

একটু থামিয়া কহিল, ফেরবার পথে অম্‌নি নাপ্‌তে বউদি'র কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে আনিস্ ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে, যে সে সেইখান হইতেই কাঁপিতে কাঁপিতে যাত্রা করিল।

[৪]

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই; মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে,—পায়ের ধূলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিলনা, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই-মৃত্যু-পথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধূলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধূলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশন বসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধূলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে এ আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি করে দাও বাবা,—কাঙালীর হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানিনা, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিলনা। কি জানি, এত ছোট-জাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিম্বা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওয়ানা হইতে হয়,—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গেছে।

কুটীর প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাটতে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ এযে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামাকো তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়াছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গেছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাত মুখ নাড়িয়া জানাইল এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা! লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসঙ্গত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না।

হায়রে অনভিজ্ঞ! বাংলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সন্তমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কেরে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয়নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল,—আমার মা মরেচে—বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকালবেলা এই কান্না কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবর জল ছড়িয়ে দে। কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে বলে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে বলে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে! মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হইয়া কণ্ঠ যেন তাহার ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্‌গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যস্বরূপ তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল্‌গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়,—পাজি, হতভাগা নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ বাবু মশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে পোঁতা গাছ!

হাতে পোঁতা গাছ ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে ত ! পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল, এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকুরী তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকি পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়, —হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যে বাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন,—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, ঠাকুর মশাই, আমার মা মরে গেছে !

তুই কে ? কি চাস্ তুই ?

আমি কাঙালী। মা বলে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা' দিগে না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়—এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আব্দার, আমারই কত কাঠের দরকার,—কাল বাদে পরশু কাজ। যা, যা, এখানে কিছু হবে না,— এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে পোড়ায় রে ? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বেলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে।

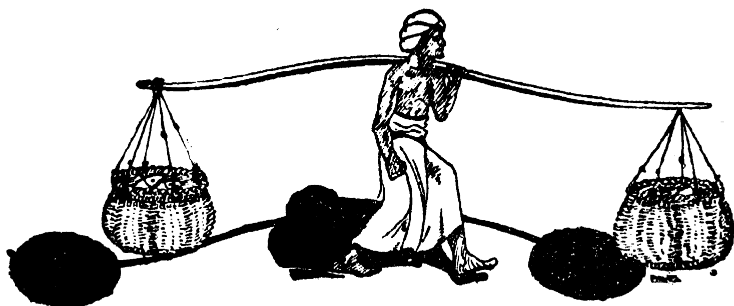
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্ছেন, ভট্চার্য্যি মশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

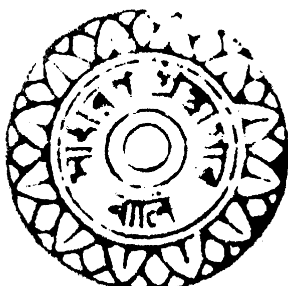
কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে

সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ান হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত,—শুধু সেই পোড়া খড়ের আটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী উর্দ্ধদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।





শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আহুতি

[১]

ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার শিং ঢুকিয়ে দেয় নি; অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। কাজেই কলিকাতা থেকে বাড়ী যেতে অদ্যাবধি কতক পথ আমাদের সেকেলে যানবাহনের সাহায্যেই যেতে হয়; বর্ষাকালে নৌকা, আর শীত-গ্রীষ্মে পাল্কিই হচ্ছে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এই স্থলপথ আর জলপথ ঠিক উল্টো উল্টো দিকে। আমি বরাবর নৌকা-যোগেই বাড়ী যাতায়াত করতুম, তাই এই স্থলপথের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ আমার কোনই পরিচয় ছিল না। তারপর যে বৎসর আমি B.A. পাস করি, সে বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে একবার দেশে যেতে হয়; অবশ্য স্থলপথে। এই যাত্রায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল, তোমাদের কাছে আজ তারই পরিচয় দেব।

আমি সকাল ছ'টার ট্রেণ থেকে নেমে দেখি, আমার জন্য ষ্টেশনে পাল্কি বেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিল, তা বলতে পারি নে। কেননা চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তারপর বেহারাদের চেহারা দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্ম্মসার মানুষ, অন্য কোনও দেশে বোধ হয় হাঁসপাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরি পাঁজরার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাত পায়ের মাংস সব দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এদের শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ —উদর—অস্বাভাবিক রকম স্ফীতি ও চাকচিক্য লাভ করেছে। আমি ডাক্তার না হলেও, অনুমানে বুঝলুম যে তার অভ্যন্তরে পীলে ও যকৃত পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। মনে পড়ে গেল বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়েছিলুম যে, অশ্বমেধের অশ্বের "যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা"। পীলে ও যকৃৎ নামক মাংসপিণ্ড

দুটিকে পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা যে অসঙ্গত নয়, এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন, শক্তিহীন হতে পারে, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম ; এ রকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে। অথচ আমাদের গ্রামের হিন্দুর বীরত্ব এই সব দেহে আশ্রয় করেই টিঁকে আছে। এরা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও হিন্দু —শরীরে অশক্ত হলেও বীর। কেননা শীকার এদের জাতব্যবসা। এরা বর্শা দিয়ে শুয়োর মারে, বনে ঢুকে জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে বাঘ বার করে ; অবশ্য উদরান্নের জন্য। এদের তুলনায়, মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে সাদা চাপকান পরা— আমার দর্শন-ধারী সঙ্গী ভোজপুরী দারওয়ানটিকে রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছিল।

এই সব কৃষ্ণের জীবদের কাঁধে চড়ে, বিশ মাইল পথ যেতে প্রথমে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়েছিল। মনে হ'ল এই সব জীর্ণ শীর্ণ জীবন্মৃত হতভাগ্য--দের স্কন্ধে আমার দেহের ভার চাপানোটা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য হবে। আমি পাল্কিতে চড়তে ইতস্তত করছি দেখে, বাড়ী থেকে যে মুসলমান সর্দ্দারটি এসেছিল, সে হেসে বললে—

"হুজুর উঠে পড়ুন, কিছু কষ্ট হবে না। আর দেরি করলে বেলা চারটের মধ্যে বাড়ী পৌছতে পারবেন না।"

দশ ক্রোশ পথ যেতে দশ ঘণ্টা লাগবে, এ কথা শুনে আমার পাল্কি চড়বার উৎসাহ যে বেড়ে গেল, অবশ্য তা নয়। তবুও আমি 'দুর্গা বলে' হামাগুড়ি দিয়ে সেই প্যাকবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লুম, কেননা তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে নিজের মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে, মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করে' যাত্রা করায় পাপ নেই। আমরা ধনীলোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে, থাকবে এবং থাকা উচিত, এই ত 'পলিটিকাল ইকনমি'র শেষ কথা। Conscienceকে ঘুম পাড়াবার কত না মন্ত্রই আমরা শিখেছি!

অতঃপর পাল্কি চলতে সুরু করল।

সর্দ্দারজী আশা দিয়েছিলেন যে, হুজুরের কোনই কষ্ট হবে না। কিন্তু সে আশা যে "দিলাশা" মাত্র, তা বুঝতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি। কেননা হুজুরের সুস্থ শরীর ইতিপূর্ব্বে কখনও এতটা ব্যতিব্যস্ত হয় নি। পাল্কির আয়-তনের মধ্যে আমার দেহায়তন খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টায় আমার শরীরের

যে ব্যস্তসমস্ত অবস্থা হয়েছিল, তাকে শোয়াও বলা চলে না, বসাও বলা চলে না। শালগ্রামের শোওয়া বসা দুই এক হলেও মানুষের অবশ্য তা নয়। কাজেই এ দুয়ের ভিতর যেটি হোক একটি আসন গ্রহণ করবার জন্য আমাকে অবিশ্রাম কসরৎ করতে হচ্ছিল। কুচিমোড়া না ভেঙ্গে বীরাসন ত্যাগ করে, পদ্মাসন গ্রহণ করবার জো ছিল না, অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্ত্তন করতে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একাসনে বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারতেন না, কেননা পৃষ্টদণ্ড ঋজু করবামাত্র, পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত করছিল। ফলে, গুরুজনের সুমুখে কুলবধূর মত, আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থিতি করতে হয়েছিল। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্ব্বে কখনও পাইনি। কিন্তু অভ্যাস-দোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত-বৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করে' নাভি-বিবরে সুনিবিষ্ট করতে পারলুম না।

শরীরের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থাতে আমি অবশ্য কাতর হয়ে পড়িনি। তখন আমার নবযৌবন। দেহ তার স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম তখনও হারিয়ে বসে নি। বরং সত্য কথা বলতে গেলে, নিজ দেহের এই সব অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গী দেখে আমার শুধু হাসি পাচ্ছিল। এই যাত্রার মুখে, পূর্ব্বদিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিল, তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল উল্লসিত হয়ে উঠেছিল; সে বাতাস যেন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন মন সব জেগে উঠেছিল। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। চারিদিকে শুধু মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘর নেই দোর নেই, গাছ নেই, পালা নেই, শুধু মাঠ—অফুরন্ত মাঠ—আগাগোড়া সমতল ও সমরূপ, আকাশের মত বাধাহীন এবং ফাঁকা। কলিকাতার ইটকাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগল। আমার মন থেকে সব ভাবনা চিন্তা ঝরে গিয়ে সে মন ঐ আকাশের মত নির্ব্বিকার ও প্রসন্নরূপ ধারণ করলে,—তার মধ্যে যা ছিল সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, কেন না দিনের সঙ্গে রোদ, প্রকৃতির গায়ের জ্বরের মত বেড়ে উঠতে লাগল, আকাশ বাতাসের উত্তাপ, দেখতে দেখতে একশত পাঁচ ডিগ্রিতে চড়ে গেল। যখন বেলা প্রায় ন'টা বাজে, তখন দেখি বাইরের দিকে আর

চাওয়া যায় না, আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমার চোখ একটা কিছু সবুজ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়ে দিগদিগন্তে তার অন্বেষণ করে এখানে ওখানে দুটি একটি বাবলা গাছের সাক্ষাৎ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, এতে চোখের পিপাসা মিটল না, কেন না এ গাছের আর যে গুণই থাক, এর গায়ে শ্যামল শ্রী নেই, পায়ের নীচে নীল ছায়া নেই। এই তরুহীন, পত্রহীন, ছায়াহীন পৃথিবী আর মেঘমুক্ত রৌদ্রপীড়িত আকাশের মধ্যে ক্রমে একটি বিরাট অবসাদের মূর্ত্তি ফুটে উঠল। প্রকৃতির এই একঘেয়ে চেহারা আমার চোখে আর সহ্য হল না। আমি একখানি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে Meredith-এর Egoist এনেছিলুম তার শেষ চ্যাপ্টার পড়তে বাকী ছিল। একটানা দু'চার পাতা পড়ে দেখি তার শেষ চ্যাপ্টার তার প্রথম চাপ্টার হয়ে উঠেছে,—অর্থাৎ তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকল না। বুঝলুম পাল্কির অবিশ্রাম ঝাকুনিতে আমার মস্তিষ্ক বেবাক ঘুলিয়ে গেছে। আমি বই বন্ধ করে, পাল্কি-বেহারাদের একটু চাল বাড়াতে অনুরোধ করলুম, এবং সেই সঙ্গে বকশিশের লোভ দেখালুম। এতে ফল হল। অর্দ্ধেক পথে যে গ্রামটিতে আমাদের বিশ্রাম করবার কথা ছিল, সেখানে বেলা সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মেয়াদের আধঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছলুম।

এই মরুভূমির ভিতর এই গ্রামটি যে ওয়েসিসের একটা খুব নয়নাভিরাম এবং মনোরম উদাহরণ, তা বলতে পারি নে। মধ্যে একটি ডোবা, আর তার তিন পাশে একতলা সমান উঁচু পাড়ের উপর খান দশবারো খড়োঘর, আর এক পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে পাল্কি নামিয়ে, বেহারারা ছুটে গিয়ে সেই ডোবায় ডুব দিয়ে উঠে, ভিজে কাপড়েই চিঁড়ে-দইয়ের ফলার করতে বসল। পাল্কি দেখে গ্রাম-বধূরা সব পাড়ের উপরে এসে কাতার দিয়ে দাঁড়াল। এই পল্লীবধূদের সম্বন্ধে কবিতা লেখা কঠিন, কেন না এদের আর যাই থাক,— রূপও নেই, যৌবনও নেই। যদি বা কারও রূপ থাকে ত, তা কৃষ্ণবর্ণে ঢাকা পড়েছে, যদি বা কারও যৌবন থাকে ত, তা মলিন বসনে চাপা পড়েছে। এদের পরণের কাপড় এত ময়লা যে, তাতে চিমটি কাটলে একতাল মাটি উঠে আসে। যা বিশেষ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে হচ্ছে তাদের হাতের পায়ের রূপোর গহনা। এক জোড়া চুড় আমার চোখে পড়ল, যার তুল্য সুশ্রী গড়ন একালের গহনায় দেখতে পাওয়া যায় না। এই থেকে প্রমাণ পেলুম যে, বাঙলার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের দেহে সৌন্দর্য্য না থাক, সেই শ্রেণীর পুরুষের হাতে আর্ট আছে।

ঘণ্টা আধেক বাদে আমরা আবার রওনা হলুম। পাল্কি অতি ধীরে সুস্থে চলতে লাগল, কেননা ভূরিভোজনের ফলে আমার বাহকদের গতি আপন্নসত্ত্বা স্ত্রীলোকের তুল্য মৃদুমন্থর হয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে আমার শরীর মন ইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ প্রভৃতি সব এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আমি চোখ বুজে ঘুমবার চেষ্টা করলুম। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদ্দুর এবং পাল্কীর দোলার প্রসাদে আমার তন্দ্রা এল; সে তন্দ্রা কিন্তু তন্দ্রা নয়। আমার শরীর যেমন শোওয়া বসা এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, আমার মনও তেমনি সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। তারপর পাল্কির একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি জেগে উঠলুম, সে ধাক্কার বেগ এতই বেশি যে, তা আমার দেহের ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে একেবারে সহস্রারে গিয়ে উপনীত হয়েছিল! জেগে দেখি ব্যাপার আর কিছুই নয়—বেহারারা একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সোয়ারি সজোরে নিক্ষেপ করে' একদম অদৃশ্য হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সর্দারজী বললেন, ওরা একটু তামাক খেতে গিয়েছে। যাত্রা করে' অবধি, এই প্রথম একটি জায়গা আমার চোখে পড়লো, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে বট একাই একশ'; চারিদিকে সারি সারি বোয়া নেমেছে, আর তার উপরে পাতা এত ঘনবিন্যস্ত যে, সূর্য্যরশ্মি তা ভেদ করে আসতে পারছে না। মনে হল প্রকৃতি, তাপক্লিষ্ট পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য একটি হাজার থামের পান্থশালা সস্নেহে স্বহস্তে রচনা করে রেখেছেন। সেখানে ছায়া এত নিবিড় যে, সন্ধ্যে হয়েছে বলে' আমার ভুল হল, কিন্তু ঘড়ি খুলে দেখি বেলা তখন সবে একটা।

আমি এই অবসরে বহুকষ্টে পাল্কি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে' হাত পা ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। দেহটিকে সোজা করে' খাড়া করতে প্রায় মিনিট পোনরো লাগল; কেননা ইতিমধ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গে খিল ধরে এসেছিল, তার উপর আবার কোন অঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল; কোনও অঙ্গে ঝিনঝিনি ধরেছিল, কোন অঙ্গে পক্ষাঘাত, কোনও অঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। যখন শরীরটি সহজ অবস্থায় ফিরে এল, তখন মনে ভাবলুম গাছটি একবার প্রদক্ষিণ করে' আসি। খানিকটে দূর এগিয়ে দেখি, বেহারাগুলো সব পাঁড়েজীকে ঘিরে বসে আছে, আর সকলে মিলে একটা মহা জটলা পাকিয়ে তুলেছে। প্রথমে আমার ভয় হল যে, এরা হয়ত আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করবার চক্রান্ত করছে; কেননা সকলে এক সঙ্গে মহা উৎসাহে বক্তৃতা করছিল। কিন্তু তার-

পরেই বুঝলুম যে, এই বকাবকি চেঁচামেচির অন্য কারণ আছে। এরা যে বস্তুর ধূমপান করছিল, তা যে তামাক নয়—"বড় তামাক" তার পরিচয় ঘ্রাণেই পাওয়া গেল। এদের স্ফূর্ত্তি, এদের আনন্দ, এদের লম্ফঝম্ফ দেখে, গঞ্জিকার ত্বরিতানন্দ নামের সার্থকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। এক একজন ফঙ্কেয় এক এক টান দিচ্ছে, আর "ব্যোম্ কালী কল্‌কাত্তা ওয়ালি" বলে হুঙ্কার ছাড়চে! গাঁজার কল্কের গড়ন যে এত সুডোল, তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না,—গড়নে কল্কে ফুলও এর কাছে হার মানে। মাদকতার আধার যে সুন্দর হওয়া দরকার, এ জ্ঞান দেখলুম এদেরও আছে।

প্রথমে এদের এই ধূমপানোৎসব দেখতে আমার আমোদ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে বিরক্তি ধরতে লাগল। ছিলেমের পর ছিলেম পুড়ে যাচ্ছে, অথচ দেখি কারও ওঠবার অভিপ্রায় নেই। এদের গাঁজা খাওয়া কখন শেষ হবে জিজ্ঞাসা করাতে, সর্দ্দারজী উত্তর করলেন—"হুজুর, এদের টেনে না তুললে এরা উঠবে না, সুমুখে ভয় আছে তাই এরা গাঁজার দম দিয়ে মনে সাহস করে নিচ্ছে।" আমি বল্লুম, "কি ভয়?" সে জবাব দিলে "হুজুর, সে ভয়ের নাম করতে নেই। একটু পরে সব চোখেই দেখতে পাবেন।" এ কথা শুনে ব্যাপার কি দেখবার জন্যে আমার মনে এতটা কৌতূহল জন্মাল যে, বেহারা-গুলোকে টেনে তোলবার জন্যে স্বয়ং তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি, যে-সব চোখ ইতিপূর্ব্বে যকৃতের প্রভাবে হলুদের মত হলদে ছিল, এখন সে-সব গঞ্জিকার প্রসাদে চুণ-হলুদের মত লাল হয়ে উঠেছে। প্রতি লোকটিকে নিজের হাতে টেনে খাড়া করতে হল, তার ফলে বাধ্য হয়ে কতকটা গাঁজার ধোঁয়া আমাকে উদরস্থ করতে হল ; সে ধোঁয়া আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করে' আমার মাথায় গিয়ে চড়ে বসল। অমনি আমার গা পাক দিয়ে উঠল, হাত পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, চোখ টেনে আসতে লাগল, আমি তাড়াতাড়ি পাল্কিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। পাল্কি আবার চলতে সুরু করল। এবার আমি পাল্কি চড়বার কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব করলুম না, কেননা আমার মনে হল যে শরীরটে যেন আমার নয়—অপর কারো।

খানিকক্ষণ পর,—কতক্ষণ পর তা বলতে পারি নে,—বেহারা-গুলো সব সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম,—কিন্তু সে জোর যে এত অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর

থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাড়েজীটিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "রামনাম সৎ হ্যয়" "রাম নাম সৎ হ্যয়" এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে আমার মনে হল যে আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভূতেরা পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেতপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে! এ ধারণার মূলে আমার অন্তরস্থ গঞ্জিকাধূমের কোনও প্রভাব ছিল কিনা জানিনে। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানবার জন্য আমার মহা কৌতূহল হল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেইরকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশ-যোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জ্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারপর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে, সুমুখে যা পড়ে আছে তা একটি মরুভূমি—বালির নয়, পোড়ামাটির,—সে মাটি পাতখোলার মত, তার গায়ে একটি তৃণ পর্য্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল, তার অসংখ্য এবং অপর্য্যাপ্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি শুধু ইট আর ইট, কোথাও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও বা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে; আর সে ইট এত লাল যে, দেখলে মনে হয় টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ; কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথাও বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা দু' একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইটকাঠ, মাটি, আকাশের সর্ব্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেননা আমারই গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধতার বুকের ভিতর থেকে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এল। সে স্বর এত মৃদু, এত করুণ, এত কাতর যে, মনে হল সে সুরের মধ্যে যেন মানুষের যুগযুগান্তের বেদনা সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এ কান্নার সুরে আমার সমগ্র অন্তর অসীম করুণায় ভরে গেল, আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বমানবের ব্যথার ব্যথী হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে হঠাৎ-ঝড় উঠল, চারিদিক থেকে এলোমেলো

ভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল, চারিদিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তারপর দেখি সেই অগ্নি-প্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিলবিল করছে, ছটফট করছে। এই ব্যাপার দেখে ঊনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে করতে লাগল। ক্রমে এই সব শব্দ মিলেমিশে একটা অট্টহাস্যে ত হল,—সে হাসির নির্ম্মম বিকট ধ্বনি দিগদিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে সে হাসি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, আবার সেই মৃদু করুণ ও কাতর ধ্বনিতে পরিণত হল। এই বিকট হাসি আর এই করুণ ক্রন্দনের দ্বন্দ্বে আমার মনের ভিতর এই ধ্বংসপুরীর পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিয়ে তুললে,—সে স্মৃতি ইহজন্মে কি পূর্ব্বজন্মের তা আমি বলতে পারি নে। আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে বলে' দিলে যে এ গ্রামের ইতিহাস এই—

[২]

এই ইটকাঠের মরুভূমি হচ্ছে রুদ্রপুরের ধ্বংশাবশেষ। রুদ্রপুরের রায় বাবুরা এককালে এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। রায় বংশের আদি পুরুষ রুদ্রনারায়ণ, নবাব-সরকারে চাকরি করে, রায়-রাইয়ান খেতাব পান এবং সেই সঙ্গে তিন পরগণার মালিকি সত্ব লাভ করেন। লোকে বলে এঁদের ঘরে দিল্লীর বাদশার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত সনদ ছিল, এবং সেই সনদে তাঁদের কোতল কচ্ছলের ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সনদের বলে হোক আর না হোক, এরা যে কোতল কচ্ছল করতেন, সে বিষয় আর সন্দেহ নেই। কিম্বদন্তি এই যে এমন দুর্দ্দান্ত জমিদার এ দেশে পূর্ব্বাপর কখনও হয়নি। এদের প্রবল প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খেত। কেননা, যার উপর এরা নারাজ হতেন, তাকে ধনে প্রাণে বিনাশ করতেন। এরা কত লোকের ভিটামাটি যে উচ্ছন্নে দিয়েছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। রায়-বাবুদের দোহাই অমান্য করে, এত বড় বুকের পাটা বিশ ক্রোশের মধ্যে কোনও লোকেরই ছিল না। তাঁদের কড়া শাসনে পরগণার মধ্যে চুরি ডাকাতি দাঙ্গাহাঙ্গামার নামগন্ধও ছিল না, তার একটি কারণ ও-অঞ্চলের লাঠিয়াল সড়কিয়াল তীরন্দাজ প্রভৃতি যত ক্রূরকর্ম্মা লোক, সব তাঁদের সরকারে পাইক সর্দ্দারের দলে ভর্ত্তি হত। একদিকে যেমন মানুষের প্রতি তাঁদের নিগ্রহের সীমা ছিল না অপরদিকে তেমনি অনুগ্রহের সীমা ছিল না। দরিদ্রকে

অন্নবস্ত্র, আতুরকে ঔষধপথ্য দান এঁদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। এদের অনুগত আশ্রিত লোকের লেখাযোখা ছিল না। এঁদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরের প্রসাদে দেশের গুরুপুরোহিতের দল সব জোৎদার হয়ে উঠেছিলেন। তারপর পূজা আর্চ্চা, দোল দুর্গোৎসবে তাঁরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। রুদ্রপুরে দোলের সময় আকাশ আবীরে ও পুজোর সময় পৃথিবী রুধিরে লাল হয়ে উঠত। রুদ্রপুরের অতিথিশালায় নিত্য একশত অতিথি-ভোজনের আয়োজন থাকত। পিতৃদায় মাতৃদায় কন্যাদায়গ্রস্ত কোনও ব্রাহ্মণ, রুদ্রপুরের বাবুদের দ্বারস্থ হয়ে কখনও রিক্তহস্তে ফিরে যায়নি। এঁরা বলতেন ব্রাহ্মণের ধন বাঁধবার জন্য নয়—সৎকার্য্যে ব্যয় করবার জন্য। সুতরাং সৎকার্য্যে ব্যয় করবার টাকার যদি কখনও অভাব হত, তাহলে বাবুরা সে টাকা সা-মহাজনের ঘর লুঠে নিয়ে আসতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এক কথায়, এরা ভাল কাজ মন্দ কাজ সব নিজের খেয়াল ও মর্জ্জি অনুসারে করতেন ; কেননা নবাবের আমলে তাঁদের কোনও শাসনকর্ত্তা ছিল না। ফলে, জনসাধারণে তাঁদের যেমন ভয় করত, তেমনি ভক্তিও করত, তার কারণ তাঁরা জনসাধারণকে ভক্তিও করতেন না ভয়ও করতেন না। এই অবাধ যথেচ্ছাচারের ফলে তাঁদের মনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা উত্তরোত্তর অসাধারণ বৃদ্ধিলাভ করেছিল। তাঁদের মনে যা ছিল, সে হচ্ছে জাতির অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, বলের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার। রায় পরিবারের পুরুষেরা সকলেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁদের ঘরের মেয়েদের রূপের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব কারণে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা এদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এ দেশে ইংরেজ আসবার পূর্ব্বেই এ পরিবারের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিল, তারপর কোম্পানির আমলে এদের সর্ব্বনাশ হয়। এদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার দরুণ যে-সকল সরিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেতে আরম্ভ হল ; কেননা নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করাটা এঁদের মতে অতি হেয় কার্য্য বলে' গণ্য ছিল। তারপর সরিকানা বিবাদ। রায় পরিবার ছিল শাক্ত,—এত ঘোর শাক্ত যে, রুদ্রপুরের ছেলে বুড়াতে মদ্যপান করত। এমন কি, এ বংশের মেয়েরাও তাতে কোন আপত্তি করত না, কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল মদ্যপান করা একটি পুরুষালি কাজ। সন্ধ্যার সময় কুলদেবতা সিংহবাহিনীর দর্শনের পর বাবুরা যখন

বৈঠকখানায় বসে মদ্যপানে রত হতেন, তখন সেই সকল গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষদের কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা আর জবাফুলের মত দুই চোখ, এই তিনে মিলে সাক্ষাৎ মহাদেবের রোষকষায়িত ত্রিনেত্রের মত দেখাত। এই সময়ে পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসের কার্য্য নেই, যা তাঁদের দ্বারা সিদ্ধ না হত। তাঁরা লাঠিয়ালদের এ-সরিকের ধানের গোলা লুঠে আনতে, ও-সরিকের প্রজার বৌঝিকে বে-ইজ্জৎ করতে হুকুম দিতেন। ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড হত। এই জ্ঞাতি-শত্রুতার দরুণ তাঁরা উৎসন্নের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তারপর এদের বিষয়সম্পত্তি যা অবশিষ্ট ছিল, তা দশশালা বন্দোবস্তের প্রসাদে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। কিস্তির শেষ তারিখে সদর খাজনা কোম্পানির মালখানায় দাখিল না করলে লক্ষ্মী যে চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করবেন, এ জ্ঞান এদের মনে কখনও জন্মাল না। পূর্ব্ব আমলে নবাব-সরকারে নিয়মিত শালিয়ানা মাল খাজনা দাখিল করবার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। অনভ্যাসবশত কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব এরা নিয়মমত দিয়ে উঠতে পারতেন না। কাজেই এদের অধিকাংশ সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে রায়বংশ প্রায় লোপ পেয়ে এসেছিল। যে গ্রামে এরা প্রায় একশ' ঘর ছিলেন, সেই গ্রামে আজ একশ' বৎসর পূর্ব্বে ছ'ঘর মাত্র জমিদার ছিল।

এই ছ'ঘরের বিষয়সম্পত্তিও ক্রমে ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হল। এর কারণ ধনঞ্জয় সরকার ইংরাজের আইন যেমন জানতেন, তেমনি মানতেন। ইংরাজের আইনের সাহায্যে, এবং সে আইন বাঁচিয়ে, কি করে' অর্থোপার্জ্জন করতে হয়, তার অন্ধি-সন্ধি-ফিকির-ফন্দি সব তাঁর নখাগ্রে ছিল। তিনি জিলার কাছারিতে মোক্তারি করে' দু-চার বৎসরের মধ্যেই অগাধ টাকা রোজগার করেন। তারপর তেজারতিতে সেই টাকা সুদের সুদ তস্য সুদে হুহু করে বেড়ে যায়। জনরব যে, তিনি বছর দশেকের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা উপায় করেন। এত না হোক, তিনি দু'চার লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই টাকা করবার পর তাঁর জমিদার হবার সাধ গেল এবং সেই সাধ মেটাবার জন্য তিনি একে একে রায়বাবুদের সম্পত্তিসকল খরিদ করতে আরম্ভ করলেন ; কেননা এ জমিদারির প্রতি কাঠা জমি তাঁর নখদর্পণে ছিল। রায়বংশের চাকরি করেই তাঁর চৌদ্দপুরুষ মানুষ হয়, এবং তিনিও অল্প বয়সে রুদ্রপুরের বড় সরিক ত্রিলোকনারায়ণের জমাসেরেস্তায় পাঁচ সাত বৎসর মুহুরির কাজ করেছিলেন। সকল সরিকের সমস্ত সম্পত্তি মায় বসতবাটি

খরিদ করিলেও, বহুকাল যাবৎ তাঁর রুদ্রপুরে যাবার সাহস ছিল না, কেননা তাঁর মনিবপুত্র উগ্রনারায়ণ তখনও জীবিত ছিলেন। উগ্রনারায়ণ হাতে পৈতা জড়িয়ে সিংহবাহিনীর পা ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে ধনঞ্জয় যদি রুদ্রপুরের ত্রিসীমানার ভিতর পদার্পণ করে, তাহলে সে সশরীরে আর ফিরে যাবে না। তিনি যে তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, সে বিষয়ে ধনঞ্জয়ের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কেননা তিনি জানতেন যে, উগ্রনারায়ণের মত দুর্দ্ধর্ষ ও অসমসাহসী পুরুষ-রায় বংশেও কখন জন্মগ্রহণ করে নি।

উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, ধনঞ্জয় রুদ্রপুরে এসে রায়বাবুদের পৈতৃক-ভিটা দখল করে বসলেন। তখন সে গ্রামে রায়বংশের একটি পুরুষও বর্ত্তমান ছিল না, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে সকল সরিকের বাড়ী নিজ-দখলে আনতে পারতেন, তবুও তিনি উগ্রনারায়ণের একমাত্র বিধবা কন্যা রত্নময়ীকে তাঁর পৈতৃক বাটী থেকে বহিস্কৃত করে দেবার কোনও চেষ্টা করেন নি। তার প্রথম কারণ, রুদ্রপুরের সংলগ্ন পাঠানপাড়ার প্রজারা উগ্রনারায়ণের বাটীতে রত্নময়ীর স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। গ্রামশুদ্ধ লোক পুরুষানুক্রমে লাঠিয়ালের ব্যবস্থা করে এসেছে; সুতরাং ধনঞ্জয় জানতেন যে, রত্নময়ীকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করলে খুন জখম হওয়া অনিবার্য্য। তাতে অবশ্য তিনি নিতান্ত নারাজ ছিলেন, কেননা তাঁর মত নিরীহ ব্যক্তি বাঙলা দেশে তখন আর দ্বিতীয় ছিল না। তার দ্বিতীয় কারণ, যার অন্নে চৌদ্দপুরুষ প্রতিপালিত হয়েছে, ধনঞ্জয়ের মনে তার প্রতি পূর্ব্বসংস্কারবশত কিঞ্চিৎ ভয় এবং ভক্তিও ছিল। এই সব কারণে, ধনঞ্জয় উগ্রনারায়ণের অংশটি বাদ দিয়ে, রায়বংশের আদ্‌বাড়ীর বাদবাকী অংশ অধিকার করে বসলেন, সেও নাম মাত্র। কেননা, ধনঞ্জয়ের পরিবারের মধ্যে ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা রঙ্গিনী দাসী আর তাঁর গৃহ জামাতা এবং রঙ্গিনীর স্বামী রতিলাল দে। এই বাড়ীতে এসে ধনঞ্জয়ের মনের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটল। অর্থ উপার্জ্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অর্থলোভ এতদূর বেড়ে গিয়েছিলো যে তাঁর অন্তরে সেই লোভ ব্যতীত অপর কোনও ভাবের স্থান ছিল না। সেই লোভের ঝোঁকেই তিনি এতদিন অন্ধভাবে যেন-তেন-উপায়েন টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিসের জন্য কার জন্য টাকা জমাচ্ছি, এ প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের মনে কখনও উদয় হয় নি।

কিন্তু রুদ্রপুরে এসে জমিদার হয়ে বসবার পর ধনঞ্জয়ের জ্ঞান হল যে তিনি শুধু টাকা করবার জন্যই টাকা করেছেন, আর কোনও কারণে নয়, আর কারও জন্য নয়। কেননা তাঁর স্মরণ হ'ল যে, যখন তাঁর একটির পর একটি সাতটি ছেলে মারা যায়, তখনও তিনি একদিনের জন্যও বিচলিত হন নি একদিনের জন্যও অর্থোপার্জ্জনে অবহেলা করেন নি। তাঁর চিরজীবনের অর্থের আত্যন্তিক লোভ, এই বৃদ্ধবয়সে অর্থের আত্যন্তিক মায়ায় পরিণত হল। তাঁর সংগৃহীত ধন কি করে চিরদিনের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে, এই ভাবনায় তাঁর রাত্তিরে ঘুম হত না। অতুল ঐশ্বর্য্যও যে কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, এই রুদ্রপুরই ত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্রমে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, মানুষে নিজে চেষ্টায় ধন লাভ করতে পারে কিন্তু দেবতার সাহায্য ব্যতীত সে ধন রক্ষা করা যায় না। ইংরাজের আইন কণ্ঠস্থ থাকলেও, ধনঞ্জয় একজন নিতান্ত অশিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিগত বর্ব্বরতা কোনরূপ শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা পরাভূত কিম্বা নিয়মিত হয় নি। তাঁর সমস্ত মন সেকালের শূদ্রবুদ্ধিজাত সকলপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ছেলেবেলায় শুনেছিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণ-শিশুকে যদি টাকার সঙ্গে একটি ঘরে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে সেই শিশুটি সেই ঘরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে' যক্ষ হয়ে সেই টাকা চিরকাল রক্ষা করে। ধনঞ্জয়ের মনে এই উপায়ে তাঁর সঞ্চিত ধন রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এত অদম্য হয়ে উঠল যে, তিনি যখ্ দেওয়াটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিন্ত হলেন। যেখানে ধনঞ্জয়ের কোন মায়া মমতা ছিল না, এবং তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের কার্য্য উদ্ধার করবার কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এক বিষম বাধা উপস্থিত হ'ল। ধনঞ্জয় একটি ব্রাহ্মণ-শিশুকে যখ্ দিতে মনস্থ করছেন শুনে, রঙ্গিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে। ফলে ধনঞ্জয়ের পক্ষে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ধনঞ্জয় এ পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছু যদি ভালবাসতেন ত, সে হচ্ছে তাঁর কন্যা। চুনসুরকির গাঁথনির ভিতর এক একটি গাছ যেমন শিকড় গাড়ে, ধনঞ্জয়ের কঠিন হৃদয়ের কোন একটি ফাটলের ভিতর এই কন্যাবাৎসল্য তেমনি ভাবে শিকড় গেড়েছিল। ধনঞ্জয় এ বিষয়ে উদ্যোগী না হলেও, ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হ'ল।

রত্নময়ীর একটি তিন বৎসরের ছেলে ছিল। তার নাম কিরীটচন্দ্র। তিনি সেই ছেলেটি নিয়ে দিবারাত্র ঐ বাড়ীতে একা বাস করতেন, জনমানবের সঙ্গে

দেখা করতেন না, এবং তাঁর অন্তঃপুরে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। রুদ্রপুরে লোকে তাঁর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যেত যদি না তিনি প্রতিদিনের স্নানান্তে ঠিক দুপুরবেলায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন। সে সময়ে তাঁর আগে পিছে পাঠানপাড়ার দুজন লাঠিয়াল তাঁর রক্ষক হিসেবে থাকত। রত্নময়ীর বয়েস তখন বিশ কিম্বা একুশ। তাঁর মত অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে লাখে একটি দেখা যায়। তাঁর মূর্ত্তি সিংহবাহিনীর প্রতিমার মত ছিল, এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কোণ্-তোলা তাঁর চোখ দুটি দেবতার চোখের মতই স্থির ও নিশ্চল ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনও পলক পড়ে নি। সে চোখের ভিতর যা জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চারপাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা! রত্নময়ী তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের তিনশত বৎসরের সঞ্চিত অহঙ্কার উত্তরাধিকারীসত্বে লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর অন্তরে তাঁর রূপেরও অসাধারণ অহঙ্কার ছিল। কেননা তাঁর কাছে সে রূপ ছিল তাঁর আভিজাত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। রত্নময়ীর মতে রূপের উদ্দেশ্য মানুষকে আকর্ষণ করা নয়—তিরস্কার করা। তিনি যখন মন্দিরে যেতেন, তখন পথের লোকজন সব দূরে সরে দাঁড়াত, কেননা তাঁর সকল অঙ্গ, তার বর্ণ ও রেখার নীরব ভাষায় সকলকে বলত, "দূর হ! ছায়া মাড়ালে নাইতে হবে।" বলা বাহুল্য, তিনি কোনও দিকে দৃকপাত করতেন না, মাটির দিকে চেয়ে সকল পথ রূপে আলো করে' সোজা মন্দিরে যেতেন, আবার ঠিক সেই ভাবে বাড়ী ফিরে আসতেন। রঙ্গিণী জানালার ফাঁক দিয়ে রত্নময়ীকে নিত্য দেখত, এবং তার সকল মন, সকল দেহ হিংসার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে উঠত, যেহেতু রঙ্গিণীর আর যাই থাক, রূপ ছিলনা। আর তার রূপের অভাব তার মনকে অতিশয় ব্যথা দিত, কেননা তার স্বামী রতিলাল ছিল অতি সুপুরুষ।

ধনঞ্জয় যেমন টাকা ভালবাসতেন, রঙ্গিণী তেমনি তার স্বামীকে ভালবাসত, অর্থাৎ এ ভালবাসা একটি প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং সে ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধার মতই অন্ধ ও নির্ম্মম। এ ভালবাসার সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক ছিল তা বলা কঠিন, কেননা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর মত জীবদের মন, দেহের অতিরিক্ত নয়, অন্তর্ভূত বস্তু। তারপর ধনঞ্জয় যে-ভাবে টাকা ভালবাসতেন, রঙ্গিণী ঠিক সেইভাবে তার স্বামীকে ভালবাসত—অর্থাৎ নিজের সম্পত্তি হিসেবে। সে সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে, একথা মনে হলে সে একেবারে মায়ামমতাশূন্য হয়ে পড়ত। এবং সে সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য

পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর কাজ নেই যা রঙ্গিণী না করতে পারত। রঙ্গিণীর মনে সম্পূর্ণ অকারণে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে রতিলাল রত্নময়ীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে, ক্রমে সেই সন্দেহ তার কাছে নিশ্চিয়তায় পরিণত হল। রঙ্গিণী হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে রতিলাল লুকিয়ে লুকিয়ে উগ্রনারায়ণের বাড়ী যায় এবং যতক্ষণ পায়ে ততক্ষণ সেইখানেই কাটায়। এর যথার্থ কারণ এই যে রতিলাল রত্নময়ীর বাড়ীতে আশ্রিত যে ব্রাহ্মণটি ছিল, তার কাছে সে ভাঙ্গ খেতে যেত। তারপর রত্নময়ীর ছেলেটির উপর নিঃসন্তান রতিলালের এতদূর মায়া পড়ে গিয়েছিল যে সে কিরীটচন্দ্রকে না দেখে একদিনও থাকতে পারত না। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর সঙ্গে রতিলালের কখনও চার চক্ষুর মিলন হয় নি, কেননা পাঠান পাড়ার প্রজারা তাঁর অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষা করত। কিন্তু রঙ্গিণীর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রত্নময়ী তার স্বামীকে সুপুরুষ দেখে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার মজ্জাগত হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, রঙ্গিণী রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ্ দেবার জন্য কৃত-সংকল্প হল। রঙ্গিণী একদিন ধনঞ্জয়কে জানিয়ে দিলে যে যখ্ দেওয়া সম্বন্ধে তার আর কোনও আপত্তি নেই। শুধু তাই নয়, ছেলের সন্ধান সে নিজেই করবে।

এ কাজ অবশ্য অতি গোপনে উদ্ধার করতে হয়। তাই বাপে মেয়েতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, রঙ্গিণীর শোবার পাশের ঘরটিতে যখ্ দেওয়া হবে। দু-চার দিনের ভিতর সে ঘরটির সব দুয়ার জানালা ইট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর অতি গোপনে ধনঞ্জয়ের সঞ্চিত যত সোণা রূপোর টাকা ছিল সব বড় বড় তামার ঘড়াতে পুরে সেই ঘরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা হল। যখন ধনঞ্জয়ের সকল ধন সেই কুঠরিজাত হল, তখন রঙ্গিণী একদিন রতি-লালকে বললে যে, রত্নময়ীর ছেলেটি এত সুন্দর যে, তার সেই ছেলেটিকে একবার কোলে করতে নিতান্ত ইচ্ছে যায়; সুতরাং যে উপায়েই হোক তাকে একদিন রঙ্গিণীর কাছে আনতেই হবে। রতিলাল উত্তর করলে, সে অসম্ভব, রত্নময়ীর লাঠিয়ালরা টের পেলে তার মাথা নেবে। কিন্তু রঙ্গিণী এত নাছোড় হয়ে তাকে ধরে বসল যে, রতিলাল অগত্যা একদিন সন্ধ্যাবেলা কিরীটচন্দ্রকে ভুলিয়ে সঙ্গে করে রঙ্গিণীর কাছে নিয়ে এল। কিরীটচন্দ্র আসবামাত্র রঙ্গিণী ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে, চুমো খেলে, কত আদর করলে, কত মিষ্টি কথা বললে। তারপর সে কিরীটচন্দ্রের গায়ে লাল চেলির যোড়, তার গলায় ফুলের মালা, তার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আর তার হাতে দু'গাছি

সোণার বালা পরিয়ে দিলে। কিরীটচন্দ্রের এই সাজ দেখে রতিলালের চোখমুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারপর রঙ্গিণী হঠাৎ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে, সেই ব্রাহ্মণ শিশুকে সেই অন্ধকূপের ভিতর পুরে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজার গা-চাবি বন্ধ করে চলে গেল। রতিলাল এ দোর ও দোর ঠেলে দেখে বুঝলে যে, রঙ্গিণী তাকেও তার শোবার ঘরে বন্দী করে চলে গিয়েছে। রতিলাল ঠেলে, ঘুঁসো মেরে, লাথি মেরে সেই অন্ধকূপের কপাট ভাঙ্গবার চেষ্টা করে দেখলে সে চেষ্টা বৃথা। সে কপাট এত ভারি আর এত শক্ত যে, কুড়োল দিয়েও তা কাটা কঠিন। কিরীটচন্দ্র সেই অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে প্রথমে ককিয়ে কাঁদতে লাগলে, তারপর রতিলালকে দাদা দাদা বলে ডাকতে লাগলে। দু'তিন ঘণ্টার পর তার কান্নার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া গেল না। রতিলাল বুঝলে সে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তিন দিন তিন রাত নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রতিলাল কখনও শোনে যে কিরীটচন্দ্র দুয়োরে মাথা ঠুকছে, কখনও শোনে সে কাঁদছে আবার কখনও বা চুপচাপ। রতিলাল এই তিন দিন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দিনের ভিতর হাজার বার পাগলের মত ছুটে গিয়ে সেই কপাট ভাঙতে চেষ্টা করেছে অথচ সে দরজা একচুলও নাড়াতে পারে নি। যখন কান্নার আওয়াজ তার কাণে আসত, তখন রতিলাল দুয়োরের কাছে ছুটে গিয়ে বলত "দাদা দাদা অমন করে কেঁদোনা, কোনও ভয় নেই, আমি এখানে আছি"। রতিলালের গলা শুনে সে ছেলে আরও জোরে কেঁদে উঠত, ঘন ঘন কপাটে মাথা ঠুকত। রতিলাল তখন দুই কাণে হাত দিয়ে ঘরের অন্য কোণে পালিয়ে যেত, ও চীৎকার করে কখনও রঙ্গিণীকে কখনও ধনঞ্জয়কে ডাকত, এবং যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিত। এই পৈশাচিক ব্যাপারে সে এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, কিরীটচন্দ্রের উদ্ধারের যে অপর কোনও উপায় হতে পারে এ কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনে উদয় হয় নি, তার সকল মন ঐ কান্নাব টানে সেই অন্ধকূপের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল। তিন দিনের পর সেই শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ হয়ে এসে, পঞ্চম দিনে একেবারে থেমে গেল। রতিলাল বুঝলে, কিরীটচন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন সে তার ঘরের জানালার লোহার গরাদ দু হাতে ফাঁক্ করে, নীচে লাফিয়ে পড়ে একদৌড়ে রত্নময়ীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল। সেদিন দেখলে অন্তঃপুরের দরজায় প্রহরী নেই, পাঠানপাড়ার প্রজারা সব ছেলে খোঁজবার জন্য নানা দিকে বেরিয়ে

পড়েছিল। এই সুযোগে রতিলাল রত্নময়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তার কাছে এক নিঃশ্বাসে জানালে। আজ তিন বৎসরের মধ্যে রত্নময়ীর মুখে কেউ হাসি দেখে নি। তার ছেলের এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, দেখতে মনে হল সে যেন হেসে উঠলে। এ দৃশ্য রতিলালের কাছে এতই অদ্ভুত বোধ হল যে, সে রত্নময়ীর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তারপর, সেই দিন দুপুর রাত্তিরে—যখন সকলে শুতে গিয়েছে—রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। সকল সরিকের বাড়ী সব গায়ে গায়ে। তাই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে আগুন দেবতার রোষাগ্নির মত ব্যাপ্ত হয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়ী আক্রমণ করলে। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, সদর ফটকে এসে দেখে রত্নময়ীকে ঘিরে পাঠানপাড়ার প্রায় একশ প্রজা ঢাল সড়কি ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রত্নময়ীর আদেশে তারা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিনীকে সড়কির পর সড়কির ঘায়ে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলে দিলে। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে উঠল। তার সঙ্গীরা বুঝলে যে, সে পাগল হয়ে গিয়েছে। তারপর সেই পাঠানপাড়ার প্রজাদের মাথায় খুন চড়ে গেল, তারা ধনঞ্জয়ের চাকর দাসী, আমলা ফয়লা, দ্বারবান, বরকন্দাজ যাকে সুমুখে পেলে তার উপরেই সড়কি ও তলোয়ার চালালে, রায় বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুনের ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগল। তারপর ঝড় উঠল, ভূমিকম্প হতে লাগল। যখন সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, তখন রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে।

রুদ্রপুরের সব ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে। শুধু কিরীটচন্দ্রের কান্না ও রত্নময়ীর উন্মত্ত হাসি আজও তার আকাশ বাতাস পূর্ণ করে রেখেছে।



জলধর সেন

বাতাসী

বাতাসী জেলের মেয়ে। বাপ নাই, মা নাই, ভাই নাই—থাকিবার মধ্যে আছে এক বুড়ী ঠাকুরমা। সকলে মরিয়া গেল; যাহাদের পরে মরিবার কথা, তাহারা আগে চলিয়া গেল, বুড়ী রহিল, আর রহিল তাহার বুড়া বয়সের একমাত্র অবলম্বন বাতাসী।

বাতাসী নামটার একটু ইতিহাস আছে। বাতাসীর বাপ মার অনেক দিন সন্তান হয় নাই। কত দেবতার মানস করিয়াছে, কিন্তু দেবতারা পাঁঠা, মহিষ, ষোড়শোপচার পূজা প্রভৃতির লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন—মৎস্যজীবীর পুত্র সন্তান লাভে হতাশ হইয়াছিল। অবশেষে একদিন তাহার গৃহিণী গঙ্গাদেবীকে একমণ বাতাসা মানত করিল। গঙ্গাদেবীর বোধ হয় সে সময় বাতাসা খাইবার সাধ হইয়াছিল; তিনি বাতাসার লোভে ভুলিয়া গেলেন। জেলের ঘরে একটী মেয়ে জন্মিল। মেয়ের ষষ্ঠী পূজার দিন একমণ বাতাসা গঙ্গাদেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, পাড়ার সকলে তাহাতে যথাযোগ্য ভাগ বসাইল। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন,—"বাতাসা দিয়া যখন মেয়ে পাইয়াছ, তখন তাহার নাম থাকুক বাতাসী।" পুরোহিতের আজ্ঞায় মেয়ের নাম হইল বাতাসী।

বাতাসীর বয়স যখন তের বৎসর, তখন তাহার পিতা বুঝিল, আর বিবাহের চেষ্টা না করিলে নয়। জেলের ঘরের মেয়ে একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিলেও সমাজে বড় কথাবার্ত্তা হয় না। রামমোহনের ঐ একটী মাত্র মেয়ে। যে কয়দিন ঘরে রাখিতে পারা যায়, থাকুক না; এই ভাবিয়াই পিতা-মাতা বিবাহের বিশেষ চেষ্টা করে নাই। বিশেষতঃ, তাহারা মনে মনে বর স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। হরি হালদারের পুত্র স্বরূপ বেশ ছেলে। হরি হালদার গাঁয়ের পার্শ্বের ইচ্ছামতী নদীর পাটনী; দু পয়সা রোজগার করে। এ পাটনীগিরিটা সে এক রকম মৌরসী করিয়াই লইয়াছিল; ঘাট ডাকের সময় গ্রামের আর কেহ ডাকিত না, হরিই যাহা হয় দিয়া ঘাট ইজারা লইত। বাতাসীর পিতা-মাতার

স্বরূপের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল। এতদিন কথাটা বলি বলি করিয়াও বলা হয় না। এখন মেয়ে তের বৎসরে পড়িল; সুতরাং আর অপেক্ষা সঙ্গত নয়। রামমোহন প্রস্তাব করিল; হরি আনন্দে সম্মত হইল। মেয়ে সুন্দরী, স্বরূপের সঙ্গে বাতাসী শৈশবে কত খেলা করিয়াছে, নৌকায় চড়িয়াছে, দুইজনে খুব ভাব। কিন্তু বিবাহের কালবিলম্ব হইল; স্বরূপের তখন কুড়ি বৎসর বয়স; ষোল বৎসরে ছেলের বিবাহ দিতে স্বরূপের মাতার আপত্তি হইল। রামমোহন বলিল, "বেশ, এত তাড়াতাড়ি কি? এক বৎসর পরেই বিবাহ হইবে।"

বৎসর যাইতে না যাইতেই স্বরূপের মা মরিল। গ্রামের দশ মাতব্বর বলিলেন, "এক বৎসর মরণাশৌচ; তাহার পূর্ব্বে বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।" রাম মোহন বলিল, "বেশ।"

এই ভাবে দুই বৎসর গেল। বাতাসীর বয়স তখন পনর। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। হরি হালদারেরই বিশেষ আগ্রহ; তাহার ঘরে স্ত্রীলোক নাই। কিন্তু তাহাদের আগ্রহ হইলে কি হয়, প্রজাপতি ঠাকুর নিতান্তই বাঁকিয়া বসিলেন। ঠাকুরই মন্ত্রণা করিয়া ওলাদেবীকে গ্রামে ডাকিয়া আনিলেন। গ্রামে হাহাকার উঠিল; দেবী প্রথমেই জেলে পাড়ায় প্রবেশ করিলেন—পাড়াটা নদীর তীরেই কি না। আজ ওবাড়ীর রসিক দাস গেল, কা'ল ফটিকের ছেলেটা গেল, তার পরদিন হরি হালদার আক্রান্ত হইল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সে মরিল। রামমোহন ভাবী বেয়াইয়ের প্রাণরক্ষার জন্য দিনরাত্রি শুশ্রূষা করিয়াছিল; রামমোহন ওলাউঠার বীজ লইয়া ঘরে গেল। সে ঘরে গিয়া দেখে, তাহার স্ত্রী তাহার অগ্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। একই দিনে একই সময়ে স্বামী স্ত্রী চলিয়া গেল। দেবী রামমোহনের বৃদ্ধা মাতাকেও কিছু বলিলেন না, বাতাসীকেও কিছু বলিলেন না। তাহার পর ক্ষুদ্র হরিশপুর গ্রামের ১৩৯ জনের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেবী গ্রামান্তরে চলিয়া গেলেন। বাতাসীর বিবাহ চাপা পড়িয়া গেল—কাহার বিবাহ কে দেয়?

দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। রামমোহন মেয়ের বিবাহের জন্য তিন শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল; তাহাই ভাঙ্গিয়া বাতাসী ও তাহার ঠাকুরমার দিন চলিতে লাগিল। এমন সময় একদিন পুরোহিত মহাশয় রামমোহনের বাড়ীতে পদধূলি দান করিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বলিলেন, "মোহন ত চলিয়া

গেল, এখন আমাকেই তো তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল দেখিতে হয়। তা, এখন মেয়েটার কোন রকমে সাতপাক দিতে ত হয়, কি বল ?"

বুড়ী বলিল, "তা ত বটেই ; এখন আমাদের ত আর কেউ নেই ; আপনিই আছ ; যা হয়, আপনিই কর।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "আমি স্বরূপকেও বলি, গ্রামের দশ জনকে বলি ; যাতে শুভকর্ম্মটা এই মাসেই করা যায়, তাই করা যাবে ; সেইজন্ম তুমি ভেবো না।" এই বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

বাতাসী ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, সে সব কথা শুনিয়াছিল। পুরোহিত চলিয়া গেলে, বাতাসী তাহার ঠাকুরমাকে বলিল, "ঠাকুরমা, আমি সব শুনেছি। তোমরা যাই বল, আর যাই কর, আমি বিয়ে কোরব না। বাবা গেল, মা গেল, বিয়ে আর যায় না।"

বুড়ী নাতিনীর কথা শুনিয়া একেবারে অবাক। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বুড়ী বলিল, "তুই বলিস কি, বাতাসী। বিয়ে কর্‌বি নে ? সে কি কথা ? অমন কথা মুখেও আনিস্ নি ; লোকে বল্‌বে কি ?"

বাতাসী রাগিয়া বলিল, "লোকে যা বল্‌তে হয়, বলুক। আমার দশটা ভাইও নেই, বোনও নেই যে, লোকের কথায় ভয় পাবো। তুই চোখ বুঁজলেই আমার সব গেল ; আমি বিয়ে কিছুতেই কো'রবো না।"

বুড়ী রাগিয়া বলিল "আবাগী, বিয়ে কোর্‌বিনে, খাবি কি ? তোর বাবা ত জমিদারী রেখে যায় নি ; আর ব'সে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। শেষে একটা কলঙ্ক কিন্‌বি নাকি ?"

বাতাসী বলিল, "তোর মুখে আগুন ; রামমোহন মাঝির মেয়ের কলঙ্ক রটায় তার দিকে কু নজরে চায়, এমন লোক এ সাত গাঁয়ের মধ্যে নেই। খাবো কি ব'ল্‌ছিস্ ? জেলের মেয়ে খাবো কি ? তুই বুড়ো হোয়েছিস্, ঘরে বো'সে থাক্‌বি, আমি গাঁয়ে গাঁয়ে মাছ বেচে তোকে খাওয়াবো,—তার জন্যে ভয় কি ?"

বুড়ী আসল কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না ; বলিল, "দিদি, ভয় সবই। তোর এই সোমত্ত বয়েস, তার পর এই রূপ ; সবই ভয় দিদি, সবই ভয়। এত বড় মেয়ের কি আইবুড়ো থাক্‌তে আছে—না, কেউ থাকে ?"

বাতাসী বলিল, "তা, তুই যা বল্ ঠাকুরমা ! আমি এ জন্মে আর বিয়ে কো'র্‌ছিনে।"

বুড়ী বলিল, "কেন, স্বরূপকে কি মনে ধরে না? তা, তাকে বিয়ে না করিস্, অন্য বর দেখি।"

বাতাসী বলিল, "তুই ফের যদি বিয়ের কথা ব'লবি, তা হোলে আমার যেদিকে দুই চোখ যাবে সেই দিকে চো'লে যাবো।"

বুড়ী তখন বিমর্ষ ভাবে বলিল, "তা, আমি ত আর তোর সঙ্গে কথায় পেরে উঠ্‌ব না। যাই তোর বরের কাছে; সে যদি পারে।"

বুড়ী সত্য সত্যই স্বরূপের বাড়ী গেল; তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। স্বরূপ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঠাকুরমা, তুমি ঘরে যাও। আমি বাতাসীর মন বুঝিব।"

স্বরূপ অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক বুঝাইয়াছে, বাতাসীর সেই এক কথা —"আমি বিবাহ করিব না। তোমাকেও না—আর কাহাকেও না।"

একদিন স্বরূপ বাতাসীকে বলিল, "দেখ বাতাসী, তোমার দিকে চেয়ে আমি এত দিন ব'সে আছি। আমার এ সংসারে কেউ নেই। তুমি কি, মনে কর, আমি তোমায় ভালবাসিনে? তুমি কি ভাব, আমি তোমায় যত্ন কো'রব না? বাতাসী, আমি দিনরাত তোমার কথা ভাবি। ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে যখন নদীতে লোক পার ক'রতে যাই, তখন তোমার মুখ মনে কো'রেই আমি বল পাই। যখন খালি ঘরে আঁধার রেতে একলা রাঁধি-বাড়ি, তখন তোমার কথাই মনে করি। কতদিন তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত হোয়ে যায়, আর রাঁধিনে—না খেয়েই প'ড়ে থাকি। তারপর সকাল বেলায় যখন তোমাকে দেখি, তখন মনেও হয় না যে, আগের রাত্রি আমার উপবাসে গিয়েছে। বাতাসী,—" স্বরূপ আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

স্বরূপের কথা শুনিয়া বাতাসীর মন নরম হইল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আজ সে স্বরূপের সঙ্গে অনেক কথা কহিল। অন্য দিন স্বরূপের কথায় সে কাণও দিত না। আজ সে স্বরূপকে বলিল, "তোমাকে সোজা কথা বলি। দেখ, তোমার কেউ নেই, আমার বুড়ী ঠাকুরমা আছে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হো'লে ঠাকুরমা কোথায় যাবে? তুমি বোল্‌বে 'আমার বাড়ীতে এসে থাক্‌বে।' তা হ'তেই পারে না; রামমোহন মাঝির মা দু'টো ভাতের জন্য তার নাত্‌জামায়ের বাড়ীতে থাক্‌বে—তা' আমি কিছুতেই সইতে পা'রবো না। আমি নিজে রোজগার ক'রে আমার ঠাকুরমাকে খাওয়াবো; তাকে তোমার

দোরে আস্‌তে দেব কেন? অহঙ্কারই বল, আর যাই বল, তোমায় আমি ব'লছি, আমার যে কথা, সেই কাজ। হয় ত তুমি বো'ল্‌বে, তুমিই আমাদের বাড়ী এসে থা'ক্‌বে। তোমাকে ভালবাসি আর নাই বাসি, তুমি ঘরজামাই হ'তে যাবে কেন? যে নিজের বাপের ভিটে ছেড়ে বিয়ের লোভে ঘরজামাই হ'তে চায়, আমি তাকে বিয়ে কো'র্‌ব না। তুমি আর আমাকে কিছু বো'লো না। এর পর থেকে যদি তুমি আবার বিয়ের কথা তোলো, তোমার সঙ্গে আমি কথাও কইবো না।"

স্বরূপ নির্ব্বাক্‌ হইয়া বাতাসীর কথা শুনিল; তাহার কথা শেষ হইলে, স্বরূপ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাতাসী তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেল। স্বরূপ কি ভাবিতে ভাবিতে খেয়া নৌকায় গিয়া বসিল।

বাতাসী এখন মাছ বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া জেলেদের নিকট হইতে সে মাছ কিনিয়া ওপারের হাটে যায়। সেখানে মাছ বিক্রয় করিয়া হাটের পরে আবার নদী পার হইয়া ঘরে আসে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন সে স্বরূপের নৌকাতেই পার হইত; স্বরূপও সুবিধা পাইলেই বাতাসীকে কত কথা বলিত; বাতাসী কোনও কথার উত্তর দিত না। এক মাস পরে একদিন বাতাসী মাসের পারের পয়সা চারি আনা স্বরূপকে দিতে গেল। স্বরূপ পয়সা লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "বাতাসী, তুমি কি মানুষ? কি বো'লে তুমি আমায় পারের পয়সা দিতে এলে?"

বাতাসী এ কথার আর উত্তর করিল না; চুপ করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে সে আর স্বরূপের ঘাটে পার হইত না; এক ক্রোশ ভাঁটিতে আর একখানি খেয়া ছিল, বাতাসী সেই খেয়ায় পার হইত। তাহাতে এপার ওপারে প্রায় দুই ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিত না।

এদিকে স্বরূপের খেয়ায় প্রতিদিন কত লোক পার হইত। দূর হইতে লোকে যখন আসিত, তখন স্বরূপ মনে করিত, উহাদের মধ্যে বাতাসী নিশ্চয়ই আছে। তাহারা ঘাটে আসিত—বাতাসী তাহাদের সঙ্গে নাই, স্বরূপ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া নৌকা ছাড়িয়া দিত। কতদিন সে নৌকা লইয়া বসিয়া থাকিত, তাহার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিত। বাতাসীকে পার করিবার জন্য সে

ত আগ্রহে পারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। দিনের পর দিন গেল—াতাসী আর পার হইবার জন্য আসে না। সন্ধ্যার সময় যখন পারের লোক াসিত না, স্বরূপ তখন নৌকায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিত; একটু শব্দ ইলেই তীরের দিকে চাহিয়া দেখিত। তাহার মনে হইত, এইবার হয় ত াতাসী আসিতেছে।

এমনই করিয়া কিছু দিন গেল। একদিন অপরাহ্নে বড় ঝড় উঠিল। তিনটা হইতেই আকাশে মেঘ সাজিতেছিল। চারিটা বাজিতে না বাজিতেই ড় উঠিল,—যেমন ঝড়, তেমনই বৃষ্টি। ইচ্ছামতী নদী গর্জ্জন করিতে াগিল। চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। আকাশে প্রলয়ের মেঘ গর্জ্জিতে াগিল। স্বরূপ খেয়া নৌকাখানি ডবল কাছি দিয়া তীর সংলগ্ন করিল। ষ্টিতে তাহার কাপড় ভিজিয়া গেল। সে তখন তাড়াতাড়ি তাহার কুটীরে াইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভিজা কাপড় ছাড়িয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া রূপ ধূমপানের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বাহিরে যেন একটা শব্দ ইল; স্বরূপ কান পাতিয়া শুনিল, কে যেন ঘরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। াহার পরেই অতি কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "স্বরূপ!"

এ যে চেনা গলা। এই কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য স্বরূপ যে আজ একমাস কান পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল! কিন্তু আজ এ কি? এমন অসময়ে এই দুর্য্যোগে, প্রবল ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাতাসী আসিবে কেন? না, না, বাতাসী নয়। স্বরূপ মনে করিল, তাহার ভ্রম হইয়াছে। এই ঝড়ে, এই দুর্দ্দিনে বাতাসী তাহার কুটীর দ্বারে আসিবে? তাও কি হয়? তবুও স্বরূপ কান পাতিয়া রহিল। হায় মোহ!

এবার শব্দটা আরও একটু স্পষ্ট হইল। কে ডাকিল, "স্বরূপ! স্বরূপ! ঘরে আছ?" আর ত সংশয় নাই! এ নিশ্চয়ই বাতাসীর কণ্ঠস্বর! স্বরূপ তখন তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, দ্বারের সম্মুখে বাতাসী একটা ঝুড়ি মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত।

স্বরূপ আর বাতাসীকে কথা কহিবার অবকাশ দিল না, তাড়াতাড়ি তাহার মস্তক হইতে মাছের ঝুড়ি নামাইয়া লইল, এবং তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। তাহার পর সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন বাতাসী বলিল, "স্বরূপ! আমায় পার ক'রে দেবে? আমাকে এখনই ওপারে যেতে হবে।"

পার!—এমন ভয়ানক দুর্য্যোগে এই ঝড়ে পার! বাতাসী বলে কি? এই প্রলয়ের ঝড়ে পার করিতে হইবে—তাও যাকে তাকে নয়, বাতাসীকে! বাতাসী বলে কি?

স্বরূপ কথাটা হয়ত শুনতে পায় নাই মনে করিয়া বাতাসী আবার বলিল, "স্বরূপ! আমায় পার ক'রে দেবে?"

স্বরূপ বলিল, "বাতাসী। তোমাকে পার ক'রবার জন্য ত আমি দিনরাত পথ চেয়ে আছি। তুমি ত আমার খেয়ায় পার হ'তে আস না বাতাসী!"

বাতাসী কোমল স্বরে বলিল, "স্বরূপ, আমাকে পাঁচটার মধ্যে এই মাছ ওপারে মুখুয্যে বাবুদের বাড়ী দিতে হবে। তিন টাকা বায়না নিয়েছি। আমাকে যেতেই হবে। ও ঘাটে গিয়েছিলাম, তারা এ ঝড়ে খেয়া দেবেনা। তাই বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমায় পার কো'রে দেও। আজকের এই ঝড়ে তুমি ছাড়া আর কেউ পারে যেতে সাহস ক'র্‌বে না।" এই বলিয়া বাতাসী স্বরূপের মুখের দিকে চাহিল। স্বরূপ এমন রূপ আর কখনও দেখে নাই; এমন কথাও আর কখন শোনে নাই। সে বলিল, "বাতাসী, তোমায় পারে নিয়ে যাব তার আবার কথা কি? কিন্তু তোমার না গেলে হয় না? তুমি এইখানে থাক, আমি ওপারে মাছ পৌঁছে দিয়ে আসি। বড় তুফান বাতাসী, আজ বড় তুফান!

বাতাসী বলিল, "তা হবে না, স্বরূপ। তুমি যে একেলা এই ঝড়ে আমার জন্য পারে যাবে, তা হবেনা; আমিও যাব। চল, আর দেরী কোরোনা, আঁধার ক্রমেই বা'ড়ছে!"

স্বরূপ বলিল, "বাতাসী, আমার জন্য তোমার ভয়! এ কথা ত আর কখনও বলনি। চল, তোমাকে আজ পারে নিয়ে যাই! স্বরূপ হালদার আজ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে পাড়ি মেরে দেবে! চল, আজই তোমায় নিয়ে পারে যাবার সময়।" স্বরূপের চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল সে তখন মাছের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া লইল। বাতাসী দুইখানি বৈঠা লইল।

নদীর মধ্যে কি যাওয়া যায়? অনেক কষ্টে তাহারা নৌকায় উঠিল। স্বরূপ

একবার আকাশের দিকে চাহিল, একবার বাতাসীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর নৌকার কাছি খুলিয়া দিল; নৌকা নাচিয়া উঠিল। স্বরূপ বলিল, 'বাতাসী, ওখানে নয়; আমার এই হালের কাছে এসে ব'সো। দেখ, স্বরূপ তোমায় পারে নিয়ে যেতে পারে কি না?"

সত্যসত্যই স্বরূপ আজ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাতাসী থাকিয়া থাকিয়া বলে, "বাঁয়ে স্বরূপ, বাঁয়ে টান রেখো" "ঐ ঢেউটা কেটে ওঠো", আর বিহ্বল দৃষ্টিতে সে এক এক বার স্বরূপের দিকে চায়। কি অপূর্ব্ব কৌশল! কি আশ্চর্য্য শক্তি। স্বরূপ নিজে নিজেই বলিতে লাগিল "চল মোর ভাই, আর একটু, আর একটু—" "ঐ ঢেউটা কাটাতে পাল্লেই হয়," "সাবাস জোয়ান!" নিজের বল বৃদ্ধির জন্যই স্বরূপ কথা কহিতেছে। যখন এক একবার সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সে বাতাসীর মুখের দিকে চায়, আর তাহার বুকে নূতন করিয়া বল আইসে।

ঝড় বৃষ্টির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া স্বরূপের নৌকা পারে পঁহুছিল। স্বরূপ এক লম্ফে তীরে নামিয়া নৌকা টানিয়া ধরিল; তাহার পর নদী-তীরের বট গাছের সঙ্গে নৌকার কাছি বাঁধিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই।

স্বরূপ ক্লান্ত হইয়া নদী-তীরে বসিয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি পড়িতেছে। বাতাসী তখন স্বরূপকে বলিল, "স্বরূপ, আজ আর ও পারে গিয়ে কাজ নেই। নৌকা এখানেই থাক, তুমি ওপরে চল; বাজারের একটা দোকানে আজ তুমি থাকিও। আমার সঙ্গে ত কিছু নেই। বাবুদের বাড়ী যে টাকা পাবো, তাই তোমাকে দিয়ে আস্‌বো; তুমি খেয়ে দেয়ে রাত্রিটা দোকানেই কাটিয়ে দিও। আমি বাবুদের বাড়ীর এক কোণে প'ড়ে থাকব। কি বল?"

স্বরূপ উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "তা হবে না বাতাসী; তোমাকে না নিয়ে আমি কোথাও যাবো না। তোমায় পারে এনেছি, তোমায় ঘরে নিয়ে যাবো। যতক্ষণ তুমি না আস্‌বে, ততক্ষণ পথের দিকে চেয়ে আমি এই খেয়া নৌকায় ব'সে থাক্‌বো। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে প'ড়লেও নড়বোনা।" বাতাসী হাসিয়া বলিল, "আর যদি আমি না আসি!"

স্বরূপ। তা হ'লে স্বরূপেরও এ জীবনের মত খেয়া দেওয়া শেষ হবে। তার স্বরূপ কাউকে আর পার ক'রবে না। যাকে পার করবার জন্যে এতদিন বেঁচে ছিল, সে যদি আর পারে না যায়, স্বরূপের খেয়া দিয়ে কাজ কি?"

বাতাসী মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিল ; তাহার পর বলিল, "তুমি নৌকায় থাক ; আমি মাছ পৌছে দিয়ে আস্‌চি। তার পর দু'জনে ঘরে যাবো।" এই বলিয়া বাতাসী মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া তীরে উঠিল, স্বরূপ এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাতাসী যখন অদৃশ্য হইল, তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নৌকার উপর শুইয়া পড়িল।

যখন সন্ধ্যা হয় হয়, তখন বাতাসী ফিরিয়া আসিল। তখন আকাশে আরও একখানা ঘন কালো মেঘ উঠিতেছিল। নদী-তীর অন্ধকার, ঘাটে একখানিও নৌকা নাই। বাতাসী ডাকিল "স্বরূপ"। স্বরূপ উত্তর দিল, "বাতাসী"। তাহার পরই এক লম্ফে নৌকা হইতে নামিয়া স্বরূপ বাতাসীর নিকট উপস্থিত হইল। বাতাসী আকাশের নূতন কালো মেঘখানি দেখাইয়া বলিল, "স্বরূপ ! ও মেঘখানি বড় ভাল নয়, মেঘের গতিক দেখ, নৌকা"—স্বরূপ মেঘখানির দিকে চাহিয়া বলিল, "ও কিছু নয়। ও মেঘ উঠে আস্‌তে আস্‌তে আমরা পাড়ি জমিয়ে দেব। নৌকায় এস।"

বাতাসী বলিল, "স্বরূপ, মেঘখানি একটু দেখে চল।" স্বরূপও সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। সিকিখানি নদী যাইতে না যাইতেই আরও প্রবল ঝড় হইল। স্বরূপ বলিল, "বাতাসী ভয় নাই ; ঐ ত ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবো।"

বাতাসী একটু দূরে বসিয়াছিল ; সে তখন স্বরূপের আরও একটু নিকটে আসিয়া বসিল। স্বরূপ তখন সিংহবিক্রমে হাল চালাইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ হালখানি ভাঙ্গিয়া গেল, স্বরূপ জলে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। নৌকা ঢেউয়ের উপর আছাড় খাইতে লাগিল। স্বরূপ তখন চীৎকার করিয়া বলিল "বাতাসী ! এইবার গেল, আর রক্ষা নাই। বৈঠা কৈ ?" তখন বৈঠা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; তাহাদের অজ্ঞাতসারে বৈঠা দুইখানিই জলে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন স্বরূপ বলিল, "বাতাসী আর রক্ষার উপায় নাই। ঐ যে ঢেউটা আস্‌ছে, ঐ ঢেউয়েই আমাদের নৌকা ডুবে যাবে।"

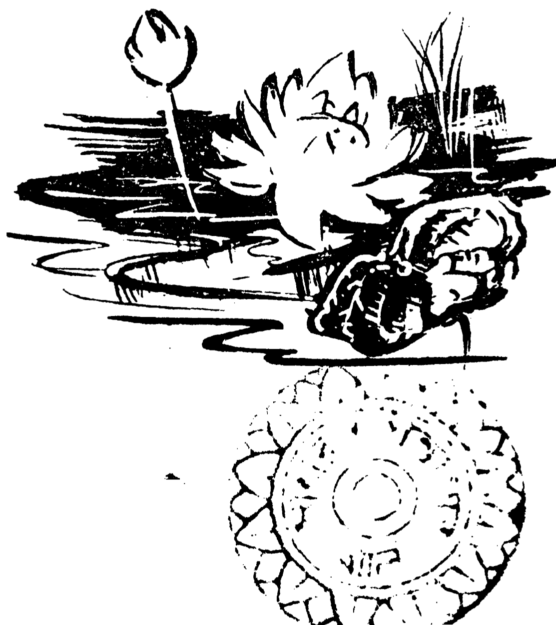
বাতাসী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে ; সে বলিল, "ভয় কি স্বরূপ ! তুমি কি মরিতে ডরাও। এস দুই-জনে আজ গলা জড়িয়ে ধ'রে মরি। আজ আমাদের বিয়ে, স্বরূপ, আজ আমাদের বিয়ে।" এই বলিয়া বাতাসী স্বরূপের গলা

জড়াইয়া ধরিল। স্বরূপ আর কথা কহিতে পারিল না; সে প্রাণপণ শক্তিতে বাতাসীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

বাতাসী তখন চীৎকার করিয়া বলিল, "স্বরূপ, চল আজ আমরা পারে যাই।"

প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসিয়া নৌকাখানি আছড়াইয়া ফেলিল; স্বরূপ ও বাতাসী দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া ইচ্ছামতীর গর্ভে ডুবিয়া গেল।

আজও বদনগঞ্জের লোকেরা স্বরূপ বাতাসীর গল্প করে। যে ঘাটের সম্মুখে তাহাদের নৌকা ডুবিয়াছিল, এখনও তাহাকে সকলে "স্বরূপ মাঝির ঘাট" বলিয়া থাকে।



পরশুরাম

ভুশণ্ডীর মাঠে

শিবু ভট্টাচার্যের নিবাস পেনেটী গ্রামে। একটি স্ত্রী তিনটি গরু, একতলা পাকা বাড়ী, ছাব্বিশ ঘর যজমান, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি, কয়েক ঘর প্রজা,—ইহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যায়। শিবুর বয়স বত্রিশ। ছেলেবেলায় স্কুলে যা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিল এবং বাপের কাছে সামান্য যেটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছিল তাহা সম্পত্তি এবং যজমানরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু শিবুর মনে সুখ ছিল না। তার স্ত্রী নৃত্যকালীর বয়স আন্দাজ পঁচিশ, আঁটো-সাঁটো মজবুত গড়ন, দুর্দান্ত স্বভাব। স্বামীর প্রতি তার যত্নের ক্রটি ছিল না, কিন্তু শিবু সে যত্নের মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইত না। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিত। পাঁচ মিনিট বকাবকির পরেই শিবুর দম ফুরাইয়া যাইত, কিন্তু নৃত্যকালীর রসনা একবার ছুটিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিরস্ত হইত না। প্রতিবারে শিবুরই পরাজয় ঘটিত। স্ত্রীকে বশে রাখিতে না পারায় পাড়ার লোকে শিবুকে কাপুরুষ, ভেড়ো, মেনীমুখো প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিল। ঘরে বাহিরে এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় শিবুর অশান্তির সীমা ছিল না।

একদিন নৃত্যকালী গুজব শুনিল তার স্বামীর চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। সেদিন কার বচসা চরমে পৌঁছিল,—নৃত্যকালীর ঝাঁটা শিবুর পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। শিবু বেচারা ক্রোধে, ক্ষোভে, কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কোনগতিকে রাত কাটাইয়া পরদিন ভোর ছ'টার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

শিয়ালদহ হইতে সোজা কালীঘাটে গিয়া শিবু নানা উপচারে পাঁচ টাকার পূজা দিয়া মানত করিল—"হে মা কালী, মাগীকে ওলাউঠোয় টেনে নাও মা আমি জোড়া পাঁঠার নৈবিদ্যি দেবো। আর বরদাস্ত হয় না। একটা সুরাহা করে দাও মা যাতে আবার নতুন করে সংসার পাত্‌তে পারি। মাগীর ছেলে-পুলে হল না, সেটাও ত দেখতে হবে। দোহাই মা!"

মন্দির হইতে ফিরিয়া শিবু বড় এক ঠোঙা তেলেভাজা খাবার, আধ সের দই এবং আধ সের অমৃতি খাইল। তারপর সমস্ত দিন জন্তুর বাগান, যাদুঘর, হগ সাহেবের বাজার, হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা বীডন স্ট্রীটের হোটেল-

ডি-অর্থোডক্সে এক প্লেট কারী, দু প্লেট রোষ্ট ফাউল এবং আটখানা ডেভিল জলযোগ করিল। তারপর সমস্ত রাত থিয়েটার দেখিয়া ভোরে পেনেটী ফিরিয়া গেল।

মা কালী কিন্তু উল্টা বুঝিয়াছিলেন। বাড়া আসিয়াই শিবুর ভেদবমি আরম্ভ হইল। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল, ফলে কিছুই হইল না। আট ঘণ্টা রাগে ভুগিয়া স্ত্রীকে পায়ে ধরাইয়া কাঁদাইয়া শিবু ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

গ্রামে আর মন টিকিল না। শিবু সেই রাত্রেই গঙ্গা পার হইল। পেনেটির আড়পার কোন্নগর। সেখান হইতে উত্তর মুখ হইয়া ক্রমে রিশ্‌ড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটীর হাট, চাঁপদানীর চটকল ছাড়াইয়া আরো দু'তিন ক্রোশ দুরে ভূশণ্ডীর মাঠে পৌঁছিল। মাঠটি বহুদুর বিস্তৃত, জনমানবশূন্য। এককালে এখানে ইট্ খোলা ছিল সেজন্য সমতল নয়। কোথাও গর্ত্ত, কোথাও মাটির ঢিবি। মাঝে মাঝে আস্‌শেওড়া, ঘেঁটু, বুনো ওল, বাবলা প্রভৃতির ঝোপ। শিবুর বড়ই পছন্দ হইল। একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ইটের পাঁজার এক পাশে একটা লম্বা তালগাছ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে একটা নড়া বেলগাছ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিবু সেই বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য হইয়া বাস করিতে লাগিল।

যাঁহারা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্ বা প্রেততত্ত্বের খবর রাখেন না, তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষ মরিলে ভুত হয় ইহা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু এই থিওরীর সঙ্গে স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম খাপ খায় কিরূপে? প্রকৃত তথ্য এই।—নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁরা মরিলে অম্লজান উদ্‌জান, যবক্ষারজান প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন। সাহেবদের মধ্যে যাঁরা আস্তিক, তাঁদের আত্মা আছে বটে কিন্তু পুনর্জন্ম নাই। তাঁরা মৃত্যুর পর ভূত হইয়া প্রথমতঃ একটি বড় ওয়েটিং-রুমে জমায়েৎ হন। তথায় কল্পবাসের পর তাঁদের শেষ বিচার হয়। রায় বাহির হইলে কতকগুলি ভুত অনন্ত স্বর্গে এবং অবশিষ্ট সকলে অনন্ত নরকে আশ্রয়লাভ করেন। সাহেবরা জীবদ্দশায় যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ভুতাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। বিলাতী প্রেতাত্মা বিনা পাশে ওয়েটিং-রুম ছাড়িতে পারে না। যাঁরা seance দেখিয়াছেন, তাঁরা জানেন বিলাতী ভুত নামানো কি রকম কঠিন কাজ। হিন্দুর জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত, কারণ আমরা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, কর্ম্মফল, ত্বয়া হৃষিকেশ, নির্বাণ, সব, সবই মানি। হিন্দু মরিলে প্রথমে ভুত হয় এবং যত্র তত্র স্বাধীনভাবে

বাস করিতে পারে,—আবশ্যক মত ইহলোকের সঙ্গে কারবারও করিতে পারে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী নয়। কেহ কেহ দু'চার দিন পরেই পুনর্জন্ম লাভ করে, কেউ বা দশ-বিশ বৎসর পরে, কেউ বা দু'তিন শতাব্দী পরে। ভূতদিগকে মাঝে মাঝে চেঞ্জের জন্য স্বর্গে ও নরকে পাঠানো হয়। এটা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কারণ স্বর্গে খুব ফূর্তিতে থাকা যায় এবং নরকে গেলে পাপ ক্ষয় হইয়া সূক্ষ্ম শরীর বেশ হালকা ঝরঝরে হয়, তা ছাড়া সেখানে অনেক ভাল ভাল লোকের সংগে দেখা হইবার সুবিধা আছে। কিন্তু যাঁদের ভাগ্যক্রমে ৺কাশীলাভ হয়, অথবা নেপালে পশুপতিনাথ বা রথের উপর বামন-দর্শন ঘটে—কিংবা যাঁরা স্বকৃত পাপের বোঝা হৃষিকেশের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন,—তাঁদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—একেবারেই মুক্তি।

দুতিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। শিবু সেই বেলগাছেই থাকে। প্রথম প্রথম দিনকতক নূতন স্থানে নূতন অবস্থায় বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, কিন্তু এখন শিবুর বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মেজাজটা যতই বদ্ হোক, নৃত্যের একটা আন্তরিক টান ছিল, শিবু এখন তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে। একবার ভাবিল—দুর হোক্, না হয় পেনেটিতেই আড্ডা গাড়ি। তারপর মনে হইল—লোকে বলিবে বেটা ভূত হইয়াও স্ত্রীর আঁচল ছাড়িতে পারে নাই। নাঃ, এইখানেই একটা পছন্দমত উপদেবীর যোগাড় দেখিতে হইল।

ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে! সুর্য্যদেব জলে হাবুডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটুফুলের গন্ধে ভুশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ-ঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিক্ মিক্ করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হল্‌দে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুব্‌রে পোকা ভবুর্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অদূরে বাবলা গাছে এক জোড় দাঁড়কাক বসিয়া আছে। কাক গলায় সুড়সুড়ি দিতেছে, কাকিনী চোখ মুদিয় গদগদ স্বরে মাঝেমাঝে ক-অ-অ- করিতেছে। একটা কট্‌কটে ব্যাং সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া গুটিগুটি পা ফেলিয়া বেলগাছের কোটর হইতে বাহিরে আসিল এবং শিবুর দিকে ড্যাব্-ডেবে চোখ মেলিয়া টিট্‌কারী দিয়া উঠিল। একদল

ঝি-ঝি পোকা সন্ধ্যার আসরের জন্য যন্ত্রে সুর বাঁধিতেছিল, এতক্ষণে সঙ্গৎ ঠিক হওয়ায় সমস্বরে ঝি-ঝি-ঝি-ঝি করিয়া উঠিল।

শিবুর যদিও রক্ত-মাংসের শরীর নাই, কিন্তু মরিলেও স্বভাব যাইবে কোথা। শিবুর মনটা খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল সেখানটা ভরাট হইয়া ধড়াক্ ধড়াক্ করিতে লাগিল। মনে পড়িল,—ভুশণ্ডীর মাঠের প্রান্তস্থিত পটুলী বিলের ধারে শ্যাওড়া গাছে একটা পেত্নী বাস করে। শিবু তাকে অনেকবার সন্ধ্যাবেলা পোলো হাতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছে। তার আপাদ-মস্তক ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা, একবার কেবল সে ঢাকা খুলিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া লজ্জায় জিভ কাটিয়াছিল। পেত্নীর বয়স হইয়াছে, কারণ তার গাল একটু তোবড়াইয়াছে, এবং সামনের দুটা দাঁত নাই। তার সঙ্গে ঠাট্টা চলিতে পারে কিন্তু প্রেম হওয়া অসম্ভব।

একটি শাঁকচুন্নী কয়েকবার শিবুর নজরে পড়িয়াছে। সে একটা গামছা পরিয়া আর একটা গামছা মাথায় দিয়া এলোচুলে বকের মত লম্বা পা ফেলিয়া হাতের হাঁড়ি হইতে গোবর গোলা জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। তার বয়স তেমন বেশী বোধ হয় না। শিবু একবার রসিকতার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু শাঁকচুন্নী ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফ্যাঁচ্ করিয়া ওঠে, অগত্যা শিবুকে ভয়ে চম্পট দিতে হয়।

শিবুর মন সবচেয়ে হরণ করিয়াছে এক ডাকিনী। ভুশণ্ডীর মাঠের পূর্ব-দিকে গঙ্গার ধারে ক্ষীরি-বাম্‌নীর পরিত্যক্ত ভিটায় যে জীর্ণ ঘরখানি আছে, তাহাতেই সে অল্পদিন হইল আশ্রয় লইয়াছে। শিবু তাকে শুধু একবার দেখি-য়াছে এবং দেখিয়াই মজিয়াছে। ডাকিনী তখন একটা খেজুরের ডাল দিয়া র'ক ঝাঁট দিতেছিল। পরনে সাদা থান। শিবুকে দেখিয়া নিমিষের তরে ঘোমটা সরাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়াই সে হাওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া যায়। কি দাঁত! কি মুখ! কি রঙ! নৃত্যকালীর রঙ ছিল পানতুয়ার মত। কিন্তু এই ডাকিনীর রঙ যেন পানতুয়ার শাঁস।

শিবু একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গান ধরিল—

আহা, শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী
কারে রেখে কারে ফেলি।

সহসা প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া নিকটবর্ত্তী তালগাছের মাথা হইতে তীব্রকণ্ঠে শব্দ উঠিল—

চা রা রা রা রা রা
আরে ভজুয়াকে বহিনিয়া ভগ্লুকে বিটিয়া
কেক্‌রাসে সাদিরা হো কেক্‌রাসে হো-ও-ও-ও—

শিবু চমকাইয়া উঠিয়া ডাকিল—"তালগাছে কে রে?"

উত্তর আসিল—"কারিয়া পিরেত বা।"

শিবু। কেলে ভূত? নেমে এস বাবা।

মাথায় পাগ্‌ড়ি, কালো লিক্‌বিকে চেহারা, কাঁকলাসের মত একটি জীবাত্ম সড়াক্ করিয়া তালগাছের মাথা হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয় বলিল—"গোড় লাগি বরম্‌দেওজি।"

শিবু। জিতা রহো বেটা। একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

কারিয়া পিরেত। ছিলম্ বা?

শিবু। তামাকই নেই তা ছিলিম। যোগাড় কর না।

প্রেত উর্দ্ধে উঠিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে বৈষ্ণবাটীর বাজার হইতে তামাক টিকা, কলিকা আনিয়া 'আগ শুল্‌গাইয়া' শিবুর হাতে দিল; শিবু একটা কচু ডাটার উপর কলিকা বসাইয়া টান দিতে দিতে বলিল—"তারপর, এলি কবে? তোর হাল-চাল সব বল্।"

কারিয়া পিরেত যে ইতিহাস বলিল তার সার মর্ম এই।—তার বাড়ী ছাপরা জিলা। দেশে এককালে তার জরু, গরু, জমি, জেরাৎ সবই ছিল। তার স্ত্রী মুংরী অত্যন্ত মুখরা ও বদ্‌মেজাজী, বনিবনাও কখনো হইত না। একদিন প্রতিবেশী ভজুয়ার ভগ্নীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হয় এবং স্ত্রীর পিঠে এক ঘা লাঠি কশাইয়া স্বামী দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে মুংরী বসন্ত রোগে মরিয়াছে। স্বামী আর দেশে ফিরিল না, বিবাহও করিল না। নানা স্থানে চাকরী করিয়া অবশেষে চাঁপদানীর মিলে কুলীর কাজে ভর্ত্তি হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সর্দ্দারের পদ পায়। কিছুদিন পূর্বে একটি লোহার কড়ি 'হাফিজ' অর্থাৎ কপিকলে উত্তোলন করিবার সময় তার মাথায় চোট লাগে। তারপর একমাস হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। সম্প্রতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেতরূপে এই তালগাছে বিরাজ করিতেছে।

শিবু একটা লম্বা টান মারিয়া কলিকাটি কারিয়া পিরেতকে দিবার উপক্রম

করিতেছিল, এমন সময় মাটির ভিতর হইতে ভাঙা কাঁসরের মত আওয়াজ আসিল—"ভায়া। কলকেটায় কিছু আছে নাকি?"

বেলগাছের কাছে যে ইটের পাঁজা ছিল তাহা হইতে খানকতক ইট খসিয়া গেল এবং ফাঁকের ভিতর হইতে হামাগুড়ি দিয়া একটি মূর্ত্তি বাহির হইল। স্থূল খর্ব্ব দেহ, থেলো হুকার খোলের উপর একজোড়া পাকা গোঁফ গজাইলে যে-রকম হয় সেই প্রকার মুখ, মাথায় টাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পরনে গরদের ধুতি, পায়ে তালতলার চটি। আগন্তুক শিবুর হাত হইতে কলিকাটা লইয়া বলিলেন—

"ব্রাহ্মণ? দণ্ডবৎ হই। কিছু সম্পত্তি ছিল, এইখানে পোঁতা আছে তাই যক্ষি হয়ে আগ্‌লাচ্চি। বেশী কিছু নয়—দু-পাঁচশো। সব বন্ধকী তমস্সুক দাদা—ইষ্টাম্বর কাগজে লেখা,—নগদ সিক্কা একটিও পাবে না। খবরদার, ওদিকে নজর দিও না—হাতে হাতকড়ি পড়বে। থুঃ থুঃ।"

শিবুর মেঘদূত একটু-আধটু জানা ছিল। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল—"যক্ষ মশায়, আপনিই কি কালিদাসের—"

যক্ষ। ভায়রা-ভাই। কালিদাস আমার মাস্তুতো শালীকে বে করে। ছোকরা হিজ্‌লিতে নিম্‌কির গোমস্তা ছিল, অনেক দিন মারা গেছে। তুমি তার নাম জান্‌লে কিসে হ্যা?

শিবু। আপনার এখানে কতদিন আগমন হয়েচে?

যক্ষ। আমার আগমন? হ্যা, হ্যা, আমি বলে গিয়ে সাড়ে তিন কুড়ি বচ্ছর এখানে আছি। কত এল দেখলুম কত গেল তাও দেখলুম। আরে তুমি ত সেদিন এলে কাটপিঁপড়ে তাড়িয়ে তিনবার হোঁচট্ খেয়ে গাছে উঠলে। সব দেখেচি আমি। তোমার গানের সখ্ আছে দেখচি,—বেশ বেশ। কালোয়াতি শিখ্‌তে যদি চাও ত আমার সাকরেদ হও দাদা। এখন আওয়াজটা যদিচ একটু খোনা হয়ে গেছে, তবু মরা হাতি লাখ টাকা।

শিবু। মশায়ের ভূতপূর্ব পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

যক্ষ। বিলক্ষণ। আমার নাম ৺নদেরচাঁদ মল্লিক, পদবী বসু, জাতি কায়স্থ, নিবাস রিশ্‌ড়ে, হাল সাকিন এই পাঁজার মধ্যে। সাবেক পেশা দারোগাগিরি, এলাকা রিশ্‌ড়ে ইস্তক ভদ্রেশ্বর। জর্জটি সাহেবের নাম শুনেচ? হুগলীর কালেক্টার,—ভারি ভালবাসত আমাকে। মুল্লুকের শাসনটা

তামাম আমার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল। নাদু মল্লিকের দাপটে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

শিবু। মহাশয়ের পরিবারাদি কি ?

যক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সব সুখ কি কপালে হয় রে দাদা। ঘর-সংসার সবই ত ছিল, কিন্তু গিন্নীটি ছিলেন খাণ্ডার। ব'লব কি মশায়, আমি হলুম গিয়ে নাদু মল্লিক,—কোম্পানির দেওয়ানী, ফৌজদারী, নিজামৎ আদালত যার মুঠোর মধ্যে,—আমারই পিঠে দিলে কিনা এক ঘা চেলা-কাঠ কশিয়ে। তারপরেই পালালো বাপের বাড়ী। তিন-শ চব্বিশ ধারায় ফেলতুম, কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর ছাড়লুম না। কিন্তু যাবে কোথা ? গুরু আছেন, ধর্ম্ম আছেন। সাতচল্লিশ সনের মড়কে মাগী ফৌত হ'ল। সংসারধর্মে আর মন ব'সল না। জর্জটি সাহেব বিলেতে গেলে আমি পেন্‌সন্ নিয়ে এক সখের যাত্রা খুললুম। তারপর পরমাই ফুরুলে এই হেথা আড্ডা গেড়েচি। ছেলেপুলে হয় নি তাতে দুঃখু নেই দাদা। আমি ক'রব রোজগার, আর কোন্ আবাগের-বেটা-ভূত মানুষ হয়ে ঘরে জন্ম নিয়ে সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে—সেটা আমার সইত না। এখন তোফা আছি, নিজের বিষয় নিজে আগ্‌লাই, গঙ্গার হাওয়া খাই আর বব বম্ করি। যাক্, আমার কথা ত সব শুনলে, এখন তোমার কেচ্ছা বল।"

শিবু নিজের ইতিহাস সমস্ত বিবৃত করিল, কারিয়া পিরেতের পরিচয়ও দিল। যক্ষ বলিলেন—"সব স্যাঙাতের একই হাল দেখ্‌চি। পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ করে ফল নেই, এখন একটু গাওনা-বাজনা করি এস। পাখোয়াজ নেই,—তেমন জুৎ হবে না। আচ্ছা, পেট চাপ্‌ড়েই ঠেকা দিই। উহুঁ—ঢন্ ঢন্ কচ্চে। বাবা ছাতুখোর, একটু এঁটেল-মাটি চটকে এই মধ্যিখানে থাব্‌ড়ে দে ত। ঠিক হয়েচে। চৌতাল বোঝো ? ছ-মাত্রা, চার তাল, দুই ফাঁক। বোল্ শোনো—

ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নি ঘা দেন কর্ত্তা কে।
ধরে তাড়া কে'রে খিট্‌খিটে কথা কয়
ধূর্ত্তা গিন্নি কর্ত্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধ'রে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্‌টে পাল্‌টে ফ্যালে
গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়।

ধাক্কা ধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনি করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—

'ধা' এর ওপর সোম। ধিন্ তা তেরে কেটে গদি ঘেনে ধা। এই 'ধা' ফস্কালেই সব মাটি। গলাটা ধরে আস্‌ছে। খোট্টাভূত, আর এক ছিলিম সাজ্ বেটা।"

উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভ অনিবার্য। অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ডাকিনী শিবুর ঘর করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু সে এখনো কথা বলে নাই, ঘোমটাও খোলে নাই, তবে ইশারায় সম্মতি জানাইয়াছে। আজ ভৌতিক পদ্ধতিতে শিবুর বিবাহ। সূর্যাস্ত হইবামাত্র শিবু সর্বাঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা মাখিয়া স্নান করিল, গাবের আঠা দিয়া পৈতা মাজিল, ফণি-মনসার বুরুশ দিয়া চুল আঁচড়াইল, টিকিতে একটি পাকা তেলাকুচা বাঁধিল। ঝোপে ঝোপে বন-জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাশ ঘেঁটুফুল, বৈঁচি, কয়েকটি পাকা নোনা ও বেল সংগ্রহ করিল। তারপর সন্ধ্যায় শেয়ালের ঐক্যতান আরম্ভ হইতেই সে ক্ষীরি-বাম্‌নীর ভিটায় যাত্রা করিল।

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। ঘরের দাওয়ায় কচুপাতার আসনে ডাকিনীর সম্মুখে বসিয়া শিবু মন্ত্রপাঠের উদ্যোগ করিয়া উৎসুক চিত্তে বলিল—"এইবার ঘোম্‌টাটা খুল্‌তে হচ্চে।"

ডাকিনী ঘোমটা সরাইল। শিবু চমকিত হইয়া সভয়ে বলিল—"অ্যাঁ! তুমি নেত্য?"

নৃত্যকালী বলিল—"হ্যাঁরে মিন্‌সে। মনে করেছিলে মরে আমার কবল থেকে বাঁচবে! পেত্নী শাকচুন্নীর পিছু-পিছু ঘুরতে বড় মজা, না?"

শিবু। এলে কি ক'রে? ওলাউঠোয় নাকি?

নৃত্যকালী। ওলাউঠো শত্তুরের হোক্। কেন, ঘরে কি কেরাসিন ছিল না?

শিবু। তাই চেহারাটা ফরসাপানা দেখাচ্চে। পোড় খেলে সোনার জলুস বাড়ে। ধাতটাও একটু নরম হয়েচে নাকি?

শুভকর্মে বাধা পড়িল। বাহিরে ও কিসের গোলযোগ? যেন একপাল শকুনি-গৃধিনী ঝুটোপটি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিড়ি করিতেছে। সহসা উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া পেত্নী ও শাকচুন্নী উঠানের বেড়ার আগড় ঠেলিয়া ভীষণ

চেঁচামেচি আরম্ভ করিল ! (ছাপাখানার দেবতাগণের সুবিধার জন্য চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলাম, পাঠকগণ ইচ্ছামত বসাইয়া লইবেন) ।

পেত্নী । আমার সোয়ামী তোকে কেন দেব না ?

শাঁকচুন্নী । আ মর বুড়ী, ও যে তোর নাতির বয়সি ।

পেত্নী । আহা, কি আমার কনে-বউ গা !

শাঁকচুন্নী । দূর মেছোপেত্নী, আমি যে ওর দু-জন্ম আগেকার বউ

পেত্নী । দূর গোবরচুন্নী, আমি যে ওর তিন জন্ম আগেকার বউ ।

শাঁকচুন্নী । মর্ চেঁচিয়ে, ওদিকে ডাইনী মাগী মিন্সেকে নিয়ে উধাও হোক্ ।

তখন পেত্নী বিড় বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া আগড় বন্ধ করিয়া বলিল- "আগে তোর ঘাড় মট্‌কাবো তারপর ডাইনী বেটিকে খাবো ।"

কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি চুলোচুলি আরম্ভ হইল । একা নৃত্যকালীতেই রক্ষা নাই, তার উপর পূর্বতন দুই জন্মের আরো দুই পত্নী হাজির। শিবু হাতে পৈতা জড়াইয়া ইষ্টমন্ত্র জমিতে লাগিল । নৃত্যকালী রাগে ফুলিতে লাগিল

এমন সময় নেপথ্যে যক্ষের গলা শোনা গেল—

ধনি, শুন্‌চ কিবা আন্‌মনে
ভাব্‌চ বুঝি শ্যামের বাঁশি ডাক্‌চে তোমায় বাঁশবনে ।
ওটা যে খ্যাঁক্‌শেয়ালী, দিওনা কুলে কালি
রাত-বিরেতে শ্যালকুকুরের ছুঁচোপ্যাঁচার ডাক্ শুনে

যক্ষ বেড়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—"ভায়া এখানে হচ্চে কি ? অত গোল কিসের ?"

কারিয়া পিরেত হাঁকিল—"এ বরম্ পিচাস, আরে দর্‌বাজা ত খোল ।" শিবুর সাড়াই নাই ।

প্রচণ্ড ধাক্কা পড়িল, কিন্তু মন্ত্রবদ্ধ আগড় খুলিল না, বেড়াও ভাঙিল না। তখন কারিয়া পিরেত তারস্বরে উৎপাটন-মন্ত্র পড়িল—

মারেজ্ জুয়ান্—হেঁইয়া
আউর ভি থোড়া—হেঁইয়া
পর্ব্বত তোড়ি—হেঁইয়া
চলে ইঞ্জন—হেঁইয়া
ফটে বয়লট্—হেঁইয়া
খবরদার—হা-ফিজ্ ।

মড় মড় করিয়া ঘরের চাল, দেওয়াল, বেড়া, আগড় সমস্ত আকাশে উঠিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

ডাকিনী, অর্থাৎ নৃত্যকালীকে দেখিয়া যক্ষ বলিলেন—"একি, গিন্নী এখানে! বেম্মদত্যিটার সঙ্গে! ছি ছি—লজ্জার মাথা খেয়েচ?" ডাকিনী ঘোমটা টানিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

কারিয়া পিরেত বলিল—"আরে মুংরি, তোহর সরম নেহি বা?"

* * * * *

তারপর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল, তাহা মনে করিলেও কলমের কালি শুখাইয়া যায়। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী,—এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভুশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প সুরু হইল। ভূত, প্রেত, দৈত্য, পিশাচ, তাল, বেতাল, প্রভৃতি দেশী উপদেবতা যে যেখানে ছিল, তামাশা দেখিতে আসিল। স্পুক, পিক্সি, নোম, গব্‌লিন প্রভৃতি গোঁফ-কামানো বিলাতী ভূত বাঁশি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। জিন্‌, জান্‌, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি লম্বা দাড়িওয়ালা কাবুলী ভূত দাপাদাপি আরম্ভ করিল। চিং, চ্যাং, ফ্যাচাং ইত্যাদি মাকুন্দে চীনে-ভূত ডিগবাজী খাইতে লাগিল।

রাম রাম রাম। জয় হাড়িঝি চণ্ডী, আজ্ঞা কর মা! কে এই উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সমাধান করিবে? আমার কম্ম নয়। ভূত-জাতি অতি নাছোড়বান্দা,—ন্যায্যগণ্ডা ছাড়িবে না! পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেত্নীর পেত্নীত্ব,—এ-সব তারা বিলক্ষণ বোঝে। অতএব সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুয্যে, চারু বাঁড়ুয্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন—যাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে না যায় এবং কোনোরকম নীতি-বিগর্হিত বিদ্‌কুটে ব্যাপার না ঘটে। নিতান্ত যদি না পারেন তবে চাঁদা তুলিয়া গয়ায় পিণ্ড দিবার চেষ্টা দেখুন, যাহাতে বেচারারা অতঃপর শান্তিতে থাকিতে পারে।



শ্রীঅবনীনাথ ঠাকুর

হীরা-কুণি

গোয়ালিনীর নাম হীরা—গাইটির নাম কুণি।

হীরার একটি একমাসের ছেলে, গাইটির একটি একমাসের বাছুর।

হীরা দুধ বেচতে চলে রায়গড়ের পাহাড় ভেঙে বর্গি-রাজাকে! কুণি-গাইয়ের টাট্‌কা দুধ রাজা খায়, বাছুরটি কাঁদতে থাকে; হীরার মনে কোনোদিন ব্যথা বাজে না বাছুরের জন্যে! দুধ-দুইবার বেলায় কুণি-গাই থেকে-থেকে তার বাছুরকে ডাকে, বাছুর ছুটে আসতে চায় দুধ খেতে, হীরা তাকে ফিরিয়ে দেয়;—খোঁটায় বেঁধে রাখে। বাছুর তার মাকে পায় না,—কাঁদতে থাকে দুধের জন্যে; হীরা সেদিকে নজরই দেয় না, সকাল-বিকাল দুধ দুয়ে নিয়ে চলে যায় বেচতে বর্গির কেল্লায়, সেখান থেকে ফিরে আসে সন্ধ্যার আগে, প্রথমে নিজের ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, তার পর বাছুরকে নিয়ে কুণির কাছে ধরে, বাছুর তার মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে যায় কিন্তু দুধ পায় একটুখানি! কুণি সে বাছুরের গা চেটে তাকে ঘুম পাড়ায়। বাছুর থাকে উপবাসী, দুধ খায় বর্গি-রাজা,—এই ভাবে দিন চলেছে।

সে একদিন হীরা গেল দুধ বেচতে কেল্লায়, সেখানে দুধের দাম চোকাতে রাজার খাতাঞ্চি করলে দেরী—সন্ধ্যার ঘড়ি পড়লো, কেল্লার ফাটক ঝনাৎ-কোরে বন্ধ হোয়ে গেল। হীরা বলে—"দোর খোলো!" সেপাই বলে—"হুকুম নেই!" হীরার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে ছেলের জন্যে, সে কেঁদে বলে—"বাছা আমার না খেয়ে রয়েছে—পায়ে ধরি, দোর খোলো!" বর্গি-রাজার কড়া পাহারা দোর খোলে না। হীরার বুক টন্ টন্ করে ছেলেকে দুধ দিতে, সে দোরের শিকল ধরে নাড়া দেয়, বলে—"একটিবার খোলরে খিল্!" লোহার তালা খোলে না, ঝন্‌ঝন্ কোরে জানায়—হুকুম নেই!

বেলা পড়লো, সন্ধ্যা-তারা কেল্লার মাঝখানে দেবতার মন্দিরের ঠিক উপরে দেখা দিলে, রাতের পাখীরা ডানা মেলে উড়ে চল্লো বাসায়; হীরা কেঁদে বল্লে—"ওরে ডানা পাই তো উড়ে যাই বাছার কাছে—সে যে না খেয়ে মরে!" পাহাড়ের নীচেই হীরার ঘর, সেখান থেকে কুণি-গাই তার বাছুরকে ডাক

দিচ্ছে শোনা গেল। হীরা দুধের খালি কলসী আছড়ে ভেঙে উঠে দাঁড়ালো; কোমর বেঁধে পথের সন্ধানে চল্লো।

রায়গড়ের পুরোনো বুরুজ, তারি ধারে পাহাড়ের খানিক ধ্বসে গেছে, একটা অশথগাছ তার উপর ঝুঁকে পড়েছে—সেইখানটাতে অর্দ্ধেক রাতে চাঁদের আলো পড়লো; হীরা দেখলে পাথরগুলো কুমীরের দাঁতের মত খোঁচা-খোঁচা ঝক্-ঝক্ করছে! হীরা সেই পথে আস্তে-আস্তে নামতে থাকলো—একটির পর একটি পাথরে পা রেখে। তার পর একটা পাকদণ্ডি বেয়ে হীরা নেমে গেল আপনার ঘরে। তখন রাত ফুরিয়ে সকাল হচ্ছে—ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেছে। হীরা ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে দুধ দিতে লাগলো—দড়ি ছিঁড়ে কুণির উপবাসী বাছুর দুধ খেতে থাক্‌লো, হীরা সেদিন তাকে বাঁধলে না—তার মার কাছ থেকে সরিয়ে দিলে না।

বেলা হলো। রায়গড়ের বর্গি-রাজা ঘুম ভেঙে দুধের জন্য ডাকা-ডাকি করতে লাগলেন। হীরা আজ দুধ আনে নি! সেপাই ছুটলো, শান্ত্রী ছুটলো—হীরার ঘরে দুধ চেয়ে। হীরা বল্লে—"দুধ নেই, শুকিয়ে গেছে।" বর্গি-রাজার সেপাই সে, শুনবে কেন? হীরাকে ধরে নিয়ে গেল কেল্লায়। সেখানে রাজা শুনলেন সব কথা। হীরাকে তার গ্রামখানা জায়গীর দিলেন—আর যে-পথে হীরা প্রাণ হাতে করে নেমে গিয়েছিল—ছেলের কাছে, সেই দুর্গম পথটার নাম দিলেন বর্গি রাজা—'হীরা কুণি'।

হীরা দুধ-বেচা ছেড়ে চাষ-বাসে লেগে গেল।



দীনেন্দ্রকুমার রায়

গৃহহীন

[১]

মাতব্বর চাষী-গৃহস্থ গোবিন্দ দাসের পুত্র মহেশ দাসকে দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না যে, সে কলি-কালের মানুষ! কিন্তু তাহাকে সত্য যুগের মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইবারও কোন কারণ ছিল না। ক্ষুদ্র ফতাইপুর গ্রামে তাহার বাস।—তাহার পিতা একজন সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ ছিল, এবং তাহার অঙ্গনাস্থিত ধানের গোলা ছু'টি ধানে পূর্ণ থাকিত; দু'খানি লাঙ্গল চারি-জোড়া লাঙ্গলা বলদ, দুইটি-গাই গরু, 'খাদা' খানেক ধানের জমি, দুখানি চৌরী ও একখানি গোয়ালঘর,—এবং একখানি পাকশালা—পল্লীগ্রামে চাষী-গৃহস্থের যাহা যাহা থাকা আবশ্যক, সমস্তই বজায় রাখিয়া মহেশ দাসের পিতা গোবিন্দ দাস তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষ্যে বৃন্দাবন ধামে গিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ করে। তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে মহেশ দাসের কন্যা গৌরীর জন্ম হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মহেশ দাস চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। বয়স বত্রিশ হইলেও এ পর্যন্ত সে লাঙ্গল বহা ও গরুর রাখালীগিরি ভিন্ন আর কিছুই শিখিতে পারে নাই; তবে সে তামাক সাজিতে ও ঘরামীপাড়ার বেহুলার দলে লখিন্দর সাজিয়া ভাঙ্গা গলায় বক্তৃতা করিতে খুব ওস্তাদ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে কাছা গলায় দিয়া তাহার প্রধান মুরুব্বি ও 'মেণ্টর' জগবন্ধু দাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন করি কি?"—জগবন্ধু বলিল, "খুব ধূমধামে বাপের ছোরাদ্দ কর।"—কিন্তু শ্রাদ্ধটা যে কতদূর গড়াইবে—জগবন্ধু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না, কিংবা সে সম্বন্ধে চিন্তাও করিল না। এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের 'মটো'—"মোর বুদ্ধি তোর কড়ি, ফলার করি আয়!" এই ফলারে' বুদ্ধিতে জগবন্ধু দাস তাহাদের গ্রামের কৈবর্ত্ত সমাজে অদ্বিতীয় ছিল।

গৌরীর মা কাদি কৈবর্ত্তিনী সিক্ত কেশে উঠানে বসিয়া তিনটা জিউলি কচার ডালের উপর একটা মালসা রাখিয়া অরহর কাষ্ঠের অগ্নিতে 'হবিষ্যি'

]কাইতেছিল।—মহেশ দাস দীঘিতে স্নান করিয়া আসিয়া তাহার গলার
াছাখানি পরিধান করিল, এবং পরহিত কাছাখানি উভয় প্রসারিত বাহুর
পর ছড়াইয়া দিয়া, পাখীর ডানা ঝাড়িবার মত করিয়া সবেগে আন্দোলিত
রিতে করিতে গৌরীর মাকে বলিল, "দেখ্, দেখ্তে দেখ্তে দশদিন ত
কটে গেল! আঃ, শীতকালে মা বাপ মরা কি ফ্যাসাদ! জাড়ের (শীতের)
্যালায় বুকের ওপর য্যানো ঢেঁকির পাড় পড়চে! জলের য্যানো দাঁত
বরিয়েছে; কি জাড় রে বাবা!—তা দেখ গৌরীর মা, বেঁচে থাকলে আওলাৎ
পত্তোর ঢের হবে; বাবা কিছু ফিরে আস্বে না। জগো দা বল্ছিল,
পাঁচগাঁয়ের দশ ঠাকুরকে ফলারটা ভাল করেই দিতে হবে।—গোলার
ানগুলো বের করে কতক চিঁড়ে কুট্তে দে, কতক মুড়ির জন্যে সেদ্দ কর।
আমাদের কুলে এড়েটা দেগে 'বিষোচ্ছুগ্গু' (বৃষোৎসর্গ) করবো; আর রাঢ়
থেকে, কি বলে ওর নাম, লটোবর দাসের কেত্তনের দলটা আনাবো মনে
রিছে। চব্বিশ পহর করার ইচ্ছেটা আমার বড্ড বেশী।—তা আমাকে কিছু
ভাব্তে হবে না, জগ'দাই সব ভার নিতে চেয়েছে।—দশ ট্যাকা খরচ হবে, তা
লে আর কি করচি? বাপের ছোরাদ্দ ত একবার বই পাঁচবার হবে না!"

গৌরীর মা মাস্লার নীচে খান দুই খড়ি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "কেত্তনের
ল আন্তে চাইচ, কত ট্যাকা তাতে খরচ হবে?"

মহেশ দাস শুষ্কপ্রায় কাছাখানি পরিধান করিতে করিতে বলিল, "তা স
াড়েক ট্যাকা ত লাগ্বিই, তাতে পার পেলে বাঁচি।"

গৌরীর মা দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "সে ক কুড়ি ট্যাকা?"

মহেশ দাস বলিল, "ফেল্লি আবার নিকেশের তলায়!—জগ'দা বলেছে—স
াড়েক টাকাতেই হতি পারে। স্যাড়শো টাকা যে ক কুড়ি, তা কি তাকে
ধিয়েছি? তা আন্দাজ দশ-বারো কুড়ি হতি পারে।"

গৌরীর মা টাকার পরিমাণ শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিল, "দ-শ
া-রো কুড়ি ট্যাকা! আমরা গরীব মানুষ, দু'বিঘে চাষ আবাদ করে গেরস্তালি
ালাই, এত ট্যাকা কুতায় পাবো?

মহেশ দাস রাগ করিয়া বলিল, "রাজারা হাতী ঘোড়া কোথায় পায়?
ামার এক খাদা জমি, আট দশটা গরু! ট্যাকার ভাবনা কি?—গুপি
াদ্দার বলেছে ট্যাকায় চার পয়সা সুদ দিলে, এ সব বন্ধক রেখে যত ট্যাকা
গে—সে দেবে। জগ'দাই ট্যাকা নিয়ে দেবে।"

গৌরীর মা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "তবেই হয়েচে। এই ছরাদেই তুমি ফতুর হবা।—সে আঁখোট কলাপাতে মাল্‌সার হবিষ্যান্ন ঢালিয়া একতাল মটরের ডাল-বাটা সিদ্ধ ও কাঁচকলা সিদ্ধ ছানিতে আরম্ভ করিল।

একে এত বেলা পর্য্যন্ত অনাহার, তাহার উপর পত্নীর মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ!—মহেশ দাস একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিল, "তোর বাপের ছেরাদ্দ হ'লে আর একথা বল্‌তিস্ নে। আমার বাপের ছেরাদ্দ কি না, তাই ট্যাকা খরচের কথা শুনে আঁতকে উঠ্‌ছিস! আমি আমার বাপের ট্যাকা খরচ করব;—তোর বাপের ঘরে ত আর সিঁদ দিতে যাচ্ছি নে।"

গৌরীর মা চটিয়া বলিল, "আ মোলো শগুন। যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা! আমার বাপ তুল্‌ছিস্? আমার বাপের ছেরাদ্দ করতে চাস্! মুখে না মুড়ো জ্বেলে দেব। অল্লপ্পেয়ে ড্যাক্‌রা মিন্‌সে!"

মহেশ দাস চাবি-বাঁধা উত্তরীয়খানি তাড়াতাড়ি কোমরে জড়াইয়া সক্রোধে বলিল, "তবে রে হারামজাদি!—আমার খাবি পরবি—আমাকেই গাল? আয়, আগে তোরই ছেরাদ্দ করি।"—সে তাহার সহধর্ম্মিণীর রুক্ষ চুলের গোছা ধরিয়া একটানে তাহাকে চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর 'হবিষ্যির মুখে মারি বাদার বাড়ি' বলিয়া অদূরবর্ত্তী মাল্‌সাটা তুলিয়া লইয়া সবেগে সেই কদলিপত্রস্থিত হবিষ্যান্নের উপর নিক্ষেপ করিল।

গৌরীর মা উঠানে পড়িয়া "বাবা রে, মেরে ফেল্লে রে, অ্যামোন হাবাতের হাতেও পড়েছিলাম!"—ইত্যাকার আর্ত্তনাদে পাড়ার লোক জড় করিতে লাগিল। —কানকাটা একটা কালো বেঁড়ে কুকুর কিছু দূরে বসিয়া এক একবার লুব্ধনেত্রে কদলীপত্রস্থিত সুলোহিত আতপান্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল,—এইবার সুযোগ বুঝিয়া সে এক লম্ফে আসিয়া 'হবিষ্যি' আরম্ভ করিয়া দিল!

শ্রাদ্ধ আরম্ভ না হইতেই শ্রাদ্ধ এইরূপে অনেক দূর গড়াইল!—গৌরীর মা সেইদিনই অপরাহ্নে গৌরীকে কোলে লইয়া মবারকপুরে তাহার বাপের বাড়ী চলিল।

[২]

কিন্তু শ্রাদ্ধ আটক রহিল না। মহেশ দাসের পরমাত্মীয় ও পরামর্শদাতা

জগদা' বলিল, "মরদ কি বাৎ, আর হাতী কি দাঁত!—হাতী কি না, তা দাঁত দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায় আর মরদ কি না কথাতেই মালুম হয়।—পরিবার গোসা করে বাপের বাড়ী গিয়েছে, যাক্; যত টাকা লাগে, খরচ করে বাড়ীতে দশ ঠাকুরের পাতা পাড়াও। আর কেত্তন, বোষ্টম সেবা, দশটা কাঙ্গালী বিদেয়—এ করা চাই-ই। গোবিন্দ খুড়ো স্বর্গে থেকে দেখবে, হাঁ, ছেলে বটে ছরাদের মত ছরাদ করেচে!"

মহেশ দাস সোৎসাহে পিতৃ-শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। গৌরীর মা রাগ করিয়া বাপের বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু লোকের গঞ্জনায় সেখানে দু'দিনের বেশী থাকিতে পারিল না; স্বামীগৃহে ফিরিবার সময় তাহার মা, মাসী, এবং ছোট ভগিনীটিকেও সঙ্গে লইয়া আসিল। দিবারাত্রি ঢেঁকির পাড়ের শব্দে পাড়ার লোকের মাথা নড়িতে লাগিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া উঠিল। মহেশ হিতৈষী মুরুব্বি জগদা'কে সঙ্গে লইয়া গ্রামের সর্ব্বপ্রধান উত্তমর্ণ গোপ পোদ্দারের নিকট গিয়া দলিল দিয়া টাকা ধার পাইল না!—গোপী পোদ্দার বড় হিসাবী লোক; টাকায় চারি পয়সা হিসাবে সুদ খাইয়া তাহার উদর সম্ভবাতিরিক্ত স্থূল হইয়াছিল। গোপীনাথ পোদ্দার পরম বৈষ্ণব; দাড়ি গোঁফ কামান; হাঁড়ীর মত গোল মুখখানিতে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন; নাকের উপর সুদীর্ঘ তিলক; কণ্ঠে তিনকণ্ঠি স্থূল তুলসীর মালা। পরিধানে আটহেতে একখানি নরুণপেড়ে ধুতি; ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতশালা হইতে বাহির হইয়া এ পর্য্যন্ত তাহার রজকালয় দর্শনের সুযোগ হইয়াছে কিনা সন্দেহ! সুতরাং তাহা যৎপরোনাস্তি ময়লা,—তদ্দ্বারা তাহার বিশাল উদরের বর্ত্তুল-পরিধি কোনরূপে আচ্ছাদিত হইলেও তাহা কাছা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই, অগত্যা পোদ্দার মশায় মুক্তকচ্ছ!—অপরাহ্ণ কালে গোপীনাথ তাহার খড়ো চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টায় ভাগবত গ্রন্থখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ইহকালের সঞ্চয়ের কথা চিন্তা করিতেছিল; অর্থাৎ কাহার নিকট কত সুদ বাকি আছে, কে কোন কিস্তী খেলাপ করিয়াছে, ও পরদিন প্রভাতে উকীল-বাড়ী গিয়া কোন্ কোন্ খাতকের নামে নালিশ রুজু করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল; এমন সময় রুক্ষকেশ মলিনবদন মহেশ দাস কাছা-গলায় তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। অশৌচ বশতঃ সে তাহাকে নমস্কার না করিলেও জগবন্ধু দাস পোদ্দারের পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়া একপাশে

খুঁটির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পোদ্দার পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া ডালভাঙ্গা সুতাবাঁধা চশমাখানির ভিতর দিয়া জগবন্ধুর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল! তাহার পর হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল, "হরি হে দীনবন্ধু! পার কর ভবসিন্ধু।—তারপর জগবন্ধু, কি মনে করে এমন অবেলায়?"

জগবন্ধু ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বিনীতভাবে বলিল, "এজ্ঞে কর্ত্তা! আপনার ছিচরণ দর্শন করতে আসবো, তার আর সকাল সন্ধ্যে কি?…আপনি ত জানেন আমাদের মহেশের বাপ গোবিন্দ খুড়ো ছিবিন্দাবনধামে গিয়ে কেষ্টপ্রাপ্তি হয়েছেন; তা তার ছেরাদ্দর আর তো দিন নেই! আপনার ভরসাতেই ময়শা দশ ঠাকুরকে নেমন্তন্নো—"

গোপীনাথ বাধা দিয়া বলিল, "এ অতি উত্তম কাজ। বাড়ীতে দশজন কুটুম্বোর পায়ের ধুলো পড়ে, এ কি কম ভাগ্যির কথা?—কিছু টাকা ধার নেবে বুঝি?—মহেশের বাপের 'আবস্তা' বেশ ভালই ছিল।—সোণা-দানা কিছু এনেছ? আমি কিন্তু টাকায় চার পয়সার কম সুদে টাকা ধার দিই নে মহাজনী কারবার—ঝকমারি কত? নালিশ ছাড়া আজকাল টাকা আদায় করা মুস্কিল।—আর নালিশ করতে গেলেই, বুঝলে কিনা, উকীল বেটারা রাঘব বোয়ালের মত হাঁ করে আছে! তার ওপর উকীলের মুহুরী বলে 'তহরি' দাও, হাকিমের পেস্কার বলে 'দাখিলী' দাও; কিছু দক্ষিণে না দিলে পেয়াদা বেটারা দস্তুর মত সমন জারি করে না! সুদ তো চুলোয় যাক্ আসল নিয়েই টানাটানি! যেন টাকার জলছত্তর খুলে বসেছি! মহাজনী কারবারে আর সুখ নেই!"

জগবন্ধু বলিল, "ওর বাপের সোণা রূপো যে দশ তোলা ছিল, তা সে তিথি করতে যাবার সময় বেচে কিনে সাঙ্গ করে নিয়ে গিয়েছিল। থাকবার মধ্যে আছে গোটা আষ্টেক দশেক গরু, খান দুই নাঙ্গল, আর খাদা খানেক ভুঁই।"

পোদ্দার বলিল, "আরে ভুঁই ত জমিদারের। চাষ করে, উঠবন্দী জমির খাজনা দ্যায়, আজ আছে কাল নেই; সে জমি আবার বন্দক কি দেবে?—পাকা মাল ছাড়া আমি বন্দক রেখে টাকা ধার দিই নে।—আর যে গরুটা বাছুরটার কথা বলছো, ও ত মুচির চামড়া! বিশেষ হালের গরু বন্দক রেখে তা কি আজ কাল নিলাম করে টাকা আদায় করবার যো আছে?—আমার কাছে হবে-টবে না; দেখ যদি আর কোথু পাও।"

গোপী পোদ্দারের মন কিছুতেই নরম হইল না; অগত্যা জগবন্ধুকে বেকু

হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইল। মহেশ দাস বাড়ী আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। চিড়া কুটিবার 'ধপাধপ' শব্দ শুনিয়া তাহার মনে হইল, ঢেঁকির চুরণ' তাহার মাথায় পড়িতেছে! সে দশদিক অন্ধকার দেখিল।—এখন উপায় ?—জগবন্ধু তাহাকে পূর্ব্বে আশা দিয়াছিল, গুপি পোদ্দার টাকা হাতে লইয়া বসিয়া আছে, চাহিতে যে কিছু বিলম্ব! মহেশ জগবন্ধুর উপর বিষম 'ব্যাজার' হইয়া উঠিল।

[৩]

পৃথিবীতে কিছুই আটক থাকে না। মহেশ দাসের পিতৃশ্রাদ্ধও বন্ধ হইল না। মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ শেষ হইল। শ্রাদ্ধান্তে তাহার আঙ্গিনায় নৌকার পাল টাঙ্গাইয়া, তাহার নীচে রাঢ়ের কীর্ত্তনওয়ালা নটবর দাস দুই দিন কীর্ত্তন করিয়া গেল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সুদখোর গুপি পোদ্দারের মুহুর্মুহু ভাব লাগিতে লাগিল, এবং সে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া 'খুলী'কে কয়েকবার আলিঙ্গন করিতে গেল! ভক্তিবিহ্বল গুপি পোদ্দারের বিশাল ভুঁড়ির সংঘর্ষণ হইতে মৃদঙ্গখানি রক্ষা করিবার জন্য, ভীতিব্যাকুল খুলী যতই সরিয়া যায়, গুপি পোদ্দার ততই উৎসাহের সহিত 'অহঃ' 'অহঃ' বলিয়া ভাবাতিশয্যে তাহার দিকে অগ্রসর হয়! চোখের জলে তাহার গোলগাল কালো গাল দু'খানি ভাসিয়া গেল। মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে ক্ষুদ্র ফতাইপুর গ্রাম সঘন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে গুপি পোদ্দার সতরঞ্চির ধুলা তুলিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে মস্তকে ধারণ করিল, মহেশ দাসকে বলিল, "ধন্যি ভাই, বাপের ছেরাদ্দটা তুমিই কল্লে। আমরা মিথ্যে মনিষ্যি হয়ে জন্মেছি।"

কিন্তু শ্রাদ্ধ শেষ করিতে মহেশ দাসকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। তাহার ধান, গোলা, গরু বাছুর যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিয়া শ্রাদ্ধের খরচ যাগাইতে হইয়াছিল। দুইখানি কুটীর ভিন্ন তাহার আর কিছুই সম্বল রহিল না। অবশেষে পৌষ মাসের একদিন রাত্রিকালে মহেশ দাসের প্রতিবেশী অঘোর দাসের গোয়াল ঘরে 'সাঁজালের আগুন লাগিয়া তাহার সেই কুটীর দুখানিও ব্রহ্মার কুক্ষিগত হইল!—মহেশ দাস পথে বসিল।

বিপন্ন মহেশ দাস তাহার মুরুব্বি জগবন্ধু দাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "জগ-দা, এখন করি কি ?—তোমার বুদ্ধিতেই ত আমি মারা গেলাম!"

জগবন্ধু দাস তখন তাহার খর্জ্জুর-পত্রাচ্ছাদিত 'বাইনে' বসিয়া প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড দুইখানি খোলায় খেজুরের রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতেছিল; এবং শতধাছিন্ন মলিন চাদর গলায় জড়াইয়া, ও তদ্দ্বারা কোনরূপে পিঠ ঢাকিয়া দুর্জ্জয়শীত-কম্পিত পল্লীবালকদল 'খোলা'র চারিদিকে বসিয়া বহ্নিসেবন করিতেছিল। কেহ কেহ বা শুষ্ক আশ্‌শ্যাওড়া ও ভাঁট বাকশের স্তূপ হইতে খড়ি টানিয়া প্রকাণ্ড চুলির মুখে নিক্ষেপ করিতেছিল। খোলার মধ্যে লোহিতাভ খর্জ্জুর রস টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল। অদূরবর্ত্তী ছাইগাদায় একটা খেঁকি কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া নিমীলিতনেত্রে শয়ন করিয়াছিল, এবং তাহার শাবক চতুষ্টয় জগবন্ধুর আস্তাকুঁড়ে দুই একটি উচ্ছিষ্ট অন্নের আশায় ব্যাকুল ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।—জগবন্ধু সবেমাত্র তাহার পেঁটে কল্‌কেটাতে একটু দা'কাটা তামাক সাজিয়া ধূমপানের আয়োজন করিয়া লইয়াছে,—এমন সময় মহেশ দাসের উদ্ভট প্রশ্ন শুনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল!—সে একখানি জ্বলন্ত খড়ি উনান হইতে টানিয়া তুলিয়া তাহার দুই এক টুকরা কলিকায় রাখিয়া মহেশ দাসকে বলিল, "আমার দোষ ত তুমি এখন দিবাই! এ কলিকালে কি নোকের ভাল কর্‌তে আছে? আমি কি তোমাকে বলেছিলাম—সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে তোমার বাপের ছেরাদ্দ কর?—না আমি তোমার ঘরে আগুন দিতে গিয়েছি? বাপের ছেরাদ্দ করলে, বাড়ীতে দশ ঠাকুরের পায়ের ধূলো পড়লো, কেত্তন দিলে; এ তল্লাটের নোক তোমার সুখ্যাৎ করতে লাগ্‌লো; আর এখন নিন্দে করে বেড়াচ্ছ আমার? আগুনে ত তোমার সবই যেত, তা আগুনে না পুড়ে—তোমার বাপের ছেরাদে গিয়েছে; সে ত তোমার বাপের ভাগ্যি—আমার দোষ দেও কেন?"

মহেশ দাস সবিনয়ে বলিল, "না, তোমার দোষ দিচ্ছি নে; তবে এখন কুতায় মাথা রাখি তাই পুছ করছি।—এ গাঁয়ে ত আমার মাথা রাখবার ঠাঁই নেই।"

জগবন্ধু তামাকে একটা উৎকট দম্ কষিয়া নাক মুখ দিয়া আগ্নেয়গিরির ধূম্রোদ্গীরণের ন্যায় ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "তুমি কি উপায় করবে, তা আমি কি করে বলি? তোমার মত আহাম্মুককে শলা-পরামর্শ দেওয়াও ঝকমারি!—গাছতলা তো আর কেউ নেয় নি। তোমার ভিটের যে তেঁতুল গাছটা আছে, তার 'ওতে' খেজুরপাতার খানদুই টাটি বেঁধে এখনকার মত থাক গিয়ে। তারপর তোমার পরিবারের হাতের খাড়ু দু'গাছা গাড়ীখানেক খড় কিনে একখানা কুঁড়ে তুলো—কেন পরাণ মণ্ডল কি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে?"

পরাণ মণ্ডল সম্বন্ধে মহেশ দাসের মামা-শ্বশুর; গৃহহীন হইয়া মহেশ দাস তাহার বাড়ীতেই আশ্রয় লইয়াছিল। পরাণ মণ্ডল ঘরামীর কাজ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বাড়ীতে তাহার দুইখানি মাত্র ঘর; তাহার সংসারে অনেকগুলি পরিবার, স্ত্রী, চারি পাঁচটি ছেলে মেয়ে, একটি ছোট ভাই, একটি বিধবা ভগিনী এবং বাতব্যাধিগ্রস্তা স্থাবর শাশুড়ী। দুইখানি ঘরে এতগুলি লোকের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন, তাহার উপর চক্ষুলজ্জার খাতিরে এই বিপন্ন পরিবারটিকে আশ্রয় দান করিয়া, সে বিষম বিপদে পড়িয়াছিল; সে মহেশকে সঙ্গে লইয়া কয়েকদিন জোগালেগিরিতে লাগাইয়া দেখিল মহেশ দাস এমনই অকর্ম্মণ্য যে, খড়ের আটিটি পর্য্যন্ত বাঁধিতে জানে না! তাহাকে দিয়া কোন কাজ পাওয়া যায় না দেখিয়া গৃহস্থেরা ঘরামীকে তিরস্কার করিত, কেহ কেহ বলিত, "এমন অকেজো জোগালে নিয়ে কাজে এসো না।—দুপুর গড়াতে না গড়াতে চার গণ্ডা পয়সা নিয়ে বাড়ী যাবে, চারিটি পয়সারও কাজ করতে পারবে না!"—প্রমাদ গণিয়া পরাণ মণ্ডল মহেশ দাসকে বলিয়াছিল, "তুমি বাপু নিজের পথ দেখ, আমি আর কতদিন তোমাকে পুষবো?"

কিন্তু কোনদিকে পথ দেখিতে না পাইয়া মহেশ দাস নিরুপায় হইয়া আজ তাহার মুরব্বি জগবন্ধু দাসের নিকট সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। জগবন্ধু তাহাকে গাছের তলা দেখাইয়া দিল!

এ পরামর্শটা মহেশ দাসের ভাল লাগল না। সে বলিল, "পৌষমাসের এই হাড়ভাঙ্গা শীতে কুকুর মেকুরটা (বিড়াল) গাছতলায় থাকৃতে পারে না, তুমি আমাকে গাছতলায় আশ্রয় নিতে বলৃছো! আমরা নয় দুটোতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে থাকলাম; গৌরী আমার দু'বছরের মেয়ে, সে যে হিমে মারা যাবে।"

জগবন্ধু বিরক্ত ভরে বলিল, "তা এখন রাজ অট্টালিকে কুতায় পাবে? আমার বলে, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করকে ডাকে!—আমি নিজের ভাবনায় পথ দেখতে পাইনে, তোমাকে কি পথ দেখাব বল?"

[৪]

মহেশ দাস নিরুপায় হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সেখান হইতে উঠিল। আজ পৃথিবী তাহার নিকট অন্ধকার। দুর্ভাগ্যের ফুৎকারে যেন জীবনের সকল আলোক নিভিয়া গিয়াছে। একদিন যাহারা তাহার সর্ব্বপ্রধান সুহৃদ

ও পরামর্শদাতা ছিল, তাহারা আজ তাহাকে দেখিয়া অবজ্ঞাভরে সরিয় যাইতেছে, কেহবা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিতেছে। তাহা পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যাহারা পরমাত্মীয় হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল দুর্দ্দিনের ঝটিকার তীব্র ফুৎকারে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মত তাহারা কোথা অদৃশ্য হইল!—

একখানি ছেঁড়া ন্যাকড়ায় গৌরীর সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া তাহাকে কোলে লইয়া গৌরীর মা পরাণ মণ্ডলের পাঁচিলের ধারে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, কিন্তু ভাবনার কুল কিনারা পাইতেছিল না! অবশেষে সে মলিন অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া মেয়েটাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। তখন বেলা হইয়াছিল, গ্রামের মজুরেরা নিজের নিজের কাজে গিয়াছিল; গরুর পাল লইয়া রাখালের দলও অনেকক্ষণ মাঠে চলিয়া গিয়াছে। পঁড়োরা মূলো, সিম বেগুন, সাদাআলু প্রভৃতি বড় বড় ঝোড়ায় বোঝাই করিয়া গ্রাম হইতে লক্ষীপুরের হাটের দিকে দৌড়াইতেছিল, এবং জেলেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্যাপলা জাল দিয়া অদূরবর্ত্তী দীঘির জলে চিংড়ি পুঁটি ট্যাংরা প্রভৃতি মাছ ধরিতেছিল।

মহেশ দাস মুখ ভার করিয়া স্ত্রীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরীর মা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে এলে? মামী ত আজ জবাব দিয়েছে; 'তুমি পথ দেখ বাছা! আমি আর কদিন তোমাকে পুষ্‌বো?'— চল আমরা এ গাঁ থেকে চলে যাই।"

মহেশ দাস হতাশভাবে বলিল; "কুতা যাবো? আমাদের যে মাথা গুজ্‌বার ঠাঁই নাই রে!'

গৌরীর মা বলিল, "আমাদের যে দু'খানা পেতল কাঁসার বাসন আছে তাই নিয়ে মায়ের কাছে যাই, তার কুঁড়েখানা ত আছে।"

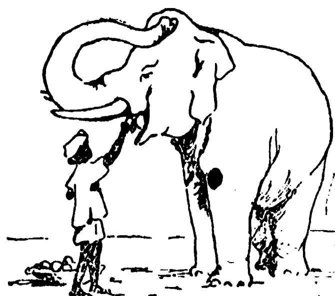
মহেশ দাস অগত্যা সেই যুক্তিই সঙ্গত মনে করিল। সেইদিনই সে সপরিবারে চিরজীবনের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল! তাহারা ফতাইপুরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী মবারকপুরে যাত্রা করিল। গৃহদাহের পর তাহাদের যে কিছু তৈজসপত্র বাঁচিয়াছিল, তাহা ও দুই এক খানি কাপড়-চোপড় লইয়া একটা বোঁচকা বাঁধিয়া, মহেশ দাস বোঁচকাটা মাথায় করিয়া চলিল; গৌরীর মা গৌরীকে কোলে লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। তখন বেলা প্রায় দশটা। গ্রামের ভিতর দিয়া কিছুদূর যাইয়া তাহারা মাঠে পড়িবে, এমন সময়

গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী কলুপাড়ার পথে আসিয়া মহেশদাস শুনিতে পাইল—কলুবাড়ীতে তখনও বেহুলা'র গান চলিতেছে। কলুবাড়ীর প্রাঙ্গণে একখানি জীর্ণ সামিয়ানার নীচে গ্রামের অনেক চাষা দলবদ্ধ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে গান শুনিতেছে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর বেহুলার পালা আরম্ভ হইয়াছে, এত বেলা পর্য্যন্ত তাহাদের বিরাম বিশ্রাম নাই। ঢোলক ও খঞ্জনী বাজিতেছে, গান গাইতে গাইতে গায়কদের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পৌষের দারুণ হিমে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহাদের চোখ বসিয়া গিয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তখনও স্ত্রী-বেশে সজ্জিত একটা চাষা হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া যে গান গায়িতেছে, দশ বারজন গায়ক তাহারই আবৃত্তি করিয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া মাথা নাড়িয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক সমস্বরে বলিতেছে—

"ও হাটে যেওনা বেউলো, বেউলো আমার মা!
চাঁদের ব্যাটা দুস্‌মন নখা দেখ্‌লে ছাড়বে না।

এই চিরপরিচিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মহেশ দাস চলিতে চলিতে পথপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল, তাহার পা আর চলিতে চাহিল না! গৌরীর মা পশ্চাৎ হইতে বলিল, "হাঁ করে ও কি শুন্‌চো! তিন তিন কোশ পথ যেতে হবে, তা মনে আছে? এই কাল বেউলোর গানেই তোমাকে খেয়েছে!"

মহেশ দাস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তা কি করে বুঝিবি, তুই মাগী! চল; এমন গাঁয়ের মায়া কাটাতে আমার বুক খানা চড়চড়িয়ে ফেটে যাচ্ছে।"—দুই বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিয়া মহেশ দাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। হায় মা পল্লী জননী, যে গৃহহীন অনাথ তোমার আশ্রয় বঞ্চিত, তোমার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে তাহারও হৃদয় বিদীর্ণ হয়!



শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিশ্বনাথ

[১]

সহরের এক কোণায় জঙ্গলে ঘেরা বিশ্বনাথের মন্দির। অনেক লোক সেখানে আসিয়া পূজা পৌঁছাইয়া যায়। মাঝে মাঝে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া সেখানে কুণ্ড জ্বালাইয়া বসেন। আশে পাশে গৃহস্থ কয়েক ঘর আছে; কিন্তু মন্দিরের স্থায়ী বাসিন্দা এক পূজারীর পরিবার—আর একটি পাগল।

পাগল—সে একলা একটা অশ্বত্থগাছের তলায় পড়িয়া থাকে, আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি বকে, আপন মনে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। পরনে তার শুধু ছোট একখানা দারুণ ময়লা কাপড়, কোনও মতে কোমরে জড়ান। তাও সে সব সময় পরিয়া থাকা আবশ্যক বোধ করে না; আর পরিলেও সেই ছেঁড়া কাপড়ে ঠাট বজায় থাক বা না থাক, লজ্জা নিবারণ হয় না।

পাগলের একদিকে জ্ঞান টনটনে। বিশ্বনাথের বাড়ীর পাগল, অনেকে তাকে বাবার অবতার বলিয়া এক আধটুক মানে। তাই তারা পূজার সঙ্গে সঙ্গে পাগলকেও কলাটা মূলাটা দিয়া যায়। তা ছাড়া পাগল দিনের বেলা এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া চাল ডাল যা পায়, তাতে তার দিন গুজরান বেশ হয়। সে আর যাই করুক, তার সমস্ত দিনের ঘোরা ফেরার পর তার সেই গাছতলায় বসিয়া রান্নাটা করা চাই-ই। দিনের বেলায় সে যেখানেই যা খাইয়া বেড়াক, রাত্রে তাঁর নিজে রাঁধিয়া খাইতেই হইবে। সে রান্নার জোগাড় না হইলে সে উদ্দাম হইয়া উঠিত। রাঁধিয়া বাড়িয়া সে এমন ভাব করিয়া বসিয়া খাইত—যেন সে রাজা কি বাদশা।

পাগলের নাম কেহ জানিত না, সবাই তাহাকে বলিত বিশ্বনাথ। সে ছিল ছেলেদের মহা আনন্দের খনি; পাশের গৃহস্থ বাড়ীর ছেলেপিলে তাহাকে একরকম সারাদিন ঘিরিয়া বেড়াইত, তাহাকে ক্ষেপাইত, তার রঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া গড়াইত। সাধারণতঃ পাগল ছিল খোস-মেজাজের লোক। সে

াচিত, গাইত, আর ছেলেমেয়েদের হাসাইত। হাসাইয়া সে হাসিতে যোগ দিয়া আনন্দে গড়াগড়ি যাইত।

সে দিন সে বিশ্বনাথের বাড়ীর আঙ্গিনায় হঠাৎ আনন্দে নাচিয়া গাইতে লাগিল। ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া আনন্দে হাততালি দিতে লাগিল; তাকে নানারকম ফরমায়েস করিতে লাগিল। পাগল পরম আনন্দে ফরমায়েস তামিল করিয়া নানারকম অদ্ভুত সঙ্গতিবিহীন গান গাইতে লাগিল; আর নানারকম নাচের মহলা দিতে লাগিল। খোঁড়া কুকুরের নাচ, বেঙের নাচ, খেঁকশেয়ালির নাচ প্রভৃতির সে অদ্ভুত রকমের নমুনা দেখাইয়া সকলকে হাসাইল; আর সেই হাসির গর্‌রায় যোগ দিয়া মাটিতে পড়িয়া হাসিতে হাসিতে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল।

তখন ঠিক দুপুর বেলা, রাজ্যের লোক পূজা দিতে আসিয়াছে। তা ছাড়া পাড়ার ছেলেরা তো পাগলকে ঘিরিয়া আছেই। একটা প্রকাণ্ড মজলিস বসিয়া গেল। হাসির উপর হাসির তরঙ্গ উঠিয়া গেল।

তার পর পাগলের খেয়াল হইল বাইনাচ দেখাইবার। চট করিয়া পরনের কাপড়খানা খুলিয়া সে ওড়নার মত করিয়া হাতে ধরিয়া বাইনাচের নমুনা দেখাইতে লাগিল। রমণীরা মুখ ফিরাইলেন; পুরুষেরা ইতস্তত: চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। ছেলের দল পরম আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল।

ঠাকুরের সেবাইত মহাশয় বেশীর ভাগ সহরেই বাস করিতেন; কিন্তু আজ আসিয়াছিলেন একটা উৎসবের দিন বলিয়া। তিনি পাগলের নৃত্য দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর মোটা লাঠিখানা দিয়া খুব কসিয়া দুই চার ঘা লাগাইয়া পাগলকে কাপড় পরিবার আদেশ দিলেন। পাগল চীৎকার করিয়া কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে ছুটিল। তার অশ্বত্থতলায় গিয়া সে অনেকক্ষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

[২]

পাগলের নাচ দেখিতেছিল আর একজন, পূজারীর ঘরের একটা জানালায় দাঁড়াইয়া—সে পূজারীর মেয়ে সরমা! সবাই যখন হাসিয়া লুটাইতেছিল, তখন সরমার দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সরমা ছিল বিধবা, বয়স বছর কুড়ি বাইশ। চলনসই রকম সুন্দরী;

কিন্তু যৌবনের ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। তার যৌবনের ভিতরে আবেগ ছিল না, চঞ্চলতা ছিল না। সে ছিল পরম শুদ্ধাচারিণী। বিশ্বনাথের সেবা-পূজায় সে আপনাকে নিঃশেষে নিয়োজিত করিয়াছিল।

বিশ্বনাথের সেবাইৎ মহাশয় প্রায় মন্দিরে থাকিতেন না। পূজারীর লাভের দিকে যতটা নজর, পূজার সৌষ্ঠবের দিকে ততটা আগ্রহ নাই। তবু এক সরমার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যে বিগ্রহের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা পূজা যে রকম সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইত, অনেক মন্দিরে তেমন হয় না।

সরমা ঘর ও মন্দিরের বাহিরে কখনও পা দেয় না। বাহিরের লোকের সঙ্গে তার কোনও সংশ্রব নাই। তার জীবনের একমাত্র আনন্দ ও একমাত্র কর্ত্তব্য বিশ্বনাথের সেবা ও পিতার সেবা।

আর ছিল তার এক ভার—এই পাগল। সে রোজ পাগলকে প্রকাশ্যে হউক, গোপনে হউক খাইতে দিত। সরমার সংক্ষিপ্ত সুযোগ ও অবসরে যতদূর পারিত, সে পাগলের সেবা করিয়া তার নিঃসঙ্গ অসম্বদ্ধ জীবনের দুঃখ কষ্ট দূর করিত।

এ পাগলের জন্য তার দুঃখ ও চিন্তার অবধি ছিল না। শীতের রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে ভাবিত, পাগল এখন একা এই শীতে গাছের তলায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে। অমনি তার আরাম ঘুচিয়া যাইত, ঘুম ছুটিয়া যাইত। প্রায় সে একটা লোক পাঠাইয়া দিত পাগলের কাছে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিতে। আবার তাতেও তার স্বস্তি ছিল না। সে ভাবিয়া মরিত বুঝি বা পাগল সেই আগুনে হাত পা পোড়াইয়া কষ্ট পাইতেছে। সরমার নিজের জীবনে তার সুখের কিছু প্রাচুর্য্য ছিল না; কিন্তু এমনি করিয়া দিনরাত পাগলের দুঃখের কথা ভাবিয়া তার জীবনটা আরও দুঃখে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছিল।

সরমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ হইত এই ভাবিয়া, যে, এ হতভাগ্য নিজের দুরদৃষ্টের কথা কিছুই বোঝে না। এত দুঃখ তার, তবু সে আনন্দে অধীর——এ কথা ভাবিতে সরমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইত। ভগবান পাগলকে সব সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে তার বুঝিবার শক্তি হরণ করিয়াছেন, এইটাই তার সব চেয়ে বেশী দুঃখ বলিয়া সরমা মনে করিত। তাই সবাই পাগলের নৃত্য গীত শুনিয়া হাসিত, সরমা তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া সারা হইত।

কাজেই পাগলের যে সব কাণ্ড দেখিয়া মন্দির-ভরা লোক হাসিয়া আকুল

হইতেছিল, সরমা তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছিল। জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একদৃষ্টে পাগলের অসুন্দর মলাময় মুখের দিকে চাহিয়া তাই সে চোখের জল মুছিতেছিল।

পাগলের যে দুঃখ তা সরমা যত বুঝে আর কে তত বুঝিবে। তার বুকের ভিতর পাগলের ব্যথা যে মেরুর তুষার-পর্বতের মত জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল।

সে তো বেশী দিনের কথা নয়, যখন সরমা আনন্দে উৎফুল্ল হৃদয়ে শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে কি এক স্বপ্নপুরীর ভিতর আনন্দ-ধারায় নিরন্তর স্নাত হইয়া বাস করিয়াছিল মাত্র একটি বৎসর। তারপর—সে কি দারুণ অন্ধকার। কি বুকভাঙ্গা তার বেদনা। যে স্বামীর মুখে চাহিয়া তার এত আনন্দ, যার আদরে সে রাজরাণী, সেই স্বামী তার পাগল হইয়া গেলেন। তারপর দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ দুইবৎসর সে পাগল স্বামীর সেবা করিয়াছে। অশ্রুজলে ভাসিয়া, মার খাইয়া, তাড়া খাইয়া সে ছায়ার মত পাগল স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তার শুশ্রূষা করিয়াছে। তারপর পাঁচ বছর সেই পাগল স্বামীর ধ্যান করিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছে! পাগলের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিবে না ত কি?

যখন সেবাইৎ নির্দ্দয় প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া পাগলকে তাড়াইয়া দিলেন তখন অসহায় সরমা সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তার পর যতক্ষণ পাগল আর্ত্তনাদ করিল, ততক্ষণ সে বলির পশুর মত ধড়ফড় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর মন্দিরের গোলমাল অনেকটা শান্ত হইলে, সরমা ধীরে ধীরে সসঙ্কোচে গেল সেই গাছতলায় পাগলের কাছে। সে সঙ্গে লইল একখানা কাপড় আর কিছু খাবার। পাগল তখন একলা পড়িয়া ছিল; আর আপন মনে কি বিড় বিড় করিতেছিল ও মাঝে মাঝে হাসিতেছিল কিন্তু সে অসাধারণরূপে শান্ত, মাঝে মাঝে তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—যেন মাঝে মাঝে কি সব কথা তার মনে আসিতেছে, অথচ সে ভাল করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। পাগল তার নেকড়াখানা পরিয়াই ছিল, কিন্তু তাহাতে তার লজ্জানিবারণ হয় নাই। সরমা সঙ্কুচিত হইল; কিন্তু পাগলের সেবা করা তার অভ্যাস আছে,—সে সঙ্কোচ জয় করিল।

কাপড়খানা পাগলকে দিয়া সে বলিল, "ক্ষেপু, কাপড়খানা পর।"

এ নারীর সদয় ব্যবহারে পাগল চিরদিনই তার কথার বশ। সে হাত পাতিয়া কাপড়খানা লইয়া পরিল। পুরা দশ হাত সে কাপড়—সে সামলাইতে পারিল না, কোনও মতে কোমরে জড়াইল মাত্র। সরমা কিছুক্ষণ মুখ

ফিরাইয়াছিল, ফিরিয়া দেখিল পাগল ভাল করিয়া কাপড় পরিতে পারে নাই। তখন সে সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া নিজেই ভাল করিয়া তাহাকে কাপড় পরাইয়া দিল; আর একটা দড়ি দিয়া সে এমন করিয়া কাপড় আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল, যাহাতে সে সহসা তাহা খুলিতে না পারে।

পাগল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

তার পর সরমা তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সুস্থির করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তার আঁচলে চক্ষু মুছিল।

[৩]

পাগল হাঁ করিয়া সরমার দিকে চাহিয়া রহিল। আজ তার মনের ভিতর একটা ভীষণ গোলমাল লাগিয়া গিয়াছে। একদিন তার মনের ভিতর সব কথা এলোমেলো হইয়া আসিত; কিন্তু এলোমেলো বলিয়া তার কিছু মনে হয় নাই। সে যখন যে কথাটা ভাবিত তাই বলিত, সেই অনুসারে কাজ করিয়া যাইত; একটা চিন্তার সঙ্গে আর একটা মিশাইবার চেষ্টা করিত না বা তার অসঙ্গতি লক্ষ্য করিত না। আজও তার মনে অনেক কথা এলোমেলো ভাবে আসিতেছে, কিন্তু তার মনে হইতেছে যে, যেন কথাগুলো এলোমেলো। সে একটু চেষ্টা করিতেছে তার ভাবনা চিন্তাগুলিকে গুছাইবার।

সরমা যতক্ষণ তার কাছে ছিল ততক্ষণ তার কোনও এলোমেলো কথা মাথায় আসে নাই। সে একাগ্রচিত্তে সরমাকে দেখিতেছিল, তার সেবা গ্রহণ করিতেছিল—আর কিছুই ভাবিতেছিল না। কেবল যখন সরমা তাহাকে কাপড় পরাইতে লাগিল, তখন সে একটু লজ্জা অনুভব করিয়াছিল।

সরমা চলিয়া গেল। তখন সে তার দিকে চাহিয়া রহিল, আর ভাবিতে লাগিল। তার মনে হইল সরমা সুন্দরী, সরমা স্নেহময়ী, দয়াময়ী। সরমার প্রতি তার মন স্নেহে প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া গেল। তার ইচ্ছা হইল, সে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তার লজ্জা বোধ হইল।

সরমার চিন্তা আশ্রয় করিয়া তার অনেক দিনের হারান বুদ্ধি ধীরে ধীরে উষার আলোকের মত তার চিত্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেক কথা তার একে একে মনে হইল। সে তো এখানকার নয়। অনেব

দিন আগে সে এখানে আসিয়াছে; কেমন করিয়া সে আসিয়াছে তা' তা'র মনে নাই, তবে মনে পড়ে এক সাধুর সঙ্গে সে আসিয়াছিল। তার আগে সে যেখানে ছিল, সে স্থান অনেক দূরে।

পাগল যে কোথাকার কে তাহা কেহ জানিত না। একদিন এক সাধু তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সাধু তাহাকে পীড়িত অবস্থায় পথে কুড়াইয়া পাইয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করেন। তার পর সে সাধুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরিয়া শেষে এই মন্দিরে আসিয়া থাকিয়া যায়।

সে ছিল এক গরীব ভদ্রপরিবারের একমাত্র সন্তান, বিধবা মায়ের ভবিষ্যতের আশা-প্রদীপ—সে কলেজে পড়িত; ভাল ছেলে বলিয়া তার প্রতিপত্তি ছিল, দুঃখিনী মা তাকে আশ্রয় করিয়া কত না আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছিলেন। একদিন সে পাগল হইয়া ঘরে ফিরিল। মা তার চোখের জলে ভাসিয়া পাগল ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু রাখিতে পারিলেন না। বারে বারে সে উধাও হইয়া বাহির হইয়া যায়, অনেক সন্ধানে তাহাকে তিনি ধরিয়া আনেন। এমনি করিতে করিতে একদিন সে যে কোথায় গেল, কেহ তার সন্ধান দিতে পারিল না।

আজ পাগলের মনে পড়িল তার সেই মায়ের কথা। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, মার কাছে যাইবার জন্য সে ছট্ ফট্ করিয়া উঠিল। কিন্তু কেমন করিয়া সে যাইবে? সে যে অনেক দূর, তার সম্বল কই? এখানে তার বন্ধু কে আছে?

ভাবিতে ভাবিতে পাগল সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন দারুণ শীতে সে তার কাপড়খানা গায়ে জড়াইয়া ঘুমাইতেছিল। শীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাগল দেখিল, সরমা বসিয়া একটা কাঠের কুঁদায় আগুন জ্বালিবার চেষ্টা করিতেছে। খড়ের আগুন করিয়া সে তার উপর কতকগুলি কাঠ চাপাইয়া ফুঁ দিতেছে।

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া পাগল দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিতে ফুৎকার দিতে তার উজ্জ্বল জ্যোতিতে সরমার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, ধোঁয়ায় তার চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিতেছিল; দেখিতে বড় সুন্দর; পাগল বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া পড়িয়া রহিল, সে যে জাগিয়াছে তার কোনও সাড়া সে দিল না।

অনেকক্ষণ চেষ্টা ও যত্নের পর আধপোড়া কুঁদাটা জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে

আগুনের শিখাটাও বেশ উঁচু হইয়া উঠিল। সরমা হাঁটু গাড়িয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিয়া যাইবার আগে পাগলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—আর কি করিয়া তার আরামের আয়োজন করা যায়, তাই সে ভাবিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল পাগল ঘুমায় নাই, তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! চমক লাগিয়া সরমার সমস্ত শরীর যেন আঁকিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় টানিয়া দিয়া এক পায় দু'পায়ে সরিয়া যাইতে লাগিল।

পাগল উঠিয়া বলিল, "দয়া করে যদি এসেছ দেবী, তবে যেও না, একটু ব'স।"

হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরমার সর্ব্বশরীর কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল, সে পিছন ফিরিয়া ছুটিল। পাগল উঠিয়া তার পিছু পিছু ছুটিল।

পাগল বলিল, "দাঁড়াও, ভয় নাই, আমার দুটো কথা না শুনে যেও না—আমার কথা না শুনে তুমি যেতে পারবে না।"

সরমা ছুটিল।—তার বুকের ভিতর হিম হইয়া গেল—সে যত ছুটিতে চায় ততই তার পা যেন ভারী হইয়া যায়। কয়েক পা যাইতে না যাইতে পাগল তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

"মা গো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া সরমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পাগল দুই হাত বাড়াইয়া তাকে ধরিয়া ফেলিল।

এক মুহূর্ত্ত কপালে হাত দিয়া পাগল সরমার মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিল। তারপর সে অত্যন্ত যত্নের সহিত সরমাকে কোলে করিয়া তার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। ঘরের সম্মুখের দাওয়ায় সে সরমাকে শোয়াইয়া দিল। তার পর সে পূজারীকে ডাকিতে চলিল; কিন্তু সরমার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া সে নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইল।

আড়াল হইতে সে দেখিল, জ্ঞানলাভ করিয়া সরমা উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল। তারপর ছুটিয়া সে ঘরে পলাইয়া দুয়ারে খিল দিল।

পাগল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তার সেই গাছতলায় সেই জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ডের পাশে ফিরিয়া গেল। রাজ্যের ভাবনা সে ভাবিল না। তার সমস্ত ব্যর্থ জীবনের ব্যথার উপর তার আজকার সহসা ব্যর্থ প্রেমের বেদনা তাহার হৃদয় চুর চুর করিয়া দিল! কি অশুভক্ষণে তার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে! কি পাপ ভালবাসা তার মনে জাগিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ সে করিতে বসিয়াছিল! এই যে নারী তার নিঃসঙ্গ জীবনে দয়া দিয়া সেবা দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে, তাকে

সে একটা বীভৎসভাবে প্রেম নিবেদন করিতে গিয়া কি যাতনা দিয়াছে! হায়, কেন তার জ্ঞান হইল! কেন তার সঙ্গে সঙ্গে এমন দুর্ম্মতি তার কাঁধে ভর করিল!

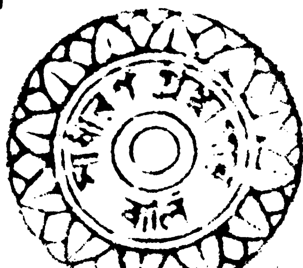
তার স্নেহময়ী সেবাময়ী দেবী স্বরূপিনী শুশ্রূষাকারিণীকে আর সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে?

* * * *

পরের দিন সকলে দেখিল পাগলের দেহ সেই অশ্বথ গাছের ডালে ঝুলিতেছে! তার পরণে সেই পুরাতন মলিন বসন, গলায় বাঁধা সরমার দেওয়া সেই কাপড়খানা।

সবাই দেখিয়া আহা উহু করিল। সরমা মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল—হায়, সেই যে কাপড়খানা দিয়া পাগলকে মারিবার উপায় করিয়া দিয়াছে!





শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দিনের আলোয়

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

পাড়ার বুকে মস্ত বস্তী...ক ঘর গরীব গৃহস্থের বাস। কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাট সেখানে এখনো চোকে নাই! খাওয়া-দাওয়া, ঘর ধোওয়া, বাসন মাজার সঙ্গে সঙ্গে বেদনার কত কাহিনী, কলহের কত সাড়া জাগিয়া উঠিতেছে! বস্তীর গায়ে মস্ত তেতলা বাড়ী। সে-বাড়ীর বৈঠকখানায় বাজনার সুরে গান চলিয়াছে—

তুমি কোন্ কাননের ফুল
তুমি কোন্ গগনের তারা......

ভাগ্যে ঐ বাড়ীটায় অমনি আলো-গানের সমারোহ চলে...নহিলে সারাদিন দুঃখ-ধন্দা করিয়া শ্রান্তিজর্জ্জর এই বস্তীর লোকগুলা চারিদিককার সুগভী নৈরাশ্যের মাঝে বুঝি দম বন্ধ হইয়াই মারা যাইত! ঐ আলো আর গানে সুরে কোন্ স্বপ্নলোকের কুহক-মাধুরীর স্পর্শ যে তারা পায়!

ঘণ্টাখানেক পরে ওদিককার গানের সঙ্গে বস্তীর সাড়াশব্দও দীপের ম নিব-নিব হইয়া আসিল। দু'একটা বেদনার গুঞ্জন বা শিশুর কান্না থাকিয়া-থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী বিপর্য্যয় শব্দে চারিদিককার স্তব্ধ সুষুপ্তির গায়ে ভারী রকমের আঁচড় টানিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে...

বস্তীর এক জীর্ণ ঘরের কোণে আঁচল পাতিয়া ঘরের তরুণী বধূ মূর্চ্ছিত মতো পড়িয়া আছে। মাটীর দীপ...তৈলের অভাবে তার জ্বলা শেষ করিয় কখন্ নিবিয়া গিয়াছে। একধারে ছোট কাঁশি-ঢাকা খাবার। বধূ তার প্রহরা বসিয়া থাকিয়া ঘুমে ঢুলিয়া মেঝেয় কখন গড়াইয়া পড়িয়াছে! মুখে-চোখে বেদনায় করুণ আভাস তার তরুণ রূপশ্রীকে এমন ম্লানিমায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে দেখিলে শ্রাবণের মেঘ-ভরা পূর্ণিমা-রাত্রির কথাই মনে পড়ে

ঘরের বাহিরে জুতার দুপ্-দাপ্ শব্দ হইল এবং সবলে দ্বার ঠেলিয়া দৈত্যে মত একটা পুরুষ ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই ডাকিল—বকুল... কণ্ঠের স্বর যেম কর্কশ, তেমনি তাহাতে ঝাঁজ!

বধূ ধড়মড়িয়া উঠিয়া আঁচল গায়ে জড়াইয়া বসিল। পুরুষ হাঁকিল,— ঘর অন্ধকার! দিব্যি আরাম করে ঘুমোচ্ছিস্…এ্যাঁ…

অপ্রতিভ হইয়া বধূ চাহিয়া দেখে, দীপ নিভিয়া গিয়াছে। উপায়? ঘরে একটিও দিয়াশলাই নাই! ওদিকে ওরাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বধূ কাঠ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পুরুষ কহিল,—দাঁড়িয়ে রইলি যে…কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বকুলের হাত ধরিয়া সে প্রবল ঝাঁকানি দিল। সে ঝাঁকানি বধূ সহিতে পারিল না; একধারে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

পুরুষ বলিল,—আলো জ্বালো দয়া করে! খেতে-দেতে হবে আমায়।

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বধূ কহিল,—দেশলাই নেই। পিদিম নিবে গেছে!

—এই নাও দেশলাই—বলিয়া পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই বাহির করিয়া সে বধূর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল! বধূ দিয়াশলাই লইয়া দীপ জ্বালাইতে গিয়া দেখে, দীপে তেল নাই, দীপের বুকটা অবধি পুড়িয়া গিয়াছে। পলিতা-পোড়া ছাই বিদ্রূপের হাসির মত দীপের বুকের উপর! সে শিহরিয়া উঠিল।

পুরুষ কহিল,—নবাব-নন্দিনী তবু দাঁড়িয়ে রইলেন!

বধূ কহিল,—তেল নেই।

একে প্রমত্ত অবস্থা, তায় মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার আনন্দ ও নেশার রেশ তখনো প্রাণ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই! ভাবিয়াছিল, ঘরে ফিরিয়া মুখে কিছু আহার গুঁজিয়া বিছানায় দেহ-ভার গড়াইয়া আরামে ঘুমাইবে, কিন্তু এ কি দুর্গ্রহ!

বধূর হাত দুইটা সবলে ধরিয়া দেওয়ালে তার মাথা ঠুকিয়া দিয়া মনের ঝাল সে কতক মিটাইল; তবু বধূ কাঠের পুতুলের মত নিৰ্জ্জীব দাঁড়াইয়া আছে! রাগ চড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর হইতে যে তরল সুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছে, সে-সুধা তখন তার কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে! বধূর অঙ্গে প্রহারের জ্বালা সবলে বর্ষিত হইল! পড়িয়া মার খাইবে, তবু আলো জ্বালিয়া স্বামীর পরিচর্য্যায় মন দিবে না? ভালো আপদ! বধূর ঘাড় ধরিয়া পুরুষ-স্বামী তখন তাকে বাড়ীর বাহির করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল; সঙ্গে সঙ্গে সগর্জ্জনে জানাইল,—যেখানে খুশী চলে যা…পা আছে, সামনে মস্ত পথ। এখানে আর ঠাঁই হবে না! স্বামীর মান রাখতে জানো না?

ঝড়ের নির্ম্মম আঘাতে তরুণ গাছ যেমন মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, বধূ তেমনি পথের মাঝে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

……কতক্ষণ…… !

সহসা চেতনা পাইয়া বধূ উঠিয়া দেখে, নির্জ্জন পথ। একটু দূরে বড় রাস্তায় মোটরের ভেঁপু মাঝে মাঝে বাজিয়া যাইতেছে, তার পর চুপ-চাপ! ঐ সেই তেতলা বাড়ীটা…উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে! পথে গ্যাসের আলো· নির্ব্বাক নেত্রে যেন তারি দুঃখ দেখিতেছে! বধূ উঠিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল…এক বার, দুই বার, অনেক বার! ভিতর হইতে কাহারো সাড়া নাই! তখন নৈরাশ্য আর নিরুপায়তার কঠিন বাঁধন তাকে এমন করিয়া বাঁধিল যে তার চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

বধূ ভাবিল, নিত্য এ অত্যাচার, লাঞ্ছনাও তো আর সহা যায় না! কেন? কি তার অপরাধ? মার কোল ছাড়িয়া একা এই ঘরে কিসের আশায় সে পড়িয়া আছে? স্বামী! একটি দিনের জন্য এতটুকু আদর বা একটা মিষ্ট কথাও তো দেয় নাই! কেবলি পীড়ন! কায়-মনে এই সেবা, এই পরিচর্য্যা সে করিয়া আসিতেছে—কলের মত কাজ চলিয়াছে, কোনো-কিছুর প্রত্যাশাও সে রাখে না! শুধু একটু আশ্রয়, ঐ জীর্ণ ঘরের কোণে এত বড় বাহিরের অজানা রহস্যের অন্তরালে নিরাপদ জানা কোনটুকু…তাহা হইতেও আজ বঞ্চিত করিলে, পুরুষ! এ জীবন কেনই বা রাখা?…মরণই উপায়!

বেদনাহত নারীত্বের রুদ্ধ অভিমান তার চিত্তে দোলা দিয়া সাড়া তুলিল, আর কেন বাঁচিয়া থাকা! মরাই উচিত! মরণের কোলে যা-কিছু আরাম! মরণেই মুক্তি!

কোনো দিকে না চাহিয়া সে তখন বুক বাঁধিয়া ঐ নির্জ্জন পথকেই সম্বল করিয়া চলিল! কিন্তু কি ভয়…সর্ব্বাঙ্গ ছম্ ছম্ করিতেছে! প্রতি পদক্ষেপে কে যেন দুই পা চাপিয়া ধরিতেছে!

একজন পথিক নিজের খেয়ালে গান ধরিয়া আসিতেছিল, এই দিকে! চলার ভঙ্গী দেখিয়া বধূ শিহরিয়া উঠিল! এ চলার ভঙ্গী তার খুব চেনা! সহজ মানুষ এমন চলা চলে না! পা টলিতেছে…গতি চপল, সারা পথটাকে এধার হইতে ওধার অবধি মাড়াইয়া চলিতেছে! ভয়ে সে একটা গ্যাস-পোষ্টের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, দুনিয়ার পথে মাতালগুলাকেই শুধু ছাড়িয়া দিয়াছ, ভগবান!

নিজেকে প্রাণপণে খাড়া রাখিয়া মাতাল-পথিক কাছে আসিয়া থমকিয়া

াড়াইল, খুব মনোযোগী দৃষ্টিতে বধূকে লক্ষ্য করিয়া তারপর কহিল,—কে বাবা, ।ই রাত্রে ভয় দেখাতে পথে বেরিয়েচো!

লজ্জায়, ভয়ে বধূ যেন মরিয়া গেল! সে আপনার ভীত কুণ্ঠিত দেহলতাটিকে থাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া গ্যাস-পোষ্টটাকে নিরাপদ দুর্গের মত আঁকড়াইয়া রিল।

মাতাল আগাইয়া আসিল; তার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল—বধূর চোখের ।সহায়তার কি আর্ত্ত বেদনা, কি মিনতি ফুটিয়া উঠিল! মাতালের তা দৃষ্টি ।ড়াইল না!

মাতাল বলিল—কাদের মেয়ে তুমি, বাছা?

এ স্বরে কতখানি দরদ! বধূ কাঁদিয়া জানাইল, সে অতি-অসহায়…এত- ড় বিশ্বে তার গৃহ নাই, কেহ নাই।

মাতাল কহিল—এত রাত্রে পথে বেরিয়েচো, বাছা! বিপদে পড়বে যে!

বধূ তার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। মাতাল কহিল,—কোথায় ঘর? ।মায় বলো তো মা।

মা। এ সম্বোধনে কি আশ্বাস! বকুলের বেদনার্ত্ত চিত্তে যেন এক ঝলক ন্নিগ্ধ হাওয়ার পরশ লাগিল!

বধূ কহিল—বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দেছে…সে পাগলের মত ।াদিয়া উঠিল।

মাতাল কহিল—কে এত বড় হতভাগা…বলো তো মা? স্বামী? আমি ।কবার দেখচি তাকে।

সর্ব্বনাশ! তার সঙ্গে পারিবার জো কি। বকুল তো জানে, কি প্রচণ্ড ক্তি তার দেহে! প্রহারের স্মৃতি তার সর্ব্বাঙ্গে জাগিয়া আছে…অহর্নিশি! ধূ চুপ করিয়া রহিল।

মাতাল কহিল—বেশ, আজ এতরাত্রে আর চেঁচামেচি করবো না। ।াল দেখা যাবে। তা আজ পথে থাকা তো চলবে না মা। আমার সঙ্গে ।সো…

বধূ যন্ত্র চালিতের মত মাতালের সঙ্গে চলিল। মাতাল নীরব; বধূর ্খেও কোনো কথা নাই। হঠাৎ মাতাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,— ।াইতো, আমার ঘরে আর কেউ নেই! আমি একা।…বলিয়া মাতাল থামিল, ।রক্ষণে কহিল—তাতে কি! তুই মা, আমি ছেলে—কি এসে যাবে! আর…

নিজের মনেই মাতাল বকিল,—আমি নীচের ঘরে থাক্‌বো'খন······মা আর ছেলে বৈ তো নয়!

ছোট্ট বাড়ীখানি। ভারী পরিপাটী···ছবির মত! আকাশে চাঁদের আলো ···কি আরাম ও-আলোয়···সব বেদনা ভুলাইয়া দেয়! সেই রুদ্ধ ঘরের আঁধার কোণে চাঁদের এই আলোর একটা বিন্দুও যদি ঝরিত কোনো দিন! পৃথিবীতে এত আলো ফোটে······বধূর তা জানা ছিল না! জানিত। কিন্তু সে কথা কবে ভুলিয়া গিয়াছে!

দ্বারে কুলুপ আঁটা ছিল। মাতাল চাবি খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, বলিল, —আয় মা। কোনো ভয় নেই!

ভয়! যে-ভয় বুকের ভিতর ভরিয়া ছিল...প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়ের কি সে বিভীষিকা!······

বধূকে লইয়া মাতাল দোতলায় উঠিল; একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া কহিল, ঐ বিছানা রয়েচে—ঐখানে শোও মা। কোনো ভয় নেই, আমি নীচেই শোবো। ভয় পেলে চেঁচিয়ে ডেকো মা, 'ছেলে' বলে! আমার নাম কান্তি। তবে বয়সে বড়, নেহাৎ কান্তি বলে ডাকতে যদি না পারো, তাই বলচি, ছেলে বলে ডেকো। কথাটা বলিয়া মাতাল প্রাণ খুলিয়া হাসিল!

বধূ তখনো কেমন নিস্পন্দ! ঘটনাগুলা ছায়ার মত মনের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল,···একি সব সত্য, না, স্বপ্ন!···

মাতাল নীচে নামিয়া গেল; একটু পরে ঠোঙায় খাবার লইয়া আবার উপরে আসিয়া দেখে, তরুণী তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, ঘরের সামনে ছোট বারান্দায় কাঠের মত! জ্যোৎস্নার আলো তার সারা অঙ্গে ঝরিয়া পড়িয়াছে! মুখখানি ম্লান! চোখে কি দৈন্য, কি ব্যথা যে ফুটিয়া আছে!

কান্তি কহিল,—দাঁড়িয়ে কেন মা—শোও'গে। তবে শুয়ে পড়বার আগে এইটুকু খেয়ে নাও। উপোসী থাকা ঠিক নয়, সধবা মানুষ! ভেবে কি করবে? সকাল হোক, আমি সব ঠিক করে দেবো। কোনো ভয় নেই।

এত আদর, এমন সহানুভূতি···এর অমর্য্যাদা করা চলে না! বধূ মুখে কিছু দিয়া ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বেদনায় শ্রান্তিতে সারা দেহ-মন কাতর, অবসন্ন! তাছাড়া আর ভাবাও যায় না! কি-বা ভাবিবে? ভাবিয়া কি কোনো উপায় মিলিবে? না, ভাবনার কোনো কূল-কিনারা আছে?

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া বধূ দেখে, খোলা জানালা দিয়া প্রথম

প্রভাতের স্নিগ্ধ মৃদু আলোর উচ্ছ্বাস বহিয়াছে! চাঁদের আলো? না, চাঁদ... ঐ আকাশের এক কোণে জ্যোতিহীন পাণ্ডু মলিন মুখে হতাশের মত বসিয়া আছে!...পথে লোক চলিতেছে। বকুল আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। ঐ সে বস্তী...এত কাছে? যে বস্তীতে তার ঘর...! ঐ উঠান।

বস্তীর একটু অংশ ঐ দেখা যাইতেছে। উঠানে কে ঝাঁট দিতেছে। ও? মধুর মা। বধূর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ঐ বস্তী, ঐ বস্তীর ঘর ..উহারি সঙ্গে তার এ-জন্মের যা-কিছু সম্পর্ক, যত পরিচয়! বেদনার লাঞ্ছনার সহস্র স্মৃতিতে ঘেরা ঐ ঘরই তার সব। এখানে দুঃখ ভুলিয়া একরাত্রি মাত্র বড় আরামে ঘুমাইয়া বাঁচিয়াছে! কিন্তু...

ঐ...বস্তীতে ধীরে ধীরে কোলাহল জাগিতেছে!...স্বামী? এই সকালে তাকে বকুল বৌ বলিয়া ডাকে। এমনি সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে ওঠে, উঠিয়া ঘর-দ্বার ঝাঁট দেয়, উনুনে আগুন দিয়া তাড়াতাড়ি কলে গিয়া দু'কলসী জল আনিয়া তারপর রান্না চাপাইয়া দেয়। স্বামী কলে কাজ করে। তার খোঁজ পড়িবে! সবাই বলিবে, কোথা গেল বকুল-বৌ? বাড়ীর সকলে সকালেই খাইয়া দাইয়া বাহির হয়! আজো বাহির হইবে। কিন্তু আজ তাকে রাঁধিয়া দিবে কে? নিত্যকার সেই ছোট-বড় কাজ..? আজ সে-সব পড়িয়া রহিল।

এখনি ছুটিয়া সে চলিয়া যাইবে?

বধূ দ্বার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঐ একটা ঘর...ঘরের সামনে আসিয়া দেখে, একটা তক্তাপোষে শয্যা বিছাইয়া কান্তি ঘুমাইতেছে! ডাকিয়া তাকে জাগাইবে? এই বেলা চলিয়া গেলেই ভালো হয়! এর বেশী বেলা বাড়িলে পাড়ার সকলে উঠিয়া পড়িবে! একটা কলরব উঠিবে, একজন অজানা পুরুষের সঙ্গে এই সকালে ফিরিতে দেখিলে সকলে যদি প্রশ্ন করে, রাত্রে কোথায় ছিলে... বধূর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মাথার ভিতর কেমন ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল! সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া সিঁড়ির উপর সে বসিয়া পড়িল।

কাল রাত্রে এখানে বিছানায় নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া সে ভাবিয়াছে, ভারী বাঁচিয়া গিয়াছে! একটা রাত্রির মস্ত আরাম! তখন ভাবে নাই এই একটি রাত্রি শেষ হইলে দিনের আলোয় কি নূতন শঙ্কা জাগিতে পারে! অপর একটা বাড়ীতে অজানা একজন পুরুষের আশ্রয়ে? সে যে নারী! নারীর শোচনীয়

অসহায়তা কতখানি, তা সে জানে! আরো জানে, কত বড় মন এই তার আশ্রয়-দাতার, কি দরাজ বুক! মানুষ এমন হয়, তা তার জানা ছিল না! কিন্তু স্বামী? বাড়ীর লোক...? তারা কি তা বুঝিবে? কে জানে! তারা জানে, নারী আর পুরুষ···মনের কোনো খোঁজ রাখেনা তারা! যদি কেহ এ কথা বিশ্বাস না করে?···তার গতি কি হইবে?

অত্যাচার পীড়ন,—একথা সে ভুলিয়া গেল। কাল রাত্রে মরণের পথ খুঁজিয়া মরিতেছিল, সে কথা মনেও পড়িল না! শুধু মনে জাগিতেছিল, এই নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় না লইয়া যদি ঐ ঘরের দ্বারে পথের উপরই পড়িয়া থাকিত···তাহা হইলে দিনের আলোর সঙ্গে এই যে ভয় আর লজ্জা সাপের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, তা তো দাঁড়াইতে পারিত না! সহস্র লোকের বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টি কাঁটার মত তার মনকে বিঁধিয়া ধরিতেছিল! একটি রাত্রির আড়ালে দিনের এই স্নিগ্ধ মৃদু আলোর উচ্ছ্বাসে এত কালি, এত লজ্জা মেশানো ছিল, ভগবান!···

নীচের ঘরে কান্তি অঘোরে ঘুমাইতেছে। বধূ রেলিং ধরিয়া সিঁড়ির উপর নিস্পন্দ বসিয়া! মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মত কি সব কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে ···দুই চোখে কে যেন জলের ঝর্ণা খুলিয়া দিয়াছে···আশ-পাশে পল্লীর ঘরে-ঘরে তখন দিনের কোলাহল তার নির্ম্মম-প্রসারতায় ফাঁপিয়া ফুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে!······





শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কালীপূজোর রাত্রি

জগন্নাথ সরকার হঠাৎ একেবারে সাহেব বনে গেল। একটু কারণও ছিল।

সে চাকরী করত ইংরেজটোলার এক বাঙালী-দোকানে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের চাকরী। সোমবার থেকে শনিবার অবধি দশটা-আটটা, আর রবিবার দোকান সাফ্ করবার নাম কোরে আধখানা দরজা খোলা হোতো। সেই ফাঁক দিয়ে একবার কোনো খদ্দের দোকানে ঢুক্‌লে তার আর সওদা না কোরে বেরুবার উপায় ছিল না।

জগন্নাথ ধুতি পাঞ্জাবী আর চটিজুতো পরেই কাজে যেত কিন্তু তার মনিব একদিন ডেকে বল্লেন—ওহে এবার থেকে তোমায় কোট প্যাণ্টলুন পরে আস্‌তে হবে। মেম সাহেবরা ধুতি পছন্দ করে না।

জগন্নাথ বল্লে—মশায় বাইশ টাকায় ধুতিরই খরচ কুলোয় না—

মনিব বল্লেন—তার জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না, সে বন্দোবস্ত করা যাবে।

পরের মাস থেকে জগন্নাথের ত্রিশ টাকা মাইনে হোয়ে গেল। কিন্তু মাস দুয়েক যেতে না যেতেই সে বুঝতে পার্‌লে যে, ত্রিশ টাকায় সাহেবীয়ানা আর বাঙালীয়ানা দুই একাধারে চালান মুস্কিল। ধোপার খরচ বিস্তর, তার ওপরে গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ ইত্যাদি নানারকমের বন্ধনে দেহকে বাঁধ্‌তেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়। ওদিকে আত্মা ও দেহের মধ্যে যে পৈতৃক বন্ধন বর্ত্তমান তা অটুট রাখা দায় হোয়ে ওঠে। অনেক ভেবে চিন্তে সে একদিন বুক ঠুকে মনিবকে বলে ফেল্লে—মশায় ত্রিশ টাকায় তো কিছুতেই কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

মনিব তার আস্পর্দ্ধার কথা শুনে গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন—ত্রিশ টাকার বেশী দিলে আমার কুলিয়ে ওঠা মুস্কিল।

অগত্যা এই দুই অকুলানের মধ্যে সামঞ্জস্য কোরে জগন্নাথ ধুতি চাদরের খরচটা কমিয়ে ফেল্লে। কর্ম্মস্থান থেকে বাড়ীতে ফিরে ফরসা পোষাক ছেড়ে দিয়ে সে ময়লা ইজার কোট পর্‌ত। সেই পোষাকেই আড্ডা দিতে

বেরুত; এমন কি বাজার করা, স্নান করা, শোয়া সবই সেই পোষাকেই চলত।

বন্ধু-বান্ধবেরা জগন্নাথের হঠাৎ এই হাল-চালের পরিবর্ত্তন দেখে বলত—জগা ছোঁড়া একেবারে সাহেব বনে গেল।

বন্ধুদের মন্তব্য শুনে জগন্নাথ কায়দা কোরে বাঁকাভাবে বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলত—ড্যাম্ ইট্—।

তার ইংরেজী উচ্চারণের কায়দা দেখে আড্ডাধারীদের বুক গর্ব্বে ফুলে উঠ্ত। তারা ভাবত, তবু যা হোক্, আমাদের মধ্যে অন্ততঃ একটাও লায়েক হোলো।

সেবার দুর্গাপূজা পড়েছিল কার্ত্তিকমাসে। পূজোতে জগন্নাথের ছুটি নেই। সে সময় দেশী খদ্দেরের ভিড় বেশী, আর সাহেবরা নাকি পূজোর সময় দোকান বন্ধ থাকাটা মোটেই পছন্দ করেন না। এই সব কারণে জগন্নাথের মনিব রাতে আরও একঘণ্টা বেশী দোকান খোলা রাখেন। জগন্নাথের বাড়ী ফিরতে প্রায় রাত্রি সাড়ে নটা বাজে! বাড়ীতে এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে সে আড্ডায় গিয়ে জোটে আর বারটা অবধি সেখানে বসে মনিবের সাতপুরুষ উদ্ধার করে বাড়ী ফেরে—এইটুকু ছিল তার পূজোর আনন্দ।

সেদিন কালীপূজা। কদিন থেকে আড্ডাধারীরা মহা উৎসাহে তুবড়ী তৈরী করতে লেগে গিয়েছে। কাজে যাবার সময় জগন্নাথ একবার আড্ডায় ঢুঁ দিয়ে বলে গেল—আমি না এলে তুব্ড়ি জ্বালাস্-নি।

জগন্নাথ কিন্তু সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারলো না। বিকেল থেকে একটা বেয়াড়া খদ্দের জুটে আটটা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে চলে যাওয়ার পর জগন্নাথ সে দিনের মত ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে এল।

কার্ত্তিকের শেষাশেষি। রাত্রে বেশ হিম পড়ে বলে আজকাল সে কোটের ওপর একটা ওভারকোট চড়িয়ে আড্ডা দিতে বেরোয়। বাড়ীতে ফিরে তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে আড্ডায় গিয়ে সে দেখলে তুবড়ীগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর যে গোটাদশেক আছে তা সরলার বাড়ীতে গিয়ে জ্বালানো হবে।

সরলা জগন্নাথের প্রধান আড্ডাধারী চৈতন্যকিঙ্করের রক্ষিতা। আড্ডার অধিকাংশ সেবায়েতেরই সেখানে অবাধ গতিবিধি থাক্লেও জগন্নাথ কখনো সেখানে যায়-নি! এ বিষয়ে তার চরিত্র ছিল নিষ্কলঙ্ক। পৃথিবীর অধিকাংশ

চরিত্রবান্ লোকের মতন চরিত্র হারাবার সুযোগ সে বেচারীর আজও পর্য্যন্ত হয়ে ওঠে-নি ; তুবড়ী পোড়ান শেষ হোয়ে গিয়েছে, আর আড্ডাও এখুনি ভাঙ্বে শুনে জগন্নাথের মনটা দমে গেল। সে বল্লে—তোদের জন্য তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে এলুম আর তোরা কিনা চল্লি !—ড্যাম ইট।

বন্ধুরা বল্লে—তুইও চল্ না সরলার বাড়ী।

জগন্নাথ বল্লে—না না দূর,—আমি কি যাব।

চৈতন্য বল্লে—চল্ না, তুই তো কখনো যাস্-নি।

যাবার ইচ্ছা যে তার একেবারেই ছিল না তা নয়। সে আর একবার ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে বল্লে—এই বেশে !

গোবিন্দ বল্লে—তাতে কি হয়েছে ? সরলা সে রকম লোকই নয় যে কিছু মনে করবে।

রামহরি উচ্ছ্বসিত্ ভাবে বলে উঠ্ল—সত্যি বল্তে কি, ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি কিন্তু আমাদের সরলার মত মেয়েমানুষ দেখি-নি। চৈতন্য ছাড়া সে আর কারুকে জানে না। বেশ্যার মধ্যে সতী পাওয়া যায় না কে বলে ?

জগন্নাথ বল্লে—চল্ যাই, দেখে আসি তোদের সরলাকে।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় বন্ধুরা মিলে সরলার বাড়ীর দিকে অভিযান করলে। সবার হাতেই একটা কি দুটো তুব্ড়ী। রাস্তা থেকে সের পাঁচেক মাংস কিনে নেওয়া হোলো। ঠিক হোলো যে অনুপানটা সরলার বাড়ী থেকেই আন্তে দেওয়া।

চিৎপুর রোডের ট্রাম তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় ভিড়ের অন্ত নেই, অনেকে উর্দ্ধমুখ হোয়ে চলেছে। মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকি হোলেই অত্যন্ত অনিচ্ছায় একবার তারা ঘাড় নামিয়ে ধাক্কাটা সাম্লে আবার উর্দ্ধমুখী হোয়ে চলে। চারিদিকে দুম্দাম্ পটকার শব্দ ; বাতাস বারুদের গন্ধে বিষিয়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে জগন্নাথের দল সরলার বাড়ীতে ঢুক্ল।

সরলার বাড়ী চিৎপুর রোডের ওপর। বাড়ীতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা ঘর সেদিন সব ঘরই ভর্ত্তি। এক একটা ঘরে এক এক রকমের হল্লা। সহরের প্রায় শ'দুয়েক তান্ত্রিক সেখানে কারণ-সলিলে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই এ রকম হট্টগোল শুনে জগন্নাথ প্রথমটা ভড়্কে গিয়েছিল, কিন্তু পাছে বন্ধুরা নাবালক মনে করে এই ভয়ে কোনো মন্তব্য না করে তাদের সঙ্গে এগিয়ে চল্ল।

সরলার ঘর একেবারে তেতলায়। ছাতের ওপরে এই একখানি মাত্র ঘর। তাদের দল সিঁড়ি বয়ে একেবারে ছাতে উঠে সরলার ঘরের দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। সরলা তখন ঘরের দরজা খুলে বাতি জ্বেলে একজন পুরুষের গলা জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। সে দৃশ্য দেখে চৈতন্যকিঙ্করের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে হাঁক দিলে—সরলা!

সরলার কোনো সাড়া নেই। চৈতন্য আবার হাঁক্‌লে—সরি!

এবারেও কোনো সাড়া না পেয়ে চৈতন্য ঘরের মধ্যে ঢুকে সরলার হাতখানা সেই লোকটার গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে হিঁচড়ে টেনে তুল্লে। সরলা দাঁড়াতে পার্‌ছিল না; সে টলে দরজায় হেলান দিয়ে বল্লে—দুপুরবেলা বড্ড মদ খেয়েছিলুম, ভারি নেশা ধরেছে।

চৈতন্য বল্লে—ওটা কে?

—ও গোপাল।

চৈতন্য গলার স্বর আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে দিয়ে বল্লে—আবার ওকে ঘরে ঢুকতে দিয়েচিস্—আজ ওকে মেরে ফেল্‌ব।

সরলা চৈতন্যের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে…দেখ কেলেঙ্কারী কোরো না। দুপুরবেলা এখানে বেড়াতে এসে এক বোতল মদ আনিয়ে খেলে; এখুনি নেশা ছাড়লেই চলে যাবে। ও তোমার ক্ষেতিটা কি করেছে শুনি?

—আচ্ছা দেখছি—বলে চৈতন্য ছাতে বেরিয়ে এসে বল্লে—মাংস আনা হয়েছে, রাঁধবার যোগাড় কর।

ছাতের কোণে একটা উনুন ছিল, সরলা তাতে আগুন দেবার ব্যবস্থা কর্‌তে লাগল। ওদিকে চৈতন্য মাংস হজম কর্‌বার আরক আন্‌তে দেবার জন্য ঘন ঘন রামচরণকে ডাকাডাকি সুরু করে দিলে।

উনুনে মাংস চড়িয়ে দেবার পর চৈতন্য বল্লে…এবার তুব্‌ড়ীগুলো জ্বালান যাক।

সমস্ত ব্যাপারটা জগন্নাথের মন্দ লাগছিল না। চৈতন্যর প্রস্তাব শুনে সে উৎসাহিত হোয়ে বল্লে—আমি তুব্‌ড়ীতে আগুন দেব।

তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা খুলে ছাতের ওপরে ফেলে গোটা তিনেক তুবড়ী তুলে নিয়ে জগন্নাথ রাস্তার দিকের আল্‌সের ওপর পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে এল। আরও দু'একজন তুবড়ী ধরাবার উদ্যোগ কর্‌ছিল কিন্তু জগন্নাথ

তাদের থামিয়ে দেশলাই নিয়ে অগ্রসর হোলো। কে একজন পেছন থেকে বলে উঠল—দেখ্‌ব জগা এক কাঠিতে ধরাতে—

এক কাঠিতেই একটা তুবড়ী ধরিয়ে জগন্নাথ পেছু হটে এল। একটার পর একটা তারপর আর একটা, এমনি করে তিন্‌টে তুবড়ী হুস হুস্‌ কোরে জ্বলে গেল। তখনো গোটাকয়েক তুবড়ী বাকী, জগন্নাথ আরও তিনটে তুলে নিয়ে আল্‌সের কাছে গিয়ে শুনতে পেলে রাস্তায় যেন ভারী গোলমাল হচ্ছে। গোলমাল শুনেই সে তড়াক করে পিছু ফিরে এসে বল্লে—রাস্তায় ভয়ানক গোলমাল হচ্ছে!

রাস্তার গোলমাল ক্রমেই যেন বাড়তে লাগল। বন্ধুদের মধ্যে আর সাহস ক'রে রাস্তার দিকে একটু উঁকি মেরে ফিরে এসে ভয়ে ভয়ে বল্লে—গোলমাল—ভারি গোলমাল!

সবাই বল্‌তে লাগল—ব্যাপার কি? এত গোলমাল কিসের?

সরলা এতক্ষণ এক জায়গায় নির্ব্বাক হোয়ে দাঁড়িয়ে বাজী পোড়ান দেখছিল। হঠাৎ সে ছুটে আল্‌সের ধারে গিয়ে তখুনি ফিরে এসে বল্লে—সর্ব্বনাশ হয়েছে! নীচের তলায় বাজীর দোকানে আগুন ধরে গেছে। আল্‌সেতে কখনো তুবড়ী জ্বালায়—

চৈতন্য হাঁপাতে-হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করুলে—দোকানটা কার?

—এ পাড়ার গুণ্ডাদের, সাংঘাতিক লোক ওরা।

রাস্তায় তখন গোলমাল বেশ পাকিয়ে উঠেছে। আগুন—আগুন,—বের করে নিয়ে আয়—এই সব চীৎকারে রাস্তা সরগরম।

ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয় বুঝ্‌তে পেরে জগন্নাথ তাড়াতাড়ি ওভার-কোটটা পরে, একটু অন্ধকারে গা ঢাকা দেবার চেষ্টায় ছাতের অন্য এক ধারে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে দোতলার এক সারের ঘরগুলো সব দেখা যায়। সে দেখলে একটা ঘরে একদল লোক মদ খেয়ে খুব হল্লা করছে। কেউ ঘুমুর পায়ে দিয়ে নাচছে, কেউ গান গাইছে, কেউ তবলা বাজাচ্ছে। তারই পাশের ঘরে একটা ভুড়িওয়ালা বুড়ো বসে মদ খাচ্ছে, সাম্‌নে একটী আধা-বয়সী স্ত্রীলোক বসে। লোকটা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছে। অন্য সময় এই দৃশ্যগুলো সে বেশ উপভোগ করত, কিন্তু তখন এ সব দিকে মন দেবার অবসর তার ছিল না। সে ভাবছিল—বাজীর দোকানে আগুন এখুনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে শহর শুদ্ধ লোককে

চম্‌কে দিয়ে দমকল এসে হাজির হবে ; তারপরে পুলিশ এসে তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। সে-ই তো তুবড়ীতে আগুন দিয়েছিল, সাজাটা নিশ্চয় তারই হবে। কাল সকালে খবরের কাগজে তাদের কীর্ত্তি-কথা প্রকাশ হবে। একবার তার মনে হলো—এখান থেকে লাফ দিয়ে যদি একতলায় পড়া যায় তা হলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই কেলেঙ্কারীর পর তো মৃত্যুই ভাল।

সে একবার ঝুঁকে নীচে উঠোনের দিকে চেয়ে দেখলে। অন্ধকার। উঃ এখান থেকে পড়্‌লে হাত-পা গুঁড়ো হোয়ে যাবে। না না তা সে পারবে না, যা কপালে আছে তাই হবে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ এই রকম সব আকাশ পাতাল ভাবছিল, এমন সময় বাজীর দোকানের একদল লোক মার্‌ মার্‌ শব্দে লাঠি নিয়ে সেই বাড়ীর ভেতরে ঢুক্‌ল। সে দেখতে পেলে লোকগুলো লাঠি ঘোরাতে-ঘোরাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে যারা হল্লা কর্‌ছিল, তাদের মধ্যে একজন লোক কি কাজে বাইরের বারান্দায় বেরিয়েছিল, সে হঠাৎ কতকগুলো লোককে লাঠি হাতে ঐ রকম উত্তেজিত অবস্থায় দেখে বল্লে —এই অত চেঁচাচ্ছিস্‌ কেন ?

গুণ্ডাদের মধ্যে একজন বল্লে—ধর্‌, এই এক ব্যাটা—

ঘরের ভেতর থেকে একজন বল্লে—কি হয়েছে রে নেদো ?

নেদো বল্লে—দেখ না এই এক শালা—

—তবে রে—বলে একটা লোক ঘর থেকে একটা সোডার বোতল নিয়ে এসে কোনো বাক্যব্যয় না করে গুণ্ডাদের ছুঁড়ে মারলে। তারপর দুই তরফে রক্তারক্তি।

দোতলায় আর একটা ঘরে বসে যে বুড়ো লোকটা এতক্ষণ অতি শান্তভাবে মদ্যপান করছিল, গোলমাল শুনে হঠাৎ সে একটা বিকট চীৎকার করে খাড়া হোয়ে উঠল। মারামারিতে যোগ দেবার জন্য মহা উৎসাহে সে টল্‌তে-টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছিল, কিন্তু সেই ঘরের স্ত্রীলোকটা তাকে টেনে ঘরের মধ্যে পুরে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

জগন্নাথ ছাতে দাঁড়িয়ে এই সব দৃশ্য দেখছিল, আর ভাবছিল—সব অনর্থের মূল আমি—

হঠাৎ কে তার হাত ধরে টান্‌তেই সে ফিরে দেখলে যে, সরলা এসে তার

পাশে দাঁড়িয়েছে। সরলা ফিশ-ফিশ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমিই তুবড়ীতে আগুন দিয়েছিলে ?

জগন্নাথের চোখের সাম্‌নে তখন সহস্র তুবড়ী সর্ষেফুলের ঝরণা ঝরিয়ে দিচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ওরা কোথায় ?

—ওরা যে যার পালিয়েছে, কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? এতক্ষণ কি করছিলে তবে ? তোমাকেই তো ওরা খুঁজছে ?

সর্ব্বনাশ ! জগন্নাথের বুকের ভেতর কে যেন বল্‌তে আরম্ভ করে দিলে—আমাকে খুঁজচে ?

সে প্রকাশ্যে সরলাকে জিজ্ঞাসা কল্লে—আমি কোথা দিয়ে পালাই বল দিকিন ?

সরলা একবার চারিদিকে চেয়ে বল্লে—পালাবেই বা কি কোরে ? এই বেশে ওখান দিয়ে নাম্‌তে গেলেই ওরা ধরে ফেল্‌বে।

জগন্নাথ বল্লে—তা হোলে তোমার একখানা শাড়ী আমায় দাও, পরে পালাই।

সরলা বল্লে—তাই দিচ্ছি, এখানে দাঁড়াও।

সরলা তার ঘরের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হোয়েই ছুটে ফিরে এসে বলে—পালাও, পালাও—ওরা ওপরে উঠেছে। পাশের বাড়ীর ঐ ছাতে লাফিয়ে পরে ওদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যাও।

জগন্নাথ আর দ্বিরুক্তি না কোরে পাশের বাড়ীর ছাত লক্ষ্য কোরে ছুটল।

পাশাপাশি বাড়ী, দু বাড়ীর ছাতের মধ্যে কয়েক হাত মাত্র ব্যবধান। সে এক লাফে সেই ব্যবধানটুকু পার হোয়ে সেই ছাতে গিয়ে আল্‌সের ধারে আত্মগোপন কর্‌লে।

কিছুক্ষণ সেই নির্জ্জন ছোট্ট ছাতে বসে থেকে জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল। সামনেই একখানা ছোট ঘর, জগন্নাথ বুঝ্‌তে পারলে যে, ঘরখানা না পার হলে সিঁড়ি পাওয়া যাবে না।

একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আগেই, পাছে একটা বিপদ এসে জোটে এই ভয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে সাহস করছিল না। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—কি করা যায় ?

হঠাৎ রাস্তায় একটা গোলমাল ওঠায় সে আর কোনো চিন্তা না কোরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—কে ! কে এল !

ঘরের এককোণে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। কিন্তু সে আলোতে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। জগন্নাথ ঘরের মধ্যে পা দিতেই ক্ষীণকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করলে—কে ? কে এল ?

সে চমকে ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু কারুকে দেখতে পেলে না। ঘরের মধ্যে একটা দড়িতে খানকয়েক ময়লা শাড়ী ঝোলান ছিল। জগন্নাথ ভাবলে পেণ্টুলান ছেড়ে এর একটা শাড়ী পরে এখান থেকে সরে পড়া যাক্। বুকের মধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চয় কোরে সে আল্‌না থেকে খাঁ কোরে একখানা শাড়ী টেনে নিলে।

আবার যেন কে চাপা আর্ত্তনাদের স্বরে বলে উঠ্‌ল—কে ? চোর—আঃ—

জগন্নাথ মুহূর্ত্তের মধ্যে শাড়ীখানা দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে আর একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে। এবার সে দেখতে পেলে ঘরের অন্ধকার কোণে মাটিতে একটা ছেঁড়া মাদুরে কে যেন শুয়ে রয়েছে। সে আস্তে-আস্তে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে, একটি রুগ্না স্ত্রীলোক একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে পড়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কে ? কি চাও ?

জগন্নাথ বল্লে—দেখ আমি বড় বিপদে পড়েছি।

স্ত্রীলোকটি একটু চুপ করে থেকে বল্লে—বিপদ ! কি বিপদ ?

জগন্নাথ সমস্ত ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি বলে গেল। মেয়েটি চোখ বুজিয়ে পড়ে রইল, তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে কিছুই শুন্‌তে পাচ্ছে না। জগন্নাথ তার কাহিনী শেষ কোরে তাকে বল্লে—তোমার একখানা শাড়ী পরে আমি আজকের মত পালাই ; কাল এসে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। কি বল ?

মেয়েটি তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলে না। জগন্নাথ দেখলে সে চোখ বুজিয়ে নিস্পন্দ হোয়ে পড়ে রয়েছে। ধীরে অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাস পড়ছে। জগন্নাথ বুঝতে পারলে জীবন-মৃত্যুর এই ক্ষীণ বন্ধন যে কোনো মুহূর্ত্তে ছিন্ন হোতে পারে। সে একবার ঝুঁকে তার মুখখানা ভাল কোরে দেখবার চেষ্টা করলে। শীর্ণ মুখ, চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ; চোখ কোটরগত, রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে যে কেমন দেখতে ছিল তা কিছুতেই ঠিক করা যায় না। ব্যাধির নির্ম্মম হস্ত তার দেহে পুরাতন পরিচয়ের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট রাখে-নি। তার দিকে চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে জগন্নাথের

মনটা করুণায় ভরে উঠতে লাগল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আহা!

ঠিক সেই সময় রাস্তায় একদল লোক চেঁচিয়ে উঠল—ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালী—

বাইরের আনন্দ-উৎসবের চীৎকার আর ঘরের মধ্যে এই করুণ-দৃশ্য; এই দুইয়ে মিলে জগন্নাথের মনে কি রকম একটা উদাস ভাব এনে দিলে। সে সেখান থেকে উঠে আবার ছাতে বেরিয়ে গেল!

পাশের বাড়ীর ছাতে তখনো কয়েকজন লোক এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জগন্নাথ একবার রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে গুণ্ডারা তখনো লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় পট্টি-বাঁধা একটা লোক রাস্তায় একখানা চেয়ার পেতে বসে চুরুট খাচ্ছে। এই লোকটা একবার ওপর দিকে মুখ তুলতেই সে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ঘরের প্রদীপটা তখন নিব-নিব হোয়ে এসেছে। সেই আঁধারে জড়ান আলোর মধ্য দিয়ে জগন্নাথ নিজের দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ কোরে একবার শায়িত নারীর দিকে চেয়ে নিলে। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই, সব চুপচাপ, মৃত্যুর মত সব নীরব। একবার তার মনে হলো এবার দড়ি থেকে একটা শাড়ী টেনে নিয়ে পরে চলে যাই। কিন্তু তখুনি আবার মনে হোলো—ছি-! এই অসহায়া মুমূর্ষু নারীর একখানা শাড়ী চুরি কোরে প্রাণ বাঁচাতে হবে! কিন্তু এই বেশে নামলে তো গুণ্ডারা নিশ্চয় ধরে ফেল্‌বে। পোষাক দেখে নিশ্চয় তারা চিনে রেখেছে; ও বাড়ীর সরলাও তাই বলেছে—তবে উপায় !!!

বাইরে কতকগুলো লোক চেঁচিয়ে উঠল—পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো—

জগন্নাথ চমকে উঠে একবার হতাশ দৃষ্টিতে সেই নিদ্রিতা নারীর দিকে চাইলে। প্রদীপের ক্ষাণ আলো ক্ষীণতর হ'য়ে এসেছিল। তার মুখ মোটেই দেখা যাচ্ছিল না। জগন্নাথের মনে হোতে লাগল তার সম্মুখে শায়িতা এই অপরিচিতার জীবন-প্রদীপও যেন ঐ আলোর মত ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। কে এই নারী? ঘটনা চক্রের কি অদ্ভুত সংঘটন! সহসা তার বুকের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠল—পালা পালা—এখানে দাঁড়াতে আছে?

জগন্নাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমন

সময় ক্ষীণ নারীকণ্ঠে আবার প্রশ্ন হলো—বাইরে এত গোলমাল হচ্ছে কিসের?

জগন্নাথ আবার তাকে গোলমালের কারণ বলে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার একখানা কাপড় আমায় দাও, আমি পরে পালাই।

সে বল্লে—ঐ যে কতকগুলো শাড়ী রয়েছে একখানা পরে যাও।

জগন্নাথ তাড়াতাড়ি একখানা শাড়ী টেনে নিয়ে খুলে দেখলে সেখানা শতছিদ্র। সেটা ফেলে দিয়ে আর একখানা শাড়ী টেনে নিলে। সেখানা দিয়ে এমন বিশ্রী একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল যে কাপড়খানা খুল্‌তেও তার ঘেন্না হলো। সেটা ফেলে দিয়ে সে আর একখানা আধময়লা শাড়ী টেনে নিয়ে তাকে বল্লে—এখানা পরেই পালাই। তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা খুলে ফেলে, সে আবার বল্লে—কাল এসে এগুলো নিয়ে যাব।

অত্যন্ত বেদনাযুক্ত অঙ্গে আঘাত লাগলে লোকে যেমন আর্ত্তনাদ করে ওঠে ঠিক সেই রকম আর্ত্তনাদের সুরে মেয়েটি বলে উঠল—না, না—ওগো ও শাড়ীখানা পরে যেও না। ওটা আমার মা দিয়েছিল। ঐটে আমায় পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে বলে রেখেছি।

এক ঝলকে বুকের সমস্ত ব্যথা উছলে দিয়ে মেয়েটি অত্যন্ত হাঁপাতে লাগল। তার সেই কাতর অনুনয় যেন মূর্ত্তিমতী হোয়ে এসে জগন্নাথের হাত দুখানা চেপে ধরলে, অজ্ঞাতসারে তার হাত থেকে শাড়ীখানা খসে মেঝেতে পড়ে গেল। জগন্নাথ স্থির হোয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন দেখতে লাগল—ছোট্ট একটি মেয়ে, গাঁয়ের পথে আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। সে বড় হোলো তার বিয়ে হোলো। তারপর একদিন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। আজ মনুষ্যত্বের শেষ ধাপে নেমে এসেও সে মায়ের-দেওয়া এই রাঙা শাড়ীখানার মায়া ছাড়তে পারে-নি। নানা রকমের সম্ভব ও অসম্ভব ছবি তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর একবার নিজের মনটাকে শক্ত করে নিয়ে সে বল্লে—আচ্ছা, এই তোমার শাড়ী রইল, আমি চল্লুম—

দেখ তুমি বড় বিপদে পড়েছ না? আচ্ছা শাড়ীটা পরে যাও কিন্তু কাল আবার মনে করে ফিরিয়ে দিয়ে যেও। একবার শীতের দিনে একটা লোক আমার গায়ের কাপড়খানা চেয়ে নিয়ে গেল, আর ফিরিয়ে দিলে না।

জগন্নাথ তাকে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশের বাড়ীর ছাত থেকে আওয়াজ হোলো—ঐ ছাত দিয়ে পালিয়েছে—

জগন্নাথ চেয়ে দেখ্‌লে পাশের বাড়ীর ছাতে কয়েকজন লোক ও ছুটো পাহারাওয়ালা সেই দিকে চেয়ে রয়েছে। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সে পোষাক ছেড়ে শাড়ীটা পরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

যখন সে বাড়ী ফিরলে তখন ভোরের বাতাস বইতে স্রুরু করেছে। ঘরে ঢুকে সে চারিদিকের জানালা খুলে দিয়ে অবশ দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিলে।

পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙ্‌ল তখন বেলা প্রায় বারোটা। দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চেয়ে সে পাশ ফিরে চাকৃরীর কথা ভাবতে-ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বেলা পাঁচটা অবধি ঘুমিয়ে উঠে স্নান করে কাল রাতের শাড়ীখানা একটা খবরের কাগজে বেশ করে মুড়ে নিয়ে সেই অপরিচিতার উদ্দেশে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

একদিন আগে যেখানে জীবন-মরণ সংশয় হয়েছিল আশ্চর্য্যের বিষয় সে সেই বাড়ীটা খুঁজে বার কর্‌তে জগন্নাথের আধঘণ্টা সময় কেটে গেল। রাস্তায় খানিকক্ষণ পায়চারী করে দরজাটা ঠিক করে নিয়ে সে টপ্‌ কোরে বাড়ীর ভেতর ঢুকে একেবারে তেতলায় গিয়ে উঠল।

তেতলার ঘরে সেদিন আর প্রদীপের আলো নেই, অন্ধকার! ঘরের মধ্যে ঢুকে জগন্নাথ ছুটো তিনটে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখলে কেউ নেই, ফাঁকা ঘর হা-হা করছে। একটা দম্‌কা হাওয়া জগন্নাথকে শিউরে দিয়ে সাম্‌নের দরজা দিয়ে হুস্‌ কোরে বেরিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি দোতলায় নেমে একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলে—ওপরে যে থাকত সে কোথায় গা?

—মরে গেছে।

—এ্যাঁ! কখন মারা গেল?

—আজ ছুপুরে! এখনো তারা শ্মশান থেকে কেউ ফেরে-নি। জগন্নাথ আর কোনো কথা না বলে সেখান থেকে নেমে একেবারে নিমতলার ঘাটের দিকে ছুট্‌ল।

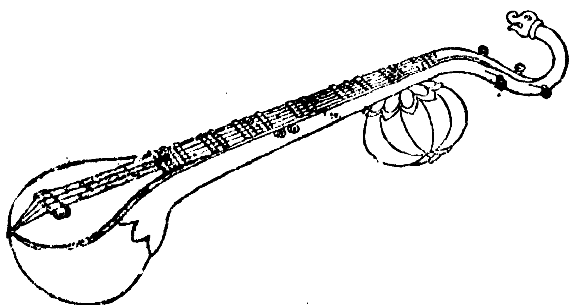
রাস্তার ছুপাশের দোকানঘর গুলোতে তখন বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে শাঁখ, ঘণ্টা ও আনন্দের কলবর। জগন্নাথের কানে তখন কোনো শব্দই যাচ্ছিল না, তার কানে শুধু সেই অপরিচিতার করুণ অনুনয় এসে বাজছিল—ওগো ওখানা পরে যেওনা, ওটা আমার মায়ের দান।

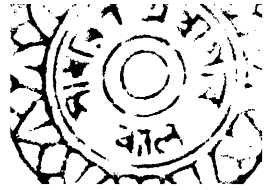
জগন্নাথ এক রকম ছুট্‌তে-ছুট্‌তে শ্মশানের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলো। এক জায়গায় কতকগুলো লোক একটা চিতা সাজাচ্ছিল, চিতার পাশেই একটি

নারীর শব। জগন্নাথ ছুটে গিয়ে সেই মৃতদেহের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। না এতো সে নয়! কিছুক্ষণ ধরে সে শ্মশানের চতুর্দ্দিকে পাগলের মত ছুটে সমস্ত মৃতদেহগুলোকে দেখে বেড়ালে। কিন্তু কোথাও তার জীবনদাত্রীর দেখা পেলে না।

বুকজোড়া একটা অবসাদ নিয়ে সে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এসে গঙ্গার ওপরে একটা নির্জ্জন পণ্টুনে গিয়ে বসে পড়ল।

অমাবস্যার অন্ধকার। নদীর জল মিশ কালো, কিছুই দেখা যায় না। চারিদিকে বিসর্জ্জনের করুণ বাজনা, এরই মধ্যে বসে-বসে জগন্নাথ ভাবছিল—কি করা যায়! অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে ধড়মড়িয়ে উঠে একবার —ড্যাম ইট্ বলে কাগজে-মোড়া শাড়ীখানা ছুড়ে নদীর জলে ফেলে দিলে। তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ি বার কোরে ধরিয়ে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে।





শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কেরাণী

[ক]

"ভাত বাড়ো, ভাত বাড়ো!"

"রেসো, রেসো,—আর একটু সবুর করো।"

"সবুর! ঘড়ীতে ন'টা বেজে এক কোয়াটার, সেটা দেখেচ কি?"

"দাঁড়াও না, ডালটা নাবিয়ে একটা বাটা মাছ ভেজে দি' না হয়! অমন কল্লে শরীর টেক্‌বে কেমন করে গা! প্রাণটা আগে, না ছেয়ের চাক্‌রী আগে?"

"চাক্‌রী আগে সুরো, চাক্‌রী আগে! কেরাণীর আবার প্রাণ! কেরাণীর আবার শরীর! সায়েব যদি তোমার এ কথা শুন্‌ত সুরো, তা'হলে ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে যেত। নাও কথায় কথায় বেলা বেড়ে যাচ্ছে, ছাই-ভস্ম যা আছে শীগ্‌গির দাও, কোন রকমে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে এখন অপিসে গিয়ে পৌছতে পাল্লে বাঁচি।" প্রিয়নাথ ধুপ করিয়া পিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল।

সুরবালা, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিছু যে হয়নি, খাবে কি দিয়ে?"

"তবে অদেষ্টে আজ নিরেট্ উপোস! ভাতও হয়নি নাকি?"

"হ্যাঁ ভাত হয়েচে বৈকি! ডালও হ'ল,—আলু ভাতে, কাঁচকলা ভা—"

"ব্যস্, ব্যস্—এ যে একটা যজ্ঞির ব্যাপার! আবার কি চাই? কেরাণী আবার কি খাবে? দাও, দাও—চট্‌পট্ দাও।"

পাঁচ মিনিটে খাওয়া শেষ করিয়া, এক এক লাফে তিন-তিনটা সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া প্রিয়নাথ উপরে উঠিল। তাড়াতাড়ি এদিক্-সেদিক চাহিয়া সে গলা চড়াইয়া ডাকিল, "ওগো—জল্‌দি।"

সুরবালা ত্রস্তপদে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গা?"

"কাপড়, কাপড়, আমার কাপড়।"

সুরবালা জিভ্ কাটিয়া বলিল, "ঐ যাঃ! তোমায় বল্‌তে ভুলে গেচি। তোমার কাপড়ে যে খোকা মুতে দিয়েচে, এখনো শুকোয় নি।"

প্রিয়নাথ কর্কশকণ্ঠে কহিল, "আমার চাক্‌রিটি তোমরা খাবার ফিকিরে আছ ? তার চেয়ে আমায় খাওনা কেন, একদম সব ন্যাটা চুকে যাক্‌

সেই সময় ক্ষুদে আসামীটি সুমুখ দিয়া যাইতেছিল। প্রিয়নাথ হুঙ্কার দিয়া বলিল, "এই হারামজাদা, এদিকে আয় ত দেখি।"

খোকা ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া আস্তে আস্তে অনিচ্ছাসত্বেও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ খোকার গালে এক বিরাশি শিক্কা ওজনের চড় বসাইয়া দিয়া সক্রোধে কহিল, "পাজী ছুঁচো! চড় খাইয়া খোকা মহা চীৎকার সুরু করিয়া দিল

প্রিয়নাথ, রাগে গশ্‌-গশ্‌ করিতে করিতে যে ময়লা কাপড়খানা পরিয়াছিল, তারই উপরে একটা আধফর্শা টুইলের সার্ট চড়াইয়া দিল। সার্টের গায়ে তিন রকমের চারিটা বোতাম—একটা রূপার, একটা হাড়ের, দুটা কাঁচের। এক হাতায় বোতাম আছে, অন্যটা সুতা দিয়া বাঁধা। একখানি পাকানো ও কোঁচানো চাদর কাঁধে ফেলিল। পায়ে একজোড়া সাদা ক্যাম্বিসের পম্প জুতা পরিল—তার উপরে কালো বার্ণিশ চামড়ার তিন-চারিটা ছোট বড় অপারেশনের চিহ্ন। প্রিয়নাথ লোকটার সখ আছে—নাই শুধু পয়সা।

খোকা তখনও কাঁদিতেছিল। প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার দুই গালে দুটি চুমো খাইয়া বলিল, "ছি বাবা, কেঁদ না, কাঁদতে নেই।"

সুরবালা স্বামীর কাছে অন্যায় ধমক্‌ খাইয়া একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে জানালার গরাদে ধরিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ধারাবর্ষী মেঘমেদুর আকাশের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রিয়নাথ সব বুঝিল। অনুতপ্ত কণ্ঠে ডাকিল, "সুরো!"

সুরবালা, চমকিয়া মুখ ফিরাইল।

"সুরো, রাগ করেচ ?"

"না।"

প্রিয়নাথ সুরবালার কাছে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "সুরো, তুমিও যদি আমার কথায় রাগ কর্ব্বে তা' হলে কার মুখ চেয়ে আমি বাঁচব বল ? আমাতে কি আর আমি আছি ? আমার কথায় রাগ ? বল রাগ করনি ?'

স্বামীর স্নেহ ও প্রেমে সুরবালার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। "না, আমি রাগ করিনি" বলিয়া, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

প্রিয়নাথ স্ত্রীকে চুম্বন করিবার জন্য মুখ বাড়াইল। হঠাৎ ঘড়ীতে টং করিয়া সাড়ে নয়টা বাজিল। চুম্বন ভুলিয়া প্রিয়নাথ স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক লাফে ঘরের দরজার কাছে গেল। তাড়াতাড়ি ছাতিটা লইয়া ছুটিল।

[খ]

এই কেরাণী-জীবন, এই বাঙ্গালী জীবন—ক্ষণে সুখ, ক্ষণে দুঃখ, তুচ্ছ প্রেম—তুচ্ছ বিরহ—জীবনটা শুধু তাড়াতাড়ি, আর দীর্ঘশ্বাস, আর কিছু না। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এই ছবি।

প্রিয়নাথ সদর দোরের কাছে আসিয়া দেখিল, রাস্তা জলে জলময়, যেখানে জল নাই, সেখানে হাঁটুভরা কাদা। সে শীঘ্র খানিকটা ছেঁড়া খবরের কাগজ যাগাড় করিয়া জুতাযোড়া পা হইতে খুলিয়া সন্তর্পণে মুড়িয়া ফেলিল এবং তাহা বগলদাবা করিয়া জল-কাদা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কেরাণীর দেবালয়—যেখানে সাহেব দেবতা, বড়বাবু পুজারী ও তাহারা পাণ্ডা—তাহার উদ্দেশ্যে চলিল।

প্রিয়নাথ সুশিক্ষিত যুবক। বাপ-মা এবং প্রতিবেশীরা তাহার বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কালে সে বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। এণ্ট্রান্সে সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল—ফলে তাহার জননীর মনে অকস্মাৎ একটি রাঙ্গা টুকটুকে বধূর মুখদর্শন করিবার সাধ একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তারপর কিরূপে একে একে বর্ষে বর্ষে তাহার ঘরে মা ষষ্ঠীর দূতেরা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, তার মাতা, তারপর তার পিতার মৃত্যু হইল এবং অর্থাভাবে তাহার বি, এ পরীক্ষা দেওয়া হইল না, এখানে আমরা সে সমস্ত ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে চাহি না।

প্রিয়নাথ চলিয়াছে, দুই হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া চলিয়াছে, আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। কেরাণীর ভাবনা। সবটা শুনিয়া কাজ নাই; কারণ, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই।

তাহার কত উচ্চ আশা ছিল,—কোন্ মানুষের না থাকে? ধীরে ধীরে তাহার জীবনের সাম্‌নে একটা মহান্ আদর্শ ভবিষ্যের পটে আত্মসম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, হয় ত কালে তাহা পূর্ণগঠন হইত; ধীরে ধীরে আপনাকে সে সংসার-সমরের জন্য উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল, হয়ত, পরিণামে সে বিজয়ী

হইত। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রবাদবাক্য আপনার কঠোর সত্যতা সপ্রমাণ করিল—"মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে!" প্রিয়নাথ গড়িতেছিল। বিধাতা ভাঙ্গিল।

জীবনের প্রভাতে, উপার্জ্জনক্ষম পিতার মৃত্যুতে, প্রিয়নাথ অকস্মাৎ একদা আপনার খেদ-করুণ ভাগ্যলিপির প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিল। সে কি কঠোর আঘাত। দেখিল, অনন্ত সংসার-পাথারে সে নিরাশ্রয়—একাকী। বড় একাকী। তাহার বন্ধু নাই, সহায় নাই, অর্থ নাই,—আছে শুধু স্ত্রী, চারিটী সন্তান, আর শূন্য লৌহমঞ্জুষা। আর একখানি জীর্ণভগ্ন দ্বিতল বাড়ী।

মা সরস্বতীর দিকে পিছন ফিরিয়া সে অতি কষ্টে কোন সওদাগরী অফিসে একটি ২০৲ টাকা মাহিনার চাকুরী যোগাড় করিল। পাড়ার বিজ্ঞেরা আসিয়া বলিয়া গেলেন, "চাকরীর বাজার বড় মাগ্যি। তোমার অতি সৌভাগ্য

তারপর এই 'সৌভাগ্যের' ভিতর দিয়া একে একে ছয়টি দীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং কুড়িটি টাকার উপর আরও পাঁচটি টাকা আজ কয়েক মাস ঘরে আসিতেছে। কি 'সৌভাগ্য' রে।

হতভাগিনী সুরবালা। পরণে ছেঁড়াখোড়া কাপড়, যত্নাভাবে অমন মেঘের মত কেশরাশি রুক্ষ, অমন সোণার বরণ দেহে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে গায়ে একখানি গয়না নাই, প্রাণে এতটুকু সুখ নাই; মুখে সদাই হাসি, কিন্তু তার পিছনে যে কি হাহাকার লুকানো আছে—দরদী ভিন্ন কে তাহা বুঝিবে?

তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। বড় মেয়েটির বয়স আট বৎসর,—দুদিন বাদে তাহাকে পার করিতে হইবে।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এতগুলিকে লইয়া একটি সংসার,—চাল, ডাল, ঘি, তেল, নিত্য বাজার আছে, লজ্জা-নিবারণের ন্যাকড়া আছে, ছেলে-পিলের দু আছে, সমাজের কুটুম্বিতা আছে, নিত্য রোগের ডাক্তারের ভিজিট, ঔষধ-পথ্য আছে—নাই কি? বলিতে পার মাসে পঁচিশটি টাকায় কোন্ ইন্দ্রজালে এই ভদ্র গৃহস্থের মান এবং প্রাণ রক্ষা হয়?

এখন আর কি জিজ্ঞাসা করিবে, প্রিয়নাথ কি ভাবিতেছিল?

হঠাৎ একখানা দু'ঘোড়ার মস্ত চকচকে গাড়ী বাতাসের আগে ছুটিয়া আসিল। প্রিয়নাথ সন্ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী

ভিতরে মোটা নরম গদির উপরে পরম আলস্যভরে সুসজ্জিত দেহ এলাইয়া দিয়া এক যুবক আছে। তাহার চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত, তাহার ভাবভঙ্গী নির্ব্বিকার, যেন সহরের যত দুঃখ, যত দৈন্য, যত হাহাকারের ভিতরে অটল-মহিমায় বধির শ্রবণে বসিয়া, সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে।

গাড়ীর চাকা হইতে কাদার ধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রিয়নাথের যত্ন-রক্ষিত সামান্য পরিচ্ছদ সুবিচিত্র করিয়া দিল। সে বিরস বদনে আপন মনে কহিল, "কেন এই বিভেদ? কেন আমি রাস্তায় কুকুরের মত এই জল-কাদায় হাঁটিয়া চলিয়াছি, আর ঐ বা কেন আরামে লোকের গায়ে কাদা ছিটাইয়া, সকলকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়াছে? কেন আমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও, বিদ্যায়, রূপে, গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াও অর্থহীন ব্যর্থ জীবনে অর্দ্ধাহারে ছিন্নবেশে দিনের পর দিন গণিতেছি, আর ঐ মূর্খ, কদাকার পশু কেন দিব্য বেশে, বিনা শ্রমে, বিনা চিন্তায় ধূলির মত টাকা উড়াইয়া দিবার অধিকার লাভ করিল? কেন এই প্রভেদ? ভগবান, তুমি কি আছ? যে তোমায়, ভগবান, সমদৃষ্টি বলিয়া প্রচার করে, প্রতারক সে—মূর্খ সে। 'তুমি' নাই—'তুমি' নাই।"

সাম্‌নে আফিস,—প্রকাণ্ড অট্টালিকা, চক্‌চকে দামী পাথরের থাম, বড় জান্‌লা-দরজাগুলি উজ্জ্বল রং করা। বাহির হইতে মাথা তুলিয়া তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিতে চাহিতে পথিকেরা রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে; ভাবিতেছে, কি চমৎকার বাড়ী। যেন স্বর্গপুরী। হায়, তারা ভুলিয়া গিয়াছে, মাকালের রাঙা রূপের আড়ালে কি মালিন্য।

প্রিয়নাথ ভিতরে ঢুকিল। কার্পেটমোড়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। মধ্যে মস্ত একটা হল্, বার্নিশ করা কাঠের ছোট ছোট দেওয়ালে তাহা বহুভাগে বিভক্ত। স্প্রিংয়ের দরজা ঠেলিয়া সে আপনাদের বিভাগে ঢুকিল।

সারি সারি টেবিল। প্রতি টেবিলের দুদিকে দুখানা করিয়া চেয়ার। একদিকে বড়বাবুর নিজস্ব একটা মেজ্। চারিদিকে কাঠের 'তাক্'—তাহাতে বড় বড় বাঁধানো খাতা। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা, বিজলীর আলো। আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। ঠিক যেন বন্দী পাখীর জন্য সোনার 'পিঁজরা'।

এখনও দশটা বাজে নাই। কেরাণীরা, কেহ টেবিলের উপরে বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, দলে দলে গল্প করিতেছে, হাসিতেছে।

হঠাৎ জুতার মশমশ শব্দ হইল।

"ওহে, সায়েব, সায়েব।"

পলকে কি পরিবর্ত্তন। সবাই যে যার আসনে আসীন, সামনে খাতা খোলা, চোখে জ্বলন্ত মনোযোগ, আর হাতে চলন্ত কলম। সাহেব কি একটা কাজে আসিয়াছিল; কাজ সারিয়া তখনই চলিয়া গেল। অমনি সকলের হাতের কলম খসিল, দৃষ্টি অপাঙ্গে ফিরিল, একজন অর্দ্ধোচ্চ কণ্ঠে কহিল, "গেছে ?"

আর একজন দরজার ফাঁক্ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "হুঁ।"

অমনি যতীনচন্দ্র একটি গান ধরিয়া দিল। আর একজন ঘাড় নাড়িয়া তবলা অভাবে টেবিল চাপড়াইয়া তাল দিতে লাগিল।

এবার বড়বাবু আসিতেছেন। আবার সব চুপচাপ।

কেরাণীদের অসম্পূর্ণ ছবি এইরূপ। মানুষ যে কত হীন, কত কপট হইতে পারে, বুকে তুষানল জ্বালিয়া মুখে কত যে হাসিতে পারে, তা যদি দেখিতে চাও, সওদাগরী আফিসের কেরাণীদের দেখ। এমন ফটো আর কোথাও পাইবে না। বুকে তুষানল, মুখে হাসির কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইও না। খাঁচার পাখী কি গান গায় না ?

প্রিয়নাথ আপনার টেবিলের সুমুখে গিয়া, চাদরখানা গলা হইতে খুলিয়া আগে চেয়ারের হাতায় বাঁধিল। তারপর একখানা কাগজে লাল কালি দিয়া কয়েক লাইন "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়" লিখিল। এই না সে বলিতেছিল, বিশ্বে ঈশ্বর নাই ? হাঁ, মানুষের স্বভাব ত' এই।

দুর্গানাম-লেখা কাগজখানি চোখ বুজিয়া বারকয়েক কপালে ছুঁয়াইয়া, সে একেবারে কাজ সুরু করিয়া দিল।

প্রিয়নাথ আফিসের কাহারও সঙ্গে সাধ্যমত মিশিত না। সে শিক্ষিত, তাহার সহকর্ম্মীদের মনের সঙ্গে তাহার উচ্চাভিলাষী মন ঠিক খাপ্ খাইত না।

তিনদিন পরেই পূজা। আফিসে কাজের বড় ভিড়। প্রিয়নাথ যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, ঘড়ীতে তখন সন্ধ্যা আট্‌টা প্রায় বাজে।

সে তাড়াতাড়ি বড়বাজারের ভিতর দিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। রাস্তার জনতায় প্রতিপদেই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তার মন যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। লোকগুলার কি অন্যায়। ইচ্ছা করিয়াই আমার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। একটু চট্‌পট্ বাড়ীতে গিয়া যে হাত-পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিব, তারও যো নাই। আর এই গরুর গাড়ী এগুলা কলিকাতা হইতে দূর হইলে সব আপদ্

ঢুকিয়া যায়, এমনি নানা উদ্ভট কথা ভাবিতে ভাবিতে প্রিয়নাথ শেষে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল।

ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া, ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে সে ডাকিল, "সুরো!"

খোকাকে কোলে করিয়া, সুরবালা মাদুরের উপরে বসিয়াছিল। প্রিয়নাথের সাড়া পাইয়া মুখ তুলিয়া চাপা আওয়াজে বলিল, "চুপ! চুপ! খোকার ভারি জ্বর!"

প্রিয়নাথ উদ্বেগের সহিত বলিল, "জ্বর!"

"হ্যাঁ। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। এখন একটু ঘুমিয়েচে, অত জোরে কথা কোয়ো না, এখনি জেগে উঠবে।"

প্রিয়নাথ—শুষ্কমুখে খোকার গায়ে হাত দিয়া দেখিল,—গা যেন আগুন! তার সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত মস্তিষ্ক তখন উত্তপ্ত। বাড়ীতে আসিয়া কোথায় একটু বসিয়া জিরাইবে, দুটা কথা কহিবে, না, আবার এই হাঙ্গাম! সে আর সহ্য করিতে পারিল না, বিরক্তিপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল, "না, আর অসহ্য হয়ে উঠেছে, রোজ একটা না একটা লেগে আছেই, তার চেয়ে একেবারে মরুক্ না কেন, হাড়ে বাতাস লাগে!"

সুরবালা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ষাট ষাট, অমন সর্ব্বনেশে কথা কি করে তোমার মুখ দিয়ে বেরুল গা?"

প্রিয়নাথ বুঝিল, রাগের মাথায় সে একটা ভারি অন্যায় কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। অনুতপ্ত হইয়া তখনই সে খোকাকে কোলে করিয়া স্তব্ধ-ভাবে বসিয়া পড়িল।

[ঘ]

রাত্রে খোকার জ্বর ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। জ্বরের 'ধমকে' সারারাত সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। "বাবা আমায় জামা দিলে না? জামা প'রে আমি ঠাকুর দেখ্‌তে যাব।"

প্রিয়নাথ তার মাথা চাপড়াইতে বলিল, "দেবো বৈকি বাবা! আগে সকাল হোক।"

ভোর হইল। খোকার জ্বর কমিল না, বরং তার উপরে ফিটের লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

সুরবালা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিল, "ওগো, ডাক্তার ডাকো।"

প্রিয়নাথ বলিল, "হুঁ—ডাক্তার! স্বরো, কাল মাস-কাবার, সেটা মনে আছে কি? ডাক্তার ডাকো! পয়সা কোথায়?"

সুরবালা বলিল, "তা বলে ত বিনে চিকিচ্ছায় ছেলেটাকে মেরে ফেল্‌তে পারি না, কোথাও কেউ ধার্‌-টার্‌ দেবে না?"

"দেখি।" প্রিয়নাথ চটি পায়ে দিয়া নীচে নামিয়া গেল

ধার মিলিল,—বহু কষ্টে। ডাক্তার আসিল, ছেলের নাড়ী টিপিল, বুক দেখিল, নাক মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "ব্যামো শক্ত, দেখি, কতদূর কি কর্ত্তে পারি।"

[৬]

পরদিন যথাসময়ে প্রিয়নাথ, আফিসে গিয়া হাজিরা-বইয়ে নামসই করিল তখনও বড়বাবু আসেন নাই। অথচ, প্রত্যেক মিনিট তার কাছে এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শেষে আর সে থাকিতে পারিল না,—তাড়াতাড়ি সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

সাহেব কি লিখিতেছিল, কাগজ হইতে চোখ না তুলিয়াই ঘাড়টি একটু হেঁট করিল মাত্র।

প্রিয়নাথ বলিল, "স্তর, আমার ছেলের বড় অসুখ, দুদিন ছুটি।

সাহেব তেমনি ভাবেই বলিল, "বাবুকে বল।"

'বাবু' মানে বড় বাবু! প্রিয়নাথ আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, বড়বাবু আসিয়াছেন। বড়বাবুর গোঁফ-দাড়ী কামানো,—কিন্তু খুরের সঙ্গে বহুদিনের দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায়, ছোট ছোট কর্কশ পাকা চুলে মুখের নীচের দিক্‌টা বেজায় বন্ধুর! ঠোটের দুপাশ দিয়া পানের পিচের ক্ষুদ্র স্রোত সদা প্রবাহিত। দেহখানি ভয়ানক মোটা, তার উপরে টান্‌ চাপকান। একটা সচল তাকিয়ার কল্পনা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বড়বাবুর চাপকান-চাপা স্থূল দেহের কতক আঁচ পাইতে পারা যায়। তাঁর আকৃতির আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেটি তাঁর মাথা-যোড়া অতি চক্‌চকে বার্ণিশ-করা টাক্‌,—দিনের আলো পড়ায় তাহ ইস্পাতের মত উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। টাকের মাঝখানে ঠিক তিনগাছি চুল; কোন রসিক তাহা দেখিয়া বলিয়াছেন, ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো!

বড়বাবু চেয়ারে বসিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে মুখ বিকৃত করিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় ছুটির দরখাস্ত হাতে করিয়া প্রিয়নাথ আসিয়া হাজির হইল।

কোনরূপ ভূমিকা করিয়া কথা পাড়ে, প্রিয়নাথের মনের অবস্থা তখন তেমন ছিল না। সে বড়বাবুর সুমুখে গিয়া সোজাসুজি বলিল, "মশাই, আমার ছেলে বাঁচে কি না বাঁচে, আমাকে দুদিনের ছুটি দিতে হইবে।"

বড়বাবু তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে অবহেলাভরে বলিলেন, "ওসব ছুটিটুটি বুঝ্‌লে কি না—এখন হবে-টবে না, কালকে 'মেল-ডে', তারপর বুঝলে কি না, সাম্‌নে পূজো, এখন কাউকে ছাড়্‌তে টাড়্‌তে পার্ব্ব না!"

প্রিয়নাথ শুষ্কমুখে কহিল, "আজ্ঞে, ছেলেটার ব্যামো, একটিবার দয়া করুন।"

বড়বাবু একটা আল্‌পিন দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন, "হেঃ, দয়া! ছেলের ব্যামো বল্লে, বুঝ্‌লে কি না, সায়েব মানে না।"

প্রিয়নাথ টেবিলের উপর হইতে একটা কাগজচাপা লইয়া সেটা নাড়িতে নাড়িতে নিম্নমুখে বলিল, "আজ্ঞে, সায়েবের কাছে গিয়েছিলুম; তিনি বল্লেন আপনার কাছে আস্‌তে।"

বড়বাবু কঠোর ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "সাহেবের কাছে এরি মধ্যে ঘুরে আসা হয়েচে! ভ্যালা মোর বাপ্‌রে! তবে আর কি, তুমি যখন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে,—বুঝ্‌লে কি না, ঘাস খেতে শিখেচ, তখন আর আমার কাছে কেন?"

প্রিয়নাথ কহিল, "আজ্ঞে, আমার ছেলে মারা যায়।"

বড়বাবু ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিলেন, "যাওহে ছোক্‌রা যাও! ন্যাকামির আর যায়গা পাওনি, আমার কাছে এসেচ,—বুঝ্‌লে কি না—চালাকি কর্ত্তে! ছেলের ব্যামো!"

প্রিয়নাথ কোনরূপে রাগ সামলাইয়া বলিল, "আমাকে ছুটি দিতেই হবে।"

বড়বাবু রুলটা তুলিয়া লইয়া সজোরে টেবিলের উপর আছড়াইয়া মহা খাপ্পা হইয়া বলিলেন, "দিতেই হবে? আমি তোমার বাবার চাকর? ইউ স্কাউনড্রেল, আমার ওপর হুকুম—অ্যাঁ?"

প্রিয়নাথের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। তাহার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল, এই হৃদয়হীন পশুটাকে আচ্ছা করিয়া ঘা দুই দিয়া, এই ঘৃণ্য, তুচ্ছ গোলামীকে পায়ে থ্যাৎলাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই সে চলিয়া যায়। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, ঘরে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা! ছেলের জ্বর, ঔষধ-পথ্য, ডাক্তার

চাই। মেয়ে বড়, আজ বাদে কাল সেটিকে পার করিতে হইবে! ঘরের বাক্স খালি, রাত পোহাইলে পোড়া পেটের ভাবনা ভাবিতে হইবে।

এক পলকের ভিতরে, প্রিয়নাথের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মত এমনি নানা চিন্তা খেলিয়া গেল এবং তখনই যেন কাহার অপূর্ব্ব সম্মোহিনীতে তাহার গর্ব্বোদ্ধত শির আবার নুইয়া পড়িল, তাহার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত আবার শিথিল হইয়া পড়িল। কেরাণীর আবার রাগ! সে বড় ক্ষণিক!

বড়বাবুর রাসভ-নিন্দিত স্বর, বোধ হয় সাহেবের কাণে গিয়াছিল। কারণ হঠাৎ সাহেব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। একবার প্রিয়নাথের দিকে চাহিয়া বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি বাবু?"

বড়বাবু সব কথা খুলিয়া বলিলেন। অবশ্য, তার উপর কালোপযোগী টীকা-টিপ্পনি করিতে ভুলিলেন না। সাহেব সমস্ত শুনিয়া প্রিয়নাথের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি বাবুর উপর হুকুম চালিয়েছ?"

প্রিয়নাথ নিম্নস্বরে বলিল, "না, স্যর!"

সাহেব অধীরভাবে ওষ্ঠ দংশন করিয়া বলিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও, আমার বাবু মিথ্যাবাদী?"

প্রিয়নাথ কহিল, "না স্যর! আমি তা বল্‌তে চাই না, তবে উনি কথাটা একটু বাড়িয়ে বলেছেন।"

বড়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "তবে রে ছুঁচো! আমার সাম্‌নে তুই আমারি নামে লাগাস। এত বড় বুকের পাটা তোর! স্যর! স্যর! ওকে ডিশ্চার্জ্জ করুন, এখনি ডিশ্চার্জ্জ করুন।"

সাহেব মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর শিষ্‌ দিতে দিতে দরজার কাছে গিয়া হঠাৎ থামিয়া বলিল, "তোমার ছেলের অসুখ?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

সাহেব একান্ত সহজ স্বরে বলিল, "আচ্ছা বাবু, আজ তোমার ছুটি। কিন্তু কাল 'মেল-ডে', তুমি অবশ্য আস্‌বে। আমি তোমার পুত্রের মঙ্গল প্রার্থনা করি।" বলিয়া আবার শিষ্‌ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

সাহেবের এই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবপরিবর্ত্তনে বড়বাবু রাগে ফুলিতে ফুলিতে হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তারপর অত্যধিক মনোযোগিতার সহিত একখানা কাগজ দেখিতে দেখিতে আপন মনে অস্ফুট

কণ্ঠে বলিলেন, "জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ? আচ্ছা, দেখা যাবে। এক পোষে শীত পালায় না।"

ঝড়ের আগে শুক্‌না পাতা যেমন করিয়া উড়িয়া যায়, প্রিয়নাথের প্রাণখানা দেহের আগে তেমনি ছুটিয়া চলিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, পাখীর মত যদি আমার দুখানা ডানা থাকিত!

বাড়ী পৌঁছিয়া সে ভাবিল, এই ত বাড়ী আসিলাম। এইবার খোকাকে দেখিব। তার জন্যে জামা কিনিয়া আনিয়াছি; জামা পাইয়া তাহার কত আহ্লাদ হইবে!

"সুরো, সুরো।"

কাহারও সাড়া নাই! এ কি,—কে যেন কাঁদিতেছে না? কে কাঁদে? কে? কে? প্রিয়নাথ দু হাতে বুক চাপাইয়া, কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল শুনিতে সাহস হইতেছিল না, তবু—সে শুনিতে লাগিল।

"খোকারে, ওরে আমার খোকারে,"—কে কাঁদে? সুরো? প্রিয়নাথের দেহ হিম হইয়া গেল। আর তবেত' সন্দেহ নাই! থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে সে বসিয়া পড়িল,—তাহার চোখের সামনে,—আলোকাম্বরা ধরণীর উপর কে যেন একটা অন্ধকারের পর্দ্দা ফেলিয়া দিল। এবং সেই কঠোরকালো আঁধারের গভীর মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া, এক শোকার্ত্ত মাতৃ-হৃদয় ভেদ করিয়া কি করুণ ক্রন্দন তাহার অভিভূত শ্রবণে বারবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও খোকা, খোকারে!"

শুনিতে শুনিতে সহসা তীব্র আঘাতে চেতনা-প্রাপ্ত আহতের মত সে আবার দাঁড়াইয়া উঠিল এবং দীপ্তনেত্রে রক্তহীন মুখে উর্দ্ধে অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিয়া ক্ষিপ্তের মত বলিত, "নিয়েছ? আর দু'দণ্ড তর্ সৈল না? ভগবান্? ভগবান্? এখন যদি একবার তোমার নাগল পাই, তাহলে জেনো, তোমার ওই নির্দ্দয় প্রাণকে এই দুই হাতের চাপে পিষে, থেঁতলে গুঁড়িয়ে,—ছুঁড়ে ফেলে দি।"

প্রিয়নাথ উপরে উঠিল, এই ভীষণ অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে একটা দম্‌কা বাতাসের মত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবা-মাত্র, সুরবালা বিদীর্ণকণ্ঠে একটা আর্ত্তনাদ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

প্রিয়নাথের চোখে এক ফোঁটা জল নাই—আপনার পাষাণ-চক্ষু মেলিয়া প্রাণপণে সে চাহিয়া রহিল। বিছানার উপর খোকার পুষ্প-পেলব দেহ

পড়িয়া আছে,—মৃত্যুর কঙ্কাল-করের কাঠিন্য এখনও তাকে ছুঁইতে পারে নাই। তার ছোট হাতদুটি মুঠা-করা, কচি-কচি ঠোঁট-দুখানির ফাঁকে মুক্তার মত দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে। চোখদুটি মুদিয়া আছে, পাতার পাশে রাঙা গালের উপর অশ্রুর শুষ্ক চিহ্ন।

'তুই কেঁদেচিস, ঘুমোবার আগে কেঁদেচিস্ যাদু? আবদার ভুল্‌তে পারিস্ নি? এই যে বাবা, জামা কিনে এনেচি। নে, পর্—জামা পর্।"

প্রিয়নাথ সন্তর্পণে কাগজের ভিতর হইতে জামাটি আস্তে আস্তে বাহির করিল। তারপর খোকাকে জামা পরাইয়া তার মৃতদেহ বুকে চাপিয়া, তার অসাড় মুখে মুখ দিয়া সেইখানে স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল।

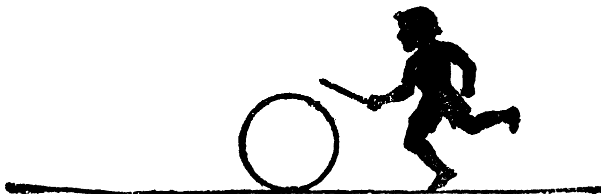
* * * *

টং।—

পরদিনের বেলা সাড়ে নয়টা।

টুইলের জামা-গায়ে, কাঁধে চাদর দিয়া, হাতে ছাতা লইয়া প্রিয়নাথ বাড়ী হইতে বাহির হইল।

খোকার চিতার ধোঁয়া তখনও বুঝি মিলায় নাই,—কিন্তু কি করিবে সে? আজ যে সওদাগরের "মেল-ডে"—সে কেরাণী। দিনের বেলা কলম ধরিবে, রাত্রে কান্নার ছুটি মিলিবে। এখন কাঁদিবার অবকাশ নাই। আজ যে সওদাগরের "মেল-ডে,"—সে যে কেরাণী!



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদেনী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা কঙ্কালীর এষ্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি; কিন্তু শম্ভু বলে, 'ভোজবাজি—ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি—সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি, অন্যপাশে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজী অর্থে 'গোলকধামে'র খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দ্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর', তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্ব্বশেষে একটা পর্দ্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখোমুখী দাঁড়াইয়া বাঘটা চুমা খায়, সর্ব্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয়, মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়, সর্ব্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম দুম, দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী প্রকাণ্ড একজোড়া করতাল বাজায়, ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বড় বাঘ? ওই বড় বা—ঘ।

বেদেনী প্রশ্ন করে, বড় বাঘ কি করে?

—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে একটা তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জ্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল স্পন্দিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকয়েক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জ্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটা বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহির দুইটা ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির উপর প্রকাণ্ড একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে!

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্ম্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রুর নিষ্ঠুরতা-পরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রং আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে; আকৃতি দীর্ঘ সর্ব্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই নাকে একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সম্মুখের দুইটা দাঁত কেমন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে, ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চক্‌মক্ করিয়া উঠে তেমনই ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল; সে বলিল, দাঁড়া বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ দী

পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কে বেটে, মালিক কে বেটে?

কি চাই? তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটেরও অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল ও দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা হাল্কা দেহ, তাজী' ঘোড়ায় যেমন একটি মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হাল্কা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রং কালোই, নাকটি লম্বা, টিকালো চোখ দুইটি সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি আঁকা গোঁফের মত এক জোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, ঝুলানো একটি সোনার ছোট চৌকা তক্তি;—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল! দুজনেই দুজনকে দেখিতেছিল।

কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচের বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিয়া মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ খাও টুক্‌চা।

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, রাধিকা কখন আসিয়া শম্ভুর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইসা?

ছোকরাটী শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। কালো সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্ব্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সূতার মত সিঁথিতে তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্দ্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুটি চোখে, সুচালো চিবুকটিতে—সর্ব্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়াফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপ বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের মধ্যে একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে;

কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিত্রিক হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়; ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিল খিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল,—ব্যাক হর‍্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল, বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব! এস।

কথা সত্য, এই অদ্ভুত জাতটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়, কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখন ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্য্যন্ত ইহাদের এ অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি; নতুবা—। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই আইলি কেনে এখেনে?

রাধিকা এবারও খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখীর মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলা মুড়ি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, খানিকটা নুন; দুইটা খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্দ্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া উর্দ্ধবাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মত লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল, কি নাম গো তুমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার নাম যে রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, কই কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল; কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা! আহত সর্পশিশু হিস্ গর্জ্জনে মুহূর্ত্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল; শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, আ-কামা! অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু রাগে সে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ওই সাপটার মতই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বল্ল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্ত্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ

করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল ; আরও একটু দূরে আর একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্ম্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা-পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু-পুরাণ-গান করে, তাহারা নিজেদের বলে পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ আদান প্রদান সমগ্রভাবে ইসলামধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা, সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়, অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়। কিন্তু এই নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া সে বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকণ লোম, মুখে হিংস্র হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে! আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ,—অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলা দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার সে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, যাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া লঠিল, তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধস্বরে শম্ভু বলিল, তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল, ওরে মড়া, বুড়ার নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে? আমারে বলে, তু জানছিস সব!

শম্ভু মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিণীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্ব্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি! সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ, —ধামা বুনিত, চেয়ার পাল্কির ছাউনি করিত, ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ারি করিত; তাহাতে তাহার উপার্জ্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস; রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সাহত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আরও কতবড় গুণ ছিল! তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক

শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা সুতার খুব ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে! সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত; সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল, এই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন?

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, নাগরের সখ দেখি যে খুব! পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা তেমনই অদ্ভুত কথা; বলে বাঘ দেখাইবে! সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বুলছ?

বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। রাধিকা সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, ই বাঘ নিয়া তুমি কি কর?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হাঁ?

হাঁ, দেখবি তু?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা হাতে ধরিয়া তুলিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইবার সাপ দেখা আমাকে!

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল, উটা তুমার পোষ মেনেছে?

হি হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাইতে আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্য্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ওদিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে! দোসরা দফায় খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার অন্তরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথ রাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ পোষাক, চোখ রাঙা, সেই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে, ইথে দোষটা কি হ'ল? তুমরা ব'সে রইছ, আমাগোর খেলা হছে। খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার! অপমান করতে আসছিস তু!

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মারিয়া বসিল। অব্যর্থ

লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মত সেটাকে লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্ত্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্দ্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইয়া লইল; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই মেলার বাদেই বাঘ লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাৎ, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাৎ খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে!

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরৎ দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, কাল পুলিশে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিব।

ওদিকে টীয়া পাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা।

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুটা আগুন ধরিয়া ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই; সে বোধ হয় দুই চারজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারপাশে পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। একি? সে

সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদ মস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব!

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল, কি কসুর করলাম হুজুর?

মদ আছে কিনা দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন, কিন্তু সে তাঁহার ভুল ভাঙিল না। সে বলিল, ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে—হুজুর—

আচ্ছা ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিস আসছে, ব'সে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন, এ তাঁবু তোমার?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল, জী, হুজুর।

দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশাইয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়াছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল, রাধিকার সেদিকে ভ্রুক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাবা, ছেলে খাবা ?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল, সব মাটি ক'রে দিছিস তু ; উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিসে ব'লে এলাম, আর তু করলি এই কাণ্ড !

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা। সত্যই, এ কথা শম্ভু তো বলিয়াছিল ! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণ হইতে এ তাঁবুতেও খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পুরাতন পোষাকটা বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙার মত সরু প্যাণ্টালুন, আর একটা কালো রঙের খাটো-হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো ঘাঘ্‌রা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস্। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত ; কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল-মোটা, স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সার্টিনের একটা ঘাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস্। কুৎসিত মেয়েটাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনের আওয়াজের মত একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে। আর এই কতকালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক, ছি—!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজানা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ !

রাধিকা রুদ্ধ স্বর কোন মতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কি করে ?

শম্ভু খুব উৎসাহ ভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী সিংহক আর্ত্তনাদের মত গর্জ্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। ক্রূর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে! রাধিকার সহিত চোখোচেখি হইতেই সে হাঁকিল, ফিন একবার!

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয় বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবলতর গর্জ্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভু তাঁবুতে অল্প কয়টি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবিল, কি উটা?

কেরাচিনি। আগুন লাগায়ে দিব উয়াদের তাঁবুতে। পুরা পেলম নাই, দু' সের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল, দাউ দাউ ক'রে জ্বলবেক যখন!

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারে মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরৎ দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল! দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখুন লয়, সেই—নিষুত-রাতে।

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে। বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই। বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দ্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থম থম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথায় জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস্ করিয়া একটা দেশলাই জ্বালাইল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া তবে এদিকে মেলটার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া শন্ শন্ করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাড়িয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার! সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফঁস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মত পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতেই লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলা কি নিটোল! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে! ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দ্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন! দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্ত্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে

কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল, হঁ্যা, চুপ।

কিষ্টো চুমায় চুমায় তাহার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়াও, মদ আনি।

না। চল, উঠ, এখুনই ইখান থেক্যে পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল।

কিষ্টো বলিল, কুথা?

হু-ই, দেশান্তরে।

দেশান্তরে? ই তাঁবুটাবু—

থাক পড়্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

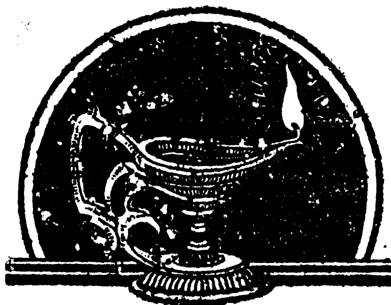
সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া—তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।



শ্রীসুবোধ ঘোষ

ফসিল

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আট বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এককুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি; তিনি নরপাল, ধর্ম্মপাল এবং অরাতিদমন। দু'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'ত, এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে শুধু ন্যাংটো ক'রে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ী আর তরবারির ঘটা; দেয়ালে দেয়ালে ঘুটের মত তামা আর লোহার ঢাল।

একজন অমাত্য, আটজন প্রধান আর—ফৌজদার, আমিন, কোতোয়াল, সেরেস্তাদার। ক্ষত্রিয় আর মোগল এই দু'জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন। সেই অপূর্ব্ব অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজে রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে-আট বর্গমাইল অঞ্জনগর—শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটীর ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়। কুর্ম্মি আর ভীলেরা দু'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ডগুলি থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা, যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসীল বিভাগ আর ভীল ও কুর্ম্মি প্রজাদের ভেতর একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে

চায় না। কিন্তু অর্দ্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টীম আছে। শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভুষি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা, যব, জনার চাই-ই।

তসীলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীর্য্যের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ—বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলেদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্ত্তি হয় সোজা কোন ধাঙড়-রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্ম্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ; সালসার মত সুগন্ধ মাটীতে। তাদের যেন নাড়ীর টানে বেঁধে রেখেছে। বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়—ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্ত্তনে তাদের দিনসন্ধ্যার সমস্ত মুহূর্ত্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আল্পনা আঁকা হাতীর পিঠের চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন—প্রজাদের আশীর্ব্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই আর দুচারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে, আশীর্ব্বাদ বা রামলীলা সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়; প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন, আদায় উসুল আর তার তসীল চলছিল

বটে কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব টিকিয়ে রাখা যায় না। নরেন্দ্র মণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টীমের খরচ! রাজবাড়ীর বাপেরকেলে সিন্দুকের রূপো আর সোনার গাদিতে ক্রমে ক্রমে হাত পড়ল।

অঞ্জনগড়ের এই অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেণ্টের পদে আনানো হল একজন ইংরেজী আইননবীশ। আমাদের মুখার্জ্জীই এল ল-এজেণ্ট হয়ে। মুখার্জ্জীর চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জ্জীই হয়ে গেল ডি ফ্যাক্টো অমাত্য, আর অমাত্য রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জ্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলার হিস্ট্রি পড়া মার্কিণী ডিমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সৎসাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জ্জী তার প্রতিভার প্রতিটী পরমাণু উজাড় করে দিলে স্টেটের উন্নতি সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেণ্ট সাহেবকে—একদিকে যেমন কড়া অন্যদিকে তেমনি হমদরদী। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জ্জীর নির্দ্দেশে বন্ধ হল লাঠিবাজি। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করে তুললো। স্টেটের জরীপ হ'ল নতুন করে; সেন্সাস নেওয়া হল। এমন কি মরচে-পড়া কামান দুটোকেও পালিস করে চকচকে করে ফেলা হ'ল।

ল-এজেণ্ট মুখার্জ্জীই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ রত্নগর্ভ অঞ্জনগড়—তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেষ্টসের স্তূপ। ক'লকাতার মার্চ্চেণ্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রী ষ্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজেয়িক, কংক্রীট আর ভিনিসিয়ান সার্সীর বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্ম্মান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানী আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি।

প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত্র ধক্ ধক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেন্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে—মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্পবসান ইঁদারা, ক্লাব বাংলো, কেয়ারি-করা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, শুয়োর বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে; আরো এগার কাঠা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালীয়ান ব্যাণ্ড মাস্টার হ'লেই ভাল।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখার্জ্জী বিভোর হয়ে ভাবে—তার ইরিগেশন স্কীমটার কথা। –উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান-করা কড়া-গাঁথুনির শ্লুস বসানো বড় বড় ডাম। বরাকরের বর্ষার সমস্ত ঢলটাকে কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মত। প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি। আউশ আর আমন; তা ছাড়া একটা রবি। বছরে এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক; দক্ষিণেরটায় আখ, যব, আর গম। তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক; ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটী এস্টিমেটে সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয়; এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল—এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব, কভি নেহি। মুখার্জ্জী উঠলো; দেখা যাক বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কি না।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির গোছাটাকে একটা নির্ম্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জ্জীর সামনে এগিয়ে দিল দুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দররারের ঈশ্বর মহারাজ! আপনি

প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে, তাতে যেন সরকারী হাত না পড়ে। আইনসঙ্গত ভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য : কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখছ তো মুখার্জ্জী, শালাদের হিম্মৎ।

—হ্যাঁ, দেখছি।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়ল—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি ; দুদিন দুরাত ধরে দেখি।

মুখার্জ্জী মহারাজকে শান্ত করল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটী টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিষ। ফয়জাবাদ স্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেণের কামরায় তুলে দাও। বাস্—নগদ একটী আনা, হাতে হাতে।

দুলাল বলতো—ভাই সব, এই বুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেণ্ট, ছুটী, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সব সে-ই কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে

এস, দুলাল। বলতো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্ত্তি করে নি।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাততঃ কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক্।

—আচ্ছা তাই হবে। সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দিত।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হ'ল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকাচুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়ীটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হ'ল, এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ কে আমাদের দুসমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোন মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মত দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ল—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ...।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল—মাহাতোর জন্য।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে গেল ফিরে।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন মুখার্জ্জীর কিছু জানতে বাকী রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘেই বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জ্জর এই সব নরপালদের তা হ'লে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয় তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক্।

পেয়াদারা এসে মহারাজকে জানালো—কুর্মিরা রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলেছে—বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখার্জ্জীর। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হ'ল। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো। মেষশিশুর মত ভীরু—দুলাল যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—তুমিই এসব সয়তানী করছ! মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধূলো আমি।

—চুপ থাক।

—জী সরকার।

—চুপ্! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

—ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি খাটতে পারবে না।

—জী সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল; এবার আদেশ হ'ল মুখার্জ্জীর ওপর।—সিণ্ডিকেটকে এখুনি নোটীশ দাও, যেন আমার বিনা সুপারিশে আমার কোন কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্ত্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র।—যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। তৃতীয়—আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিণ্ডিকেটেরও একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন সর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্ত্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নশো নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ, মুখার্জ্জী? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল-কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজ আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে, তাঁর মনের ভেতর ফুঁসে ফুঁসে তড়পাচ্ছে।

মুখার্জ্জী সবিনয়ে নিবেদন করল—মন খারাপ করবেন না, সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জ্জী বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা। সিণ্ডিকেটের দুষ্ট উৎসাহেই কুর্ম্মি সমাজের এত নাচানাচি। এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়!

দুলাল মাহাতোর কুঁড়ের কাছে মুখার্জ্জী এসে দাঁড়ালো। শশব্যস্তে দুলাল বেরিয়ে এসে একটা চৌকী এনে মুখার্জ্জীকে বসতে দিল। মাথার পাগড়ীটা খুলে মুখার্জ্জীর পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসলো মাটীর ওপর। মুখার্জ্জী এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে, শেষে বড় অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল—একি করছো মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমরা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ! তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিণ্ডিকেট আজ তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে!

মুখার্জ্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলল—কসম, এজেণ্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা; তাঁর জন্য আমরা জান দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটা একটু জলদি জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জ্জী দুলালের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়ল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেকদিন। এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোষাক বদলাবার কথা মুখার্জ্জীকে ভুলতে হ'ল আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিণ্ডিকেটের অফিসে।

—দেখুন মিষ্টার গিবসন, রাজা-প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের সুখ-সুবিধার জন্য দরবার তো পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিয়াছে।

গিবসন বললো—মিষ্টার মুখার্জ্জী, আমরা মনিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। Wronged humanity-র জন্য আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরও লড়বো।

—সব কুর্ম্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলেচেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তা'হলে কি করে বাঁচে বলুন তো!

ঝোঁকের মাথায় মুখার্জ্জী তার ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেললো।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েল্‌থ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন?

—তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন, মিষ্টার গিবসন। কুলি ভর্ত্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজাও খুসি হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয় ভাল হবে।

—সরি, মিষ্টার মুখার্জ্জী। গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুরুট ধরালো।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জ্জীর কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে চলে গেল অফিস ছেড়ে।

ম্যাককেনা এসে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার হে গিবসন?

—মুখার্জ্জী, that monkey of an administrator, মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টার্মই গ্রাহ্য করিনি।

—ঠিক করেছ। ওর ঐ ইরিগেশন স্কীমটা। খুব সাবধান, fight it at any cost। নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন expansionএর মুখে।

—কোন চিন্তা নেই। Domesticated মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করবো।

পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বলল—মাহাতো এসে বসে আছে বোধ হয়। দেখি একবার।

অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলল—এই যে দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দি।

মাহাতোর পিঠ থাবড়ে ম্যাককেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মৎ, মাহাতো আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য, সব সময়। ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জ্জী শুধু আকাশপাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মত সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলোর মাথার ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান ; খাস কামরায়।

আমাত্য ও ফৌজদার শুষ্ক মুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের চারিদিকে পায়চারী করছেন ছটফট করে। মুখার্জ্জী ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুদ্গার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার ওপর আর স্টেট চালিও।

হতভম্ব মুখার্জ্জী অমাত্যের দিকে তাকালো। অমাত্য তার হাতে তুলে দিল এক চিঠি। পলিটিকেল এজেণ্টের নোট।—স্টেটের ইণ্টার্ণাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্র সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করেই বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেণ্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্যি কথা। আমি সব জানি মুখার্জ্জী। আমি অন্ধ নই।

—সব জানি ? এ কি বলেছেন সরকার ?

—থাম, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধুলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে ! কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয় ?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের উপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যজন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। অমাত্য, ফৌজদার আর মুখার্জ্জী ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জৎ বাঁচান।

অমাত্য বলল—তাই হোক, কুর্ম্মিদের আপনি সায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল সুটে ফাঁসাচ্ছি, চেষ্টা করলে কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জ্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জ্জী এরি মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজের চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দ্দাহ লুকিয়ে আছে,

তা স্বভাবতঃ শশক হলেও মুখার্জ্জী আন্দাজ করে নিল। সত্যিই তো, এ দিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি! তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানালে।—আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জ্জী, কি যে বল! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করি না। পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না, মুখার্জ্জী।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জ্জীর হাতপায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকেল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে, দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আণ্ডার-নেক হিট্ চালায়। কড় কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের স্রোতে ঢোল হয়ে যায় কালো ওয়েলারের গলার ম্যাটিংগল আর পায়ের ফ্ল্যানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে চার্জ্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও সে বিশ্রাম করার নাম করে না। ক্যাণ্টারে ক্যাণ্টারে সারা পোলো লনটাকে বিদ্যুদ্বেগে পাক দিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভরে যেন স্পীড পান করে নেয়।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ করেন।—বড় রাফ্ খেলা খেলছ, মুখার্জ্জী।

সেদিনও সন্ধ্যের আগে নিয়মিত সূর্য্যাস্ত হল অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুম্মি কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ! মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন।—এইবার দুসমন মুঠোর মধ্যে, নির্দ্দয়ের মত পিষে ফেলতে হবে এইবার। শীগগির ডাক অমাত্যকে।

অমাত্য এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন —দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

বিনা টিকিটে কুলিরা লকড়ি কাটছিল। ফরেস্ট রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুলিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে!

—তারপর?—মহারাজার চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভাল ছিল। তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাস এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজ বিমূঢ় হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিকাল এজেন্টের নোটটা চকচকে স্থচীমুখ বর্শার ফলার মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

—অন্ততঃ সিণ্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে।—অমাত্য উত্তর দিল।

মুখার্জ্জীকে ডাকালেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার, মুখার্জ্জী। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্ দেখাও; একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জ্জী বলল—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটকান।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কী লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল দুলালের ঘরের দিকে।

মুখার্জ্জী বলল—আমার শরীর ভাল নয় সরকার; কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই।

চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। মার্চ্চেন্টরা দস্তুরমত ঘাবড়ে গেল। তৃতীয় সীমের ছাদটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধূলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্ত্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে—বুম্ বুম্ বুম্। কোয়ার্টসের পিলারগুলো চাপের চোটে তুবড়ির মত ধূলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরি মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পীটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ

পথেই দরোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কাজে যাও সব, কিছু হয় নি। কেউ ঘয়েল হয় নি, মরে নি কেউ।

মার্চেণ্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলল—মাটী দিয়ে ভরাট করবার উপায় নেই, এখনো দুদিন ধরে ধসবে। হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ।

ম্যাককেনা বলল—তাতে আর কি লাভ হবে? দি মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব। তা ছাড়া, দ্যাট মাহাতো; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই সহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটা এনকোয়ারী কমিটি, একটা গান্ধিয়াইট বদমাসও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার?

সে রাতে ক্লাব ঘরে আর আলো জ্বললো না! একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জ্জীর।

অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! মহারাজা, অমাত্য আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেন, মূর আর প্যাটার্সন। সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেণ্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জ্জীকে অভ্যর্থনা করিলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে, মুখার্জ্জী। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয় অনেক ক্লাম্‌জি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার তাই মুখার্জ্জীর কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জ্জী শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে রইল বসে।

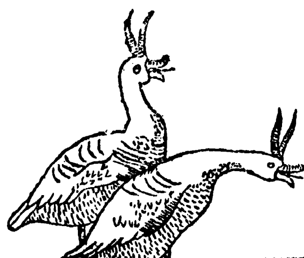
গিবসন মুখার্জ্জীর পিঠ ঠুকে একবার বলল—Be strong Mukherjee, it is adminisration!

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পীটের কাছে মোটরগাড়ী আর মানুষের একটা জনতা। ফৌজদারের গাড়ীর ভেতর থেকে দরোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাসটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল

থেকে ট্রাক বোঝাই লাস এল আরো। ক্ষুধার্ত্ত পীটটার মুখে শবদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিলে একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জ্জীর চোখ দুটো। গাড়ীর বাম্পারের ওপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল অন্যকথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতকগুলি ফসিল! অর্দ্ধপশুগঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল আর ছেনি হাতুড়ী গাঁইতা—কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত অস্ত্রশস্ত্র; যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্য্যয়ে কোয়ার্টাস্ আর গ্রানি-টের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখেছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!



শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অসমাপ্ত

রাখাল মাষ্টারকে লইয়া গল্প লেখা চলে কি না কে জানে।

রাখালমাষ্টার ইস্কুলের মাষ্টার নয়—পোষ্টমাষ্টার।

আমি গল্প লিখি এবং সেই সব গল্প কাগজে ছাপা হয় শুনিয়া অবধি রাখাল-মাষ্টার আমায় কত দিন কতবার যে তাহাকে লইয়া একটা গল্প লিখিয়া দিতে বলিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

একটি একটি করিয়া সে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই আমায় বলিয়াছে, কিন্তু সেগুলিকে পরের পর সাজাইয়া কেমন করিয়া যে গল্পের আকারে লিখিয়া ফেলিব তাহা আমি আজও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

এই বলিয়া গল্পটী একবার আরম্ভ করিয়াছিলাম:

দেখিতে নাদুশ্-নুদুশ্ হ্যালা-ক্যাবলা গোছের চেহারা, চোখে নিকেলের ফ্রেম দেওয়া চশমা, মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট করিয়া কাটা—রাখালকে দেখিলে ঠিক পাগল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই ত' রাখাল-মাষ্টার চটিয়া আগুন!

বলিল, 'না তোকে লিখতে হবে না বাপু, যা। মিছে কথা বানিয়ে বানিয়ে... এমনি করেই লিখিস তোরা তা আমি জানি।'

বলিয়া খানিকক্ষণ মুখ ভারি করিয়া থাকিয়া চশমার ফাঁকে একবার চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, 'যা বাপু যা, তুই এখন বিরক্ত করিস নে। আমার হিসেব ভুল হয়ে যাবে। বেরো তুই এখান থেকে।'

বলি, 'চটো কেন মাষ্টার, শোনই না শেষ পর্য্যন্ত।'

'হ্যাঁ, খুব শুনেছি।' বলিয়া কলমটা মাষ্টার তাহার কানে গুঁজিয়া রাখিয়া সোজাসুজি আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'পাগল কাকে বলে জানিস? না—অমনি লিখে দিলেই হলো!'

হাসিয়া বলিলাম, 'পাগল ত লিখিনি। লিখেছি—পাগলের মত।'

'ওই একই কথা।' বলিয়া হাত নাড়িয়া আমায় সে চুপ করাইয়া দিয়া বলিল, 'পাগল বলে কাকে জানিস? পাগল বলে—তোদের গাঁয়ের ওই

নিবারণ মুখুজ্জেকে। চব্বিশ ঘণ্টা বৌ আর বৌ। সেদিন বললাম, 'বলি— ওহে নিবারণ, বোসো, তামাক-টামাক খাও। ঘাড় নেড়ে বললে, না ভাই, উঠি। বেলা হয়ে গেছে,—বৌ বক্‌বে। ওই ওদের বলে পাগল। বুঝ্‌লি ?'

বলিয়া কান হইতে কলমটি আবার তাহার হাতে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে মাষ্টার তাহার কাজ আরম্ভ করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে হইল, আবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'মিছে কথা না লিখলে তোদের গল্প লেখা হয় না। তবে কাজ নেই বাপু লিখে, মিছে কথা আমি ভালবাসি না।'

সেইদিন হইতে কিছুই আর লিখি নাই।

ধানের মাঠের উপর দিয়া প্রায় ক্রোশ-খানেক পথ হাঁটিয়া প্রকাণ্ড একটা বন পার হইয়া গ্রামের শেষে, গুঠিকয়েক আমগাছের তলায়, ছোট্ট সেই পোষ্টাপিসটিতে প্রায় আমাকে যাইতে হয়।

কোনো দিন হয় ত দেখি,—দরজায় খিল বন্ধ করিয়া পোষ্টাপিসের মেঝের উপর তালপাতার একটি চাটাই বিছাইয়া রাখাল-মাষ্টার তাহার হিসাব লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে কাগজ ছড়ানো,—উড়িয়া যাইবার ভয়ে কোনোটার উপর প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢেলা, কোনোটার উপর আস্ত একখানা ইঁট, কোনোটা বা পায়ের নীচে চাপা-দেওয়া; মুখে বিরক্তির ভাব; ঝড়-বাতাসের উদ্দেশে যাহা মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতেছে, আর আপন মনেই কাজ করিতেছে।

হাসি আর কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারি না। অবশেষে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলি, 'ওহে মাষ্টার, দরজাটা একবার খুলবে না কি ?'

আর যায় কোথা !

ভিতর হইতে মাষ্টারের চীৎকার শোনা গেল,—'তা আবার খুলব না ! সময় নেই, অসময় নেই···বেরো বলছি, পালা এখান থেকে, নইলে খুন করে ফেলব।'

বাস্—চুপ্।

কাগজের খুস্ খুস্ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবিলাম, আর একবার ডাকি ; কিন্তু ডাকিতে হইল না।

জানালার কাছে খুট্ করিয়া শব্দ হইতেই তাকাইয়া দেখি, রাখাল মাষ্টার কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চোখোচোখি হইবামাত্র বলিয়া উঠিল, 'সাড়ে তের আনা পয়সার গোলমাল। বুঝ্‌লি? আস্থক্ ব্যাটা পিওন, আমি তার চাকরির মাথাটি খেয়ে দিচ্ছি—ছাখ।'

অত-সব দেখিবার অবসর তখন আমার নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, অতখানা পথ আবার আমায় একা ফিরিয়া যাইতে হইবে; বলিলাম, 'দরজাটা একবার খোলো মাষ্টার, চিঠিপত্রগুলো দেখেই আমি চলে যাব।'

কেন জানি না, হঠাৎ সে প্রসন্ন হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে ঢুকিলাম। সেদিনের ডাকের চিঠি-পত্রগুলা ছিল একটা খাটিয়ার নীচে। রাখাল-মাষ্টার আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'দেখিস্ যেন আর-কারও চিঠি নিস্‌নে।'

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। এমন কথা সে আমায় কোনো দিন বলে না।

মাষ্টার বলিল, 'কত সব মজার-মজার চিঠি থাকে তা জানিস? তুই ত' কোন্ ছার, খাম্-টাম্ খোলা-টোলা পেলে এক-একদিন আমিই দেখি। দেখে আবার বন্ধ করে দিই।—শুন্‌বি তবে? একদিন একটা মেয়ে লিখেছে—'

বলিয়া সে শতছিন্ন দড়ির খাটিয়াটির উপর চাপিয়া বসিয়া হয় ত' কোনও মেয়ের চিঠির গল্প আরম্ভ করিতেছিল। আমার মাত্র দু'খানি চিঠি। হাতে লইয়া বলিলাম, 'থাক্! ও-গল্প তোমার আর-একদিন শুনব, আজ উঠি।'

'তা উঠবি বই-কি! নিজের কাজ সারা হয়ে গেছে ত! বাস্,—যা! বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই আমার ঘাড়ে ধরিয়া দরজাটা পার করিয়া দিয়া আবার ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

আর একদিন অম্‌নি চিঠির খোঁজে ডাকঘরে গিয়াছি, দেখিলাম, দরজা বন্ধ। ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া স্থরু হইয়াছে। তুমুল ঝগড়া!

কি লইয়া যে ঝগড়ার সূত্রপাত, বাহির হইতে কিছুই বুঝা গেল না।

রাখাল-মাষ্টার ক্রমাগত নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর স্ত্রী বলিতেছে,—'না তুমি সাধু নও, তুমি ভণ্ড তুমি, বদমাস, তুমি শয়তান।'

অবশ্য মুখ দিয়া যে ভাষা তাহাদেব অনর্গল বাহির হইতেছে তাহা শুনিলে

কানে আঙুল দিতে হয়। দু'জনেই সমান। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। কেহই কম যায় না।

নিতান্ত অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। একবার ভাবিলাম, চলিয়া যাই, আবার ভাবিলাম এতখানা পথ হাঁটিয়া আসিয়া 'ডাক' না দেখিয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলে আফ্‌শোষের আর বাকি কিছু থাকিবে না। 'যা থাকে কপালে!' বলিয়া কশিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাকিলাম, 'মাষ্টার!'

উভয়েরই গলার আওয়াজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এত সহজে বন্ধ হইবে ভাবি নাই। দরজা খুলিয়া রাখাল-মাষ্টার মুখ বাড়াইয়া বলিল, 'ও, তুই! আয়, তোর আজ মেলা চিঠি!'

মাসের প্রথম। কয়েকখানা মাসিকপত্র আসিয়াছিল। হাতে লইয়া সেদিন আর দেরি না করিয়াই উঠিতে ছিলাম। রাখাল-মাষ্টার বলিল, 'বোস, কথা আছে।'

বাধ্য হইয়া বসিতে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কথা?'

মাষ্টার বলিল, 'শুনেছিস? ঝগড়া আমাদের?'

বলিলাম, 'শুনেছি। কিন্তু বুঝ্‌তে পারি নি।'

মাষ্টার তিরস্কার করিতে লাগিলেন—'বুঝতে পারিস নি কি রকম? তুই না গল্প লিখিস?—এ ত' একটা কচি ছেলেতে বুঝতে পারে।'

কি জবাব দিব বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মাষ্টার বলিল, শোন্ তবে। ও-হতভাগী যদি অম্‌নি করে ত' ওর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেবো না ত কী করব?'

অন্তরাল হইতে মাষ্টার-গিন্নির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যাঁ, তা আবার দেবে না। আ মরি মরি, কি গুণের সোয়ামী গো!'

'ওই শোন্?' বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া মাষ্টার বলিল, 'গলার আওয়াজ শুনেছিস? কাঠে যেন চোট মারছে।'

এবারেও গৃহিণী কি যেন বলিলেন, কিন্তু কথাটা ভাল বুঝা গেল না।

মাষ্টার তখন বলিতে লাগিলেন, 'শোন তবে আসল কথাটাই বলি। একদিন একটা খামের চিঠি—দেখলাম মুখটা ভাল করে মোড়া হয়নি। সরিয়ে রাখলাম। এই গাঁয়েরই চিঠি। নিতাই গাঙ্গুলী কয়লা-খাদে চাকরি করে; লিখেছে তার বৌএর কাছে। নিতাইএর বয়েস…এই তোদেরই বয়েসী হবে, ছোক্‌রা বয়েস,—বৌটিও তেমনি। ভাবলাম, পড়েই দেখি না কি লিখেছে।—আঃ!

সে কি লেখা রে! হ্যাঁ, বিয়ে করা সাথক্! বৌকে যদি অমনি চিঠিই না লিখতে পারলাম···আর ওই গ্যাখ্ দেখি—' বলিয়া মাষ্টার আর একবার তাহার গৃহিণীর উদ্দেশে আঙুল বাড়াইয়া বলিল 'ওকে চিঠি লিখব কি,—বিয়ে করা ইস্তক আজ পর্য্যন্ত মুখে আমার লাথি ঝাঁটাই মারছে! যেমন প্যাঁচার মত চেহারা, তেম্নি গুণ! বলে কি না, 'হতভাগ্য, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে না হ'লে আমি সুখী হতাম।' বলি তাই—'যা না বাপু, যেখানে খুশী তোর চলে যা, যাকে খুশী বিয়ে করগে যা, আমার হাড়টা জুড়োক্।' কিন্তু ক্ষেমতা নাই। হেঁ-হেঁ। তখন বলে কি না—হ্যাঁ যাব! মেয়েমানুষের যাবার পথ যে নেই রে পোড়ারমুখো! আমি মরব। মরে ভূত হ'য়ে এসে তোর ঘাড় মট্কাব, দেখে নিস্।' এই ত' বাক্যি।—যাক্, শোন্ তবে আসল কথাটাই শোন্!'

বলিয়া মাষ্টার একটা ঢোঁক্ গিলিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া বলিল, 'নিতাইএর যেমন বুদ্ধি! দেখি, না, চিঠির ভেতর একখানা দশ টাকার নোট। বৌকে পাঠিয়েছে। ভাবলাম, নোটখানা দিই মেরে! ধরবার-ছোঁবার ত কিছু নেই। তখন আমার সংসারে যা কষ্ট রে, সে আর কি বলব। পঁচিশটি টাকা মাইনে। তাই থেকে বোনের তত্ত্ব পাঠালাম দশ টাকার,—বাকি পনরটি টাকায় আর ক'দিন চলে! বাস্, নোটখানা সরিয়ে রেখে খেতে গেলাম। খেতে বসে ভাত আর রোচে না, হাত যেন মুখে আর উঠ্‌তেই চায় না। খালি খালি ওই নোটটার কথাই মনে হয়। বলি,—না বাবা, এ অস্বস্তিতে কাজ নাই। আধ-খাওয়া করে উঠে পড়লাম। বৌ বল্‌লে, 'ও কি গো! এ আবার কি ঢং!' বললাম, 'থামো।' বাস্! তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে নোটখানা আবার তেমনি খামের ভেতর-পুরে আটা দিয়ে আঁটিয়ে নিজেই হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিতাই গাঙ্গুলীর দরজায় গিয়ে ডাকলাম— নিতাইএর বৌকে। বৌ ছেলেমানুষ, কিছুতেই আসতে চায় না। বললাম, 'এসে ওই দরজার পাশে দাঁড়াও মা, তাহ'লেই হবে। আমি পোষ্ট-মাষ্টার।' নিতাইএর বৌ ঘোম্‌টা টেনে এসে দাঁড়ালো। বললাম, 'এই নাও মা, তোমার চিঠি নাও। চিঠির ভেতর দশটাকার একটি নোট আছে।'—চিঠিখানি বৌ হাতে করে নিলে। বললাম, 'নিতাইকে বারণ করে দিও বৌমা, এমন করে টাকা পাঠালে টাকা মারা যায়।' ঘাড় নেড়ে বৌ বললে, 'বেশ।' বাবা! বাঁচলাম! এতক্ষণে নিশ্চিন্তি হয়ে বাসায় ফিরে এসে বললাম,

'দাও, এবার ভাত দাও, খাব।' বৌ জিজ্ঞেস্ করলে, 'কেন, কি হয়েছে বল দেখি!' আগাগোড়া সব কথা বললাম বৌকে।—বৌ বলে কি জানিস্?'

'কি বলে?' বলিয়া মাষ্টারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

মাষ্টার হাসিল। বলিল, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে?'

বলিয়াই মাষ্টার আবার আরম্ভ করিল, 'পোড়ারমুখী বলে কি না,—ওরে আমার কে রে! সাধু স্যাওড়াগাছ! টাকা তুমি নিলে না কেন?'

'বাস! এই নিয়ে হ'লো ঝগড়া। বুঝলি এবার?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মাষ্টার রাগিয়া উঠিল; বলিল, 'ছাই বুঝ্‌লি। কিছু বুঝিসনি।—বুঝেও কি তুই ওই মেয়েকে নিয়ে আমায় ঘর করতে বলিস্?'

হাসিয়া বলিলাম, 'কি বলব তা হ'লে?'

হাসিয়া বলিলাম, 'কি বলব তা হ'লে?'

'কি বলবি?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁত কিস্‌মিস্ করিয়া বলিল, 'বলবি,—খ্যাংরা মেরে বাড়ী থেকে দূর করে দিতে বলবি।'

পোষ্টাফিস ও মাষ্টারের 'ফেমিলি কোয়ার্টারে' মাত্র একটি দেওয়ালের ব্যবধান। দেওয়ালের ও-পার হইতে শোনা গেল,—'হে ভগবান! হে ভগবান! এমন সোয়ামীর হাত থেকে আমায় নিষ্কৃতি দাও ভগবান! চির জন্মের মত নিষ্কৃতি দাও—হে হরি হে মধুসূদন!—বলিয়া মট্ মট্ করিয়া আঙ্গুল মট্‌কানোর শব্দ আর কান্না!

রাখাল-মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, চল্! এ আর চব্বিশঘণ্টা আমি কত শুন্‌ব? চল্—তোকে খানিকটা এগিয়েই দিয়ে আসি। চল্!'

তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। বাড়ী ফিরিতে হয় ত রাত্রি হইবে।

বাহিরে আসিয়া দেখি, অস্ত-সূর্য্যের স্তিমিত রশ্মি মেঘে-মেঘে প্রতিহত, প্রতিফলিত হইয়া সারা আকাশটাকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে হরীতকী, শাল ও মহুয়ার বন। তখন ফাল্গুন মাস। সুচিক্কণ মসৃণ পত্রভারানবত বৃক্ষশ্রেণী। শাল ও মহুয়া ফুলের গন্ধে-ভরা বাতাস। ঢেউ-খেলানো অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর সুমুখে কয়েক ঘর সাঁওতালের বস্তি। তাহারই পাশ দিয়া সঙ্কীর্ণ একটি পথ রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া বনে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

সেই পথ ধরিয়াই নীরবে চলিতেছিলাম। রাখাল-মাষ্টার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হাঁ রে, লিখেছিস কিছু?'

'কি?'

'বা রে! ভুলে গেলি এরই মধ্যে? সেই যে বলেছিলাম।'

হাসিয়া বলিলাম, 'তোমার গল্প?'

মাষ্টার শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বলিলাম, 'না, তোমার গল্প আমি আর লিখ্‌ব না।'

মাষ্টার সে কথায় কান দিল না। বলিল, 'কেন লিখ্‌বি না? লিখ্‌বি লিখ্‌বি। তবে সত্যি কথা লিখিস্ বাপু। এই ধর—আমার বৌটার কথা লিখ্‌বি আগে। লিখ্‌বি যে, ওর মত খারাপ মেয়ে আর দুনিয়ায় নেই। মাগী-টার কাছ থেকে পালাতে পেলে আমি বাঁচি। নিজের চোখেই ত সব দেখে এলি,—তোকে আর বেশি কি বলব।'

বলিলাম, 'আচ্ছা। তুমি এবার যাও, নইলে ফিরতে তোমার রাত হবে।'

'হোক না।' বলিয়া রাখাল-মাষ্টার আমার কাঁধে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'অন্ধকারে সাপে কাম্‌ড়াবে? কাম্‌ড়াক্ না। বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই, মাইরি বলছি, বৌটার জ্বালায় এক-একদিন মনে হয় আমি মরি।'

বলিয়াই সে ফিরিয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিল; বলিল, 'আসি তবে লিখিস্ কিন্তু।'

* * * *

সম্মতি দিয়া ত' বাড়ী ফিরিলাম!

লিখিবার চেষ্টাও যে করি নাই তাহা নয়।

লিখিয়াছিলাম—'পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতন। রাখাল-মাষ্টারের পোষ্টমাষ্টারী করিবার কথা নয়। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!

'বড়লোকের ছেলে নয়। ছেলে নিতান্ত গরীবের। তাও যদি বাবা বাঁচিয়া থাকিতেন!

'শৈশবে পিতৃহীন মাতৃহীন বালক—মামার বাড়ীতেই মানুষ। মামা মস্ত বড়লোক। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাসদাসী লোকজন,—তিন তিনটি মোটরকার। তাহারই একটিতে চড়িয়া প্রত্যহ বৈকালে রাখাল বেড়াইতে যায়! যেমন পোষাক, তার তেম্‌নি চেহারা! লোকে দেখে আর বলে, ব্যাটার কপাল ভাল।

মামা বিবাহ দিলেন। গরীবের ঘরের অম্‌নি অনাথা একটি মেয়ে।

'মেয়ের অভিভাবিকা ছিলেন এক পিসি। মামা নিজে মেয়ে দেখিতে গিয়েছিলেন। মেয়ের পিসি বলিলেন, তাই ত বাছা, ছেলেটির মা নেই, বাপ নেই, তার ওপর মামার কাছে মানুষ···

'মামা বলিয়াছিলেন, সেজন্যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বেয়ান, মামা তার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ভাগ্‌নেকে দিয়ে যাবে।

'হয়ত' দিতেন। কিন্তু এমনি রাখালের অদৃষ্ট যে, তিনি না দিয়াই মরিলেন। রাখাল—মেয়ের ছেলে, সুতরাং বলিবার কিছু নাই।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। —নিরবলম্ব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল রাখাল!

'তাহার পর সে সব অনেক কথা। বলিতে গেলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।

'পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া শেষে বহুদিন পরে রাখাল একটি চাকরি পায়—পোষ্টাপিসের পিওন। তাহার পর পিওন হইতে—হয় পোষ্ট-মাষ্টার।

'কিন্তু এই যে দুঃখ-দুর্ভোগ ইহাও হয় ত সে নীরবে সহ্য করিতে পারিত—যদি সঙ্গিনীটি হইত ইহার মনের মত।

'রাখাল বলে, সে দুঃখের কথা আর বলো না ভাই, মেয়েটা আমায় ভালবাসে না। ভালবাসলে এত ঝগড়া-ঝাঁটি এত কথা কাটাকাটি হয় না কখনও।'

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

লেখা কাগজগুলা প্রায় প্রত্যহই সঙ্গে লইয়া যাইতাম; ভাবিতাম মেজাজ ভাল থাকিলে মাষ্টারকে একদিন পড়িয়া শুনাইব; কিন্তু পড়া আমার আর কোনোদিনই হইয়া উঠিত না।

ভাল মেজাজে রাখাল-মাষ্টারকে পাওয়া বড় কঠিন। যে দিন যাইতাম, শুনিতাম, কেহ না কেহ তাহাকে বিরক্ত করিয়া গেছে।

বিরক্ত করিবার লোকের অভাব নাই। কেহ একখানা পোষ্টকার্ড কিনিতে আসিলেও মাষ্টার তাহাকে দাঁত খিঁচাইয়া তাড়িয়া মারিতে ওঠে। অথচ পোষ্টাপিসে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসিবেই।

গ্রামে তাহার দুর্নামের একশেষ। সবাই বলে, 'এমন বদ্‌-মেজাজী লোক বাবা আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। ওর নামে সবাই মিলে একটা দরখাস্ত না করলে আর উপায় নেই।'

কথাটা শুনিয়া বড় দুঃখ হইয়াছিল। মাষ্টারকে একদিন বলিয়াছিলাম,—'ভাখো মাষ্টার, পোষ্টাপিসের কাজে যে-সব লোকজন আসবে, তাদের সঙ্গে তুমি ওরকম-ধারা ব্যবহার করো না, এতে তোমার ক্ষতি হবে।'

'ক্ষেতি? কি বললি,—ক্ষেতি?' বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া জবাব দিয়াছিল, 'না। ক্ষেতি আমার কেউ করতে পারবে না, তা তুই দেখে নিস্। অনেকে অনেক চেষ্টাই করেছিল কিন্তু পারে নি। উল্টো পিওন থেকে পোষ্ট-মাষ্টার! ভগবান আমার সহায় আছে।

এই বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিল। বলিল, 'ভগবান সহায় না থাক্‌লে··· ভাখ্, আমি যে কারও ক্ষেতি কোনো দিন করি নি রে, আমার ক্ষেতি কেউ করবে না দেখিস্। ক্ষেতি যা কিছু আমার করবার, তা ওই উনি করেছেন।' বলিয়া সে তাহার অন্তঃপুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'চুপ! শুনতে পেলে কিছু বাকি রাখবে না।'

চুপ করিয়াই ছিলাম।

মাষ্টার কিন্তু চুপ করে নাই। বলিতে লাগিল, 'গাঁয়ের লোক আমার বদনাম করে। না? তা ত করবেই, বেটারা নিমক্‌হারাম! আমি সাচ্চা মানুষ কি না! ওই ভাখ—ওই রেজেষ্টারী চিঠিখানা ফেলে রেখেছি। কেন রেখেছি জানিস? ওই অবিনাশ-বেটার কাছে সেদিন আমি চাল কিনতে গেলাম; শুনলাম, না কি ব্যাটা টাকায় দশ সের করে বেচছে। আমায় দেখে বলে কি না, 'না ঠাকুর চাল আমি আর বিক্রি করব না। টাকায় দশ সের করে ত নয়—টাকায় আট সের।' অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর বললাম, 'তাই আট সেরই দে না রে বাপু; ঘরে যে এদিকে গিন্নি আমার জল চড়িয়ে বসে আছে।' অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না ঠাকুর, মিছে বকাবকি—আমি দেবো না।' আচ্ছা দাঁড়া রে ব্যাটা অবিনাশ, তোকে কি আমি একদিনও পাবো না!—বাস্, পেয়েছি। রেজেষ্টারী চিঠি একখানা এসেছে ব্যাটার নামে। আজ দুদিন হলো—ওইখানে পড়ে আছে। থাক্ ব্যাটা ওইখানে পড়ে!'

বলিলাম, 'কিন্তু এ তোমার অন্যায় মাষ্টার!'

'অন্যায়?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিল, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে?'

কি আর বলিব। চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু রেজেষ্টারী চিঠি ফেলিয়া রাখা যে অন্যায়, সে কথা বোধ করি

রাখালমাষ্টার ভুলিতে পারিল না; তাই সে আবার আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'অন্যায় কিসের শুনি? সে যে অন্যায় করলে সেটা বুঝি অন্যায় হলো না? আমার অন্যায়টাই অন্যায়। নয় রে?'

কি যে বলিব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার চিঠি কয়খানি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, মাষ্টার ধরিয়া বসিল, 'ওসব চল্‌বে না, তুই বলে যা!'

বলিলাম, 'চাল সে না দেওয়ায় তোমার ক্ষতি কিছু হয় নি, কিন্তু এতে যদি তার ক্ষতি হয়?'

মাষ্টার অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসে ক্ষেতি হয়?'

'চিঠিখানা ফেলে রাখায়।'

'তাও ত বটে!' বলিয়া মাষ্টার নীরবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'ঠিক বলেছিস্। লেখক মানুষ কি না, বুদ্ধি সুদ্ধি একটু আছে।'

উভয়েই চুপ।

মাষ্টার সহসা বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা।' বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—'হয়েছে তোর চিঠি নেওয়া?'

ঘাড় নাড়িয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম!

অবিনাশের চিঠিখানি হাতে লইয়া মাষ্টার বলিল, 'চল্ তবে নিজেই দিয়ে আসি। কাজ কি বাপু, রেজেষ্টারী চিঠি, দরকারীও ত হ'তে পারে! চল্।'

দু'জনে একসঙ্গেই বাহির হইতেছিলাম, বাহিরের দরজার কাছে দেখি, একজন হৃষ্টপুষ্ট লম্বা চওড়া সাঁওতাল ছোক্‌রা দাঁড়াইয়া আছে; মাথায় বাবরি চুল, গলায় লাল কাঁটির মালা, হাতে একটা বিড়ালের বাচ্চার মত মেটে-রঙের মরা খরগোস। সাঁওতাল ছোকরাটিকে দেখিবামাত্র রাখাল-মাষ্টারের মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল; চৌকাঠের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'কে…মুংরা…তুই আজও এসেছিস…' বলিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে কামড়াইতে মাষ্টার কি যেন ভাবিতে লাগিল।

মুংরা বলিল, 'ধেৎ তেরি, রোজ রোজ পুইসা নাই, পুইসা নাই; আনতে তবে তুঁই বলিস কেনে?'

অনুমানে ব্যাপারটা কতকটা বুঝিলাম। মুংরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত দাম?'

মুংরা দাম বলিবার আগেই মাষ্টার বলিয়া উঠিল, 'নিবি তুই? আহা খরগোসের মাংস—বুঝলি কি না—ভারি সুন্দর! আমার বৌ খুব ভালবাসে। দু'তিন মাস ধরে আমায় বলছে, কিন্তু ছাই এমন দিনে মুংরা আসে যে আমার হাতে পয়সাই থাকে না। আরও দু'বার দুটো এনেছিল, তা ওই যে বললাম, এমন দিনে আসে হতভাগা...। দাম? দাম আর বেশী কোথায়, দাম দু' আনা।'

পকেট হইতে একটি দু' আনি বাহির করিয়া মুংরার হাতে দিয়া বলিলাম, 'দে, ওটা আমায় দিয়ে যা।'

মুংরা অত্যন্ত খুশী হইয়া হাসিতে হাসিতে দু' আনিটি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

'দাঁড়া তবে; দাঁড়া।' বলিয়া মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া লোহার একটি লম্বা ছুরি আনিয়া বলিল, 'বেশ করে কেটে ওকে কুটে গিয়ে যা মুংরা, বাবু ছেলেমানুষ, কুটতে পারবে না—বুঝলি? সেই তোরা যেমন করে কুটিস্! যা—আগে ওই ছোট তালগাছটা থেকে একটা 'বাগড়ো' কেটে আন্, তারপর, তালের ওই পাতা দিয়ে বাবুকে জিনিসটে বেশ ভাল করে বেঁধে দিবি, বুঝলি? বাবু হাতে করে ঝুলিয়ে বাড়ী নিয়ে যাবে।'

সুমুখের ছোট তালের গাছ হইতে একটা 'বাগড়ো' কাটিয়া আনিয়া মুংরা খরগোস কাটিতে বসিল।

মাষ্টারের রেজেষ্ট্রী চিঠি দিতে যাওয়া আর হইল না। বলিল, 'থাক্, পিওনের হাতে পাঠালেই চলবে।' বলিয়া চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, 'মামার বাড়ী যখন ছিলাম, বন্দুক নিয়ে প্রায়ই শিকার করতে যেতাম। যেতাম বটে, কিন্তু একটা পাখীও কোনো দিন মারতে পারি নি, বুঝলি? গুলি ছুঁড়তাম। ছোঁড়বার সময় মনে হতো—আহা, কেন মারব। বাস্, হাত যেতো কেঁপে, আর শিকার যেতো ফস্কে। একদিন একটা কুকুর মেরেছিলাম। মামার ছিল পায়রার সখ। বুঝলি?' বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিয়া চুপ করিল। বিগত দিনের সুখৈশ্বর্য্যের স্মৃতি বোধ করি তাহার মনে পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ চাহিয়া বলিল, 'বাড়ীতে অনেকগুলো পায়রা ছিল।

নানান্ রকমের পায়রা। একদিন একটা পায়রাকে বুঝি বেড়ালে ধরেছিল। পায়রাটা খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে চলতো, ভাল করে উড়তে পারতো না। পাশের বাড়ীর সুরেশের পোষা কুকুরটা একদিন ঝপ্ করে এসে তার ঘাড়ে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে—দিলে পায়রাটাকে মেরে। আমার রাগ হয়ে গেল। জানিস ত' আমার রাগ! বাস, তৎক্ষণাৎ বন্দুক বের করে চালালাম গুলি। দড়াম করে লাগলো গিয়ে কুকুরটার পেটে! কঁাই কঁাই করে সে কী তার কান্না! ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। আবার গুলি! বাস! খতম! কুকুরটা ছটুছটু করতে করতে গোঁ গোঁ করে আমার চোখের সুমুখে মারা গেল। উঃ! সে কী দৃশ্য।'

বলিয়া মাষ্টার একবার শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, 'সেই যে বন্দুক ছেড়েছি, জীবনে আর কোনো দিন...' এই বলিয়া সেই যে সে মুখ ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া রহিল, অনেকক্ষণ অবধি সে আর কথা কহিল না।

তাহার গল্পটা আমার পকেটেই ফিরিত। ভাবিলাম ইহাই উপযুক্ত সময়। বাহির করিয়া বলিলাম, 'গল্প তোমার খানিকটা আমি লিখেছি। শোনো।'

মুখের ঢাকা খুলিয়া মাষ্টার বলিল, 'পড়।'

পড়িলাম।

খানিকটা শুনিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'নাঃ, গল্প লিখতে তোরা জানিস না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন?'

মাষ্টার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'নাঃ, দুঃখু তুই নিজে পাস নি কোনো দিন, দুঃখুর কথা তুই লিখবি কেমন করে। আমি যদি লিখতে জানতাম ত' দেখিয়ে দিতাম কেমন করে লিখতে হয়।—আচ্ছা পড়। শুনি শেষ পর্য্যন্ত।'

শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া কি একটা কথা যেন সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—মুংরার দিকে। মাংস কুটিয়া সে তখন দু'জায়গায় ভাগ করিতেছে। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি রে, দু'জায়গায় কেন?'

বলিলাম, 'আমি বলেছি। একটা তোমার, একটা আমার।'

'আমার?' বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'বানর

বললাম আমার কাছে পয়সা নেই···তুই আচ্ছা বোকা ত! চারটে পয়সাই বা আমি এখন পাই কোথায়?'

বলিলাম, 'পয়সা তোমার দিতে হবে না।'

মাষ্টার সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইল; তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চারটে পয়সা খরচ করবারও ক্ষমতা আজ আমার নাই।' বলিতে বলিতে চোখ-দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

ভাগ-দুইটার মধ্যে একটা ভাগ বেশি করিয়া দিয়া ছোট ভাগটা মুংরা মাঝিকে তালপাতায় মুড়িয়া বাঁধিয়া দিতে বলিলাম!

মাষ্টার বলিল, 'দাঁড়া, গিন্নিকে দেখিয়ে আনি।'

বলিয়া একটা ভাগ সে দু'হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া হাঁকিতে লাগিল, 'গিন্নি! এ গিন্নি!'

সেই অবসরে আমার ভাগটা লইয়া আমি পলায়ন করিলাম।

যথাসম্ভব দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে ডাক শুনিয়া তাকাইয়া দেখি, রাখাল-মাষ্টার ছুটিতে-ছুটিতে আমার পিছু ধরিয়াছে। সারাপথ ছুটিয়া আসিয়া মাষ্টার হাঁপাইতে লাগিল। বলিল, 'পালিয়ে এলি যে? আয় তোকে একবার আসতে হবে।' বলিয়া সে আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

'কেন?' বলিলাম, 'না, রাত হয়ে যাবে, আমি আর যাব না।'

মাষ্টার কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল, উঁহু, যেতেই হবে তোকে।' ব্যাপার কিছু বুঝিলাম না। বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। হাতে ধরিয়া আমায় পোষ্টাপিসের ভিতরে লইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে মাষ্টার হাঁকিল।

'ধরে নিয়ে এসেছি গিন্নি, ওগো ও শ্রীমতী কোথায় গেলে!'

মাথায় একটুখানি ঘোমটা টানিয়া শ্রীমতী আসিয়া দাঁড়াইল।—এক হাতে একগ্লাস জল আর এক হাতে ছোট একটি পাথরের বাটিতে খানচারেক বাতাসা।

মাষ্টার বলিল, 'একটু জল খা।'

পাছে দুঃখ পায় বলিয়া বাতাসা-কয়টি চিবাইয়া জল খাইলাম।

মাষ্টার হাঁকিল 'পান? পান কোথায়?' বলিয়াই সে নিজের ভুল শুধরাইয়া লইল। বলিল, 'ও, পান ত' নেই বাড়ীতে। পান আমরা দুজনেই খাই না। আচ্ছা দাঁড়া দেখি।'

বলিয়া কি যেন আনিবার জন্য মাষ্টার ভিতরে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল না, পিতলের একটি রেকাবির উপর চারটি কাটা সুপারি ও কতক গুলি মৌরী লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার স্ত্রী আবার ঘরে ঢুকিল। রেকাবি হইতে সুপারি লইতে গিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—আয়ত দুইটি চক্ষু, ম্লান একটুখানি হাসি। গৌরবর্ণ কৃশাঙ্গী যুবতী,—দেখিলে সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়। তবে সৌন্দর্য্য যে তাহার একদিন ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। দুঃখে দারিদ্র্যে সৌন্দর্য্য আজ তাহার ম্লান হইয়া গেছে। ভাবিলাম, গল্পে যে জায়গায় তাহাকে কুৎসিত লিখিয়াছি সে জায়গাটা কাটিয়া দিব।

হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিলাম, 'নমস্কার! আজ আসি।'

মাষ্টার-গৃহিণী প্রতি-নমস্কার করিল না, কোনও কথা বলিল না, ম্লান একটু হাসিয়া মাত্র তাহার জবাব দিল।

এ মেয়ে যে কেমন করিয়া মাষ্টারের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইয়া আসিলাম; মাষ্টারও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর আসিয়া মাষ্টার হাসিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখলি।'

কি দেখিলাম সে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ।'

মাষ্টার বলিল, 'ত্থাখ, আমার গল্পের মধ্যে সেই যে এক জায়গায় লিখেছিস—ও আমায় ভাল বাসে না, ওটা কেটে দিস্।'

বলিলাম, 'নিশ্চয়ই।'

ভাবিলাম গল্পটা আগাগোড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লিখিব।



শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মোট বারো

ঘাটের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের আশ্রয় নির্ম্মাণ করা বোধ হয় তখনকার প্রথা ছিল। তাই তখনকার কোন ধার্ম্মিক জমিদার এই বাঁধান ঘাটটি ও তার সঙ্গে গঙ্গাযাত্রীদের সুবিধার জন্য দুটি গৃহ নির্ম্মাণ করে পুণ্যসঞ্চয় করেছিলেন।

এখন সে জমিদার বংশের অবনতি ঘটেছে। সেই জমিদারেরই এক অভাব-গ্রস্ত প্রপৌত্র সেই ঘর দুটিই ভাড়া দিয়ে পুণ্যের চেয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। ভাড়া অবশ্য সামান্যই। কারণ সংস্কার অভাবে দুটি ঘরেরই জীর্ণদশা; গা-ময় ঘুটের প্রলেপ। একটিতে এক পক্ষীরাজের বংসাবতংস একাকী সগৌরবে বাস করেন, অপরটিতে থাকে তাঁর যান, আর তিনটি ছাগল চারটি ছোট বড় ও মাঝারি কুকুর, একটি পুরুষ ও একটি নারী।

পুরুষটি একধারে পক্ষীরাজের বংশধরের সেবক রক্ষক ও চালক—একদিন আধদিনের নয় গত পেনেরো বছরের। মালিক বদল হয়েছে বটে ঘোড়ার, কিন্তু সেবকের পদে এ পর্য্যন্ত আর কেউ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ঘোড়া ও মানুষ পাশাপাশি জীবনের পথে বার্দ্ধক্য এসে পৌঁছেচে।

ঘোড়ার নাম কেউ কখনও বোধ হয় রাখে নি—সহিসের নাম ঘমণ্ডি। সে নামকরণ সে বোধ হয় নিজেই করেছিল। আরা জেলার অখ্যাত কোন গাঁ থেকে একদিন শৈশবে বর্ষার বাঁধ ভাঙ্গা শোন্ নদীর বন্যায় তাকে বাপ মা আত্মীয় স্বজন আশ্রয় সমস্ত আপদ বালাই থেকে একেবারে মুক্ত করে কৌতুহলহীন সংসারের মাঝে ভাসিয়ে এনে ফেলেছিল। তার পর বিশ বৎসর সেই বন্যার নেশা কাটে নি; সংসারের আনাচে কানাচে গলিতে ঘুঁজিতে সে কোন লক্ষ্যহীন স্রোতের খামখেয়ালিতে অসহায়ভাবে ভেসে ফিরছে; অপ্রত্যাশিত ভাবে আছাড় খেয়েছে, অযাচিত ভাবে আশ্রয় পেয়েছে, আবার আকরণে বিতাড়িত হয়েছে।

ত্রিশ বছর বয়সে স্থায়ী আশ্রয় পেল, পেল ওই ঘোড়াটির অনুগ্রহে, ওই গঙ্গাযাত্রীদের সাবেক চটিতে।

ঘোড়াটির তখন প্রথম যৌবন। মাথা একটু সহজেই গরম হয়ে উঠে

একদিন হঠাৎ কি খেয়ালে চাটু ছুড়ে সহিস বেচারিকে ঘাল করে গাড়ী উল্টে—ক্ষেপে দৌড় দিলে। জনাকীর্ণ রাস্তায় এক তুমুল কাণ্ড বাধল। ক্ষেপা ঘোড়াকে থামান যায় না; সোজা রাস্তায় বহুদুর দৌড়ে বাধা পেয়ে একটু থামে, আবার ফিরে বিপরীত দিকে দৌড় দেয়। রাস্তার লোক চলাচল একরকম বন্ধ হয়ে গেল। একটি বৃদ্ধার ঘোড়ার ধাক্কায় খোয়ার ওপর পড়ে গিয়ে মাথা ফাট্‌ল। দুচারজন অল্প সল্প আহত হল। এই রকম দৌড়ের মাঝে হঠাৎ এক মোড়ের মাথায় গরুর গাড়ীতে বাধা পেয়ে ঘোড়াটি ক্ষণেকের জন্যে থাম্‌ল।

ঘমণ্ডির কিছুদিন থেকে কাজকর্ম্ম ছিল না। সারাদিন চার পয়সার চানা চিবিয়ে, খইনি টিপে ঘুরে বেড়াতো। সে কাছেই কোথায় ছিল। দিনকতক এর পূর্ব্বে কোথায় কোচোয়ানী করায় এই জাতির অভিজ্ঞতাও তার ছিল। সে হঠাৎ সাহস করে সাম্‌নে এসে লাগামটা ধরে ফেল্লে।

সে লাগাম সে এ পর্য্যন্ত আর কাকেও ধরতে দেয় নি।

খোঁজ করে যখন মালিককে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে এলো তখন মালিক তাকে অস্থায়ী ভাবে সহিসের পদে বাহাল করতে চাইলেন। সে রাজী হল। সাবেক সহিসের পাঁজরার দুটো হাড় ভেঙ্গে গেছল—সে তখন হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেও সে সহিসত্বের দাবী নিয়ে কোন দিন গোল করেনি, তবে ঘমণ্ডিকে এই দুঃসাহসের নোক্‌রী ছেড়ে দেবার জন্য বিস্তর সদুপদেশ দিয়েছিল। ঘমণ্ডি তা খেয়াল না করায় যাবার সময় চুপি চুপি ঘমণ্ডির কানে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ছাড়তে পেড়াপিড়ি করার আসল কারণটি সে বল্লে, তার পর চোখদুটো পাকিয়ে ঘাড় বাকিয়ে ঘমণ্ডি এই মোক্ষম সংবাদটির উপর কি বলে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঘমণ্ডি তাচ্ছিল্য ভরে মুখ বেঁকিয়ে বল্লে, "ঝুটবাত্‌!"

ঝুটবাত্‌! সে নিজের চক্ষে দেখেছে—ঝুটবাত্‌! ভূতপূর্ব্ব সহিস আরো বোঝাতে চেষ্টা করে—এ ঘরে কত লোক মরে গেছে তাদের ভূতগুলো যাবে কোথায়!

আর সে যে স্বচক্ষে রাত্তির বেলায় দেখেছে এই ঘোড়া প্রকাণ্ড একটা জিন্‌ হয়ে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। আর তার পাঁজরাই বা ভাঙ্গল কেন! ঘোড়াভূত তার লুকিয়ে দেখা টের পেয়েছিল না!

ঘমণ্ডি জানালে সে তাহলে ঘোড়াভূত না দেখে এখান থেকে নড়বে না। তার ভূত দেখবার ভারি ইচ্ছা!

এই অন্যায় আব্দারে আগেকার সহিস অত্যন্ত চটে গিয়ে পোঁটলাপুঁটলি তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে জানিয়ে গেল—এই বেয়াড়াপণার জন্যে ঘমণ্ডিকে পস্তাতে হবে। ভূতের সাথে ছেলেখেলা!

ঘমণ্ডিকে পস্তাতে হয় নি বোধ হয়। তার পর পোনেরো বছর কেটেছে।··· ঘোড়াটি সামনের বাঁ পা তুলে বাতাস আঁচড়াবার ভঙ্গি করে। ঘমণ্ডি বলে "এ বুঢ়ুয়া! তোহার ভুখ লাগল্ হো।"

বুঢ়ুয়া কান দুটি নেড়ে গলাটি বাড়িয়ে দেয়। তারা পরস্পরের নাড়ী নক্ষত্র জানে।

ঘোড়া ও মানুষ একত্র হল; এবার এল কুকুর।; পোনেরো বছর আগে একদিন শীতের সমস্ত দীর্ঘ রাত ঘমণ্ডি জেগে কাটালে। সমস্ত রাত ধরে নিকটে কোথায় কটা সদ্যোজাত কুকুর-ছানা এমন বিকট কান্না কেঁদেছে যে ঘুমোয় কার সাধ্য। সকালবেলা খোঁজ করতে দেখা গেল পথের একটা বেওয়ারিশ 'লেড়ি কুত্তা' স্থানাভাবে এই দারুণ শীতে ঘাটের সিঁড়ির ওপরই প্রসব করে মারা পড়েছে। দুটো তুলোর পুঁটলির মত নরম আকারহীন মাংসের ডেলা, তখনও শীর্ণ রোঁ-ওঠা কঙ্কালসার কুকুরীটির মৃতদেহের ওপর পড়ে মাই গুলো নিয়ে টানাটানি করছিল ও মাঝে মাঝে অসহায় ভাবে ক্ষীণ শব্দে কি প্রকাশ করছিল কে জানে। আর দুটি মাংসের ডেলা সমস্ত রাত উত্তাপের জন্যে কাৎরে তখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে একেবারে।

ঘমণ্ডি জীবিত বাচ্চা দুটোকে ঘরে এনে আশ্রয় দিলে। অনেক আদর যত্ন সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত একটিই বাঁচল, অপরটিকে কোন রকমে রাখা গেল না। ঘমণ্ডির সংসারে একটি প্রাণী বাড়ল।

······কুকুর বাচ্চাটি নড়বড়ে পায়ে ভর করে টল্‌তে টল্‌তে সমস্ত ঘর দোর তদারক করে বেড়ায়, থালাটাকে একবার শোঁকে, ঘোড়ার সাজগুলো একটু চেটে দেখে, দুটি ঘরের মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘোড়াটিকে পর্য্যবেক্ষণ করে সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিজের বিরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করে।

ঘোড়াটি একবার ঘাড় বাঁকিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে তার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়, তারপর এই নগণ্য সমালোচনা উপেক্ষা করে প্রশান্ত মনে পা ঠোকে, লেজ দুলিয়ে মাছি তাড়ায় ও নাসিকা ধ্বনি করে।

এই নাকের শব্দে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে, কুকুর বাচ্চা কটূতর ভাষা প্রয়োগ করে।

একদিন এই থেকে একটু বিপদ ঘটল। নিছক গালাগালিতে কোন ফল না পেয়ে কুকুর বাচ্চা একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবে অগ্রসর হয়ে সেদিন ঘোড়ার পায়ের ওপর আপনার দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করে বসল।

ঘমণ্ডি উনুন ধরাচ্ছিল, হঠাৎ আকাশ-ফাটা আর্ত্তনাদে চমকে উঠে ছুটে গিয়ে দেখে বীর কুকুর-কুমার চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে চীৎকার করছে এবং ঘোড়াটি বিস্মিত হয়ে ঘাড় নামিয়ে এই ক্ষুদ্র বেয়াদবটির সর্ব্বাঙ্গ শুঁকে দেখছে। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ কুকুর বাচ্চার ভয়ার্ত্ত চীৎকার থামল না এবং কয়েক দিন সে দরজায় চৌকাট পর্য্যন্ত মাড়াল না।

তারপর বোঝাপড়া অবশ্য হয়েছিল। একদিন দেখা গেল সে বেশ নির্ভয়ে ঘোড়ার পায়ের ফাঁকে খেলে বেড়াচ্ছে।

বয়সের সঙ্গে সাহস বাড়ল। রাস্তায় অপরূপ বেশে কাবুলিওয়ালাকে যেতে দেখে একদিন সাজ পোষাকের অশোভনতা সম্বন্ধে সে তীব্র প্রতিবাদ করলে। ফিরে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘমণ্ডি অনুমোদন করল কিনা তাও একবার দেখে নিলে। একদিন ভাল্লুক সমেত এক বাজীকরকে অন্যান্য সহযোগীর সঙ্গে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধাওয়াও সে করে এল। সে এক স্মরণীয় দিন। কাপুরুষ ভাল্লুক পালিয়ে ত গেলই, একবার ফিরে তাকাতেও সাহস করলে না। ঘমণ্ডিকে সেই বীরত্ব কাহিনী কণ্ঠ ও ল্যাজের সাহায্যে সে অনেক করে বুঝিয়ে দিলে। ঘমণ্ডি বুঝলে কিনা বলা যায় না। কিন্তু বুঝলেও এ বীরত্বের যথোচিত মর্য্যাদা সে যে দেয়নি এটা ঠিক—প্রতিদিনের মতই সে উচ্ছিষ্ট ভাত কটা থালায় রেখে ডাকলে—"লে দুখিয়া।"

দুখিয়া প্রতিদিনের মত ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেল না। গোটাকতক ইঁদুর ঘরে বড় উপদ্রব করত। এ পর্য্যন্ত বহুবার তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করেও দুখিয়া কিছু করে উঠতে পারে নি। অসভ্য ইঁদুরগুলো দেখা দিয়েই ঘরের কোণের গর্ত্তে গিয়ে ভীরুর মত আশ্রয় নেয়। আজ ঘমণ্ডির এই আবেগহীন অভ্যর্থনায় অত্যন্ত ক্ষুন্ন হয়ে সেই মূষিকদের সদর দ্বারে দাঁড়িয়ে তাদের গর্ত্ত আঁচড়ে সে হঠাৎ ভয়ানক হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আস্ফালন সুরু করে দিলে। আজ সে একটা রক্তারক্তি করবেই।

অন্ধ ঘমণ্ডি! সে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘোড়ার গা ডল্‌তে গেল। অগত্যা আস্ফালন ত্যাগ করে দুখিয়াকেই আসতে হয়।

তারপর কিছুদিন বাদে ঘমণ্ডির ঘরের সামনের রাস্তায় দুখিয়ার পানি

প্রার্থীদের সমাগত হতে সুরু হল। এবং সেই প্রণয়ীদের দ্বন্দ্ব কলহে রাস্তা সরগরম হয়ে উঠ্‌ল। দুখিয়ার নাগাল পাওয়া এখন ভার! নারীর ছলা কলা কৌশল তার পুরোদস্তুর আয়ত্ত।

কয়েক মাস পরে ঘোড়ার ঘরের একটি নিরাপদ কোণে ঘাসের বস্তার ওপর আবার কটি তুলোর পুঁটলির মত বাচ্চা দেখা গেল।

ঘমণ্ডির ঘরে এখন সেই দুখিয়ারই দৌহিত্র দৌহিত্রীরা ঘুরে বেড়ায়।

সকাল বেলা রাস্তার ধারের দরজায় একটা মোটা লোমের কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ঘমণ্ডি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দাঁতন করছিল। দুটো চট্ গায়ে বেশ করে জড়িয়ে অনিচ্ছুক ছাগলীটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দুলারী এসে দাঁড়াল।

"দুখিয়াকে ত দুরোজ ন দেখলু হম; কাঁহা গইল বা?"

রোজ রোজ এই গায়ে-পড়ে আলাপ করা ঘমণ্ডির পছন্দ হয় না। আজ সে দাঁতন করবার ছুতোয় মুখ বুঁজে রইল। দুলারী অনিমন্ত্রিত হয়েই ধুপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল, তারপর ছাগলের দড়িটা পায়ের সঙ্গে বেঁধে জানালে,— এমন শীত সে কখন দেখেনি। বাবুদের রকে শুয়ে মাঝ রাতে মনে হয় হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত হিম হয়ে গেছে।

দাঁতন আর কতক্ষণ ধরে করা যায়! ঘমণ্ডি দাঁতনের ছিবড়েগুলো থুতুর সঙ্গে ফেলে বল্লে—বুড়ো হলে অমন শীত একটু বেশী লাগে।

—বুড়ো আমি বুড়ো?—ঘরের ভেতর গরমে শুয়ে অমন সবাই বলতে পারে; হুঁ ওখানে শুক্ ত দেখি কে কত বড় জোয়ান।

ঘমণ্ডি সকৌতুকে এই আধাবয়সী স্থূলকায় মেয়েমানুষটির যুবতী থাকিবার ইচ্ছা লক্ষ্য করে বল্লে,—আমিত বুড়োই হয়েছি, তুইও ত তাহলে বুড়ী।

এবার যে কারণেই হোক্ কথাটা দুলারীর অপছন্দ হ'লনা। হাস্যের বেগে স্থূল শিথিল উদরের ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে প্রায় লুটোপুটি খেয়ে দু তিনবার আবৃত্তি করলে,—"বুঢ্‌ঢা আউর বুঢ্‌ঢা।" তারপর আবার হাসি।

এই অহৈতুক উচ্ছ্বাসে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠে ঘমণ্ডি কঠিন স্বরে বল্লে, "রুপয়াঠো মিলি কি ন?"

হাসি থামিয়ে উঠে গুনচট্‌গুলো ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে অনিচ্ছুক ছাগলীটাকে একটা হেঁচকা দিয়ে দুলারী মুখ ভার করে বল্লে,—

—টাকা! টাকা! রোজ রোজ তাগাদা! টাকা যেন আমি দেবনা! বলছি এই ছাগলের দুধের টাকা, বাবুদের বাড়ির মাইনের টাকা সব এক সঙ্গে

পেলে দেব। এ মাস কাবার হোক্ আগে! তারপর ছাগলীটাকে আর একটা হেঁচ্‌কা দিয়ে বল্লে, "উঠ্‌ বেটী!"

ঘমণ্ডি লোটা থেকে জল নিয়ে একটা কুলকুচো করে বল্লে, ও ওজর এই দুমাস ধরে শুনছি, এবার যেন টাকা না নিয়ে এখানে আসা না হয়।

কিন্তু দুলারী তবু আসে, এবং টাকার কথাটা তার স্মরণ থাকে না। এসে দুখিয়ার বাচ্চাগুলোকে কোলে করে নাচিয়ে আদর করে। কোনদিন বা ঘমণ্ডির খাওয়া দাওয়া শেষ হলে যেচে বলে "তু রখদে। বর্ত্তন হম্ মলি।" ঘমণ্ডি বেশী কথা কয় না—সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চায় তারপর বাসনকোষণগুলো ফেলেই রাখে। সন্ধ্যার সময় এসে ঘমণ্ডির হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে টান্ দিতে দিতে দুলারী বলে,—বক্‌রীটার আবার শীগ্‌গীর ছানা হবে, বাবুদের বাড়ীর চাক্‌রীও বেশ সুখের, তার অভাব কিসের? এগু বাচ্ছা নেই যে খাওয়াতে হবে। গতর আছে, রোজগার করে খাসা সুখে সে আছে।

ঘমণ্ডিকে সম্প্রতি তার এক দোস্ত দেশে ফিরে যাবার সময় একটি তিতির পাখী বেচে গেছে। ঘমণ্ডি খাঁচাটা নামিয়ে অন্য মনে শিষ্ দেয়। এ সব কথা যেন তাকে বলা হচ্ছে না। আর এ সব অর্থহীন কথার জবাবই বা কি হতে পারে।

দুলারী হুঁকোটা ফিরিয়ে দিয়ে আপন মনেই বলে যায়—ঠাট্টা বট্‌কেরা তার ভাল লাগে না—হরদুঙ্গি সেদিনের ছোঁড়া, দারু পিয়ে মাতাল হয়ে সেদিন বলে কি না—দুলারী আমার পিয়ারি হবি? তেমনি তার মুখ ভেঙ্গে দিয়েছে সেদিন। হরদুঙ্গি একটা চেংড়া গোলাদার! ঘর করতে গেলে কি আর লোক নেই।

ঘমণ্ডি নীরবে তামাক খেতে খেতে ডিবিয়ার আলোয় দুলারীর অত্যধিক পুষ্ট হাতের কব্জি থেকে কুনুই পর্য্যন্ত আঁকা উল্কিগুলো কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করে; তারপর নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করে,—ছাগলের দুধের 'ভাও' কত আজ কাল?

ছাগলের দুধের দাম!—দুলারীর চোখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!—ছাগলের দুধ টাকা টাকা সের! ছাগলের দুধ অমন সস্তা জিনিষ নয়। আর তার ছাগলী এই বাচ্চা হলেই ত রোজ দুসের দুধ দেবে!

ঘমণ্ডি হুঁকোটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে বলে,—তাই নাকি? বেশ মুনাফা আছে ত!

তুলারী অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আমিরী চালে বলে,—তব্ কা!

ঘমণ্ডি খানিকক্ষণ মাথানীচু করে বসে থেকে শেষে কানা উঁচু একটা কাঁসি বার করে ঠোঙা থেকে আটা ঢালতে আরম্ভ করে।

তুলারী বলে—থাক্ থাক্ আজ না হয় 'রাটিট্টা' আমিই পাকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

তুলারী উঠে গিয়ে আটা মাখতে বসে। ঘমণ্ডি বলে—"তব তোহার ভি রোটি হিঁয়ে বনা লে।"

তুলারী বিনা আপত্তিতে আর খানিকটা আটা ঢেলে নিয়ে মাখতে মাখতে গল্প করে। কথায় কথায় বলে—গলির ভেতর ডাগ্‌দার বাবুর বুড়ো কোচোয়ান নাকি ত্রিশ টাকা মাইনে পায়।

—ত্রিশ টাকা পায় না আরো কিছু। এঅঞ্চলে ত্রিশ টাকা ঘমণ্ডি ছাড়া আর কেউ পায় না।

রুটি তৈরী শেষ হলে তুলারী বাবুদের বাড়ীর কাজ সেরে আসবার জন্যে উঠ্‌ল। গাড়ীটার এক পাশে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ একটুখানি জায়গায় দড়ির খাটিয়ার উপর কম্বল গায়ে দিয়ে ঘমণ্ডি শুয়েছিল। তুলারীকে উঠ্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"হো গইল্?"

"হাঁ। হম্ অব যাওত্ বানি।"

ঘমণ্ডি খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—ছাগলের দুধ সত্যি টাকা টাকা সের ত?

অনিচ্ছুক ছাগলীটার গলার রসি ধরে টান্‌তে টান্‌তে তুলারী একদিন ঘমণ্ডির আস্তানায় এসে উঠ্‌ল। সে এগার বছর আগেকার কথা। শাঁখ বাজল না, উলুধ্বনি হল না,—কোন উৎসবের আয়োজন দেখা গেল না।

ঘরে একটু স্থানাভাব হয় বটে, কিন্তু সে এমন কিছু নয়! দুখিয়ার বাচ্চা-গুলি বড় হয়েছে। তারা আপনা থেকেই গাড়ীর ভেতর রাত্রিবাস করবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। এমন কিছু গোলমাল নেই। ছাগলীর বাচ্চা হলে ঘমণ্ডি একদিন দুসের দুধ না হওয়ার জন্যে গালাগাল করেছিল বটে, কিন্তু তুলারীও তার জবাব দিয়েছিল—ত্রিশ টাকা মাইনে কোথায় গেল?

বছর যায়! একটা কুকুর মরে আর একটা আবার বাচ্চা দেয়। প্রথম ছাগলটা হঠাৎ একদিন কি খেয়ে এসে বমি করে চোখ উলটে শেষ হয়ে গেল। আরেকটা রাস্তার ঘোড়ার গাড়ীতে চাপা পড়ে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে এল।

একটা বেড়াল কোথা থেকে এসে ভাগ বসিয়েছে। দুলারীর দেহের পরিধি দিনের পর দিন বাড়ে। ঘমণ্ডি কম্বল কাঁথা গুন্‌চট্ মুড়ি দিয়ে জ্বরে পড়ে,—দুলারীর স্থূল দেহের গেঁতোমি নিয়ে গালাগালি করে সেরে ওঠে। বছর যায়।

সকালবেলা গলায় ঘুঙুর বাঁধা ছ মাসের চঞ্চল দুরন্ত ছাগলছানাটা সবার আগে বন্ধ দরজার কাছে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে সুরু করে। দরজায় মাথা দিয়ে ঠেলা দেয়; থালা ঘটিগুলো পায়ে লেগে শব্দ করে ওঠে। দুলারী সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যে অতি কষ্টে পাশ ফিরে ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলে, "দেখ ত ওকর বদমাসী!" তবু বদমাসী থামে না। ছাগলছানা এক লাফে গাড়ীর ভেতর উঠে, ঘুমন্ত কুকুরগুলোকে মাড়িয়ে এক হট্টগোল বাধিয়ে তোলে। ঘমণ্ডি চোখ রগড়ে উঠে বসে, তারপর উঠে দরজা খোলে। বেড়ালটা দুলারীর কোলের কাছ থেকে উঠে মাথা ঝাঁকিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে ল্যাজ তুলে পাগুলো টান করে আলস্য ভেঙে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিতিরটা খাঁচার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করে। ঘমণ্ডি পা দিয়ে দুলারীকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, "উঠ বুঢ্‌ঢি হাঁথি, উঠ্।"

মানুষ ও পশু জাগে, মানুষ ও পশু আবার রাত্রে গায়ে তাল পাকিয়ে নিদ্রা যায়। সমস্ত দিন রান্না-বাড়া, খাওয়া-দাওয়া আছে, কলতলায় জল নিয়ে ঝগড়া আছে,—

"দিন ভর্ তু পানি ভরত্ রহি, আউর কোন পানি ন লেব?"

অপর পক্ষ উত্তর দেয়—"হম্‌ত আগাড়ি আয়ল্।"

"আগাড়ি আয়ল্ ত কা রাজা ভয়ল! তু দিন ভর পানি লেই। ই তোহার নানাকে কল ন হও।"—

ঘুটে দেওয়া আছে, সন্ধ্যাবেলায় জট্‌লা আছে।

মাতোয়ালা গোলদার হরদুঙ্গি আসে আর সরেঙ নিয়ে, খড়ের গোলার রামজীবন আসে ঢোলক নিয়ে। দড়ির খাটিয়া পড়ে রাস্তায়। ঘমণ্ডী, রামজীবন হরদুঙ্গি বসে, এমন কি বড়বাবুদের দরওয়ান মহাদেও পর্য্যন্ত মাথায় পাগড়ী বেঁধে এসে মাঝে মাঝে সে খাটিয়ায় বসতে দ্বিধা করে না।

দুলারী নীচে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে একটা কুকুরকে পায়ের ওপর শুইয়ে আঁটুল বাছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো মন্তব্য প্রকাশ করে।

"বড় খচ্চর হও উ হমার বিলাড়, চারগো চুহা আজ মারল্, বাকী খায়ল্ ন, দাঁতোসে তনি কাট্ কাট্‌কে ফেক দেল—"

হরদুজি সারেঙ থামিয়ে তার রাঙা ঘোলাটে চোখ দুলারীর ওপর কিছুক্ষণ কৃত্রিম প্রশংসায় নিবদ্ধ করে বলে,—দিন দিন মোটা হয়ে দুলারী যে রকম খপ্‌সুরৎ হয়ে উঠ্‌ছে আর ত তাকে চুরী না করে থাকা যায় না, শুধু "ঘমণ্ডী চিনথ্ আদমী, উত হল্লা করি" এই যা বাধা।

দুলারী মুখ ভার করে রাগের ভান করে। সবাই হাসে।

ভেতর থেকে মশা তাড়াবার জন্যে ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ শোনা যায়। ঘর থেকে দুরন্ত ছাগল ছানাটা নানা ভাবে লম্ফ ঝম্প করতে করতে এসে কি ভেবে থম্‌কে দাঁড়ায়, আবার মাথা বাঁকিয়ে গলার ঘুঙুরগুলো বাজিয়ে কোন অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাল ঠুকে লাফ দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে।—দিন যায়।

এগার বছর কেটেছে। দুলারীর মাথার চুলে বেশ পাক্ ধরেছে, মাংস আরো ঢিলে হয়েছে। চোখের কোণ আরো কুঁচকেছে।

কদিন ধরে সে কোন ভৌজাইনের বেমারের কথা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছে। ঘমণ্ডী গাড়ী বার করে ঘোড়া জুত্‌ছিল। দুলারী আবার জানালে তার ভৌজাইনের বেমার, তাকে দেশে যেতেই হবে।

ঘোড়া জুততে জুততে ঘমণ্ডী উত্তর দিলে,—কোন পুরুষে তার ভাইয়ের নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় নি, আজ আবার ভাজ কোথা থেকে জন্মাল?

ভাজ আবার কোথা থেকে জন্মাবে? যেমন করে সবার জন্মায় তেমনি করে! দুলারী ত আর ভুঁইফোড় নয়, তার মা বাপ ভাই বোন সবই আছে।

ঘোড়া জুতে পায়ে পট্টিটা জড়াতে জড়াতে ঘমণ্ডী বল্লে,—বটে! এতদিন ত ভৌজাইন খবর নেয়নি একটিবার! আর আজ খবরটাই বা এল কেমন করে?

—তার দেশের লোক এসে তাকে খবর দিয়ে গেছে।

—বেশ বেশ! তা যাওয়া হবে কবে?

—আজই।

—আজই? বেশ। কিন্তু ঘমণ্ডী আস্‌বার আগে যেন যাওয়া না হয়।

—তাই হবে। তাই হবে। দুলারী অমন চোর নয়।

ঘমণ্ডী গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। কিন্তু দুপুর বেলায় তার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে আরেক জনের জিম্মায় গাড়ী রেখে ফিরে এল। দুলারী ঘরে ছিল না। দরজা ভেজান, ভেতরে ঢুকে ঘমণ্ডি দেখলে পুটলি পোঁটলা বাঁধা-ছাঁদা শেষ হয়েছে।

দুলারী গঙ্গার ঘাটে গেছল, ফিরে এসে ঘমণ্ডিকে দেখে একটু চমকে উঠে বল্লে—মোট বাঁধতে মেহনৎ লাগে না—সব খোলা হয়েছে যে?

ঘমণ্ডি চোখ রাঙিয়ে বল্লে,—খোলা হয়েছে যে? এ সব থালা ঘটি কার?

দুলারী এবার ক্ষীণস্বরে বল্লে, তোহার হও? লেত্, বাহার কর লে!

সমস্ত পোঁটলা-পুঁটলি থেকে একে একে অনেক জিনিষই বার করে ফেলে ঘমণ্ডি বল্লে,—আরো কি চুরি করা হয়েছে?

—হাঁ চুরি করা হয়েছে! "দেখ না আউর কা হম্ চোরী কয়লু।"

ঘমণ্ডী খপ্ করে তার হাত্‌টা ধরে ফেলে কাপড়টায় এক টান দিলে। এবার দুলারী সমস্ত সংযম ত্যাগ করে উচ্চস্বরে রোদনের সঙ্গে ঘমণ্ডির পিতৃ মাতৃকুলের উদ্ধার সাধন করে মুক্তহস্তে ঘমণ্ডির ওপর কীল চড় ঘুসি কামড় বর্ষণ সুরু করে দিলে। তারপর এগার বছর ধরে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে জড়িত এই পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে নির্লজ্জ রণতাণ্ডব সুরু হল তার বর্ণনা করা যায় না।

দুপুর হলেও রাস্তায় ভীড় জমে গেছল। ঘমণ্ডি বহুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে দুলারীর কোমর থেকে সাতটি দশ টাকার নোট ও খুচরা সাতটি টাকা বার করে নিয়ে অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় তাকে লাথিয়ে ঠেলে রাস্তায় বার করে দিলে। তারপর তার বাকী পোট্‌লা-পুঁটলি রাস্তায় এক এক করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে—"বেইমান্ চোট্টা!" তার কাপড় জামার কিছু আর আস্ত ছিল না। সারা দেহে নখ ও দন্তের ক্ষত চিহ্ন।

ছিন্ন বিশৃঙ্খল চুল নিয়ে ছিন্ন অসম্বৃত বসনে দুলারী বাইরে থেকে ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে সমস্ত পাড়াকে তখন জানাচ্ছিল,—ডাকুতে তার টাকা কেড়ে নিচ্ছে, তার অনেক কষ্টে ছাগলের দুধ ঘুঁটে বেচে, মেহনৎ করে জমান টাকা!

হরভুঙ্গি ছুটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে—কি ব্যাপার!

—কি আবার ব্যাপার! ভৌজাইনের বাড়ী যাবার নাম করে চুরী করে পালাবার মতলব! বেইমান চোট্টা···

"তু বেইমান, তু চোট্টা, তু ডাকু হও, দে দ হমার রূপয়া···"

রাস্তার বসে রোদনের সঙ্গে গালাগালি করতে লাগল।—তার হকের টাকা কেন ও ডাকু কেড়ে নেবে? এগার বছর ধরে সে কি মাগনা দুধ ঘুঁটে বেচেছে!

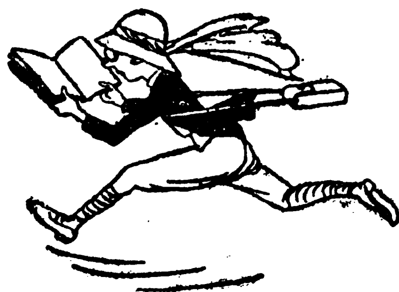
রামজীবন বল্লে,—"মিট্ মাট্ কর লে ভাই—!"

হরদুঙ্গি বল্লে, "হাঁ ভাই মিট্ মাট্ কর লে! এগার বরিষ দুনো একসাথ রইলি।"

ঘমণ্ডি তখন চৌকাটের ওপর বসে একটা কুকুর বাচ্চার গায়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলোতে বুলোতে—দুলারীর গালাগালির প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল, বল্লে,— এগার বছর ত কি হয়েছে! ও চোর আর এ চৌকাট মাড়াতে আসুক দেখি! বেইমান! ভৌজির বাড়ী যাবার ছুতোয় চুরী করা! ভাগ্যিস্ সে সময় মত এসেছিল!

দুলারী উঠে বল্লে, "হম্ থানেমে যাওত বানি।"

ঘমণ্ডি বিদ্রূপ করে বল্লে,—"যা তু থানেমে! হুঁয়ে তোহার ভৌজাইন হও।"



শ্রীবুদ্ধদেব বসু

হতাশা

—কী, শুয়ে পড়লে যে বড়ো? আপিসে যাবে না আজ?

—আহা, এই খেয়ে উঠলুম, একটু জিরোতে দাও না। আর-একটা পান দাও।

সুরমা পানের ডিবেটা নিয়ে স্বামীর শিয়রের কাছে রাখলো। অনুপম একটা পান মুখে দিয়ে খবরের কাগজের ছবির পৃষ্ঠাটা চোখের সামনে খুলে ধ'রে বললে—বিলিতি মেয়েগুলো কী অসভ্যই হচ্ছে দিন-দিন! ঐটুকু কাপড় গায়ে না রাখলেই বা কী! দেখেছো?

কিন্তু পাশ ফিরে তাকিয়ে সুরমাকে সেখানে দেখতে পেলো না। কোথায় সে? অনুপম হাঁক দিলে—সুরমা!

সুরমা পাশের ঘর থেকে বললে—যাই। কোন্ জুতোটা পরবে আজ?

—গেছে আবার জুতো বুরুশ করতে! বেশ একটু বিরক্তির সুরেই বললে অনুপম।

একটু পরে সুরমা একজোড়া চকলেট রঙের জুতো হাতে ক'রে ঢুকলো। ঝকঝক করেছে আয়নার মতো। জুতোটা নামিয়ে রেখে বললে—ওঠো এখন।

অনুপম খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টালো, কথাটা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেলো না। সুরমা টেবিলের কাছে স'রে এসে বললে—বারোটা বাজে যে।

অনুপম তবু চুপ। এত গভীর মন দিয়ে খবরের কাগজে কী পড়েছে সে-ই জানে। চেয়ারের পিঠের উপর তার পাৎলুন, কোট, নেকটাই সব সাজানো, সেগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে সুরমা আবার বললে—ওঠো না!

এবার অনুপম জবাব দিলে—কী যে বিরক্ত করো! আপিসের বাঁধা কাজ তো নয় যে দশটা বাজতেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে।

—কাল তো দশটা না বাজতেই বাড়ি মাথায় করে তুলেছিলে—একটু ঝাঁঝালো স্বরেই বললে সুরমা। ঝাঁঝের কারণ ছিলো। কাল আপিসে বেরোবার আগে অনুপমের নূতন নেকটাই খুঁজে পাওয়া যায়নি—তাই নিয়ে কী

কাণ্ড! সুরমা একাই নয়, তার শাশুড়ি তার ইস্কুলগমী ছোটো ননদ সকলকেই হাঁকে-ডাকে বিপর্যস্ত ক'রে অনুপম শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করেছিলো যে এমন বিশৃঙ্খল বাড়িতে মানুষের বসবাস অসম্ভব। স্বয়ং শ্বশুরমশাই আপিসে বোরোবার মুখেই বলেছিলেন···কী বিশ্রী মেজাজ হয়েছে ছেলেটার। তা তোমরাও তো আগে থেকেই ওর কাপড়চোপড়গুলো একটু···

লজ্জায় সুরমা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। স্বামীর তুচ্ছতম সুখ-সুবিধের জন্য সে তো প্রাণপণ করে, তবে মানুষ যদি এমন হয় যে পুরাণো চিঠিপত্রের দেরাজে নতুন নেকটাই ঢুকিয়ে রেখে তারপর বাড়িশুদ্ধ লোকের উপর মেজাজ ফলিয়ে বেড়ায়···

সেইজন্যে আজ সকাবেলাই সে কাপড় চোপড় সব ঠিক ক'রে রেখেছে, কিন্তু আজ অনুপমের তাড়া নেই। একটু পরে বললে— আজ কি তাহলে বেরোবেই না?

অনুপম গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বললে—উঠছি। কিন্তু আর ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

টেবিলের উপর কয়েকটা জিনিস নিয়ে অকারণে নাড়াচাড়া করতে-করতে সুরমা বললে—কাজে এ-রকম গাফিলি করা কি ভালো? মাসের শেষে মাইনে তো ওরাই দেবে!

—ওঃ, তা দিলেই বা। আমাদের তো আর দশটার সময় আফিসে হাজিরা দিতে হয় না। আমাদের হ'লো ফীল্ড-ওআর্ক। নিজের ইচ্ছে-মতো কাজ।

—তা হোক, বিছানায় শুয়ে থাকলে কোনো কাজই তো চলবে না।

অনুপম হঠাৎ চটে উঠে বললে আমার ইচ্ছে শুয়ে থাকবো। আমার শোয়া-বসাও তোমার হুকুমে হবে নাকি?

—আমার হুকুমে হবে কেন? সমস্ত সংসারটাই হুকুমে চলেছে। ইচ্ছে-মতো শোয়া বসা কার আছে?

—ওঃ, ভারি তো একশো-পঁচিশ টাকার চাকরি—ছেড়ে দিলেই বা কী?

এবার সুরমার মুখে সত্যি-সত্যি আশঙ্কার ছায়া পড়লো।—বলো কী, এমন ভালো চাকরিটা ছেড়ে দেবে। ভালো ক'রে কাজ তো আরম্ভই করলে না এখনো।

অনুপম যেমন হঠাৎ চটে উঠেছিলো, তেমনি হটাৎ নরম হ'য়ে বললে, না, না, ছাড়বো কী! উঠি এবার। ব'লে সে সত্যি-সত্যি উঠে বসলো।

সুরমা আশ্বস্ত বোধ করলে, তবু না ব'লে পারলে না—ছাখো, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ছেড়ে-টেড়ে দিয়ো না কিন্তু। শ্বশুরমশাই তাহলে মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

আর-কোনো কথা সুরমা বলতে পারলে না; তার নিজের দিকটা মনে এলো না তার, অনুপমের দিকটাও নয়, শ্বশুরের কথাই মনে হ'লো। বয়েসের চাইতে বেশি বুড়ো হয়েছেন। সরকারী চাকরীতে পেন্সন নেবার ছু'চার বছর বাকি। ছু'চার বছর পরে দেড়শো টাকাতে পেন্সন নেবেন—তখন এই বৃহৎ সংসার চলবে কেমন ক'রে? সারাজীবনের সঞ্চয় নিঃশেষ ক'রে টালিগঞ্জে এই ছোটো বাড়িটি করেছেন। তার উপর বিস্তর দেনা। আশ্রিত, অতিথি, নিঃসম্বল আত্মীয়ের অভাব নেই। নিজের পড়ুয়া ছেলে, অবিবাহিত মেয়ে আছে এ'নো। অনুপম বড়ো ছেলে। বছর চারেক আগে বি. এ. পাশ করেছে। বিয়ে হ'য়েছে বছর খানেক। বিবাহটা মা-বাপের কর্তব্যসম্পাদন। সুরমা খুব সুখে আছে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর-শাশুড়ি অত্যন্ত স্নেহ করেন। এত স্নেহ করেন ব'লেই শ্বশুরের জন্য তার এত কষ্ট হয়। উপার্জন একজনের, দাবি দশজনের। বুড়ো ভদ্রলোক একটা শার্ট ছিঁড়ে গেলে সহজে আর-একটা কেনেন না। অথচ পুত্রবধূর জন্যে ঘন-ঘন শাড়ি কেনা হচ্ছে—পাছে ছেলের মনে কষ্ট হয়। সুরমার ভারি লজ্জা করে।

অনুপমই একমাত্র আশা। কিন্তু···আজকালকার দিনের সাধারণ বি. এ. পাশ ছেলে, কতটুকু আশা তার, কতটুকু মূল্য? সেরা পাশিয়েরা খাবি খাচ্ছে। তাই ব'লে অনুপমের কোনো উৎকণ্ঠাও নেই। সে দিব্যি খায়-দায় ঘুমোয়, বিকেলে হাওয়া খেতে বেরোয়, সিনেমাও ছাখে। এই পরম নিশ্চিন্ত ভাবটা সুরমার ভালো লাগে না। আজকালকার দিনে কি নিজের উপর মমতা করলে চলে! জীবন পণ ক'রে খাটতে হবে...অমনি ক'রেই কিছু হয়ে যাবে। কী আর হবে। কতটুকু হবে? যেটুকুই হোক্, বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা হবে তো। তাছাড়া, শুয়ে-বসে কি আর পুরুষমানুষের দিন কাটে; না কি সেটা ভালোই দেখায়?

তবে কিছুদিন থেকে অনুপমের ভাবটা যেন বদলেছে। বাড়ি থেকে সে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায় সাড়ে-দশটা বাজতেই, ফিরে যখন আসে তখন প্রায় সন্ধে। তার রোদে-পোড়া ক্লান্ত মুখ দেখে সুরমার ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু এই তো পুরুষের জীবন...মনে মনে তার কেমন একটা আনন্দে-মেশা

গর্বও হয়। সে নিজে···সে তো দুপুরবেলা ঠাণ্ডা পাটিতে পড়ে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কী করবে সে? সে অতি সাধারণ স্ত্রীলোক···তাকে দিয়ে সংসারের যা-যা কাজ হতে পারে, তাতে সে কখনো ত্রুটি করে না। অনুপম ফিরে এসেই চা তৈরি পায়, স্নান করতে যাবার সময় কাপড়ের জন্যে হাৎড়াতে হয় না, বাথ-রুমের আলনায় সব সাজানো আছে। এর বেশি সুরমার সাধ্য নেই, সাবেকি পরিবারের আড়ালে-আবডালে সে মানুষ হয়েছে, বৃহৎ পুরুষ-পৃথিবীর কোনো ব্যাপারই সে জানে না; সে গেঞ্জি কেচে দিয়ে ধোপার খরচ বাঁচাতে পারে, দশবার ঘর ঝাঁট দিয়ে স্বামীর মেজাজ ভালো রাখতে পারে, দিতে পারে জুতো বুরুশ ক'রে, দরকার হলে সুখাদ্য রেঁধে খাওয়াতে পারে—এই পর্যন্ত। সুরমার বাপের বাড়ি বড়োলোক নয়, টানা-টানির সংসারকে নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়েই সুশ্রী করে তুলতে সে তার মাকে দেখেছে। সে-ও কি তা পারবে না?

রাত্রে সে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—কোথায় থাকো সারাদিন?

অনুপম গম্ভীরভাবে শুধু একটি কথা বলে—কাজ। এর চাইতে মহৎ কথা আজকালকার ভাষায় নেই।

—সুবিধে হচ্ছে কিছু?

—চেষ্টা তো করছি। দেখি কী হয়। অনুপম তার কথায় বেশ একটা রহস্যের ভাব বজায় রাখে; সুরমা আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আর অনুপম যখন পর-পর পাঁচ-সাতদিন সাড়ে-দশটায় বেরিয়ে গিয়ে নিতান্তই ক্লান্ত চেহারা ক'রে সন্ধেবেলা ফিরে আসতে লাগলো, তখন আর সন্দেহ করবার কোনো উপায় থাকলো না যে সত্যি-সত্যি সে এবার কর্মক্ষেত্রে নেমেছে।

তারপর একদিন সে তার স্ত্রীকে চুপি-চুপি বললে—কাউকে বোলো না এখন, একটা চাকরি পেয়েছি।

—পেয়েছো সত্যি?

অনুপম একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির নাম করলে। সেখানে, জানা গেলো, তাকে একটা চাকরি দেবার জন্যে সাধাসাধি করছে অনেকদিন থেকে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে বনিবনা হচ্ছিলো না। এবারে রফা হয়েছে—বেশি কিছু নয়, একশো-পঁচিশ দেবে গোড়াতে। ছ' মাস পরে কাজকর্ম

দেখে বাড়িয়ে দেবার কথা। তাছাড়া কমিশন। মোটর অ্যালাউএন্স গোটা পঞ্চাশ দিতেও রাজি আছে, তবে গাড়ি তো...

এখানে বাধা দিয়ে সুরমা বলেছিলো বলো কী? সত্যি?—অনুপম অবিচলিত ভাবে বললে—নেহাৎ মন্দ নয়, কী বলো? আমি অনেক ভেবে-চিন্তে আজ রাজি হয়ে এসেছি।

—রাজি হবে না! সুরমা এবার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। যে দিনকাল পড়েছে, কত সব ভালো-ভালো এম, এ, পাশ ছেলে পঞ্চাশ টাকার জন্যে ঘুরে মরছে—আর এ তো চমৎকার! কটা লোক আজকাল একশো টাকা রোজগার করে! তার উপর আবার কমিশন দেবে, অ্যাঁ?

অনুপম বললে—এম্, এ, পাশ হলেই তো হলো না, কাজের লোক হওয়া চাই। ইনশিওরেন্স কোম্পানি বিদ্যা বোঝে না, কাজ বোঝে।

—তা কাজটা কী করতে হবে?

—ওঃ, কাজ বিশেষ কিছু নয়। আমার অধীনে সব এজেণ্ট থাকবে, তারা বিজনেস জোগাড় করবে, তাদের একটু দেখাশোনা করতে হবে, এই আরকি। ভাবছি ছ'মাস পরে ছোটো একটা গাড়িই কিনে ফেলবো। বাইরে ঘোরাঘুরি আছে কিছু।

মাইনে ভালো অথচ কাজ কিছু নেই। সুরমার ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর এমন একটা সুখের কাজ বাংলাদেশের এত ছেলেকে এড়িয়ে তার স্বামীর হাতে কেমন করে এলো ভাবতে সে রীতিমতো অবাক হলো। তা অবাক হয়ে আর কী হবে—মানুষের কপাল যখন ফেরে তখন এই রকমই।

—কাউকে বলতে বারণ করলে কেন?—সুরমা নিজের সৌভাগ্য একা-একা সহ্য করতে পারছিলো না—হয়েই তো গেছে।

—হ'য়ে গেলোই বা। কাজকর্মের ব্যাপার—বাইরে বেশি বলাবলি না-করাই ভালো।

—আহা, বাইরে আমি কাকে আর ঢাক পিটিয়ে বেড়াবো। শ্বশুরমশাইকে বলেছো?

—না, বলিনি এখনো। বাবার ইচ্ছে ছিলো আমি গবর্মেণ্টের চাকরিতে ঢুকি, হয়তো তিনি খুব খুসি হবেন না। হাজার হোক্, সামান্য কোম্পানির চাকরি বই তো নয়।

—কী যে বলো! সামান্য হলো কিসে! আর গবর্মেণ্টের চাকরি চাইলেই যে পাওয়া যাচ্ছে তা তো নয়। শ্বশুরমশাই খুবই খুসি হবেন, দেখো।

হলেনও। অনুপমের এ-কাজে বিলিতি কাপড় চোপড় না হলে নাকি চলবে না, ও-সব করাতে গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গেলো। হেমবাবু ধার করে এনে দিলেন টাকাটা। তারপর কয়েকদিন সেই শ্বেতাঙ্গ বেশে অনুপম নিয়মিত যাতায়াত করলে—ইতিমধ্যে গোটা দুই নতুন টাই কেনা হয়ে গেলো। সুরমা বিছানার তলায় পাৎলুন ভাঁজ করে রাখে, টাই মোজা রুমালের হিসেব রাখে, আর বাড়ির মধ্যে সারাদিন অকারণে অফুরন্ত কাজ করে বেড়ায়।

আজ তাই স্বামীকে খাওয়ার পর শুয়ে পড়তে দেখে সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলো। রোজ এক সময়ে আপিসে না গেলেও হয়তো চলে, কিন্তু একেবারে শুয়ে থাকলে চলে কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপম উঠলো, উঠে একটা পাঞ্জাবি গায়ে জড়িয়ে বললে—চললুম।

—আজ স্যুট পরবে না?

—না, যা গরম।

স্বামীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমার একটু কষ্ট হলো। ভাদ্র মাসের রোদ্দুরে সমস্ত গায়ে পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে বেরুনো! তাই সে বললে—আজ না বেরোলেও চলে নাকি?

—বেরোলেও হয়, না বেরোলেও হয়। শরীরটা আজ মোটে ভালো লাগছে না।

—তাহলে আজ আর না বেরোলে। একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও।

অনুপম হেসে বললে—আমাদের ছুটির জন্যে দরখাস্ত পাঠাতে হয় না, যতদিন খুসি না গেলেও কেউ কিছু বলবার নেই।

—বলো কী! যতদিন খুসি না গেলেও চলে?

—তা চলে বই কি। ওদের কাজ পাওয়া নিয়েই কথা।

—কাজটা তাহলে ওরা কেমন করে পাবে?

—তুমি তা বুঝবে না।

সুরমা আর কিছু বললে না! সত্যি, সত্যি কাজটা যে কী রকম তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপমও আর কথা না বলে পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে এসে শুয়ে পড়লো, খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। উঠলো যখন

তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সুরমা চা করে এনে দিলে। চা খেয়ে ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় পরে অনুপম বেরিয়ে গেলো বোধ হয় কোনো বন্ধুর বাড়িতে।

তার পরের দুটো দিন এইভাবেই কাটালো সে। সুরমা মাঝে-মাঝে দু'একবার তাড়া দিলে, কিন্তু অনুপম নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বললে—তুমি তো দেখছি ভারি ছেলেমানুষ! এজেন্টরাই সব কাজ করে যে। আমার বেরোবার কী দরকার। এই তো আজ বিকেলেই দুজনের আসবার কথা আছে আমার কাছে।

সত্যিও সেদিন বিকেলে দুটি ছেলে এলো তার কাছে। অনুপম তাদের সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ কথা বললে। সুরমা চা পাঠালে, খাবার পাঠালে, পান পাঠালে। ভারি খুসী হলো সে মনে-মনে।

পরের দিন সকালে ন'টা না বাজতেই অনুপমের বেরোবার তাড়া লেগে গেলো। আজ তাকে যেতে হবে ভাটপাড়া, সেখানে একজন বড়োদরের মক্কেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। অসম্ভব তাড়াহুড়ো, কোনোরকমে দুটো গরম ভাত আর মাছের ঝোল গলাধঃকরণ করে, পোষাক পরে, মার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। তার কিছুই খাওয়া হয়নি ভাবতে পরে সুরমাও ভালো করে খেতে পারলে না—তিনটে না-বাজতেই উঠে স্টোভ ধরিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করতে বসলো।

এদিকে অনুপম আপিসে গিয়ে খবর পেলো ভাটপাড়ার ভদ্রলোককে অন্য কোম্পানির লোক পাকড়ে ফেলেছে। বসে-বসে আড্ডা দিলো ঘণ্টা তিনেক, তারপর আর-একজনের সঙ্গে বেরিয়ে ড্যালহৌসি স্কোয়ার, ক্লাইভ স্ট্রীটে এ-আপিস ও-আপিস ঘুরে বেড়ালো যেখানে যত চেনা লোক আছে। কোথাও একপেয়ালা চা, কোথাও পান, নানারকম লাখ-বেলাখের গল্প, সময়টা কাটলো মন্দ না। কিন্তু রোদ্দুরে ঘুরতে আর ভালো লাগে না, যা-ই বলো।

বিকেলে বাড়ি ফিরে যখন চা খাচ্ছে, সুরমা জিজ্ঞেস করলে—কেসটা পেলে।

—কোন্…?

—ভাটপাড়ায় গেলে যে?

অনুপম বলতে পারলে না যে ভাটপাড়ায় সে যায়নি। সংক্ষেপে বললে—আর-একদিন যেতে হবে।

—কবে যাবে? কাল?

এত খবর দিয়ে তোমার দরকার কী? আমার কাজ আমি ভালো বুঝি।

পরের দিন সে যথাসময়ে রাজবেশ প'রে বেরুলো, যথাসময়ে ফিরে এলো। তারপর একদিন সে স্থরমাকে বললে—আর একটা অফর পেয়েছি, এর চেয়ে ভালো।

—কী রকম?

—এক ভদ্রলোক একটা বিজনেস করবেন, আমাকে পার্টনর ক'রে নিতে চান। লায়ন্স রেঞ্জে আপিসের ঘর খোঁজা হচ্ছে। এখন অবশ্য মাত্র হাজার দশেক নিয়ে আরম্ভ হবে—তবে ভদ্রলোক কুড়ি হাজার পর্যন্ত ফেলতে রাজি। তাঁর নিজের আরো অনেক কাজ আছে—আমাকেই ম্যানেজার হতে হবে। আপিসে আলাদা ঘরে বসবো, টেলিফোন থাকবে, বাড়িতেও একটা রাখতে হবে। তুমি যখন তখন দরকার হলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। বেশ ভালো—কী বলো!

স্থরমা জিজ্ঞেস করলে—ব্যবসাটা কিসের।

—সে নানারকম আছে। ঐ ভদ্রলোকের দশ রকম ব্যবসা আছে কলিকাতায়—কাগজ, কাঠ, কয়লা তাছাড়া একটা জুয়েলারী দোকানও আছে। মস্ত বড়োলোক। পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেলতেও ওর আটকাবে না। আমাকে গোড়াতে দুশো দেবে, আস্তে-আস্তে পাঁচশো পর্যন্ত উঠবে। লাভের উপর আমার টু পার্সেণ্ট শেয়ারও থাকবে, তাইতে বা কোন্ দু'চার হাজার হবে বছরে। আর আপিসের গাড়িটা অবিশ্যি আমার জন্যেই থাকবে! আমাদের কয়েকজন কেরানি দরকার—আছে নাকি তোমার জানাশোনা কোনো ছেলে ছোকরা?

স্থরমা খানিকটা চুপ করে থেকে বললে—তুমি তাহলে ইনশিওরেন্সের কাজটা ছেড়ে দেবে?

—ছেড়ে দেবো না তো কী! ঐ মাইনেতে কোনো ভদ্রলোকের কি চলে! আর যা খাটনি রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে হায়রান।

—তা যেখানেই যাও বসে-বসে তো তোমাকে কেউ খাওয়াচ্ছে না।

তুমি কিছু বোঝ না! এটা কত ভালো। আপিসটাই আমার, সবই আমার ইচ্ছেমতো হবে। আমার পার্টনর নিজে বিশেষ-কিছু দেখতে-শুনতে পারবেন না, আমি রাজি হয়েছি বলেই তিনি ব্যবসাটা ফাঁদবেন।

—অত বড়ো ব্যবসাটা চালাতে তুমি পারবে তো? ব্যবসাতে তো খাটুনি সব চেয়ে বেশি শুনি।

ওঃ, সে ঠিক হয়ে যাবে দুদিনেই। দুচারখানা বইপত্র দেখে নিলেই হবে। তাছাড়া, আমার নিজের তো বিশেষ-কিছু করতে হবে না, নিচে তো সব কেরানিরাই থাকবে। শিগগিরই আমরা আরম্ভ করে দেবো—আপিসের একটা ভালো ঘর পেলেই হয়।

হঠাৎ সুরমার কী-রকম একটা সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে—ইনশিওরেন্সের কাজটা এক্ষুনি ছেড়ে দাওনি তো?

অনুপম মুচকি হেসে বললে—তা একরকম ছেড়েই দিয়েছি বলতে পারো।

সুরমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ক্ষীণস্বরে বললে—একেবারে ছেড়েই দিলে! ওটার তো এখনো ঠিক নেই! শ্বশুরমশাইকে একবার জিজ্ঞেসও করলে না!

—ওঃ, বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করবো কী। এ-সব ব্যাপারের উনি বোঝেনই ভারি। তাছাড়া, কিছু ঠিক নেই বলছো কেন? কোম্পানি শিগগিরই রেজিস্টর্ড হবে। আরে ভাবছো কেন—বাবার দুঃখ এতদিনে দূর হলো। বাবাকে আর একবছরের বেশি চাকরি করতে দেবো নাকি ভেবেছো!

কথাটা শুনে সুরমা রোমাঞ্চিত হলো, কিন্তু ছোট্ট একটু সন্দেহ তা মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছিলো না। তাই সে বললে—কিন্তু ব্যবসা তো, তার নিশ্চয়তা কী? বাঁধা একটা চাকরি হুট করে ছেড়ে দিলে!

—ভারি তো বাঁধা চাকরি। ব্যাটারা ভারি পাজি, ছোটোলোক, কথা দিয়ে কথা রাখে না, টাকা-পয়সা কিছু দিতে চায় না!

সুরমা অবাক হয়ে বললে—বলো কী! চাকরিতে কখনো মাইনে না দিয়ে পারে! মাস পুরলে নিশ্চয়ই দেবে। তুমি ওদের সঙ্গে খামকা ঝগড়া করোনি তো?

এবারে অনুপম বেশ উত্তেজিত স্বরেই বললে—ওদের যা ব্যবহার, তাতে ঝগড়া না করে পারা যায় না। আছে, ভিতরে অনেক ব্যাপার আছে। মান-সম্মান নিয়ে ওদের কাজ করা যায় না। দিয়েছি আজ খুব দুকথা শুনিয়ে।

সুরমা হতাশ স্বরে বললে—তাহালে ছেড়েই দিয়েছো।

অনুপম একটু হেসে বললে—আহা, তুমিও যেমন! এমন একটা ভাব

করছো যেন কত বড়ো একটা লোকসান! ও-রকম চাকরি পথে-ঘাটে অনেক ছড়িয়ে থাকে।

কথাটা আসলে সত্য, কেননা বীমার দালালি আজকাল চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু যতখানি কাজ করতে পারলে তা থেকে মাসে পঞ্চাশটা টাকাও আয় করা যায়, অনুপমের পক্ষে তা অসম্ভব। অবশ্য আসল কথাটা জানে না বলেই সুরমা চোখ বড়ো-বড়ো করে বললে—বলো কী! আজকালকার দিনের পক্ষেও তো চমৎকার চাকরি ছিলো। আমি তো মনে করি ও-রকম একটা কাজ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

অনুপম তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—তুমি ভাবতে পারো সৌভাগ্য, আমি ভাবিনে। তাছাড়া, কত একটা বড়ো কাজে যাচ্ছি। ভাখো না দু পাঁচ বছরে কী হয়। শোনো—ভদ্রলোক বলছেন আমাকেও কিছু টাকা ফেলতে। বেশি নয়, হাজার পাঁচেক। তাহলে লাভের টেন পার্সেণ্ট দিতে রাজি। টেন পার্সেণ্ট মানে জানো। বছরে হাজার কুড়ি তো বটেই। বলবো নাকি বাবাকে একবার।

সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললে—দেখতে পারো বলে।

একটু যেন দ্বিধা করে অনুপম বললে—আচ্ছা, তোমার বাবা কি কিছু দিতে পারেন না।

সুরমা ম্লান হয়ে গিয়ে বললে—আমার বাবা গরিব মানুষ, তিনি অত টাকা কোথায় পাবেন?

একটু যেন লজ্জিতভাবেই অনুপম বললে—আচ্ছা, থাক, থাক। এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম। তুমি কিছু ভেবো না। এ-ব্যবসায় লাভ আমাদের হবেই। অবশ্য রিস্‌ক্ যে কিছু নেই তা নয়—রিস্‌ক্ সব ব্যবসাতেই আছে—তা একটু রিস্‌ক্ না নিলে জীবনে কি বড়ো হওয়া যায়! তুমিই বলো!

সুমার আবার জিজ্ঞেস করলে—ব্যবসাটা কিসের?

অনুপম আবার জবাব দিলে—আছে নানারকমের।

—ইনশিওরেন্সের কাজটা এ-ক'দিন করেই ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে কিনা কে জানে। কিছুদিন করলে হয়তো ভালো লাগতো। মোটে তো ভালো করে করলেই না।

—আরে ছি-ছি, এ-কাজ কি ভদ্রলোকে করতে পারে! দু'দিনেই আমার

ঘেন্না ধ'রে গেছে। বললুম না তোমাকে, ওরা অত্যন্ত বদ লোক—কথায়-কথায় অপমান করে।

—তা এ-ক'দিনের মাইনে দিয়ে দিয়েছে তো?

—তা দিলেও তো বুঝতুম। কিছু না, এক পয়সাও না।

—বলো কী, এ-ক'দিন খাটিয়ে নিলে, তার মজুরি দিলে না! এ কি সম্ভব নাকি?

—ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

—বাঃ, এমন কথা তো কোনো দিন শুনিনি। আইন আছে কী করতে? একটা উকিলের চিঠি দাও—বাপ বাপ ক'রে টাকা দিয়ে দেবে।

—ব'য়ে গেছে এখন আমার সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে অত হাঙ্গামা করতে। বিজনেস-এর জন্য এখন ভয়ানক খাটতে হবে কিছুদিন। অত সময় কোথায় আমার?

—তাই ব'লে তুমি চুপ ক'রে এ-ও সহ্য করবে?

—খুব দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে চ'লে এসেছি—আবার কী? আমাদের ব্যবসাটা জাঁকিয়ে উঠুক, তখন ঐ পচা কোম্পানির ম্যানেজারকে কেরানি রাখবো।

এর পর কয়েকদিন অনুপমকে সত্যি খুব ব্যস্ত দেখা গেলো। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার সে বেরোয় আর বাড়ি ফেরে। অদ্ভুত সময়ে ও অদ্ভুত জায়গায় তার সব এনগেজমেণ্ট থাকে; টেলিফোন ছাড়া কাজের বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, সামনের মাসের গোড়ার দিকেই একটা আনিয়ে ফেলবে। কিছুদিন তার পকেটে কিছু টাকা-পয়সাও দেখা যেতে লাগলো। তাছাড়া পকেটে তার প্রায়ই সচিত্র পুস্তিকা দেখা যায়—মোটরগাড়ির ক্যাটালগ। আপিসের গাড়ি কেনা হবে—সে-ভারও তারই উপর পড়েছে।

দিন পনেরো এইভাবে কাটলো। ততদিনে সুরমারও প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে এসেছে যে বাণিজ্যেই বসতে লক্ষ্মী। এখন ভালোরকম সব চললেই হয়।

রাত্তিরে শোবার সময় ছাড়া অনুপম আজকাল প্রায় বাইরে-বাইরেই থাকে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর পাছে ভেঙে যায়, সেই ভাবনায় তার মা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন। কিন্তু অনুপমের সে-সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই তার। তার নামে সব বড়ো-বড়ো খামে টাইপ-করা চিঠিপত্র আসে। নানারকমের লোক আসে বাড়িতে। হ্যাঁ—এ না

হ'লে আর ব্যবসা কী! সুরমা ভাবে, এতদিনে তার স্বামী নিজের প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছেন, একদিন সত্যি-সত্যি বিরাট কিছু হ'য়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কার মধ্যে কী থাকে বলা তো যায় না।

আরো কিছুদিন গেলো তারপর একরাত্রে শুয়ে শুয়ে অনুপম বললে—ছাখো, কলেজ স্কোয়ারের কাছে পাঁচশো টাকায় একটা চায়ের দোকান বিক্রি হচ্ছে। ভাবছি বাবাকে ব'লে সেটা কিনে ফেলি। পাঁচশো টাকা তিনি নিশ্চয়ই দিতে পারবেন।

সুরমা অবাক হ'য়ে বললে—কেন, চায়ের দোকান কিনে তুমি কী করবে?

—কী আবার করবো? চালাবো মাসে ছ'শো টাকা নেট প্রফিট।

—বলো কী! মাসে ছ'শো টাকা যাতে লাভ, সে-দোকান পাঁচশো টাকায় ছেড়ে দিচ্ছে! লোকটা কি পাগল?

সঙ্গে-সঙ্গে সুর নামিয়ে অনুপম বললে—না ঠিক ছ'শো হয় তো হবে না। দেড়শো—হ্যাঁ, একশো তো হবেই। ব'লে-ক'য়ে পাঁচশোতেই রাজি করাতে পারবো বোধ হয়। লোকটার ব্যামো হয়েছে—পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চ'লে যেতে চায়।

—তোমার হাতে সেই কোম্পানি রয়েছে—এত বড়ো ব্যবসা—

—হ্যাঁ, বিজনেসটা রয়েছে বটে। তা চায়ের দোকানটাও থাক্ না। গোটা কুড়ি টাকা মাইনে দিয়ে একটা লোক রেখে দিলেই হবে। আমি তো নিজে গিয়ে দোকানে বসতে পারবো না। বুঝলে না—চার পাঁচটা কলেজের কাছে কিনা, ছাত্রদের ভিড় খুব হয়। বেশ লাভ।

—নিজে না-দেখলে দোকান চলে না।

—হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে গিয়ে দেখে আসবো বইকি। কালই বলবো বাবাকে। আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁও ক'রে তোলা যায়। তাহ'লে অবশ্য চৌরঙ্গি পাড়ায় তুলে আনতে হয়।

হঠাৎ সুরমার মনে পড়লো সেই ব্যবসার কথা স্বামীর মুখে কিছুদিন শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা ভয়ের ভাব এলো তার মনে, খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের ব্যবসা কবে থেকে আরম্ভ হবে?

—জোগাড়যন্ত্র চলেছে। এ-প্রসঙ্গে অনুপমের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলো না।

—এ মাসের প্রথমেই আরম্ভ করবার কথা ছিলো না?

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এইভাবে অনুপম বললে—চায়ের দোকানটাই কিনে নেবো। আমাদের কালীপদ বেশ বিশ্বাসী লোক, তাকেই বসিয়ে দেয়া যাবে। এ তো বাড়িতে আট টাকা মোটে মাইনে পাচ্ছে, আমি কুড়ি টাকা দেবো—আচ্ছা, না-হয় পঁচিশই দেয়া যাবে। ওর পক্ষে কত বড়ো একটা লিফ্‌ট্‌ ভাবো তো।

বোধ হয় সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে অনুপম খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরো কয়েক মাস কাটলো। অনুপম যেদিন খুসি হয় বাড়িতে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোয়, যেদিন খুসি হয় পোষাক প'রে বেরোয়। কোথায় যায়? একটি মন্থ্‌লি টিকিট নিয়ে শহরের এমন জায়গা নেই যেখানে সে না যায়। বড়োবাজারে তার আনাগোনা, ডালহৌসি স্কোয়ারে বহু আপিসে তার ঘন-ঘন আবির্ভাব। কিছু কাজ নেই, সুতরাং সে সব চেয়ে ব্যস্ত। তার পাশ দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার স্রোত ব'য়ে চলেছে, সেই ঘুর্নির মারপ্যাঁচে ঢোকবার যতবারই চেষ্টা করে, ততবারই ফিরে আসে ধাক্কা খেয়ে। ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে এসে বলে—উঃ, এত ভয়ানক পরিশ্রম আর সয় না;

সত্যি, অকারণে নিরুদ্দেশে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে ঘুরে বেড়ানো—কতদিন মানুষ তা সইতে পারে? কতদিন, আর কতদিন?

এটাও মানতে হবে যে সে এখন বিজনেসম্যান। অবশ্য সেই কুড়িহাজারি কোম্পানিটা শেষ পর্যন্ত হ'লো না, সমস্ত ঠিকঠাক হবার পরে যে-লোকটি টাকা দেবে, সে-ই শেষ মুহূর্তে পেছ-পা হ'লো—লোকটাকে শূকরসন্তান বললে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হয় না। পৃথিবীর সব লোকই এইরকম—ইতর, অশিক্ষিত, ধূর্ত, স্বার্থপর ও প্রতারক—এতগুলো খারাপ লোকের মধ্যে একমাত্র ভালো লোক অনুপমের উপায় কী? তা সেও একটা বিজনেস চালাচ্ছে, ক্লাইভ রোতে এক বন্ধুর অপিসে একটা চেয়ারে গিয়ে মাঝে-মাঝে দু' তিনঘণ্টা ব'সে থাকে। বিজনেসটা কী, সেটা সুরমা এখনো জানে না, যখন বেশ ফেঁপে উঠবে তখন জানতে পারবে। তবে সেটা চায়ের দোকান নয়। দোকানদারি করাটা ঠিক ভদ্রলোকের কাজ কি? 'দোকানে যাচ্ছি', বলতে কেমন বিশ্রী লাগে না? 'আপিসে যাচ্ছি', কথাটাই বেশ। তাও নিজের আপিস। অনুপম এখন নিজের আপিসে যাচ্ছে।

এই ভাবেই আরো এক বছর কাটলো। হেমবাবু মলিন জিনের কোট প'রে আপিসে যান, আপিস থেকে ফিরে খালি গায়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন, মাসের পয়লা তারিখে প্রচুর ধার শোধ করেন ও সাত তারিখে আবার ধার করতে ছোটেন। বড়ো ছেলের সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা হয় না তাঁর। একদিন সন্ধেবেলায় অনুপম বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, বাইরের ঘরে বাপের মুখোমুখি পড়ে গেলো। সে এড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, হেমবাবু তাঁকে ডাকলেন। একটুখানি কেশে, অত্যন্ত যেন লজ্জিতভাবে বললেন—

—শোন্—আমাদের আপিসে একটা চাকরি খালি হয়েছে।

অনুপম চুপ করে রইলো, যেন এ ব্যাপারে তার কিছুই এসে যায় না।

—আমি তোর কথা সাহেবকে বলেছি, তবে যা দিনকাল—

—কী চাকরি ?

—মন্দ নয় খুব। পঞ্চাশ টাকা থেকে আরম্ভ—

—ওঃ, পঞ্চাশ টাকা ? অনুপম খুব মৃদুস্বরে বললে কথাটা, অসম্ভব আজগুবি কিছু শুনে যেন সে প্রায় হতবাক হয়ে গেছে।

—পঞ্চাশ থেকে সওয়াশ, তারপর ডিপার্টমেণ্টল পরীক্ষায় উৎরোলে হয়তো তিনশো পর্যন্ত যাওয়া যাবে। গবর্মেণ্টের বাঁধা স্কেলে আস্তে আস্তে উঠে যাবি—বেশ ভালোই তো।

অনুপম বললে—পঞ্চাশ টাকায় আমার কী হবে!

খুব কুণ্ঠিতস্বরে বললেন হেমবাবু—আপাতত আর কিছু যখন হচ্ছে না—। আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ করিয়ে রেখেছি—কাল সেটা দিতে হবে।

অনুপম বাপের মুখের উপর আর-কিছু বললে না, পরের দিন দরখাস্ত সই করে দিলে। স্ত্রীকে বললে—দুঃখে কষ্টে বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে পঞ্চাশ টাকার কেরানিগিরি করতে বলছেন।

সুরমা বললে—ঐ পেলেই কত লোক আজকাল কৃতার্থ।

—কত লোক হতে পারে, আমার কথা আলাদা। বিজনেস্-এর লাইন আমি ছাড়বো না। আমার একটা স্কীম আছে—সেটা হয়ে গেলে তো আর কথাই নেই। দস্তুরমতো গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি জাঁকিয়ে থাকতে পারবো।

স্কীমটা কী, সুরমা তা শুনতে চাইলো না। শুনেই বা কী হবে, সে সামান্য মেয়েমানুষ, ও-সব বড়ো-বড়ো ব্যাপার বুঝবে না।

অনুপমই আবার বললে—কলকাতার সহরে একটু বুদ্ধি থাকলে মাসে

শ পাঁচেক আয় করা তো কিছুই না। ছাখো না সব মাড়োয়ারিদের—না জানে লেখাপড়া, না পারে ভদ্রলোকের মতো একটা কথা বলতে। একজন মাড়োয়ারির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তার কাছ থেকে সব ফন্দি-ফিকির শিখে নিচ্ছি। দেখবে আর দুদিন পরে।—হ্যাঁ, আমাকে একটা টাকা দাও তো।

সুরমা বললে—একটা টাকা?

—একটা টাকাও নেই তোমার কাছে?

—আমার কাছে টাকা থাকবে কোত্থেকে?

—কেন, বাজার-খরচ তো তোমার হাতেই আজকাল। আচ্ছা, এক টাকা না পারো আট আনা দাও।

—এক টাকাই দিচ্ছি। নিজের জমানো দুটি আধুলি সুরমা বার করে দিলে।

মাঝে-মাঝে এমন দেয়। তার হাতে দুচার আনা পয়সা যা আসে সব সে সযত্নে জমিয়ে রাখে, যে-কোনো দিন স্বামীর দরকার হতে পারে।

পরের দিন হেমবাবু আপিস থেকে খানকয়েক বই নিয়ে এলেন। অনুপমকে ডেকে বললেন—এগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখিস্ তো একটু—ইণ্টারভিয়ুর জন্যে ডাকতে পারে।

—পঞ্চাশ টাকার চাকরি, তার আবার ইণ্টারভিয়ু!

—ইনকম-ট্যাক্সের আইনগুলো একটু দেখে নিস। কিছু জিজ্ঞেস করলে দুএকটা কথা বলতে পারলেই হলো।

—বাবার একদম মাথা-খারাপ হয়েছে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুপম বললে। আমাকে বলেছেন ইনকম-ট্যাক্সের বই পড়তে। এখনো যেন আমার পরীক্ষা পাশ করবার বয়েস আছে। হো-হো করে হেসে উঠলো সে, হাসিটা অত্যন্তই উচ্চ।

—ভালোই তো। বছরে একখানা বই তো ছুঁয়ে ছাখো না। তবু একটু পড়াশুনোর চর্চা হবে।

—ওঃ, পড়াশুনোর এই তোমার ধারণা! ইনকম-ট্যাক্সের আইন! অনুপম আরো জোরে হেসে উঠলো।

বইগুলো সে একবার ছুঁয়েও দেখলো না। সন্ধ্যেবেলা আপিস থেকে ফিরে নাকের নিচে চশমা নামিয়ে হেমবাবুই সেগুলো পড়তে বসলেন। রোজই

এ-রকম হতে লাগলো যখনই সময় পান, হেমবাবু ব'সে বসে ইনকম-ট্যাক্সের আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ আয়ত্ত করেন। অনুপম তাঁকে একদিন দেখে ফেললো। হাসতে-হাসতে সুরমাকে বললে—দেখেছো বাবার কাণ্ড! তিনি বই পড়লে কি আমার বিদ্যে হবে!

সুরমা শান্তভাবে বললে—ও, সেটা তাহলে বোঝো!

—আমাকে দিয়ে ও-সব রাবিশ চাকরি পোষাবে না, তা তো আমি বলেই দিয়েছি।

তারপর, একদিন আপিসে সায়েবের কাছে তার ডাক পড়লো। না গেলে বাবা নেহাৎই দুঃখিত হবেন, শুধু সেই কারণেই সাজগোজ করে গেলো সে। ফিরে এসে বললে—সাহেব আমাকে বললে, তুমি আমাদের হেমবাবুর ছেলে, তোমাকে নিতে পারলে তো ভালোই হয়। তা আপাতত এটা নিলে কেমন হয়, বলতো, বিজনেসটা একটু ফেঁপে উঠলে ছেড়ে দিলেই হবে। হাত খরচটার জন্য আরকি—বুঝলে না।

সুরমা বললে—আপাতত হাত খরচ ছাড়া আর কোনো খরচও তো নেই তোমার।

—আহা, কোন রকমে দিন কাটলেই কি হলো! বাবার অবস্থা দেখছো তো সেই মাড়োয়ারিটা যা বলে তাতে তো মনে হয় ছ' মাসের মধ্যেই খুব সুবিধে হ'য়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে অনুপম বাড়ি ফিরে দেখে সুরমার মুখ ভারি গম্ভীর। জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে তোমার?

—তোমার চাকরির খবর এসেছে।

—কী খবর? অনুপম খুব তাচ্ছিল্যের সুরেই জিজ্ঞেস করলে, তবু তার গলাটা একটু কেঁপে গেলো।

হয়নি। শ্বশুরমশাই ভেঙে পড়েছেন।

মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে গেলো অনুপমের মুখ। কিন্তু তক্ষুনি আবার বললে—ওঃ, বাঁচলাম। হ'লে মুস্কিলই হতো—বাবার জন্য না নিয়েও তো পারতাম না। আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি এখন থেকে শেয়ার মার্কেটেই মন দেবো। এ ছাড়া আর কিছুতে পয়সা নেই। গোড়াতে হয়তো মাসে দুশো আড়াইশোর বেশি হবে না—ক্যাপিট্যাল না থাকার এই তো মুস্কিল! তবে বছর খানেকের মধ্যে পাঁচশো মতো সহজেই হ'য়ে যাবে। আমাদের এ-বাড়িটা ভারি ছোটো, এটা ভাড়া দিয়ে তখন বড়ো বাড়িতে যাবো, কী বলো?

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দোৎসব

[১]

কয়েক বৎসর থেকে বাঙালী তার 'ঘর-কুনো, অপবাদের বদলে নেবার জন্যে ঘরের দুর্গোৎসব ঘুচিয়ে ভ্রমণোৎসব সুরু করে' দিয়েছে। সুমতি বলতেই হবে। কলঙ্ক-মোচনে ঝোঁক্ সুসন্তানদের ধরে। নন্দবাবুকেও ধরেছিল!

অধিকাংশেরই কাশীর ওপর ঝোঁক, যে হেতু বাঙালী intelligent জাত—তাতে সস্তাকো ধর্ম্মমাচরেৎও হয়। আবার বিশ্বনাথ, বাড়ী, রাবড়ী সবই সুলভ। কন্যা 'জোনাকির' 'ঘমপুকুর' ও পচেনা,—সেথা শুষণী কলমী, সব সরঞ্জামই ল' ল' করছে।

পুরুষদের বড় বড় পরিচয় দেবার পথ খোলে।—"ওঃ শিশির-কাকার কথা বল্‌চেন?—এবার যে খাণ্ডব-দাহে স্বয়ং গাণ্ডীব সাজচেন। ইস্—বলে ফেললুম—very গোপনীয়। কারুকে বলবেন না,—এই বড়দিনেই দেখতে পাবেন";—ইত্যাদি!

মেয়েদের স্বরাজের মক্স চলে।

ছেলেরা সিগারেটে পারণ করেন,—ইমপীরিয়েল টোব্যাকো কোম্পানীর—তথা বিশ্বপ্রেমের ডিভিডেণ্ড্ বাড়ে।

কাজ বাড়ে কেবল পুলিসের, আর বাড়ীর দালালদের, কারণ সকলেরই কাশীতে একখানা নিজের বাড়ী না হলেই নয়—"খাসা জায়গা—ড্যাম চীপ!" ম্যালেরিয়ার জ্বালায় তাঁরা নাকি রাগ করে বাস্তবাটী থার্ড মর্টগেজ দিয়েছেন!

পৈতৃক ব্যবস্থার প্রিভিলেজ্ড্ ছিদাম পাল—প্রতিমে ফাঁদতে কোন্ দিন এসে প্রণাম করে দাঁড়াবে! তার 'বদসুরত' না দেখতে হয়। মা তার কাছে কাঁদতে বসবেন,—বীভৎস দৃশ্য, most annoying!

রেল্-কোম্পানী 'বিজনেস্,' বোঝে না। সেই 'কন্‌সেসন্' দিবি,—দেরী করে তোদের লাভটা কি?

এই সব নায্য চিন্তা,— almost দুর্ভাবনা, ভাদ্র মাসেই ভর্ করে,—দিগ্বিজয়ের চিন্তাচর্চ্চা সুরু হয়ে যায়।

'স ম'রা অর্থাৎ সম্পন্ন আর মধ্যবিত্তের মাঝখানের হাফব্যাকেরা,—পোষ্ট-কার্ড টেনে ফাউণ্টেন-পেনে, 'গরজে-পরিচিত'দের পত্র লেখেন—

—ভায়া, তুমি ভুল্‌লেও আমি ভুলিনি। একখানা পত্রও কি দিতে নেই! একেবারে যে মায়া কাটালে। বহুদিন সংবাদ না পেয়ে বড়ই ভাবিত আছি, সত্বর কুশল দানে চিন্তা দূর করিও।" অর্থাৎ তার পরেই—মনোমত একটি বাসার ব্যবস্থা করিও।

নন্দবাবুর বাসার বর্ণনাটা পূর্ণ 'দশ-মেসে',—'এক্‌জিবিসনে' স্বর্ণ-পদকের দাবী রাখে।

প্রায় এই রকম—

বাসাটি বারোদ্বারির ব্রাদারের মত হওয়া চাই, দশ দিক খোলা। প্রতিদিন সব হাওয়াটাই হুকুমের প্রত্যাশায় তাঁর দ্বারে এলেই ভাল হয়; পরে তিনি নিজের প্রয়োজন মত রেখে, বাকিটা ইতরে জনাদের জন্য ছেড়ে দেবেন—এই ভাব। বলাই বাহুল্য যে—বাসাটি বড় রাস্তার ওপর হবে যেন 'ব্যাল্‌কনি' থেকে বেবাক্ দেখা যায়, কিছু না চক্ষু এড়ায়। আশে পাশে ভদ্রলোকেরা, অর্থাৎ যাঁরা মোটর রাখেন,—থাকেন। আবশ্যক হলে অসুবিধায় না পড়তে হয়। পোষ্ট অফিস, বাজার, বায়স্কোপ যেন পাঁচ মিনিটে পৌছান যায়—পায়দলে। ইত্যাদি ইত্যাদি; "ভাড়ার দিকে দেখোনা ভায়া—বিশ পঁচিশ, কুছ পরোয়া নেই।"

অভিজ্ঞেরাও চট্ পোষ্টকার্ড টেনে—অবস্থা জানান, "সে আনন্দ আর অদৃষ্টে নেই ভায়া! বাত তো ছিলই জানো, in addition প্রবল হার্ণিয়ায় হায়রান্! কাশীর পাপ, বোধ হয়, ছেলে বয়ে বয়েই হ'ল! নাচার ভাই, মাপ কোরো! পারো তো একটা নিউ-টাইপের আটচল্লিস ইঞ্চি ট্রস এনো। ইত্যাদি

কিন্তু very good manএর (ভাল মানুষের) ভালাই নেই। যথাসাধ্য চেষ্টা করে যা স্থির করে রাখলেন তা নন্দর মনে ধরে না! "অ্যাঃ—এ বাড়ীতে জেণ্টেল্‌ম্যান্ থাকতে পারে? তোমার কোন আক্কেল নেই! মুখ

তুলে দেখনি, ওপরের ঘরের ক'খানা শার্সি ভাঙ্গা? পাঁচ দিনেই যে প্যারা-টাইফয়েড্ ধরবে! বাথরুমে আয়না নেই! ইস্—গালে চড় মেরে পঁচিশ পঁচিশ টাকা নিয়েছে! গামছা কাঁধে ফেলে গিয়েছিলে বুঝি? একটা হাফ্-প্যাণ্ট—

অপরাধী বন্ধু একেবারে এতটুকু!

"যাক্, এখন একবার ঢালা ফেনাইল দিয়ে আগাগোড়া ধুইয়ে দাও। আর ত্যাখো—ভাল ফাষ্ট-ক্লাস্ মটন্ চেন তো—দু'সের। রাত্রে এখানেই খাবে। ডিম পাবে তো? হাফ-এ-ডজন।

বন্ধুর প্রাণ তখন বলছে—ধরণী দ্বিধা হও। রাতের খাওয়ার আগে খাবিই খাচ্চে।

[২]

বন্ধু বেচারা ভাবে—"এক সপ্তাহ কাটলো,—আর যে পারি না! ভগবানের নাম ভুলিয়ে দিলে যে!"

তাঁর বাঁচোয়া,—সর্ব্বদা civil (সনাতন) ড্রেসেই থাকে,—হ্যাফ-প্যাণ্টের সঙ্গে খাপ খায় না। নন্দ এড়িয়ে চলে,—সে 'হাই সার্কেল্' seeker (শিকারী)। কিন্তু মহিলাদের নিয়ে বন্ধুকে ঘুরতে হয়।

বন্ধুর জ্বর হয়ে গেল।

"ও কিছু নয়,—একটু ঘুরে এলেই সেরে যাবে,—একশো তিনের নীচে জ্বর—জ্বরই নয়। এক-কাপ চা খেয়ে উঠে পড়,—এঁরা সেজে গুজে প্রস্তুত। সেণ্টারেল হিন্দু স্কুলটা দেখিয়ে আনো। দেরী না হয়, ফিরলে আমি ওঁদের বায়স্কোপ দেখাতে নিয়ে যাব, বুঝলে।"

"আজ মাপ করো ভাই—উঠতে পাচ্ছি না। কিছু খাই নি।"...

—"ওঃ তাই বল। চলো দু'খানা লুচি খেয়ে নেবে—অভ্যেস আছে তো?"

প্রতুল বন্ধুর শ্যালক,—ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে। সে কাল এসেছে। কথাটা শুনে নন্দবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে বললে,—

"দু-দিনের জন্য এসে অমন বদ্ অভ্যাস করিয়ে যাবেন না। উনি চাও খান না। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা—মিছরি মরিচ সেদ্ধ খাওয়াবার চেষ্টা করচি..."

নন্দবাবু বললেন—"তবে উনি থাকুন—বাড়ীর এঁরা সঙ্গে গেলেই হবে।

আলাপও হবে—বেশ freely—দেখা-শোনও হবে। ওদের তো সবই জানা আছে,—কাশীতে…"

প্রতুল আর বেশী শুনতে চাইলে না, বাধা দিয়ে বললে—"আপনি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক দেখছি। বিদেশে এসেছেন, তায় ইনি আপনার পরিচিত, চক্ষু-লজ্জায় কিছু গোপন করা এঁদের উচিত হয় না। যাতে আশঙ্কার কারণ আছে তা…"

নন্দ সহসা দু'পা পেছিয়ে, সভয়ে—"কেন—কি? কই শিবু তো…"

"উনি সাদা-সিদে লোক, ভয়ঙ্কর ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সবই তাঁর উপর নির্ভর। বোধ হয় জানেনও না। আপনি শিক্ষিত লোক, শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

নন্দ চক্ষু কপালে তুলে—"কি বলুন তো?"

"এসে দেখছি দিদির ভয়ঙ্কর 'ইন্‌সোমনিয়া'! এ মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগটি যে কি করে আনলেন জানি না। আমাদের ফ্যামিলিতে তো মশাই এসব ব্যাধি কারুর ছিল না। বিষম স্পর্শাক্রামক (contagious) প্রশ্বাসের সঙ্গেও স্প্রেড্ করে—ছড়ায়। আপনি তো জানেনই…"

"ইনসোমনিয়া জানি না! ও যে একেবারে যোম্‌নিয়া! বলেন কি! ওরে বাপরে! সে বছর কলকাতায় my Lord! ধন্যবাদ…"

নন্দবাবু আর দাঁড়ালেন না।

প্রতুল একচোট হেসে নিলে। সে দু'চার কথায় নন্দবাবুকে বুঝে নিয়েই, অতবড় দমে-ভারী Insomnia (ইন্‌সোমনিয়া) কথাটা ব্যবহার করবার সাহস পেয়েছিল। লেগেও গেল ঠিক্।

এদিকে নন্দ বাসায় ফিরে পত্নীকে জানালে—"ভাগ্যে শিবুর শালা এসে পড়েছিল, তা না তো আর ফিরতে হ'ত না। শিবুটা কি মতলবি! রাসকেল্ একদম চেপে রেখেছিল। কেবল হাতাবার চেষ্টা, আর বাজার-টাজার করতে দিও না। মিটমিটে লোক—কেবল ভণ্ডামি। সন্ধ্যে-আহ্নিকের চাড় দেখেই বুঝেছিলুম…"

"ও সব কি বলচো, অমন নিরীহ লোক,—মাটির মানুষ। ও সব বোল না। কেন কি হয়েছে?"

"ছোট খাটো নয় একেবারে ইন্‌সম্‌নিয়া,—পরিবারের। ছুঁলে আর রক্ষে নেই!"

"তাঁর সঙ্গে তো দেখাই হয় নি···"

"তাই রক্ষে। শিবুরও জ্বর, ভালই হয়েছে—ব্যস্ Cut off, আর নয়!"

"অমন বেইমানী করতে নেই। আহা ব্রাহ্মণের জ্বর, দেখবে না?"

"ও দিকই আর মাড়ানো নয়। সে বাসা যদি দ্যাখো। চাকর বাকরে মাথা গলায় না। কাশী-বাসের মত কাশী-বাস করতে পারবিনি তো করা কেনো,—বৈঠকখানা পর্য্যন্ত নেই, একখানা চেয়ার পর্য্যন্ত না! কাশীবাস করচেন!"

নন্দবাবুর কষ্টমসের কামাই,—'গেট্ মাষ্টার'। হাফ্ প্যাণ্ট আর কোটে—তেরপোলের পকেট। বিকেলে,—নিকেলে আর তাঁবায়—তু'সের নিয়ে ফেরেন। মুটেরা পান আর গাড়োয়ানরা সিগারেট যোগায়। ছোট নজরের লোক নন।

"শুনেছি তোমার পিসিমা কাশীবাস করেন, একবার খোঁজ নেবেনা! তোমাকে মানুষ করেছিলেন···"

"অমর নয় তো যে—এখনো বেঁচে আছে। আর ওই করতেই সেকেণ্ড-ক্লাসে আসা কিনা···তোমাদের প্রেষ্টিজ জ্ঞান খুব! যাক্ আজ রাত্রে ক্ষীরমোহন খেয়েই থাকা—আর খান কয়েক চপ্। চা খাবার খোক্কোশরা হাঁ করে পথ চেয়ে আছে। তা'দের ওই করেই চলে,—যাই দোকানেই কাঙালী বিদেয় করে আসি।"

সিগারেট ধরিয়ে 'কেন্' ঘুরাতে ঘুরাতে বেরিয়ে পড়লেন; ট্রট্রা-ট্রেট্রা-টাটা ট্রট্রা···

[৩]

নন্দ—আড়নছাঁটা কেশে রাজবেশে, দশাশ্বমেধে পা-ফাঁক করে সিগারেট টান্তে টান্তে, স্থানীয় একটি প্রবীণ লোককে পরিচয় দিতেছিল। "বুঝলেন, গ্রে ষ্ট্রীটের ওপরই বাদামী রংয়ের বারাণ্ডা-বারকরা বাড়ীখানা দেখেই থাকবেন—নজর এড়াবার যো কি! ঠাকুর্দ্দা তয়ের করিয়েই গেলেন, poor fellow ভোগ করতে পান নি। সেই বাড়ী···"

এই সময় একটি বৃদ্ধা, ছিন্ন বস্ত্রে কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করতে করতে নিকটে এসে বল্লে—"বাবা, আজ মা অন্নপূর্ণা কিছু দেন নি, মা-শীতলা

বাড়ীর দু'টি ভিজে ছোলা চিবিয়ে আছি,—আর দাঁড়াতে পারচি না বাবা! দু'টি না হয় একটি পয়সা দাও যাদু ;—চারটি মুড়ি কিনে খাই···"

নন্দ কঠোর চক্ষে বললে—"যাও যাও, বিরক্ত করোনা,—দাঁড়াতে বল্‌চে কে? ভদ্রলোকের সঙ্গে দু'টা কথা কবার যো নেই..."

—"হ্যাঁ চৌরঙ্গির বাড়ীখানা ঠাকুরদ্দাই তিনশ' পঞ্চাশ টাকায় এক সাহেবকে ভাড়া দেন—সে মরবেও না উঠবেও না, অমন সুবিধে পাবে কোথায়। অন্য লোককে দিলে, এখন তার ভাড়া সাতশ' টাকার সিকি পয়সা কম নয়। এ loss (লোকসান) মানুষ কতদিন সইতে পারে মশাই! ভাবচি কোর্ট খুললেই, ফিরে গিয়ে নোটিস্ দেবো, আমাদের পৈত্রিক এটর্ণি Orr Barrowকে বলেও রেখেছি।"

বিরক্ত না করে'—করুণা ভিখারিণী সভয় কাতর দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে প্রত্যাশাপূর্ণ নয়নে চেয়ে ছিল। সহসা বলে উঠলো..."বাবা নন্দ না। বাপরে আজ দেখ, আজ তোর পিসিমার দুর্দ্দশা। এই কাপড় এই আজ একমুটো এঁটো ভাতও···"

কাঁদতে গিয়ে স্বরবদ্ধ অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে নন্দর পদপ্রান্তে পড়ে গেলেন।

লোক জড় হ'য়ে গেল।

সপ্রতিভ নন্দ হেসে বললে,—"কে এ মাগি,—খুব ঘাগি তো! শেখা বিদ্যে! এখানে এমনা কত আছে মশাই?"

কে একজন বললেন..."বহুৎ"!

"তাই ত, ভদ্রলোক দেখে, দাঁও বুঝে,—বাবা! আমার নাম রসিক—বলে নন্দ! পিসি আজ ষোল সতের বচর হল' কাশী পেয়েচেন। ফন্দি মন্দ নয়, এরা সব কর্‌তে পারে! যদিও কিছু দিতুম···"

"বাপ রে কিছু দিতে হবে না, শুধু একবারটি পিসিমা বলে ডাক্ নন্দো। আজ এগারো বছর দেখি নি। তোকে যে আঠারো বচর মানুষ করে রেখে এসেছি! কাণের পাশে দেখ দিকি বাবা,—সে দাগ তো মেলাবার নয়। আমার শেষ সম্বল আংটিটী বেচে যে যদু ডাক্তারকে দেখাই। আমার যে প্রাণ ছিলি নন্দ,—আজ চিনতে পারলি নি! বাবা বিশ্বনাথ, তোমার রাজ্য মরণও কি এতো মাগ্যি, তাও দিচ্চনা"!

পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন।

দোকানিরা তাড়াতাড়ি জল এনে তাঁর চোখে-মুখে দিতে লাগলো। একজন ছুটে গিয়ে পো-খানেক গরম দুধ কিনে এনে খাওয়াতে গেল।

তিনি আর খেলেন না। কয়েকজন বলে উঠলেন, "ওঃ—বিশ্বনাথ এতদিনে সত্যিই আজ দয়া করলেন।"

উপস্থিত সকলেই একত্রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

নন্দবাবুকে কেহ আর সে স্থানে দেখতে পেলেন না।

একজন দূরে একটা রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, বললেন, "বৃদ্ধা ভুল করেন নি; নন্দকে আমিও চিনি। লজ্জা পাবে বলে…"

রাগে ঘৃণায় একজন বলে উঠলেন, "অতবড় নির্লজ্জের লজ্জা-বোধ! ধন্য আপনার দয়া। ওহে, সকলে এই দয়ালটিকেও চিনে রেখো, বড় দুর্লভ বস্তু!"



চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চুড়িওয়ালা

"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।"

দুপুর বেলা যখন রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, গলির পথে লোক চলিতেছে না, ঘরে ঘরে গৃহিণীরা কাজকর্ম্ম সারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একটু গা-গড়া দিতেছেন, তখন নিজের পসরা মাথায় করিয়া পথে পথে চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া ফিরিতেছিল —"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।"

গলির ধারে একটি জানালা অল্প একটু খুলিয়া একটি কিশোরী মেয়ে, ডাকিল, "ও চুড়িওলা, চুড়িওলা, এই বাড়ীতে এস।"

চুড়িওয়ালা ফিরিয়া দুই হাতে মাথার ঝুড়ি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া উপরে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কনে, কেডা ডাকছ গো?"

কিশোরী বলিল—"এই যে এই বাড়ীতে।"

চুড়িওয়ালা দেখিল একটি তন্বী সুন্দরী কিশোরী একখানা চৌড়া লাল পাড় শাড়ীতে মাথায় আধঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—শাড়ীর চৌড়া লাল পাড়টি মাথার মাঝখানে সিঁদুরের মতো টকটক করিয়া যেন জ্বলিতেছে। কিশোরীর নাকে একটি নোলক, কানে দুটি দুল—গায়ের রঙের সঙ্গে সেগুলি যেন মিশিয়া লুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই বুড়া আলিজানের মনটা খুসী হইয়া উঠিল। এমন মধুর রূপ সে আর কখনো দেখে নাই; অনেক সুন্দরীকে সে চুড়ি বেচিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিয়া তাহার প্রাণ এত খুসী হইয়া উঠে নাই। সে মাথার বোঝা হাতে নামাইয়া বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরীটি নামিয়া আসিয়া চুড়িওয়ালার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"লাল চুড়ি আছে চুড়িওলা?"

চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"আছে মা লক্ষ্মী! কার হাতের চাই? তোমার হাতের?"

কিশোরী ঘাড় কাৎ করিয়া বলি—"হ্যাঁ।"

বুড়া আলিজান মাথার মোট নীচে নামাইয়া উপরের ঢাকা খুলিতে খুলিতে হাসিয়া বলিল—"তা লাল চুড়ি ত তোমার ও লাল হাতে মানাবে না মা লক্ষ্মী!—রঙে রঙে মিশে যাবে যে? ঐ রাঙা হাতে কালো চুড়ি মানাবে। কালো চুড়ি দেবো?"

কিশোরী লজ্জায় লাল হইয়া হাসিমুখ নত করিয়া বলিল—"না, লাল চুড়ি বা'র কর।"

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—'মা আমার লালির ভক্ত! এস ত মা, হাত দেহি?"

কিশোরী লজ্জিত হইয়া বলিল—"না, তুমি চুড়ি দাও, আমি দেখে নিচ্ছি।"

চুড়িওয়ালা বলিল—"তোমার হাতে পরায়ে দেবো না মা?"

কিশোরী বলিল—"না, আমি মার কাছে পরব।

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"না মা, তা হবে না; ও রাঙা হাতে রাঙা চুড়ি আমি পরায়ে দিয়ে যাব। তা যদি না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না।"

বুড়া মনে করিতেছিল এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সে ত কত বাড়ীতে কত মেয়ের হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চুড়ি পরাইয়া দিয়াছে। কত স্পর্শ তাহাকে ক্ষণিকের জন্য একটু বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে কেহই ত মুগ্ধ করিতে পারে নাই। আজ বুড়ার মনে হইতে লাগিল এই সুন্দরী কিশোরীটির হাতে যদি সে চুড়ি পরাইয়া দিতে না পারে, তবে তাহার এই ব্যবসা মিথ্যা পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে; এই হাতখানিরই সন্ধানে সে সমস্ত জীবন রোদে রোদে গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বয়স কাটাইয়াছে, তাহার কাঁচা চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। তাই যখন সেই কিশোরী তাহার কাছে চুড়ি পরিবে না বলিল তখন বুড়া বলিয়া বসিল—"তা যদি পরাতে না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না।"

এই কথায় কিশোরীর ভারী লজ্জা বোধ হইল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিয়া বুড়ার কাছে বসিয়া সে তাহার সুন্দর সুকোমল হাতখানি বাড়াইয়া দিল—তাহার মুখে লজ্জার আভাস শাড়ীর লাল পাড়ের ছায়ার মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

চুড়িওয়ালা মৃণালসংযুক্ত পদ্মের কলির মতো কিশোরীর হাতের মুঠিটিকে নিজের দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া একবার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহের আবেগ দিয়া

চাপিয়া চুড়ির মাপ ঠিক করিয়া লইল। বুড়ার মনে হইতেছিল যদি সে এই সুন্দর সুকোমল পদ্মের কলির মতো হাতখানি চোখের জলে ধুইয়া চুমায় চুমায় একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তারপর নিজের পসরাটি উজাড় করিয়া দিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায়, তবেই তাহার উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগ কথঞ্চিৎ চরিতার্থতা লাভ করিয়া শান্ত হইতে পারে।

চুড়িওয়ালা কিশোরীর হাত দুখানিকে নিজের হাতে ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া লাল চুড়ি একগাছির পর একগাছি করিয়া পরাইয়া দিতে লাগিল। বেদনায় কিশোরীর মুখ একটু কুঞ্চিত হইলে সে বেদনা সহস্রগুণ হইয়া বুড়ার বুকে গিয়া বাজিতেছিল, আর বুড়া বলিতেছিল—বড্ড কি লাগতিছে মা? একটু সহ্য কর মা, তা হলি এ চুড়ি তোমার হাতে চাপে বসা যাবে, সে যা মানাবে মা!"

কিশোরীর চোখ ছলছল করিতেছিল, তবুও সে বুড়ার কথা শুনিয়া মুখ লাল করিয়া তুলিয়া হাসিল—হাসিতে দুটি গালে দুটি টোল পড়িল।

চুড়ি পরাইয়া দিয়া চুড়িওয়ালা আপনার ঝুড়ি হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভালো ভালো পুতুল, কড়ি-বসানো বাক্স, খেলনা, ফুলদান বাহির করিল।

কিশোরী তাহা দেখিয়া বলিল—"ওসব আমার কিছু চাইনে।"

বুড়া হাসিয়া বলিল—"তোমার না চাই, তোমার খোকারে দিয়ো।"

কিশোরী লজ্জায় আপাদমস্তক লাল হইয়া উঠিয়া মাথা নত করিল।

তাহার শাশুড়ী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বৌমার এখনো ত খোকা হয়নি, ও-সবের দরকার নেই।"

চুড়িওয়ালা তাহার ঝুড়ির উপর ঢাকা চাপা দিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"তা না হোক, আমার মা-ই ত এখনো খুকি আছে, মা-ই খেলবে।"

কিশোরী বধুর শাশুড়ী বলিলেন—"ওগুলোর কত দাম?"

চুড়িওয়ালা ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ও সব আমি মাকে অমনি দেলাম।"

শাশুড়ী বলিলেন—"ওমা, সেকি কখনো হয়! ওগো চুড়িওলা, তুমি যেয়ো না, দাঁড়াও গো দাঁড়াও, দাম নিয়ে যাও!"

ততক্ষণে চুড়িওয়ালা পথে বাহির হইয়া পড়িয়া খুসি মনে হাসিমুখে হাঁকিতে হাঁকিতে যাইতেছে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

সেই দিন হইতে চুড়িওয়ালা নিত্য দ্বিপ্রহরে সেই গলির মধ্যে চুড়ি বেচিতে আসিতে লাগিল। চুড়ি ত আর নিত্যকারের প্রয়োজনীয় নয়, তাহাকে কেহ আর ডাকিত না। কিন্তু তাহার ডাক শুনিলেই সেই কিশোরী বধূটি একবার জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, তার বুড়া চুড়িওয়ালা দুই হাতে ঝুড়ি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লইত; দুজনে চোখোচোখি করিয়া সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়া আপনাদের একটি দিনের ক্ষণিক পরিচয়ের গভীর প্রীতির সম্পর্কটি স্বীকার করিয়া যাইত।

কিশোরী বধূর শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন—"কি বৌমা, তোমার খোকা এসেছে বুঝি? খাসা তোমার পাকা-দাড়িওলা খোকাটি বাছা!"

কিশোরী বধূ আনন্দের লজ্জিত হাসি হাসিয়া জানালা হইতে সরিয়া যাইত।

চুড়িওয়ালা ভাবিত সে যদি চুড়ি বেচা ছাড়িয়া দিয়া আলু পটল কি কেরোসিন তেল বেচিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে রোজ তাহার মায়ের বাড়ীতে যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু চুড়ি না বেচিলে ত সেই পদ্মকলির মতো মুঠিটি দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও স্নেহের ধারা মুক্ত করিয়া দিবার সুযোগ ঘটিবে না। সেই সুদূরের সুযোগের প্রত্যাশাতেই বুড়া চুড়ির পসরা মাথায় করিয়া দুপ্রহরের রৌদ্রে গলিতে গলিতে হাঁকিয়া ফিরিত—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলনা চাইয়ে!"

কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই কিশোরী জানালায় তাহার নিয়মিত হাজরী বন্ধ করিয়া দিল। বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া হাঁকিয়া ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া যায়; উপরের সেই গরাদে-দেওয়া জানালার ফাঁকে সেই সুন্দর মুখখানি আর লজ্জিত স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঁকি মারে না। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফেরি সারিয়া ফিরিয়া যায়, কিন্তু ফিরিতে তাহার মন চাহে না, পা চলে না।

কিছুদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁকের পর হাঁক দিয়াও যখন আর সেই জানালায় সেই মুখখানি কিছুতেই দেখা দিল না, তখন একদিন চুড়িওয়ালা সাহসে ভর করিয়া বাড়ীর দরজায় উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরুণ, চুড়ি লেবেন?"

বাড়ীর মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—'না গো।"

চুড়িওয়ালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া

রহিল। তারপর আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কনে গা ?"

ঘরের মধ্য হইতে আবার রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—"এখানে নেই গো।"

সহস্র প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইলেও আর তাহার সাহসে কুলাইল না, সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চলিয়া গেল—সে ম্রিয়মাণ, গতি তাহার মন্থর, পথে পথে সে আর "চুড়ি চাই" বলিয়া হাঁকিলও না।

এখানে নাই! কিন্তু কবে আসিবে তাহারও ত স্থিরতা নাই। প্রতিদিন আশা বহিয়া চুড়িওয়ালা সেই গলিতে আসিয়া উচ্চস্বরে হাঁকে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!" একবার, দুবার, তিনবার! তারপর সেই শূন্য জানালাটির দিকে ছলছল দৃষ্টি তুলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ফিরিয়া যায়। পরদিন আবার আসে।

এমনি করিয়া কত মাস গেল! পূজা আসিল। আজ ঘরে ঘরে চুড়ি কেনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে—সধবা, কুমারী, তরুণী, বালিকা, সবাই মনের মতন চুড়ি বাছিয়া বাছিয়া কিনিতেছে; চুড়িওয়ালা তাহাদের মুঠি হাতে লইয়া চুড়ির পর চুড়ি পরাইয়া দিতেছে! কিন্তু তাহার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন হইতেছে না, প্রবোধ মানিতেছে না। তাহার মায়ের মতন সুন্দর হাত আর কাহারও না। তেমন নরম মুঠি আর কাহারো না, তেমন মধুর হাসি আর মিষ্ট কথা কাহারো না।

অপেক্ষা করিয়া করিয়া বুড়া ক্লান্ত হইয়া আবার একদিন সে বাড়ীর সামনে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারবার করিয়া হাঁকিল—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!" কিন্তু কাহারো সাড়া পাইল না, কেহ তাহাকে জানলা হইতে ডাকিল না—"ও চুড়িওলা, চুড়িওলা, এই বাড়ীতে এস!" সেই জানলা তেমনি শূন্য, তেমনি নিরানন্দ! তখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চুড়িওয়ালা ডাকিল—"চুড়ি লেবেন মাঠাকরুণ ?"

একজন ঝি বিরক্ত হইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"না গো না, একশ দিন বলেছি চুড়ি চাইনে, তবু কেন জ্বালাতে আস বল দিকিন? দরকার হয় রাস্তা থেকে ডেকে নেব।"

চুড়িওয়ালা ভয়ে লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে চোরের মতো ফিরিয়া যাইবে, এমন সময় দেখিল সেই কিশোরী বধূর শাশুড়ী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কি এহনো আসে নাই?"

শাশুড়ী ম্লানমুখে উদাস ভাবে চুড়িওয়ালার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এসেছে।"

চুড়িওয়ালা একমুখ হাসিয়া আনন্দ-গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিল—"মাঠাকরুণ, একবার তানাকে দেখতি পাই না! শাশুড়ী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি চোখ মুছিয়া স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"না বাবা, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

বুড়ার আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখ একেবারে নিস্প্রভ হইয়া যেন নিবিয়া গেল। সে ব্যথিত ছলছল দৃষ্টিতে একবার বধূর শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া হতাশ মনে গমনে অনিচ্ছুক পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া ফিরিয়া চলিল। সে এই পূজার সময় বাজার ঢুঁড়িয়া সব চেয়ে ভালো এক জোড়া চুড়ি পছন্দ করিয়া আনিয়াছিল তাহার সুন্দরী মা-টির হাত নিজের হাতে ধরিয়া পরাইয়া দিবে বলিয়া। কিন্তু যেখানে ভালোবাসিবার অধিকার আছে, পাইবার দাবী করিবার অধিকার নাই, সেখানে সে কেমন করিয়া জোর করিবে? সেই কিশোরী বধূটি যদি তাহার কন্যা হইত, তবে কি তাহার শাশুড়ী তাহাকে এমন করিয়া বিমুখ করিয়া হতাশ করিয়া ফিরাইতে পারিত? বুড়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পতনোন্মুখ অশ্রু গামছায় মুছিয়া ফেলিল। সদর দরজা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়া চুড়িওয়ালা থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ঘাড় ঘুরাইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল। তারপর আবার ফিরিয়া মন্থর কুণ্ঠিত পদে বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

চুড়িওয়ালা দেখিল বধূর শাশুড়ী তখনো রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। চুড়িওয়ালা গলায় গামছা দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া মিনতি-বিগলিত স্বরে বলিল—"মাঠাকরুণ, মুই চুড়ি বেচতি আসি নাই। একডা বার মায়েরে মোর দেহি যাতাম!"

এই বলিতেই বুড়ার চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া বেদনা-ভরা মিনতি অশ্রু-জলে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বধূকে একজন নিঃসম্পর্ক পথের লোকের সামনে বাহির করিবার পক্ষে যেটুকু আপত্তি ছিল, বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা তাহা চোখের জলে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিল। চোখের জল এই বৃদ্ধ মুসলমান চুড়িওয়ালার সহিত কিশোরী বধূর একটি প্রাণের টানের নিকট-সম্পর্ক এক নিমেষে প্রমাণ করিয়া দিয়া গেল। বধূর শাশুড়ী এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে তাকাইয়া অক্ষিপল্লব হইতে কম্পমান অশ্রুবিন্দু মুছিয়া, অশ্রুপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"মোক্ষদা, বৌমাকে একবার ডেকে দে!"

কিশোরী বধূ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত জড়িত পা ফেলিয়া চুড়িওয়ালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চুড়িওয়ালা একমুখ হাসিয়া কোঁচার খুঁট হইতে কাগজের বাক্স খুলিয়া এক জোড়া বিচিত্র বর্ণের জড়োয়া কাঁচের চুড়ি বাহির করিয়া বলিল—"মা, হ্যা গ্যাহ, তোমার জন্যি মুই জুবিলি চুড়ি আন্যাচ্ছি!"

চুড়িওয়ালা হাসিমুখ তুলিয়া চুড়ি জোড়া কিশোরী বধূর হাতে দিতে গিয়া দেখিল, কিশোরীর হাতে কোনো গহনা নাই! তাহার লাল হাত হইতে তাহার অত সখের লাল চুড়ি সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে; সিঁথি হইতে সিঁন্দুর মুছিয়া ফেলিয়াছে; মাথার উপর কস্তা-পেড়ে শাড়ীর চৌড়া লাল পাড় আর হাসিতেছে না; পায়ে লাল আলতা নাই; ঠোঁটে লাল পান নাই; নাকে নোলক নাই; কানে সে সুন্দর দুল নাই; মুখে সে ভুবন-ভুলানো হাসিটুকুও নাই। একখানি শুভ্র থান তাহার যূথির মতো শুভ্র সুন্দর ম্লান মূর্ত্তিখানি কুণ্ঠিত-ভাবে জড়াইয়া যেন মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। এই মূর্ত্তিমতী শোকের মূর্ত্তি দেখিয়া চুড়িওয়ালা চুড়ি-জোড়া আছড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই চূর্ণিত চুড়ির মতোই ভাঙ্গা বুকের মধ্য হইতে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে চোখ চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"মা রে, এই মুই কি দ্যাখলাম! অ্যার আগে মুই মলাম না ক্যান!"

কিশোরী মাথা নত করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া চলিয়া গেল, তাহার শাশুড়ী চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরে চলিয়া গেলেন। আর বুক-ভাঙা বুড়া চুড়িওয়ালা দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে পসরা মাথায় তুলিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মেয়ে

(১)

প্যাসেঞ্জারটা তালিত ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। নামমাত্র ষ্টেশন, তবুও কি ভিড়! সেই ইতর-ভদ্র, মেয়ে-পুরুষ, বোঁচকা-বুঁচকি। কোন্ ক্লাস লক্ষ্য নাই, ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া জমা হইতেছে, তাড়া খাইতেছে, কিছু জমিয়া যাইতেছে, কিছু আবার অন্য কামরার উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে। হুমকি, কথা-কাটাকাটি—

"আগে নাবতে দাও—আরে, নাবতে দিন আগে মশাই—কি গেরো! দেখ, তবুও ঠেলে আসে!"

"গাড়ী যে এক্ষুনি ছেড়ে দেবে মশাই!"

"ছেড়ে দিলে আপনি পরের গাড়ীতে উঠতে পারবেন, আমি নাবতে পারব পরের গাড়ি থেকে?"

কথা-কাটাকাটির মধ্যে ও নামিলও, এ উঠিয়াও পড়িল। সে যে কি রকমারি দাঁও-প্যাঁচ, না দেখিলে বোঝা যায় না।

নামিবার দল কিন্তু এবার মারমুখো হইয়া পড়িয়াছে। নামিতেছে একটা চাপ, মাঝে পড়িয়া গিয়াছে একটা চৌদ্দ-পনরো বছরের ছেলে।

"বাবা, আমার যে পা দুটো উঠে গেছে ভুঁই থেকে!"

খানিকটা পিছনেই একজন বৃদ্ধ।

"সামনের ভালমানুষটির গলাটা জড়িয়ে ধর্।"

"খবরদার!—কি রকম ভালমানুষ, দেখিয়ে দোব একেবারে।"

"বাবাঃ, কবে যে লড়াই থামবে!"

"আরে, নাম্ বুড়ো, লড়াই না থামলে নামবি নি নাকি?···আবদার! এদিকে গাড়ি দেয় ছেড়ে!"

প্ল্যাটফরমের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়া আছি, খানিকটা কোণ ঘেঁষিয়া। দৃষ্টিটা দরজার খণ্ডযুদ্ধের পানেই, হঠাৎ জানালা দিয়া একটা বেশ বড় টিনের স্যুটকেস আমার কানের কাছ দিয়া খানিকটা ভিতরে আসিয়া পড়িল, পিছনে একটা রিষ্টওয়াচ-পরা হাত। অন্যমনস্ক ছিলাম, রাগিয়া উৎকট দৃষ্টিতে মুখ

ঘুরাইয়া চাহিতেই স্থটকেসের মালিক দীন মিনতিতে আমার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, হাঁপাইতেছে, —"দোহাই !—স্কুলমাষ্টার—গ্র্যাজুয়েট—সঙ্গে—সঙ্গে লেডি —দোহাই—"

একটা আঁচড় লাগিয়া গিয়াছে স্থটকেসের কোণে, রাগটা সঙ্গে সঙ্গেই কাটাইয়া উঠিতে পারলাম না, বলিলাম, "আমি তো স্কুলের ছাত্র নয় মশাই, কানটা যে ছিঁড়ে যেত এক্ষুনি।"

আরও ব্যাকুলকণ্ঠে মিনতি, "দোহাই !—ওগো, এগিয়ে এস না—গার্ড হুইসিল দিলে, দোহাই—"

"একেবারে যে জায়গা নেই, উঠবেনই বা কি ক'রে ?"

বলিতে বলিতেই স্থটকেসটা লইলাম, সেটা না রাখিতে রাখিতেই কাঁধের উপর একটা বিছানার গাঁট আসিয়া পড়িল, তাহার উপর একটা হ্যাণ্ডেল দেওয়া বাঁশের টুকরি। সব আমার চার্জে দিয়া এঁরা তখন দরজায় ; লেডি উঠিয়া দরজার মুখে দাঁড়াইয়াছেন, উনি নিজে তখনও দুইটি ধাপ নিচে। গাড়ি হুইসিল দিল।

প্রতিদিনের ব্যাপার—প্রতি ষ্টেশনের, মনটাকে কেমন অবসাদগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে। তবুও তো বসিয়া থাকা যায় না চুপ করিয়া ! বাক্স বিছানা সামনে জড়ো করিয়া রাখিয়া উঠিলাম। কতকটা বুঝাইয়া, কতকটা হুমকি দিয়া অতি কষ্টে দুইজনের ভিতরে আসিবার একটু রাস্তা করিলাম। পুরুষটি যুবা, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, মেয়েটি নিশ্চয় তাহারই স্ত্রী, নবপরিণীতা। বয়স সতরো-আঠারো, তবুও ছেলেমানুষই তো ?—পরিশ্রমে আর এতগুলা পুরুষের মধ্যে কি রকম হইয়া গিয়াছে ! বলিলাম—"তুমি যাও মা, ওখানে ব'সগে।"

নিজের জায়গাটা দেখাইয়া দিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার ভাইঝি, মেয়েটি তাহার পাশে গিয়া বসিল। তাহার পর জামা কাপড় একটু গুছাইয়া লইয়া একবার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দরজার পানে চাহিল। কষ্ট হয়, নূতন পরিণয় ; কিন্তু উপায় তো আর ছিল না, নিজের জায়গার পাশেই মোটঘাটের মধ্যে কোন রকমে দুইটা পা পুতিয়া বাক্স ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যুবককে দরজার কাছেই কোন রকমে গুটিসুটি মারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। কষ্ট হোক, কিন্তু চোখে একটি তৃপ্তি আছে, বেশ টের পাওয়া যায়। চাহিয়া চাহিয়া কয়েকবার মেয়েটির দিকে দেখিল। গাড়ি এদিকে বেশ মোশন দিয়া দিয়াছে।

(২)

গোলমালের জের খানিকটা চলিল। সেটা থামিলে শুনিলাম, মেয়েটি বেশ সপ্রতিভকণ্ঠে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়াছে আমার ভাইঝির সঙ্গে। বোধ হয় সুযোগ হইয়াছে—আমার মুখটা দরজার দিকে ফেরানো। একবার ঘুরিয়া দেখিলাম, সে মেয়েই নয়, দিব্যি আসনপিঁড়ি হইয়া মুখমুখি হইয়া বসিয়াছে, মাথার একটু কাপড় নামিয়া গিয়াছে, ভ্রূক্ষেপও নাই সেদিকে; হাত নাড়িতেছে, মাথা দুলাইতেছে, বেশ বোঝা যায়, গাড়ির সমস্ত ব্যাপারটা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে—মনে হয়, গাড়িটা পর্য্যন্ত। যেন বাড়িতে বসিয়াই নিভৃত আলাপ জমাইয়াছে।

বেশ কৌতুকপ্রদ মনে হইল; যেমন গল্পের বিষয়টি বাছিয়াছে, তেমনই বলার ভঙ্গীতেও স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। যাহা বলিবার প্রায় একটি প্রশ্নের আকারে বলে, যেন ধরিয়া লইতেছে একটা স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাপার; চিত্রগুলি বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। অভিমতও বেশ জোরালো।—

"তা আমাদের তো ভরসার মধ্যে মাত্র বিঘে কয়েক ক্ষেত? পারবে কেন অত দিতে বাবা? শেষে অনেক কষাকষি, অনে—ক কষাকষির পর এইতে রাজি করানো গেল এঁদের;—এই ওপর হাতে আর্ম্মলেট, নিচের হাতে চারগাছি ক'রে চুড়ি, একটি ক'রে রুলি। এই হার পাঁচ ভরির; প্যাটার্ন টুকু ভাল, কিন্তু ফাঁকি। এখন এই যাচ্ছি, ওঁরা দেখে যদি নাক সিঁটকোন, দুটো কথা বলেন তো সেটা কি ভদ্দরলোকের মতন হয়? ওরা এইটেকে সাত ভরি ক'রে দেবার কথা বলেছিলেন তো? তা কি ক'রে হয় তুমিই বল না ভাই? দিতেন, বাবা, যখন কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু দেশের অবস্থা যে কি হয়ে পড়ল কারুর জানতে বাকি আছে কি?...কি বন্যে, কি বন্যে, কি বন্যে! যদি দেখতে তুমি! এক মুঠো ধান তো ঘরে উঠল না। একে তো লড়াইয়ে এই দুর্গতি!...বলেন, আমিও শুনিয়ে দেব। স্কুলে পড়া মেয়ে, কারুর তোয়াক্কা রাখি না..."

ভাইঝি প্রশ্ন করিল, "ম্যাট্রিকুলেশন পাস?"

একটু চুপ করিতে মুখটা ফিরাইয়া দেখি, জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে। অর্থাৎ প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। আবার মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"আর কেনই বা বলব না? তোমাদেরও বুঝে-সুঝে খোঁটা দেওয়া উচিত, এ তো

সেই ঠানদি'দের আমলের কনে-বউ নয়? সইতে যাবে কেন বাপ-মায়ের নিন্দে? মা আসবার সময় এক পাশে নিয়ে গিয়ে এমনি ক'রে হাত দুটি ধ'রে বললেন, 'শচী, মা আমার'..."

হঠাৎ গলাটা গাঢ় হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। একটু চাপা কান্নার শব্দ হইল, আমার ভাইঝি সান্ত্বনা দিল—"চুপ করুন, শীগগির তো আবার ফিরে আসছেন।"

একটু পরে কান্নার শব্দ ধীরে ধীরে থামিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি যেন বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়িটা খানা জংশনে থামিল, ওঠা-নামার সেই হট্টগোল, আবার ছাড়িয়া দিল। মনটা বেশ হালকা হইলে মেয়েটি আবার সহজ কণ্ঠে গল্প আরম্ভ করিল,—"হাত দুটি ধ'রে বললেন, 'শচী, মা, হারটি তো কথামাফিক আমরা দিতে পারলাম না; তবে একটু সামলে উঠলেই আবার ওটুকু পুরো ক'রে নতুন ক'রে গড়িয়ে দোব। শাশুড়ী তোর দেবে গঞ্জনা একটু, স'য়ে যাস; বুঝিয়েই বলিস, নিশ্চয় বুঝবে, মানুষই তো, দেখলে তো কি বন্যেটা ঘাড়ের ওপর দিয়ে গেল! না বোঝে সইবি চোক-কান বুজে।'...সইবার মেয়ে কিনা শচী! এমন মিষ্টি মিষ্টি ক'রে শুনিয়ে দোব! ইস্কুলে-পড়া মেয়ে আমি, খাতির বুঝি না। নিজেদের মেয়ে হাতে তুলে দিলে তোমাদের, সেটা বুঝি কিছু নয়? তার ওপর গঞ্জনা! ইস, সে যুগ আর নেই!"

কথাগুলির গুরুত্বেই মেয়েটি এবার চুপ করিয়া রহিল একটু। তাহার পর আবার শুনিতে লাগিলাম।

"ভাইবোনে তো আমরা নটি? বোন এই দুজন বিদেয় হলাম, এখনও বাপ-মায়ের ঘাড়ে তিনটি তো? তা ভিন্ন দুটি ভাইয়েরও তো কলেজের খরচ যোগাতে হচ্ছে? হয় কোথা থেকে ভাই? সম্বল তো ওই ক বিঘে ক্ষেত, তাও দামোদরে খেলে। মানুষ?—যখন দেখলে এমন একটা দৈব বিপদ ঘাড়ের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেল, মানুষ হ'লে শুধু শাঁখা-শাড়ি নিয়ে বউ ঘরে আনতো, অন্তত এটুকু বলতো, 'থাক্ বেয়াই, গয়নাগুলো না হয় এর পরে দিও, একটু সামলে ওঠ আগে।'...বেশ, তাঁরা না হয় পাড়াগেঁয়ে মানুষ, একটু লুভিষ্টি—তুমি তো বি. এ. পাস, একটা স্কুলের সেকেণ্ডমাষ্টার, ছেলেদের ভালমন্দ শেখাচ্ছ; বিজ্ঞ, জ্ঞানী ব'লে সমাজে একটা খাতির আছে, তুমি কোন্ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের বলতে পারলে?...ওই দাঁড়িয়েই আছেন সামনে, আমি কিছু

ভয় ক'রে বলছি না। শুধু গয়না? এক কাঁড়ি জিনিসপত্র—এসে পৌঁছিল না যে, নইলে দেখতে; পরের গাড়িতে দাদাকে পৌঁছে দিতে হবে।…বে এখনও হয় নি, দিব্যি আছ ভাই, দেখবে, শ্বশুরবাড়ি মানেই শুধু দাও—দাও—আর দাও; ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে।"

গলসি আসিয়া পড়িল। আপ্ প্ল্যাটফরমের পাশেই একটি বেশ মাঝারি গোছের পুষ্করিণী, চারিদিকে গাছ-পালা; ছায়ায় বসানো তিনটি পালকি, জন কয়েক বেয়ারা বসিয়া শুইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

প্ল্যাটফরমেও জন চারেক ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। হৈ-চৈ ঠেলাঠেলির মধ্যে বর-বধূ নামিল, জিনিসপত্রগুলা নামাইয়া দিয়া আমিও নিজের জায়গাটি দখল করিলাম। দলটি পুষ্করিণীর অভিমুখী হইল।…গাড়ি যখন ছাড়িল, দেখি, দূরে পালকির দোরের কাছে ঘোমটাটি দুই হাতে একটু তুলিয়া মেয়েটি আমাদের গাড়ির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

(৩)

তাহার পর কয়েকবার এইখান দিয়া যাতায়াত করিয়াছি। গলসিতে গাড়ি থামিলেই ছায়াশ্যামল পুষ্করিণীর দিকটিতে চাহিয়া থাকি। সমস্ত চিত্রটি জাগিয়া উঠিয়া কৌতুকে কৌতূহলে মনটা আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। সেই প্রগলভা নববধূ, গুরুগম্ভীর তাহার অভিমত সব—বিদায়ের স্মৃতিতে গলা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠা—তাহার পর সেই শেষ দৃশ্য—পালকির দ্বারপথে দুই হাতে ঘোমটা তুলিয়া আমাদের গাড়ির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকা।…আর একবার দেখা পাইলে বেশ হইত।

দুই বৎসর পরে আবার দেখিলাম। আমার ভাইঝির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, একটা কাজে বাপের বাড়ি আসিয়াছিল, তাহাকে পৌঁছাইতে যাইতেছি।

বেশ খানিকটা দূর হইতেই গলসির সেই পুকুর-পাড়ের কোণটিতে পালকি দেখিয়া মনটি একটু উৎসুক হইয়া উঠিল। গাড়ি প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিলে দেখিলাম, সেই দম্পতি, মেয়েটির কোলে একটি ন'দশ মাসের ফুটফুটে শিশু। আমাদের গাড়িটা প্রায় তাহাদের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইল, আমি হাঁক দিয়াই ডাকিয়া লইলাম যুবককে। শিশুটিকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী জানালা দিয়া তুলিয়া লইল। মোটঘাট তুলিয়া দুইজনে উঠিল, মেয়েটি আসিয়া আবার সেই রকম

ভাবেই আমার ভাইঝির পাশটিতে উপবেশন করিল। আমার এবার উঠিবার খুব বেশি দরকার ছিল না, তবে আমার পাশেই মেয়েটির জায়গা হওয়ায় আমি ওই ওজুহাতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নহিলে গলা খুলিবে না তো? যুবক দরজার কাছে বেঞ্চের কোণটিতে একটু জায়গা পাইল। এদিকে কান রাখিয়া আমি যুবকের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ জুড়িয়া দিলাম। এ আবার একটু মিতভাষীই। প্রজাপতি বি-যমেরই মিলন ঘটাইতে ওস্তাদ কিনা।

গল্প এবারে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।—

"ওমা, তোমারও বিয়ে হয়ে গেছে! দিলেন বাপ-মা বিদেয় ক'রে শেষ পর্য্যন্ত? এ যে কি বিদেয় করা ভাই, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝবে এবার।"

ভাইঝি প্রশ্ন করিল,—"সেই এসেছেন, আর এই প্রথম—?"

"না, অতটা এখনও হয় নি; এই তো কাছে-পিঠেই। কয়েকবার গেছি এসেছি। তা ভাই, তুমিই বল না—আর কি ছুট বলতে আমিই নাপিয়ে বাপের বাড়ি যেতে পারি?—এখন একজনদের সম্পত্তি তো? তায় ভগবান ওই গুড়োটি দিয়েছেন—শ্বশুরের তো নয়নের পুতুলি বললেই হয়?—চলে এখন আমার ছুট বলতে বাপের বাড়ি যাওয়া?…তা বাপ-মা-ভাইদের একটু অভিমান হয়। তা যে দোষের তা বলছি না, বাপ-মা-ভাইই তো? তবে আমিই বা কি করি বল ভাই? দাদার ছেলেটির অন্নপ্রাশন, চিঠি এল, লোক আসবে নিতে, আর হবি তো, ঠিক সেই সময় এদিকে মেজো দেওরের ছেলেরও ভাত, জা'টি আবার আমার বড় নেওটো—দিদি না হ'লে একদণ্ড চলে না, মেজো দেওরও বউদি-অন্ত প্রাণ। গেলে বলবে—দেখ, নিজের ভাইয়ের ছেলে, বউদি কেমন দিব্যি ছেড়ে চ'লে গেলেন! শ্বশুর-শাশুড়ি অবশ্য বললেন, বউমা, যাও, ভাইয়ের প্রথম সন্তান, দরকার যাওয়া,—লোক ওরা দু'জনেই খুব ভাল কিনা—তা নিজের তো একটা আক্কেল ব'লে…"

হাসি পাইল। খুলিল মেয়ের স্বরূপ?—এই দুইটা বৎসর যাইতে না যাইতেই?

আমার ভাইঝিও হাসিয়া বলিয়া ফেলিল—"আমি হ'লে তো চ'লে যেতাম।"

"ও ভাই বলা সহজ, কাজে অতটা সহজ নয়, দেখতেই পাবে। কি বাঁধনে যে বাঁধে! দেওরের ওই ছোট্ট ছেলেটি তো? এক দণ্ড না দেখলে

পরে প্রাণ আই-ঢাই করে। এই চ'লে এসেছি, 'জেতি জেতি' ক'রে সমস্ত গাড়িটা…"

গলাটা গাঢ় হইয়া আসিল, গল্প একটু থামিল। এবারে অবশ্য মায়ের নিকট বিদায়ের সে ক্রন্দন নয়, তবে স্রোতের উল্‌টা গতিতে আমায় সেই কথাই মনে করাইয়া দিল। আবার আরম্ভ হইল—

"বাইরে মন বসানো কি কম শক্ত ভাই? এর ওপর আবার বুড়ো শ্বশুর আছেন, শাশুড়ি বড্ড পিটপিটে, শুচিবেয়ে, সর্বদা সামলে থাকতে হয়।… তাই বলছিলাম—কি পরই যে ক'রে দেন বাপ-মায়ে!…"

উল্‌টা আমাদেরই দোষ দেয় যে! হাসিতে এবার মুখটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইলাম।

গাড়িটা খানা-জংশনে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই হট্টগোল—যুদ্ধ-দানবের যুদ্ধশিশু। খানিকটা সামিল হইয়া যাইতেই হয়, গল্পের দিকে আর মন রাখা সম্ভব হইল না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কতকটা শান্তি আসিল, আবার কানে আসিল—

হ্যাঁ, সেই সোনাটা, হারে সেই দু ভরি কম প'ড়ে গিয়েছিল না? এখন পর্যন্ত তো সেটা পূরণ করেন নি। শ্বশুর অত্যন্ত ভালো লোক, কোনমতেই চাইবেন না মুখ ফুটে, আর পেছনে ওই যে মানুষটি দেখছ—মানুষ বললেও চলে, আবার জড়পদার্থ বললেও চলে, লাজুক, মুখচোরার একশেষ—স্কুলমাষ্টারই তো? নিজের পাওনা-গণ্ডা নিজে বুঝে নিতে হবে তো?—না, কি মনে করবেন তাঁরা, সামান্য দু ভরি সোনা।…শোন কথা ভাই—দু ভরি সোনা, আজকালকার বাজারে কম হোল!—কিছু না কিছু না ক'রেও যার নাম দুশোটি টাকা। শেষকালে কিনা আমাকেই মেয়ে হ'য়ে লিখতে হ'ল…"

আমার ভাইঝি একটু বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করিল—"আপনি লিখলেন?"

মেয়েটি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল যেন, একটু লজ্জাস্তিমিত কণ্ঠে বলিল —"সে রকম ভাবে কি লিখলাম? তা কি পারি কখনও? মেয়েই তো, আর মা-বাপই তো তাঁরা?…গাছের ডালটা না হয় আলাদাই হ'ল—সম্বন্ধ তো ঘোচে না? ··লিখলাম—মা, খোকার অন্নপ্রাশনের সময় একটা কিছু সোনা-দানা না দিলে একটু নিন্দে হবে। হেমার বিয়েতে হয়ে গেছে অনেক খরচ, তা অন্তত ভরি খানেকেরও একটা কিছু যদি পার দিতে, দেখো। না পার, তোমাদের আশীর্বাদই যথেষ্ট।

মন্দ হ'ল ভাই? যখন মাস সাতেকেরটি, তখন খোকা বড্ড ভুগলে বলে ডাক্তারের মতে অন্নপ্রাশনটা পেছিয়ে দিতে হোল; মাস তিনেক সময় পেলেন, একটু সুবিধেও তে হোল? তবু এটুকুও লিখতাম না; হাজার হোক মা-বাপই তো? মনে করবেন, দেখ, ওই যে দু ভরি সোনা প'ড়ে আছে, বেয়াই লিখলেন না, বেয়ান লিখলেন না, জামাই পর্যন্ত কিছু বললে না, মেয়ে পাকে-প্রকারে আদায় ক'রে নিচ্ছে। লিখলাম, এই আসছে বোশেখে ভাত তো?—তা এরা কিছু দিতে পারবেন না। আর কোথা থেকে পারবেন বল ভাই? সম্বল তো ওই বিঘে কয়েক ক্ষেত আর ইস্কুলের চাকরটি—তাও ইস্কুলের যা অবস্থা, এই লড়াইয়ের হিড়িকে এক মাস মাইনে পায় তো দু মাস পায় না। এই সব দেখে বুঝে ওরা নিজেই যদি আক্কেল ক'রে বাকি সোনাটুকু দিতেন তো আমার আর…"

গাড়ির গতি মন্দ হইয়া আসিতেছে। মেয়েটি একবার গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইল। হঠাৎই মুখটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিশুটি আমার ভাইঝির কোলে ছিল, তুলিয়া লইয়া মুখের পানে চাহিয়া তুইটা চুম্বন করিয়া বলিল,—"মামার বাড়ি এসে গেল যে খোকন!—দিদিমা—দাদু—মামিমা! সোনাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে…সাধ ক'রে কি লিখি ভাই? এই সোনার অঙ্গে একটু সোনা-দানা না হ'লে চলে?—চ'লে কখনও—মায়ের প্রাণ কখনও বাঁচে?"

* * * * *

গাড়ি আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল।

একটি বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে খোঁজাখুজি করিতে করিতে এদিকে আসিতেছেন। মেয়েটী শিশুটিকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল,—"ওই আমার বাবা, ভাই। এই রোদ্দুরে—বুড়ো মানুষ—ওই কাহিল শরীর…"

স্বরটা হঠাৎ খুবই গাঢ় হইয়া পড়িল। বলিল—"কি দোটানা যে মেয়ের অদেষ্ট ভাই! মাকে চিঠিটা লিখে পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়ে আছে…থাকলে কি আর দেয় না মানুষে? নিজের নাতিই তো?—কি জানি, তাঁর মনের অভিমান মেটাতে পারব কিনা…"

ছেলে কোলে বাঁ হাতে আঁচল জড়ো করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া গেল।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অরুণ

তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর শ্রাবণের ধারা ধরিয়াছে। সেই ক্লান্ত বর্ষণ স্নিগ্ধ অরুণ কিরণ-উজ্জ্বল প্রভাতে বীণা তাহার ব্যারিষ্টার স্বামীকে চায়ের টেবিলে একলা বসাইয়া বর্ষাস্নাত বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। ভিজে মাটির গন্ধে তাহার অন্তর অজানা ব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, জলে-ধোয়া সবুজ পাতা আর ছেঁড়া কালো মেঘভরা আকাশের দিকে চাহিয়া চোখে অকারণে জল আসিল, অশান্ত চিত্ত লইয়া বাগানের চারিদিকে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বয় আসিয়া বিলাতী মেল্ দিয়া গেল। চিঠি ও কাগজের তাড়ার মধ্যে একটি যুদ্ধ আফিসের ছাপ-মারা প্যাকেট তাহার চোখে পড়িল; ষ্ট্রাণ্ড ন্যাস সরাইয়া, সে আগ্রহের সহিত খুলিল। দেখিল, তাহার একটি পাঁচ বছর আগের ফটো, একটি যুদ্ধ আফিসের চিঠি, আর একতাড়া সবুজ চিঠির কাগজ, বাংলা লেখায় ভরা। আশ্চর্য্য। যুদ্ধ আফিসের চিঠিতে লেখা আছে :—

"রুসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বাঙ্গালী যুবকের বুকে এই ফটো আর ছেঁড়া পাতাগুলি পাওয়া গিয়াছে। যুবকটি কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। কোটের পকেটে আপনার নামের কার্ড পাইয়া আমরা আপনার নামে এই ফটো ও কাগজের তাড়া পাঠাইলাম। আশা করি আপনি এ মৃত যুবকের আত্মীয় বা বন্ধু।"

বীণা কাগজগুলি সাজাইল; এত তাহার অরুণেরই হাতের লেখা; কোন্ তরুণ যুবকের উজ্জ্বল দৃষ্টি ও ব্যথাভরা হাস্যে সেই সবুজ ছেঁড়া পাতাগুলি ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল; কোন স্বপ্ন জন্ম হইতে উড়ে আসা রাত্রি তাহাকে ঘিরিল। একটি ঝোপে ভিজে ঘাসের উপর বসিয়াই সে পড়িতে লাগিল।

অরুণের ডায়েরী

(১)

আট্‌লান্‌টিক্ মহাসমুদ্র

জাহাজের কেবিন্

বাজ্‌ল ত একটা। ঘুম কি চোখে আস্‌বে না? সাগরের বুকে শুয়ে আছি, তবু অন্তর স্নিগ্ধ হল না। দোলা দাও; সিন্ধু, দোলা দাও; আজ এ দেহের শিরায় শিরায় রক্তের ধারা এ কি ছন্দে নৃত্য কর্‌ছে! তোমারই তরঙ্গের মত ফেনিল, চঞ্চল, গর্জ্জমান! অন্ধকার কেবিনে একা শুয়ে আছি; খোলা জান্‌লা দিয়ে সাগরের জোলো হাওয়া চুলগুলো দুলোচ্ছে, মহাসমুদ্রের অসীম চঞ্চল বারিবক্ষের ওপর তারাভরা রাত্রি তার কালো কেশ ভার এলিয়ে দিয়েছে—দূরে চেয়ে আছি যেখানে সাগরের সঙ্গে আকাশ আঁধারে এক হয়ে গেছে।

ঘুম কি চোখে আস্‌বে না? ওদিকের কেবিনগুলোয় আমার সহযাত্রীরা শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে; পাশের ঘরে মিসেস্ হোম তাঁর ছোট মেয়ে মেরীকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন—তাঁদের সুখ স্বপ্ন, সুগন্ধ, ধীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস এ কাঠের আড়ালের মাঝখান দিয়েও জান্‌তে পারছি।

তিমিরময় মহাসমুদ্র ভেদ করে আকাশ পথে উল্কার মত জাহাজখানি ছুটে চলেছে। এ রাত্রে তারি মত মত্তগতিকে কে আমার চিত্তে সঞ্চারিত করে দিল—ইঞ্জিনের শব্দ আস্‌ছে ঝক্‌ঝক্, আমার বুকটা বাজ্‌ছে দপ্ দপ্—মনোবীণায় কে এমন রুদ্র সুর বাজাল।

নাঃ! ঘুম আস্‌বে না।

ঝপ্ ঝপ্, ঝপ্—সমুদ্র তরঙ্গের একি ধ্বনি! এ কি জাহাজে ঘা মার্‌ছে, না আমার বুকে? ঢেউয়ে ঢেউয়ে ও কার স্বর শুন্‌ছি? কার করুণ কণ্ঠের ধ্বনি প্রতি জলোচ্ছ্বাসে কানে এসে বাজ্‌ছে—কারা যেন কথা কইছে—

—অরু, একবার ভালো করে ভেবে দেখ।

—না বীণা।

—চাও, একবার আমার মুখে চাও দেখি।

—না বীণা, আমি রাজি নই।

—কি কথা যে কইছ, মাথামুণ্ড নেই। তোমাকে পাওয়া আমার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হবে।

—তুমি আমায় ত জানো ; মেলাটা ত রোমান্টিক, না মেলাটা তার চেয়ে বেশী রোমান্টিক নয় কি ?

—আমার যে মেলার দর্‌কার হয়েছে।

—তবে তোমার কুঞ্জবনে বাঁশী বাজাবার পালা ফুরাল, আমি পথে বেরুলুম, বাঁশীই আমার চির-জন্মের সাথী।

আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ? না, এই ত জাহাজ দুল্‌ছে, ওই ত আকাশে তারা জ্বল্‌ছে, ওই ত কালো সমুদ্র গর্জ্জন কর্‌ছে। আবার কার কণ্ঠ কানে বাজ্‌ছে।

অরু, ভেবে কাল চিঠি লিখো, না হলে এই আমাদের শেষ দেখা।

আঃ! একটা ঝড় ওঠে না! আকাশে বাতাসে সাগরে এক তুমুল উন্মাদ নৃত্য—প্রলয়ের রূপ দেখ্‌তে চাই—আকাশে আলো নিভে যাবে, কালো মেঘ ঘনিয়ে আস্‌বে, জাহাজখানা খান্ খান্ হয়ে সাগরের তলায় লুটাবে—রুদ্রের পিণাক-ধ্বনি বাজ্‌বে, সেই ঝঞ্ঝামাঝে অগ্নিবর্ষণে বজ্রগর্জ্জনে উন্মত্ত সিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে দুল্‌তে চাই, অনন্ত মহাসমুদ্রে ডুবতে চাই। আমার রক্তের ছন্দে ছন্দে দেহ-বীণায় বীণার কথাই বাজ্‌ছে।

এই ভোর হয়ে এল, পুবের আকাশ রাঙা হয়ে আস্‌ছে। অরুণ, তোমার উজ্জ্বল কিরণে রাত্রের দুঃস্বপ্ন দূর কর। ডেকে খালাসীদের সাড়া পড়ে গেছে, বয়গুলো ডেক পরিষ্কার কর্‌ছে, সেই ঘস্ ঘস্ শব্দ মিষ্টি লাগ্‌ছে। কাপ্তানের হুইসিলটা কি সুরে ভরা, কি মিষ্টি—রাতের অন্ধকারে ওই শব্দটা শুনে দেহ শিহরিত।

আর কয়েক ঘণ্টা পরে ফ্রান্সের উপকূলে এসে পৌছব ; ব্রিটেনীর কূল এখনও নীল সাগরের জলে ডুবে আছে।

ফ্রান্স, ফ্রান্স, সাঁতার কেটে তোমার কূলে যেতে ইচ্ছা করে, জাহাজ চড়ে মন ভরে না।

ওই ব্রিটেনীর কূলে কোন ছোট কটেজে আমার স্থান হয় না ?—আট্‌লান্‌টিকের হাওয়া তার মাথায় দিনরাত বইবে, সাগরের তরঙ্গ তার তলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌বে।

(২)

প্যারিস, ১০ই

কাল সারারাত প্যারিসের পথে পথে ঘুরেছি। এই এক দিনের পরিচয়েই আমি প্যারিস্‌কে ভালবেসেছি। আজও সারারাত ঘুরতে ইচ্ছে করছে।

আমেরিকার নগরে নগরে যখন ঘুরেছিলুম তখন মনে হয়েছিল গারদ খানা দেখে বেড়াচ্ছি,—সেখানে হাজারে হাজারে মানুষ মিলেছে বেচাকেনার জন্যে, লোহার কল ঘুরছে, চিম্‌নীর ধোঁয়া উড়ছে, পায়রার খোপের মত ত্রিশ-চাল্লিশ তলা বাড়ীতে ইলেকট্রিকের আলো আর হাওয়ায় মানুষ বেঁচে আছে; নগর-লক্ষ্মী স্বর্ণপদ্মে ডলার পাপ্‌ড়ির ওপর তাঁর কোটিপতি বরপুত্রদের নিয়ে বসে আছেন। মানবসভ্যতা এক বিশ্বরূপ নিয়েছে, তাই জীবন যাত্রা ঘর বাড়ী সব দেশে দেশে এক হয়ে যাচ্ছে, বিচিত্রতার জন্যে আমার চিত্ত পিপাসিত হয়ে ওঠে। প্যারিসেও এই নব্য সভ্যতার রূপ দেখ্‌ছি—তবুও ইয়োরোপের সভ্যতার পর্ব্বে পর্ব্বে যে নব নব স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে তারই ইতিহাস এখানকার ইটে পাথরে লেখা রয়েছে। মধ্য যুগে এই নগরী ইয়োরোপের আথেন্স্‌ ছিল, এরই বুকে ফরাসী বিপ্লবের রক্তগঙ্গায় স্নান করে বর্ত্তমান সভ্যতা জন্মগ্রহণ করেছে; নেপোলিয়নের জয়পরাজয়ের ইতিহাস এরই সঙ্গে জড়ান। আমি হুগোর প্যারিস্‌, ব্যাল্‌জাকের প্যারিস্‌, ইউজি স্যুর প্যারিস্‌ দেখতে চাই —এ বিংশ শতাব্দীর প্যারিস্‌ নয়।

এর বুল্‌ভারে বসে সারাজীবন কাটান যায়; এখানে মানুষ প্রয়োজনের তাগাদায় মেলেনি, ব্যবসার জন্য নয়, কলকারখানায় খাটতে নয়—এখানে অন্তরের আদান-প্রদান করতেই মানুষ জুটেছে; এখানে দলে দলে বেড়ানো, মিলে মিশে গল্প করা, এক কাফেতে একসঙ্গে খাওয়া—সবাই হাস্‌তে চায়, মিশতে চায়, অন্তরের প্রেমকে সার্থক করতে চায়।

সীন নদীর তীরে এ সন্ধ্যাটি আমার মন ভুলালো। নৎর্‌দামের চূড়ায় অস্তগামী সূর্য্যের আভাটি এখনও লেগে আছে; নদীর নীল জল তীরের আলোয় ঝলমল্‌ করছে—ছোট ছোট তরীতে ভরা—কত বন্ধুদলের, কত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃদু গুঞ্জরণ, মধু হাস্যধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

আজ আমার মনে পড়ছে এম্নি সোনালি আভামাখা এক সন্ধ্যা বালিগঞ্জের

বাগানে—সে এক স্বপ্ন লোক থেকে ভেসে আসা রাত্রি। সেই রাত্রিটি ভাব্তে ইচ্ছা করছে।

সকালে বীণার এক চিঠি পেলুম,—আজ সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই এসো, জরুরী, কোন excuse চল্বে না। এক বন্ধুকে ল কলেজে প্রক্সি দিতে বলে সন্ধ্যার সময় বালিগঞ্জে যাত্রা করলুম। অনেক দূরে বীণাদের বাড়ী। সেখানে নগরের ধারটিতে গ্রামলক্ষ্মী তাঁর শ্যামল অঞ্চল সঙ্কোচ ভরে ছড়িয়ে দিয়েছেন খোলা হাওয়া মুক্ত আলোর মাঝখানে। বীণা আমার জন্য বাগানে বসেছিল; বাড়ীর আর সবাই বায়স্কোপ দেখ্তে গেছেন। আমি হেসে বল্লুম, কি খবর বীণা, বায়স্কোপ ফেলে সহসা আমার আহ্বান হলো কেন?

আমার পরিহাসে তার হাস্যদীপ্ত মুখখানি উজ্জলই হয়ে উঠ্ল; আজ তার বেশ-ভূষা হাসি চলা বসার মাঝে আশা ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্ছে।

বীণা শান্ত হয়ে বসে আমায় সব কথা বল্লে—বল্লে আমাকে তার চাই।

এক তরুণী তার যৌবনজাগ্রত বিকচোন্মুখ দেহপদ্মকে আমার বুকে সঁপ্তে চায়,—আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম।

আমার কথা শুনে সে এক শ্যাওলাঘেরা পাথরে বসে পড়্ল।

চৈত্র সন্ধ্যার হাওয়ায় মাথার উপর শালগাছের পাতা সরে গেল, ছিন্ন মেঘ থেকে ঝরা জ্যোৎস্নার আলো বীণার দুই কালো চোখে ঝর্ল—ঝর্ণা-বুকে তারার দীপ্তির মত। সেই নিমেষের জন্য বীণাকে অপরূপ রূপে দেখলুম—বোধ হল জগতে এমন শ্রী আর নেই। দেখ্লুম চোখ দুটি উল্কার আলোর মত; পিপাসায় ভরা; দেখলুম তার মুখখানি প্রেমারতির প্রদীপ; দেখলুম তার কণ্ঠে ও বক্ষে অনল-দীপ্তি—নীলাম্বরী শাড়ী সেখান হতে খসে পড়েছে; আমি শুন্লুম তার রক্তধারায় কিসের কান্না, তার চিত্তভরা বিরহ বেদনা—তরুণী তনুর উপর যেন কৈশোর যৌবনের দ্বন্দ্ব লেগেছে—আঁখিতে কি যাদুমন্ত্র, কণ্ঠে কি সুধা-ধারা, আঙ্গুলে কি মাদক স্পর্শ, চরণে মোহন গতি, তনুভরা মধুর আহ্বান। আমি বিস্মিত হোলুম, ভীত হোলুম। যেমন শুকতারার আলো, সঙ্গীতের স্বরধ্বনি, সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে বর্ণের উচ্ছ্বাস, যেমন মাধবী রাত্রি, সাগরে জ্যোৎস্না, সেই রকমই ত বীণা—বিশ্বের রূপলোকে তাকে দেখলুম—এই ত আমার সত্যিকার দেখা। আমি উঠে দাঁড়ালুম, স্নিগ্ধ স্বরে বললুম, বীণা, তুমি ত আমায় জান, ঘর বাঁধবার মন আমার নেই, আমি যে পথে পথে ঘুরব—

সে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, আমি তোমার পথের সঙ্গিনী হতে চাই। আমি হেসে বল্লুম, তোমার পথ হয়ত আমার পথ নয়, কিছুদূর গিয়ে আবার ছাড়াছাড়ির সময় আস্‌বে তখন টেনে টেনে যাওয়া কি দুঃসহ—আমি কাউকে আমার সঙ্গে বাঁধতে চাই না।

সেও হেসে বল্লে, তোমার সঙ্গে বন্ধনই ত আমার মুক্তি।

আমি শান্ত হয়ে বল্লুম, কিন্তু কিছু দিন পরে হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে ; মনে হবে, এ জীবন ত আমি চাইনি ; তখন সত্যিকার প্রেম মরে গিয়ে প্রেমের অভিনয় আরম্ভ হবে—সে আমি সইতে পারব না।

কি কান্না-ভরা তার হাসিটি। বীণা হতাশ হয়ে পাথরে ঠেস দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আমি তার হাত ধরে সাম্‌নে ঘাসে বসলুম। সেই হাওয়া ভরা জ্যোৎস্নারাতে দু'জনে স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ বসেছিলুম মনে নেই ; কখন দু'জনে স্তব্ধ হয়ে চলে গেলুম।

তারপর, জীবনের ঘটনাগুলো কি এলোমেলোই এল। ল পাশ করে বছর খানেক হাইকোর্ট, ছোট আদালত করলুম। বেশী দিন ভালো লাগল না; প্র্যাক্‌টিশ ছেড়ে জমিদারীতে গিয়ে বসলুম, ভাব্‌লুম দেশহিত করব। এমন সময় এক বিপন্ন বন্ধুর চিঠি পেলুম। সে দেশের নানা কাজে আত্মসমর্পণ করেছিল—নাইট্‌ স্কুল খোলা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া, পুস্তিকা বিতরণ করা, গ্রামে গ্রামে ঘুরে Co-operative movement বোঝান, দুর্ভিক্ষে খাটা, ইত্যাদি নানা কাজে পাগল হয়ে গেছ্‌ল। আত্মীয় স্বজনদের বাধা ছিল, গ্রামবাসীদের বাধা ছিল। তার পিতা বল্‌তেন, কেন গরীব চাষাদের সাহেব করার দুঃসহ ব্রত গ্রহণ করেছিস্, ওরা যেমন আছে ওম্নিই ভালো—ওসব বিলেতী আচার ব্যবহার চিন্তা চেষ্টা ওদের মাথায় ঢুকোলে ওদের কষ্ট বাড়বে বই কম্‌বে না। গ্রামবাসীদেরও মন তার প্রতি প্রেমে ভরা ছিল না। আমার মনে আছে, যখন শীতের ভোরের বেলায় ভোলা আমাকে বিছানা থেকে ঠেলে তুল্‌ত, আমি কি রাগই করতুম, ভোলা আমায় জন্ম থেকে মানুষ করে আসছে, তার সে অধিকার ছিল। যারা ঘুম ভাঙ্গাতে আসে, ঘুমন্ত লোকেরা চিরকাল তাদের ওপর রাগ করে এসেছে, গাল দিয়ে এসেছে, নির্য্যাতন অপমান করেছে। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের সন্দেহ অশ্রদ্ধা অপ্রেম বহন করে বন্ধুর সঙ্গে পূর্ণ উৎসাহে কিছুদিন দেশের কাজে লাগলুম, কিন্তু বেশীদিন ভাল লাগল না, হৃদয়ের পেয়ালা ভর্‌ল না।

আর্টের গলায় আমি বরণমালা দিয়েছি। আবার সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করলুম। নব্যযুগের নানা বিদেশী লেখা পড়তে সুরু করলুম —এ যুগের কি বাণী, নব্য সাহিত্য কি বল্‌তে চায়, এই নিয়ে নানা গান গল্প প্রবন্ধ লিখ্‌তুম। এক পত্রিকার সম্পাদক আমার কিছু লেখা ছাপালেন বটে, কিন্তু তাতেও এ নবযুগের যৌবন ভরা মন তৃপ্ত হল না। আপনার আনন্দে লিখ্‌তুম, আর কখনও নৌকা করে জলে ভাসাতুম, কখনও ঘুড়ি করে আকাশে উড়াতুম, কখন আগুনে জ্বালাতুম, কখনও ছিঁড়্‌তুম, কখনও বা যে কোন ঠিকানায় পোষ্টে বিনা নামে পাঠাতুম, কখন বা বাক্সে তুলে রাখতুম আর ছাপাতে পাঠাতুম না।

আবার আমার প্রাণের চির পথিক মানুষটি তার একতারায় ঝঙ্কার দিল। আমার বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ শ্রীচৈতন্যের শিষ্য ছিলেন, তিনি সংকীর্ত্তন করে ভারতের সকল তীর্থ ঘুরেছিলেন; তাঁরই রক্তের ধারা আমার দেহে অনুভব করলুম—পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার ইচ্ছা অনুভব করলুম—দুই চক্ষু ভরে বিরাট বিশ্বের বিচিত্ররূপ দেখবার বাসনায় বক্ষ ভরে উঠ্‌ল। বেরিয়ে পড়্‌লুম জগতের যাত্রাপথে।

চীন জাপান ঘুরে, প্যাসিফিকের দ্বীপগুলি দেখে, গ্রীনল্যাণ্ড, ক্যানেডা থেকে যখন ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এসে পৌছেছি, তখন দেশ জুড়ে মহাসমরের ‘সাজ’ ‘সাজ’ ধ্বনি পড়ে গেছে; দেশজোড়া প্রাণের কলধ্বনিতে চুপ করে থাক্‌তে পারলুম না, আমেরিকান্ রেড ক্রশে যোগ দিলুম, হুইট্‌ম্যানের দেশে এসে তাঁরই মত সেবাব্রত গ্রহণ করলুম।

এই রেড ক্রশের সঙ্গে ত ফ্রান্সে আসা গেল। নানা দেশের নানা জনের মাঝখান দিয়ে আপন জীবন-ধারাকে প্রবাহিত করে দিয়ে সার্থক অনুভব করছি। জানি না কোথায় এ ধারা অকূলে শেষ হবে—

দুটি তরুণ-তরুণী হাত ধরাধরি করে হাস্‌তে হাস্‌তে যাচ্ছে; তরুণীটি আমার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চাইছে! আর একটি সুন্দরী দূরে একা সীনের জলে ঘুরছে, কি লাল গাউন্‌টা—আমি গেলে হয়ত আমায় সঙ্গী পেয়ে একটা নৌকায় বেড়ায়।

লোকে ভালবাসে বলেই মেলে, আমি ভালবেসেছি বলেই মিলিনি, এটা এ প্যারিসের প্রেমিকারা বুঝ্‌বে!

আজও সারারাত প্যারিসের পথে পথে ঘুরতে ইচ্ছা করছে। এই ত

আর্ট দেবীর প্রতিষ্ঠাভূমি, ইয়োরোপে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই প্যারিস নগরী আর্টের আরতি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে, তারই আলোয় ইউরোপ আলোকিত; তারই শিখা থেকে নানা দেশ নানা জাতি আপন জীবন-প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়েছে।

প্রায় থিয়েটার ভাঙবার সময় হল; আজ রাতে যে নার্স এন্—র সঙ্গে Cafeএ খাবার কথা আছে তা ভুলেই গেছলুম।

(৩)

প্যারিস

৩১ শে —

মাঝের পাতাগুলো ছিঁড়ে পুড়োলুম, এ কদিনের কথা মনে যা থাকে থাক্, কথার বাঁধনে বেঁধে চিরন্তন করে রাখ্‌তে চাই না।

(৪)

রেড ক্রশ হাসপাতাল

বাগান

২৮শে—

আবার বাসা ভাঙতে হল। Ypres আর Mons, Calais আর Somme—সকল জায়গায় হাস্পাতাল ঘুরলুম—আর এক নূতন জীবন চাই।

এক বীণাকে ছেড়ে এসেছি, আর এক বীণা আমার মনের তারে ঝঙ্কার তুল্‌তে চায়—হায় রে! নার্স এন্—র সঙ্গে সম্পর্কটা দিন দিন সবাইয়ের কাছে রহস্যময় হয়ে উঠছে। পথিক, নূতন দেশে চলো, আর এখানে নয়।

এই বছর দুই ভরে কত প্রেমের দৃশ্যই দেখলুম—আহত সৈনিকদের দেখলেই ফরাসী রমণীদের প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কত উপহারের ফুল কেনা, প্রেমপত্র পোষ্ট করা, যার হাত ভেঙ্গেছে তার হয়ে তার বাড়ীতে চিঠি লেখা, যার পা ভেঙ্গে গেছে তাকে বাগানে নিয়ে আসা, বন্ধু আত্মীয় প্রেমিকাদের সঙ্গে দেখা করান—এইরূপ আহত সৈনিকদের নানা ছোট খাটো কাজে দিনগুলো আনন্দেই কাট্‌ল, কিন্তু নার্স এন— আমার বাসা ভাঙাল।

জানি না বাংলাদেশে এখন কোন্ ঋতুরাজ এসেছেন। হয়ত, বসন্তের

দখিন হাওয়ার শুক্‌নো পাতা ঝরে নতুন কচি সবুজ পাতা শিশুর মত মুখ তুলেছে—কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুন লেগেছে—আম্রবনে নব মুকুলের গন্ধ—বিজন মধ্যাহ্নে কোকিলের কুহুধ্বনি—পূর্ণিমা রাতে নদীভরা জ্যোৎস্না—হাস্নাহানায় বাতাস আকুল। হয়ত এখন বর্ষা এসেছে—মেঘমেদুর অম্বরে বিরহী-বিরহিনীদের ব্যথা ঘনিয়ে এসেছে—জলভরা মেঘ, দুরন্ত বাতাস, ধূলির ধ্বজা, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রধ্বনি, অবিরল বারিধারা—বনে বনে ঝড়, নদীতে নদীতে বান, আর অন্তর ভরা তুফান—এমন বর্ষা কোন্ দেশে আসে! হয়ত এখন শরৎ —আকাশ জুড়ে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, মাঠভরা সোনার ধান বাতাসে দুল্‌ছে, নদীভরা জল কল্‌কল্ করছে, শারদলক্ষ্মীর আগমনী গান আকাশে বাজ্‌ছে —শেফালী বন ঘুরে ঘুরে ভ্রমর পাগল। আজ ফ্রান্সের এই মুক্ত আকাশের নীচে বসে বাংলার শরতের সোনার আলোয় ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সেখানে ত আমার স্থান নেই। বাংলায় আজ কর্ম্মীর দরকার, যে দিন রাত ভুলে দেশের সেবা করবে; সেখানে শিক্ষিত ব্যবসাদার দরকার, উৎসাহী ইঞ্জিনিয়র দরকার, জনহিতৈষী ডাক্তার দরকার, প্রতিভাশালী যান্ত্রিক দরকার,—ইয়োরোপ আমেরিকার ধনী ও কর্ম্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করবে এমন কর্ম্মঠ বীর দলের দরকার; আমার মত আর্টিষ্ট্ সেখানে বাজে লোক, আমার মত ভাবুকের সেখানে জায়গা নেই।

বাস্তবিকই কি বাংলা দেশে আমার কোন জায়গা নেই? জীবনটা কি এমনিই অর্থহারা ব্যর্থ যাবেই! জীবনে ত অনেক পড়লুম, দেখ্‌লুম, ভাবলুম, —যে শক্তি আমার আছে তা' ত দেশের কোনো কাজে লাগাতে পারলুম না—

ব্যর্থ হলুম, ব্যর্থ হলুম—বাংলাদেশে আমি বাজে লোক।

কয়েকদিন পরেই ছাড়পত্র পেলে আবার নতুন দেশের সন্ধানে বেরুতে হবে।

(৫)

রুসিয়া
বল্‌সেভিক ক্যাম্প
৩রা —

বিষ্টি, বিষ্টি, বিষ্টি! অবিরল বারিধারার মধ্য দিয়েই রুসিয়ায় এসে ঢুক্‌লুম। রুসিয়ার দীর্ঘ প্রান্তর ভ'রে ঝোড়ো হাওয়া হা হা করছে—এ যেন

রুস্ জীবনের যুগ যুগের কান্না, এই জারদের নিষ্পেষিত রুসিয়া, টলষ্টয়ের সাধনার রুসিয়া, ডষ্টয়ভেস্কির চোখের জলে ভেজা রুসিয়া—তোমার ধূলিকে আমি প্রণাম করি।

কিন্তু আজ রুসিয়ার চোখে কান্না নাই, আজ সে ক্ষুব্ধ, সে গর্জ্জন করুছে। নিষ্পেষিত রুসিয়া মুক্তি পেয়ে দিকে দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে—ফরাসী-বিপ্লবের চেয়েও ভীষণ, অগ্ন্যুৎপাতের চেয়েও নির্দ্দয়, সমুদ্রঝঞ্ঝার চেয়েও তা ধ্বংসকারী। বল্‌সেভিকের রুদ্ররূপ দেখলুম—এ যেন অমানিশায় মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য। কিন্তু নবস্থষ্টির অরুণোদয় শীঘ্রই হবে।

ফ্রান্স ছেড়ে একটা মাস যেন আগুনের হুস্কার মধ্যেই ঘুরেছি, যেন নীহারিকাপুঞ্জে পথ হারিয়ে ফেলেছি—চারিদিকে অশান্তি অত্যাচার অরাজকতা—বড় বড় রাজ্য ভেঙ্গে পড়ছে, বড় বড় নগর গ্রাম স্বপ্নের মত বিলুপ্ত হচ্ছে—এই ধ্বংসের লীলায় যোগ দিতে চাই। শীঘ্রই এই নীহারিকা পুঞ্জ হ'তে নব নব সৌরজগৎ স্থষ্টি হবে—দিব্য আলোয় তাদের সঙ্গীত শুন্‌তে কান পেতে রয়েছি।

নার্স এন—র ফুলটা এখনও বোতামের গর্ত্তে গোঁজা রয়েছে দেখছি—জল পেয়ে শুক্‌নো পাতাগুলো সরস হয়ে উঠেছে—আস্‌বার সময় নার্স এন—রুমালে মুখ গুঁজে চলে গেল, একটি কথাও বল্‌তে পারলে না—ড্রিলের ঘণ্টা পড়ল—রুসসৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে বড় মজা লাগ্‌ছে।

(৬)

রুসিয়া

বল্‌সেভিক্ যুদ্ধ-ট্রেঞ্চ্

কাল সকালে লড়াই আরম্ভ হবে। হয়ত মরুতে পারি! কোথায় বাংলা, কোথায় রুসিয়ার যুদ্ধ-প্রান্তর। আশ্চর্য্য এই যে বল্‌সেভিক হয়ে লড়ছি। কেন বল্‌সেভিক্ হোলুম—নিজেই অবাক হয়ে যাই। আমার রক্তে যৌবনের আগুন জ্বল্‌ছে—যা পুরাতন ভাঙ্গতে চায়, নতুন স্থষ্টি করতে চায়, মানব-সভ্যতার নব নব রূপ দেখ্‌তে চায়—এই ত বিপ্লব—পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার নামই ত বিপ্লব।

যারা ভাঙ্‌তে চায়, আমি তাদের দলের। আমি যদি খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে জন্মাতুম তবে বুদ্ধের শিষ্য হোতুম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভাঙ্‌তুম;

আমি যদি খৃষ্টের সময় প্যালেষ্টাইনে জন্মাতুম, তবে খৃষ্টের শিষ্য হতুম, রোম রাজ্য ভেঙে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে লাগলুম; আমি যদি ক্রিন্টনের সময় ইংলণ্ডে জন্মাতুম, ক্রমওয়েলের সেনাদলে ভর্ত্তি হতুম; আমি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে জন্মাতুম গুরুগোবিন্দের শিষ্য হতুম; যদি ফ্রান্সে জন্মাতুম, রেভো-লিউসনের রক্তগঙ্গায় তর্পণ করতুম—সেই ভাঙবার গান আমার রক্তে বাজ্‌ছে, তাই বল্‌সেভিক্ হলুম।

বল্‌সেভিজমের রুদ্ররূপ আমার মত কেউ দেখেনি, কেননা আমি চৈতন্যের বাংলা হতে আস্‌ছি, তার দোষ অত্যাচার নির্য্যাতন আমার মত কেউ বুঝ্‌বে না—কেননা আমি যে আর্টিষ্ট। তবু তার দলই আমার দল হ'ল। বুদ্ধের ধর্ম্ম আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, খৃষ্টের বাণী কয়জন মানে, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা জগতে স্থাপিত হয়েছে কি? যুগে যুগে মানুষ যা সত্য বুঝেছে তার জন্যে লড়াই করে এসেছে—সে ব্যর্থ হতে পারে, তার স্বপ্ন সত্য হতে না পারে, কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যেই তার প্রাণের সার্থকতা।

মিসার (Misa) দেওয়া ফুলগুলির পাতায় খাতাখানি গন্ধে ভরে উঠেছে, আসবার সময় তার চোখও ছল্‌ছল্ করেছিল। মিসা আমাদের ক্যাম্পের কাছে এক চাষার বাড়ীর মেয়ে—তাকে দেখলেই মনে হয় যে রুস-জাতির ছাপটা তার দেহে মনে লাগান। তার দুটি রূপ আছে—একটি দৃঢ়, একটি কোমল—একটি পাষাণের, একটি ফুলের। কত সন্ধ্যাবেলা খোলা প্রান্তরে মাঠে মাঠে তার সঙ্গে তার দেশের কথা, আমার দেশের কথা বলেছি। আসবার সময় তার জলভরা আঁখি মনে পড়্‌ছে—এই অশ্রুনদী পার হয়ে কত প্রেমের তরী আমার চিত্তদ্বারে যে এলো!

হয়ত কাল মরব—সেই ভালো! পৃথিবীটা ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়েছি, আনন্দ খেলায় আর যোগ দিতে পারছি না। উনত্রিশটি বছর, হে ধরণী তোমার শ্যামল অঞ্চলে, তোমার শীতল ছায়ায় হাস্যে ক্রন্দনে নৃত্যে গানে কাট্‌ল—তোমার রূপে রসে গন্ধে আমার ভোগের পালা শেষ হল—মনোবীণায় কি একটা তার কেটে গেছে; ঝঙ্কার আর ওঠে না, দেহ আমার অবশ হয়ে আস্‌ছে, প্রাণ আমার শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে, কোন পাপড়ি ঝরে গেছে, জীবন ফুল আর ফোটে না। তোমার সৌন্দর্য্যভাণ্ডার অজস্র, অপূর্ব্ব; যা পেয়েছি তাতেই প্রাণ পূর্ণ হ'ল, আর তোমার দান গ্রহণ কর্‌তে পারছি না—এবার বিদায়ের পালা—নব নব যুগের নব নব প্রভাতে নব নব যাত্রীদল তোমার

রাজপথে জয়ধ্বনি কর্‌বে, তাদের সঙ্গে যোগ দেবার শক্তি যে আর নাই। সেই নবযুগের অরুণোদয়ে রুদ্ধদ্বারে গৃহকোণে জীর্ণ দেহমনে গতযুগের অন্ধকারে কেমন করে বাস করব—সে ত আর পারব না, পারব না। তাই বিদায় চাইছি—যোগ দিতে যখন পারছি না, তখন চলে যেতে চাই। নব প্রাণরসে অভিষিক্ত হয়ে কোন্ নতুন লোকে জন্মাব—যাত্রী-প্রাণ তৃষিত হয়ে উঠেছে। রুসিয়া, তোমার অগ্নি-শোষিত মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ দেখে যেতে পারলুম না—

তারাভরা আকাশ কি শুব্ধ। দূরে ট্রেঞ্চে মাঝে মাঝে কামানের শব্দ, বারুদের গন্ধ, রাঙা আলো অন্ধকারে নেচে নেচে উঠ্‌ছে।

আবার যদি পৃথিবীতে ফিরে আসি, আবার যদি নীল আকাশের তলে শ্যামল অঞ্চল কোলে জন্ম হয়,—তবে যেন আবার নবযুগের বাংলায় আমার বাঁশীটি নিয়ে ফিরে আসি—গঙ্গার তীরে আম্রবনছায়ে ক্ষুদ্র কুটীরের মাঝে যেন শিশু হয়ে জন্মাই। সেই নবীন সতেজ আনন্দে ভরা বাংলায় আমার বাঁশী শোন্‌বার লোক মিল্‌বে—আমি বাজে লোক হব না।

তারারা আমার মুখে চেয়ে আছে—আমায় ডাক্‌ছে—

কি ভীষণ কামানের আওয়াজ চল্‌ছে—যেন এক সঙ্গে দশটা নায়গ্রা প্রপাত ঝরছে, যেন একশ'টা রেলগাড়ী একসঙ্গে ছুট্‌ছে—যেন এক হাজারটা মোটর এক সঙ্গে ডাক্‌ছে—

আমার কাছেই গোলাগুলো পড়তে আরম্ভ হয়েছে—ওই গোলাটা ফেটে কি গভীর গর্ত্ত হয়ে গেল!

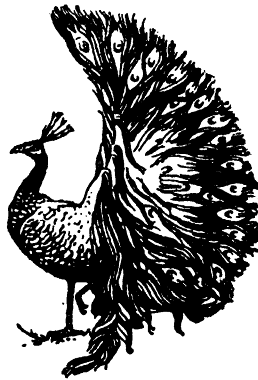
আর একটা — আর একটা

এগিয়ে চল, তরুণ যাত্রীদল, বীর বিদ্রোহীদল, এগিয়ে চল, কে গেল, চাইবে না, কে মর্‌ল, তাকাবে না, এগিয়ে চল—আমি যদি মরি, আমার এ বিধ্বস্ত দেহ মাড়িয়ে, আমার এ মুমূর্ষু প্রাণ ছাড়িয়ে, এগিয়ে চল। তোমাদের সঙ্গে নবযুগের অরুণোদয় বন্দনা করতে পারব না বলে দুঃখ নেই। মৃত্যুর জয় নয়, লোকে লোকে যুগে যুগে দেশে দেশে জয় নবযাত্রী জীবনের চিরজয়, স্বপ্নমুগ্ধ বিদ্রোহীর জয়।

আর একটা গোলা পড়্‌ল বালির বস্তার ওপর—আর একটা—। এই প্রলয়ের অগ্নি উৎসবে রাঙা আলোয় কোন তরুণীর মুখ চম্‌কে চম্‌কে ভেসে উঠছে—থাক সে মুখ, এগিয়ে চল, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াও।

বীণা যখন ডায়েরী পড়িতেছিল, তখন শ্রাবণের আকাশ আবার ঘনাইয়া আসিয়াছে, বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে—বীণার সে জ্ঞানই ছিল না। ঝোপের ফুলগাছ ঝরিয়া তাহার মাথায় পিঠে জল ঝরিতেছিল, তাহার নীল শাড়ী সবুজ ভিজে ঘাসের উপর জলে ভাসিতেছিল, কিন্তু তাহার বুকে যে আগুন জ্বলিতেছিল। যখন সে ডায়েরী শেষ করিল তাহার মনে হইল কামান হইতে অগ্নিপিণ্ড তাহারই বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। কাছে 'বয়' ছাতা লইয়া আসিয়াছিল, বলিল, সাহেব খুঁজছেন, ঘরে চলুন। বীণা তাহার দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইল, সে ভয় পাইয়া দৌড়াইয়া পলাইল।

বীণার গরম বোধ হইল, ব্লাউজ খুলিয়া ভিজে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল—ঝোপ ঘিরিয়া বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল—ঝম্ ঝম্ ঝম্।



শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঁই-মাচা

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক-খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকালবেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার-কাটি পুরিয়া দুই আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমান তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে?...দাও না একটা ঘটি? আঃ, ক্ষেন্তি টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিলেন—কেন···কি আবার···কি···

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্তসুরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা—কেন?···কি গুজব?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগ্দী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।—সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না—ও নাকি উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে, দুলে-বাড়ী, বাগ্দী-বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর!—ওঃ!...

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি সমাজের মাথা না একজন মতব্বর লোক! চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় বাহির করবে তা আর এমন কঠিন কথা?—আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী উঠল।...হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হল যে পনেরো বছরো, বাড়িবার সঙ্গে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?...পুনরায় ইশাক রান্নার বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাবএকা আমার, করতে?...

শরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার ।রের আশে কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাকীগুলা একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা ক।চিংড়ি —কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি-মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এযে...

চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হলদে, হলদে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই তিন পাকা পুঁই পাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেপটি পিন দিয়া একত্র করিয়া আটকান। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকী আছে, আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর ঘাটে পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায়-কাকা বললে, নিয়ে যা…কেমন মোটা বিশেষ ে

সহায়র্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁঝের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না একটা ঘ আহা কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছে…পাকা পুঁইডাটা কাঠ বুঝি ছোঁবে ন দু'দিন পরে ফেলে দিত…নিয়ে যা…আর উনি তাদের আগাছা অন্নপূর্ণা ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে লেন, পরে অতনা…যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে…ধাড়ী বলতে পার? দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা স্ত্রীর অত্রি পাড়া সে পাড়া করে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের ইহা যে ঝ? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? কোথায় শাক কোথায় মরীয়ুম, আর-একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাশ—ফেল্ বসছি ওসব…ফেল্।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আল্‌গা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধ'রে ফেলে দিয়ে আয়তো—যা ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড় না করি তো…

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে

ঝুলিতে চলিল।···সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে · তুমি আবার...বরং···

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কিসের? এক পাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে? যা, যা···তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয় ··

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যত সাধের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষালম্বন করিয়া দুপুর বেলায় স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না—নিঃশব্দে খিড়কী-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।···

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের?···

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী-দোরের আশে পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া একরূপ চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা বেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁই শাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ঠ মুখুয্যে—স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধ'রে প'ড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তারা কি স্বভাব? রাম বল, ছ' সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে স্বর নরম করিয়া বলিলেন—তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চলে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের...

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয়·

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক—তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো এক রকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে? আশীর্বাদ হওয়াও যা, বিয়ে হওয়াও তা, সাত-পাকের যা বাকী এই তো? সমাজে ব'সে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব, এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।...পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?...গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানাল? জজ-মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল। দুই ভাইয়ের অভাব কি?...

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেক দিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবাস্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রে

কয়েকমাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপুত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবী-লেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল···

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন—যা, শীগগির সাবলখানা নিয়ে আয় দিকি? কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কির দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার সাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপর পিতাপুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল—ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।···

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন—মুখুয্যে-বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল—খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না, তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে-বাড়ী ও পাড়ায় যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন ঘন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ-ঝোলা হলদে পাখী আমড়া গাছের এ ডাল হইতে ও ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখিটা! —পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল··· কে যেন কি খুঁড়িতেছে···দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ

করিলেন, তাহারা খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ খুপ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে গিয়া উমুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাস্‌নি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই, মা, এক্ষণি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকীদার রোজই বলে—কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধূলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং ··

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি ?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি ! না আমি কখন্‌ ? কক্ষনো না, এই ত আমি···সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এই মাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।···আমি সব জানি, মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি—দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কিসের খুপ্‌ খুপ্‌ শব্দ···তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ···তোমার তো ইহকাল নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে যা ইচ্ছে কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে ?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন ; কিন্তু স্ত্রীর চোখের

দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয়তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতঃস্তত করিতে করিতে মার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা তুজনে মিলে তুলে এনেছিস—না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটা দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশ-ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড়ো? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল—হাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—পাজী, আজ তোমার পিঠে আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছ মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই এক গলা বিজন বন, তার মধ্যে দিন-তুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোঁসাইরা চৌকীদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব—তা ব'লে পরের জিনিসে হাত? এ-মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

তু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তারকারীর আওলাত করিবার আয়োজন

করিতেছে এবং ভবিষ্যদ্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসী-হইয়া-যাওয়া আসামীর মতন উর্দ্ধমুখে এক খণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে—দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে?

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে? আজকাল রাতে খুব শিশির হয়

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁটাল-তলায় দাঁড়াইয়া আছে।...একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে-বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?...

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো...

—হাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে? সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?...

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙের মধ্যে উহা থাকিত।

পৌষ-সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া ময়দা

ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন—একটা ছোট বাটিতে এক বাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে; তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্র-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল—মা, ঐ একটু···

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু লক্ষ্মীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটী অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু···

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই-ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি, ঐ নারকেল-থালটা, ওতে তোর জন্যে একটু রাখি।···ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের থালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমতন্ন করেছিল, সুরেশ-কাকাকে আর ও পাড়ার তিনুর বাবাকে। বেলা ত পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটী জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না। খঁদী বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে?

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওই সব কথা। খেঁদির মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপ্‌টা খেতে দিলে, ওমা, কেমন একটা ধরা-ধরা গন্ধ, আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপ্‌টায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়।

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস্ নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐ দিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ-স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক-এক টুক্‌রো পাতা পেতে বোস দেখি, গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি জলদেওয়া ভাত আছে ও বেলার, বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটী বলিল—মা, বড়দি পিঠেই থাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুঁজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশ খানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি আর নিবি?—ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু···সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ-কর্ম্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি…

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোনো মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, সহর অঞ্চলে বাড়ী, সীলেট চূণ ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেঁদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।…তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?…

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো…বাবাকে পাঠিয়ে দিও—দু'টো মাস তো…

ওপাড়ার ঠান্‌দিদি বলিলেন—তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো…

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর

একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈ কি ?···দেখো তো কেমন না যান্ !···

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত—তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা বলব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি ?···

এক বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা ! আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে ?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চটকাইতে-ছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—নাঃ, সব তো আর...তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব।···তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি ?

সহায়হরি হুকাটায় পাঁচ ছ'টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে ? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার...

—তারপর বললাম টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না, ভেবে দেখলাম কি না ? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে···ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায়··· আরও কত কি ! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না; বুঝলে ? ··

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোন কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তার পর ?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম! মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পোষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!'···পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোট লোক কি বড় লোক, তোমার তো সরকার-খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি—প্রাচীন অভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বার-কতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে···

—দেখতে পাওনি ?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ-অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে।···যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।···চার কি ঠিক করলে?···পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।···

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটী ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন?

পুঁটী কহিল—আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা, দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধ'রে উঠবে···

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে এসে বোস না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল···খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন···দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।···

পুঁটী বলিল—মা, দাও, প্রথম পিটেখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে নষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।···

পুঁটী ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটী পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হাটিয়া আসিয়া খিড়কী দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।···

পুঁটী ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম···

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে···রাতও তখন খুব বেশী।···জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাটঠোকরা পাখি ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে···দুই বোনের খাইবার

জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত…

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিন জনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল…যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে…বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে…সুপুষ্ট, নধর প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!…



শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভয়ঙ্কর

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

অসময়ে সহর থেকে টাকা এসেছিল, কারখানায় পৌছে দেবার জন্য ভূষণ দত্ত প্রসাদকে ডেকে সাতশ' তেইশ টাকা দিল। চার মাইল দূরে বিরূপা নদীর ধারে ভূষণের মস্ত চামড়ার কারখানা। কাজ শেষ হবার পরেও আজ সকলে সেখানে ধন্না দিয়ে থাকবে, কিছু কিছু টাকা অন্ততঃ সকলকে আজ দেওয়া চাই। নইলে কাল কেউ কাজে আসবে না। রাস্তা ধরে বীর গাঁ হয়ে কারখানায় যেতে অনেক সময় লাগে, রেল লাইন ডিঙ্গিয়ে পেনোর মাঠ পার হয়ে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হতে হতে প্রাসাদ কারখানায় পৌছে যাবে।

গুমোট হয়েছে। আকাশের এক কোণে একটুখানি কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে প্রসাদের চোখে পড়েছিল। বুকটা তার একবার কেঁপে গেল। ভূষণকে করুণ সুরে একবার জানিয়ে দেবে কি, ঝড় উঠবার ভয়ে বাইরে যেতে তার সাহস হচ্ছে না?

বলা দূরে থাক, ভীরু চোখ তুলে ভূষণের মুখের দিকেও একবার সে তাকাতে পারল না। প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক। নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাব বোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত।

বিশেষ করে ভূষণের কাছে।

মোটাসোটা জমকালো শরীর ভূষণের, প্রকাণ্ড মাথায় ঠাসবুনানি কদম-কেশর চুল, ফোলা ফোলা গাল, নাকের বড় বড় গহ্বর দু'টি কাঁচাপাকা চুলে ভরা। পুরাণ ইতিহাসের রূপকথার নিষ্ঠুর অত্যাচারী চরিত্রগুলি ভূষণের এই চেহারার ধাঁচেই শুধু প্রসাদ কল্পনা করতে পারে। প্রচণ্ড শক্তি আর নির্মম কঠোরতার প্রতীক অবশ্য আছেন তার দেবতারা, কিন্তু তার মনে তাদের প্রভাবও ভূষণের মত জোরালো নয়। ভূষণ প্রত্যক্ষ, জীবন্ত। প্রতি মূহূর্ত্তে তার অস্তিত্ব, তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

'আজ্ঞে না, যাচ্ছি।'

গেরুয়া রঙের ছোট টাইট জামাটি গায়ে দিয়ে টাকাগুলি ন্যাকড়ায় বেঁধে পকেটে রাখল। এতটুকু দায়িত্ব নিয়েই নিজেকে বিপন্ন অসহায় মনে হচ্ছে। আশা ইসারায় তাকে ডাকতে দেখে আরেকবার তার বুকটা কেঁপে গেল।

'জাম পেড়ে এনো আমার জন্যে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আনব।'

'মরণ তোমার, আজ্ঞে হুজুর!' আশা গা-ঢলানো হাসির সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার চিবুকটা ধরে নেড়ে দিল, 'বৌঠান বলতে পার না?'

চেরা ঠোঁটের ফাঁকে আশার উপরের পাটির দু'টি ঘষা শ্বেত পাথরের মত অনুজ্জ্বল দাঁত সব সময়েই চোখে পড়ে; কথা কইতে বা হাসতে গেলে অন্তরালের আরেকটি দাঁতে খেলে যায় সোনালী ঝিলিক। দাঁতটি ভেঙ্গেছিল ভূষণ, তারপর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। তেল চপচপে একরাশি চুল দিয়ে মাথার পিছনে সে গোল চাকার মত প্রকাণ্ড চ্যাপ্টা খোঁপা বেঁধেছে। সুগঠিত দেহ একটু শিথিল হয়ে আসায় অপরিমিত যৌবন ভাঁটা ধরা জোয়ারের মত অস্বাভাবিক স্পষ্টতায় থম থম করছে। প্রসাদ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশা এই রকম সুরু করলে শরীরটা তার শক্ত হয়ে যায়।

রাস্তার মোড়ে বসাকদের মন্দির। সামনে দিয়ে যাবার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে মন্দিরের মানুষ সমান উঁচু চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা প্রসাদ জানাল, আজ যেন ঝড় না ওঠে, আর—আর, তার যেন সুমতি হয়!

আশার সুমতি হোক এই—প্রার্থনা জানাবার ভরসা তার হয় না, আশার মনে পাপ আছে মনে করলেও তারই পাপ হবে। আশা ভূষণের স্ত্রী, আশা গুরুজন। বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এলে পায়ে হাত দিয়ে আশাকে সে প্রণাম করেছিল।

আশা কাঁচা আম মাখছিল, থুতনি ধরে নেড়ে দেবার সময় ঠোঁটে আঙ্গুল ঘষে গিয়েছে। চলতে চলতে প্রসাদ ঝাল নুন তেলের স্বাদ অনুভব করতে থাকে। দুঃখে ক্ষোভে চোখে তার জল এসে পড়ার উপক্রম হয়। এ বিপদ ঠেকানো যাবে না, ঠেকানো অসম্ভব। সুমতি, না ছাই জাগবে তার, আশা কাছে এসে দাঁড়ালে ভাববার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়। দু'টি হাত দিয়ে আশা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে, কল্পনা করতে গেলেই তার সর্বাঙ্গ

যেন অবশ হয়ে আসে ; সত্য সত্যই আশা যেদিন তাকে জড়িয়ে ধরবে সেদিন নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা সে পাবে কোথায় ?

আশা যে কেন এমন হয়ে গেল কে জানে। মাঝখানে একবার প্রসাদের নিরুত্তেজ উৎসাহহীন জীবনে একটু সাড়া এসেছিল। সখ হয়েছিল, বিয়ে করবে। কাকে বিয়ে করতে দেখে, কার কাছে নববধূকে শয্যাপার্শ্বে পাওয়ার রোমাঞ্চকর বর্ণনা শুনে, অথবা কার সুখশান্তিভরা দাম্পত্য জীবনকে হিংসা করে ইচ্ছাটা তার জেগেছিল বলা যায় না। রাত জেগে সে কামনা করতে লাগল ভীরু লাজুক কিশোরী একটী বৌকে এবং কল্পনায় তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করল তার নিজস্ব জমকালো পারিবারিক জীবন। কম বয়সী, কুমারী বোকাটে ধরণের এবং অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির যে কোন ঘরোয়া মেয়ে হলেই তার চলত। কিন্তু তার জন্যে কোন মেয়ে বা কে খুঁজে দিচ্ছে ? জানাশোনার মধ্যে নিজের জন্য নিজেকেই তার একটি পাত্রী ঠিক করতে হল। মেয়ের বাপ গরীব, মেয়েটি চলন সই, সুতরাং সুলভ। তিন দিনের চেষ্টায় অনেক ভণিতার পর মেয়ের বাপের কাছে ইচ্ছাটা সে প্রকাশ করতে পারল। মেয়ের বাপ কৃতার্থ হয়ে বলল, 'সে তো আমাদের ভাগ্যি।'

তাকে দিয়েই প্রসাদ আবেদন পাঠাল ভূষণের কাছে! ভূষণ উদারভাবে বলল ' তা করুক না বিয়ে, বিয়ে করবে তাতে আর হয়েছে কি!'

দুপুরবেলা তাকে ঘরে ডাকিয়ে সোহাগের কৌতুকে আশা বলল, 'তুমি নাকি বিয়ে করবে ? মাগো মা, কোথায় যাব!'

সলজ্জভাবে একটু হাসলেও প্রসাদ মুখ নীচু করল না। আশাকে দেখতে দেখতে গভীর স্বস্তি বোধের সঙ্গে তার মনে হতে লাগল, তার বৌ এরকম হবে না, সুন্দর রোগা প্যাটকা চেহারা মেয়েটার।

তারপর কোথা থেকে আশার ছোট ছোট কটা চোখে ঈর্ষার বিহ্বলতা ঘনিয়ে এল। ভূষণের তুলনায় এ লোকটা যে একেবারে পৃথক, সম্পূর্ণ অন্য রকম—এই সহজতম সত্যটা বোধ হয় তার খেয়াল হল এতদিনে। অবহেলার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, চোখ রাঙ্গালে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মিষ্টি কথায় আহ্লাদে গলে যায়, হাসানো বা কাঁদানো চলে ছোট ছেলের মত, ইচ্ছাখুসীতে আকাশে তুলে আছড়ান চলে মাটিতে। তাছাড়া, তুচ্ছ আর নগণ্য বলে কত সহজে ওর কাছে নির্লজ্জ হওয়া যায়, যেচে ভাব করতে বাধে না,ভয় বা ভাবনার প্রয়োজন

থাকে না। এর বিচারের মূল্য কতটুকু! মন্দ ভাবুক, অসতী ভাবুক, কে কেয়ার করে ওর ভাবা না-ভাবাকে!

তবে কেমন যেন প্রাণহীন মানুষ, জড় পদার্থের মত, সাড়া দিতে জানে না। শুধু বিবর্ণ হয়ে যায়, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দিন তিনেক নেড়ে চেড়ে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে আশার রোখ চেপে গেল। বিয়ের ব্যবস্থাটা দিল বাতিল করে।

মুচকে হেসে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বিয়ে করতে হবে না অভিমান করে।'

সেই থেকে এইরকম আরম্ভ করেছে আশা। এবার একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভূষণ যে রাত্রে বাড়ী থাকবে না।

কোথাও চলে যাবার কথা মাঝে মাঝে প্রসাদ ভাবে। কিন্তু কোথায় যাবে! অজানা অচেনা জগতকে সে কম ভয় করে না। ছোটখাট ফরমাসী কাজ করে, সাবধানে খেয়ে দেয়ে শরীরটা ভাল রেখে, কোন রকমে এখানে মাথা গুঁজে সে টিকে আছে। দুর্বল শরীর, এতটুকু অনিয়মে অসুখ হয়। লেখাপড়াও ভাল জানে না, কোন কাজও শেখেনি। অপরিচিত নিষ্ঠুর মানুষের মধ্যে গিয়ে পড়লে দু'দিনে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পেনোর মাঠের মাঝখানে ভীরু প্রসাদকে ঝড় ধরে ফেলল।

পর পর ক'দিন বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, এলো-মেলো বাতাসও উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টিও নামে নি, ঝড়ও ওঠে নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ উড়ে বাতাস পড়ে গিয়েছে, দিগন্তের কোলে শুধু চোখে পড়েছে ঘন ঘন ক্ষীণ বিদ্যুতের চমক। প্রসাদ প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল, আজও যেন তাই হয়। নেহাৎ যদি খারাপ হয় তার অদৃষ্ট, শুধু যেন বৃষ্টি পড়ে। বৃষ্টিতে ভিজলেই তার সর্দ্দিকাশি হবে সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে জ্বর এসে হয়তো শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে যাবে নিমুনিয়ায়, ভূষণের সেজশালার মতই হয়তো চার দিনের দিন অচেতন হয়ে সাতদিনের দিন খটখটে জ্যোৎস্নার রাত্রে অজ্ঞান অবস্থাতেই সে মরে যাবে, তবু মাঠে একা ঝড়ের মধ্যে পড়ার চেয়ে তাও অনেক ভাল।

আকাশে ধূসর কালো মেঘের দ্রুত সমাবেশের দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে দুরু দুরু বুকে প্রসাদ জাম পাড়ছিল; দূর থেকে ঝড়ের সোঁ সোঁ

আওয়াজ কানে এল কারখানার দিক থেকে। ন্যাকড়ায় বাঁধা জামের পুঁটুলী পকেটে ভরে সেদিকে পিছন ফিরে প্রসাদ ছুটতে আরম্ভ করল। কোন মতে পেনোর মাঠ পার হয়ে রেল লাইন ধরে ষ্টেশনে পৌঁছে যদি আশ্রয় নেওয় যায়। দু'শো গজ দৌড়লেই প্রসাদকে হাঁপরের মত হাঁপাতে হয়, হাঁফ ধরবার আগেই বাতাসের প্রথম ধাক্কায় সে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল। উঠে বস মাত্র ধুলো আর বালিতে দুটি চোখ যেন তার অন্ধ হয়ে গেল। একটা শুকনে ঝাঁকাটির চারা গড়িয়ে তার গায়ে আটকে গেল, শুকনো পাতা তার গায়ে মাথায় ক্ষণিকের জন্য লেপটে থেকে ছিট্‌কে উড়ে যেতে লাগল, একটা শুক্‌নে ডাল কোথা থেকে এসে লাঠির মত আঘাত করল তার ঘাড়ে। তারপর নামল বৃষ্টি। ঝড়ের শক্তি আর কলরব যেন দশগুণ বেড়ে গেল। দু'টি বুড়ো আঙ্গুল দু'কানে ঢুকিয়ে হাতের তালুতে মুখ ঢেকে প্রসাদ তখন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।

ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জীবনে কখনো সে ঝড়ের মুর্ত্তি চেয়ে ছাখে নি। ঝড় উঠলে সে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে চোখ কান বন্ধ করে থাকে, মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে বার হয় ভয়ের উঁ উঁ কাতরাণি। কত কাল-বৈশাখী আর আশ্বিনের ঝড় এসেছে, গাছপালা ঘর বাড়ী ভেঙ্গে চারিদিকে লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে গেছে, প্রসাদের নাগাল কখনো পায় নি। আজ তাকে আয়ত্তে পেয়েই যেন নববর্ষের কাল-বৈশাখী উল্লাসে আরও বেশী ক্ষেপে গেল। বৃষ্টিধারাকে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে গায়ে তার প্রচণ্ড বেগে ঝাপটা মারতে লাগল ক্রমাগত, চারিদিকের গাছে আর্ত্তনাদের অসীম সমারোহ তুলে মড়্‌মড়্ শব্দে ভেঙ্গে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল ছোটবড় ডাল, দূর থেকে পাঠাতে লাগল কোটি হিংস্র জীবের ফুঁসে ফুঁসে শাসানোর আওয়াজ। একটা কিশোর তেঁতুল গাছ গুঁড়ির কাছে মটকে ভেঙ্গে আছড়িয়ে পড়ল, ডগার সরু সরু ডালপালাগুলি অসংখ্য চাবুকের মত একসঙ্গে আঘাত করল প্রসাদের পিঠে। সেই মুহূর্ত্তে ঠিক মাথার উপরের অবনত আকাশে প্রচণ্ড রবে গর্জন করে উঠল বজ্র।

তখন ধীরে ধীরে প্রসাদ উঠে বসল। অন্ধ ভয়ে মনে মনে সে মুহুর্মুহুঃ মরছিল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় জাগায় তার খেয়াল হয়েছে যে এখানে এভাবে পড়ে থেকে সত্য সত্যই মরা চলে না। বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে। গাছের ডালের আঘাতে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা এবার বীভৎস শিহরণের মত বার বার তার সর্বাঙ্গে বয়ে যেতে লাগল। এতজোরে সে দাঁতে দাঁত চেপে

ধরল যে মাথাটা তার থর থর করে কাঁপতে লাগল। তবু বমির বেগ ঠেকানো গেল না, দু'হাতে ভর দিয়ে উবু হয়ে সে হড় হড় করে বমি করে ফেলল। এমন হাল্কা মনে হতে লাগল নিজেকে, শুকনো পাতার মত বাতাস যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। কয়েক মুহূর্ত্ত দু'হাতে সে মাটি আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর উঠে দাঁড়ানো মাত্র বাতাসের ধাক্কায় মাটীতে পড়ে গেল। ঝড় তাকে উঠে ফাঁকায় সরে যেতে দেবে না, এইখানে তাকে ফেলে রেখে যতক্ষণ পারে খেলা করবে তাকে নিয়ে, তারপর গাছ চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস প্রসাদের কোনদিন হয় নি। ক্রুদ্ধা প্রকৃতির স্পষ্ট ও নিষ্ঠুর নির্দেশ মেনে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে কি না। ভেবে কিছুক্ষণ যে সত্যসত্যই নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু বাঁচবার প্রেরণা মানুষের সক্রিয় হয়ে উঠলে কোটি বছরের অভ্যাসকেও স্বীকার করে না, আবার সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। চলতে আরম্ভ করে ভয়ের পরিবর্ত্তে ভাবনায় তার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। রূপকথার মায়াকাননের চেয়ে ভয়াবহ এই গাছের রাজ্য পার হতে পারলেই খোলা মাঠ, সেখানে গিয়ে পৌছাতে পারলে নিরস্ত্র ঝড় তার কিছু করতে পারবে না। ফাঁকায় গিয়ে পৌছতে পারবে কি না ভেবে উৎকণ্ঠায় বার বার তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ গাছটি পার হবার আগেই তার চোখে পড়ল আলো। হেড লাইট জ্বালিয়ে রেল লাইনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। একসঙ্গে প্রবল হাসি কান্নার আবেগে প্রসাদের দেহ যেন অবশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে নড়তে পারল না। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেই অগভীর একটা খাদে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকু তার দুঃখ হল না, আঘাতের বেদনাও অনুভব করল না। নিজের সঙ্গে সে যেন তামাসা করছে, এমনি ভাবে গোঙিয়ে গোঙিয়ে সে হাসতে লাগল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠবার আগে সস্নেহ পরিহাসের ভঙ্গিতে ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে বলল, 'ধুত্তোর নিকুচি করেছে, ছুটতে গেলি কেন ?' হামা দিয়ে খাদের গা বেয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আবার ট্রেণের আলোর দিকে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করল।

প্রকাণ্ড একটা গাছ ভেঙ্গে লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। একটি থার্ড ক্লাস কামারর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই প্রসাদ মরমে মরে গেল। একগাড়ী লোক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। জামা কাপড় তার কাদা আর

রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে, না জানি কি ভাবছে সকলে তাকে দেখে! কামরার দরজা জানালা সব বন্ধ, ভেতরে অসহ্য গরম। প্রসাদের দম আটকে যাবার উপক্রম হল। তাড়াতাড়ি অপর দিকের দরজা খুলে সে লাইনে নেমে গেল।

বাড়ীতে পৌছানো মাত্র ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা পৌছে দিয়েছিস?'

'আজ্ঞে না।'

ভূষণ কটমট করে তার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'দে।'

এ পকেটে ন্যাকড়া বাঁধা জাম ছিল, অন্য পকেটে ভূষণের রুমালে বাঁধা সাতশ তেইশ টাকা। জামগুলি ছেঁচে গেছে, রুমাল শুদ্ধ টাকাগুলি কখন কোথায় পড়ে গেছে ভগবান জানেন। পেনোর মাঠেই কোথাও পড়েছে, সে যখন আছাড় খাচ্ছিল অথবা খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছিল।

থাবা উঁচিয়ে ভূষণ তার দিকে এগিয়ে আসে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে প্রসাদ তার দিকে তাকিয়ে কাশতে আরম্ভ করে দেয়। সে ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া জানে, তার ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে, ভূষণ তাকে মারবে! খালি পেটটা গুলিয়ে উঠে আবার বমি ঠেলে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরতে মাথার কাঁপুনি স্বরু হয়ে যাওয়ায় চোখের সামনে ভূষণের মস্ত গোলগাল মুখখানা পাশাপাশি দু'দিকে লম্বা হয়ে যায়।

কাছে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেই ভূষণের গতি কেমন অনিচ্ছুক ও মন্থর হয়ে পড়ে; খানিকটা তফাতে থেমে গিয়ে সে থাবা নামিয়ে নেয়। মাথায় সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখখানা দৃষ্টির ফোকাসে আনতে দাঁত খুলে গিয়ে প্রসাদের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। ভূষণ ভয় পেয়েছে! তাকে মারবার জন্য এগিয়ে এসে ভূষণের ভয় হয়েছে!

'পেনোর মাঠে খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

'পাওয়া যায় ভালই, নইলে তোকে পুলিশে দেব।'

ভূষণের ধমকে ঝাঁঝ নেই, এ যেন শুধু কথার কথা। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে এসে প্রসাদের মূর্তি হয়েছে ভীতিকর, তার লাল চোখের ভয়ার্ত্ত চাউনি থেকে বুক কেঁপে ওঠে। আশার সখের আলমারিতে বসানো প্রকাণ্ড আয়নায় প্রসাদ নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। ভূষণ ভয় পেয়েছে অনুমান করে প্রথমে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তারপর ধীরে ধীরে জাগল উল্লাস,

নিজেকে ভূত সাজিয়ে গুরুজনকে আঁতকে উঠতে দেখলে ছোট ছেলের যেমন উল্লাস জাগে সেই রকম, কিন্তু হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের আবেগের মত ঢের বেশী প্রচণ্ড ও উৎকট।

তার মধ্যেও মাথাটা আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা মনে হয়। ধীরে সুস্থে সব যেন সে হিসাব করতে পারছে, বুঝতে পারছে, ভুল হবার ভয় নেই। রুখে ওঠার ভঙ্গিতে সে যদি এখন দু'পা এগিয়ে যায়, ভূষণ আরও ভয় পাবে, আরও সংশয়ভরা দৃষ্টিতে তাকাবে, আরও নরম গলায় কথা বলবে, হয়তো দু'পা পিছিয়েও যাবে! এত ভীরু ভূষণ? এত সহজে সে ভয় পায়?

কী যে উপভোগ্য মনে হয় এই মুহূর্ত্তগুলি প্রাসাদের! শেষ করে চলে যেতে ইচ্ছা করে না। আজ বিকেলেও যার কাছ থেকে ছুটে পালাবার জন্য অদম্য প্রেরণা জেগেছিল, অকারণে সাধ করে তার সামনে প্রসাদ দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলার নেই জেনেও কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভান করে বলে, 'পড়ে গেলে কি করব! গাছ চাপা পড়েছিলাম, মরে যেতাম আর আরেকটু হলে। তখন কারো টাকার কথা খেয়াল থাকে?'

ভূষণ ভয়-বিস্ময়ের ভান করে সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'গাছ চাপা পড়েছিলে? খুব বেঁচে গেছ তো?'

তখন বিজয়ী বীরের মত প্রসাদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আশা তাকে দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'মাগো মা, একি?'

ন্যাকড়ায় বাঁধা ছ্যাঁচা জামগুলি দেখিয়ে প্রসাদ বলল, 'আপনার জন্য পেড়েছিলাম!'

আশা চাপা গলায় বলল, 'সত্যি?'

বাইরে ঝড়ের মাতামাতি চলছে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ষ্টোভ জেলে আশা রাঁধছে ভূষণের নৈশভোজনের মাংস। ঘরের মধ্যে গন্ধ আর গরমের অসহ্য সমন্বয়। গায়ের জামা সেমিজ সে খুলে ফেলেছে, ঘামে ভিজে সিদ্ধ মাংসের মত তার মেটে চামড়া হয়ে গেছে সেঁৎসেঁতে। 'একটাও ভাল নেই,'—বলে মুখে পুরবার উপযুক্ত জাম খুঁজতে সে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের আলগা আঁচলটিও তার খসে পড়ল, মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঝণ ঝণ শব্দে বেজে উঠল রিং-এ বাঁধা একরাশি চাবি।

প্রসাদ চোখ বুঁজতে চায়, বুঁজতে পারে না। পালিয়ে যাবে ভেবে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ভূষণকে ভয় দেখিয়ে যে বিদ্রোহী উগ্র আনন্দ

তার জেগেছিল, এত সহজে তার চেতনা থেকে লোপ পেয়ে তাকে যেন ঝিমিয়ে পড়তে দেবে না। মহাপাপ থেকে, অনন্ত নরক থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মন্দিরের দেবতাকে স্মরণ করতে গিয়ে সে শুধু দেখতে পায় কোমল মাংসে গড়া অপরূপ কাঁধ বাহু আর বুক। আশা সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র তার ঘামে ভেজা দেহটা সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

গভীর আলস্যে হাই তোলার মত মুখের ভঙ্গি করে আশা বলল, 'মরণ তোমার! বাড়ী ভরা লোক নেই?'

তবু সে তাকে বুকে চেপে ধরে রাখল আরও খানিকক্ষণ। ছোট ছোট কটা চোখের বিহ্বল দৃষ্টি তার মুখে বুলিয়ে, হলুদ রঙীণ আঙ্গুলে তার কপালের এলোমেলো চুল সরিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'পড়ে গিয়েছিলে মাঠে? খুব লেগেছে?'

বিস্ময় বা উত্তেজনা আশার নেই, মদালস অচপল নারীর মত সে যেন বহু পরিচিত প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করেছে। কতটুকু সময়ই বা প্রসাদের কাটল সেই ব্যাকুলতাহীন নিবিড় আলিঙ্গনে, ভূষণকে যতটুকু সময় ভয় দেখিয়েছিল তার চেয়ে বেশী নয়। সেইটুকু সময়ের মধ্যে প্রসাদের মনে হল, আশাকে, আশার অবৈধ কামনাকে, আশার দেহকে সে চিনে ফেলেছে। এ যেন একটা রবারের মেয়েমানুষ, পুরাতন ও ফাঁপা। আশার এই দেহের মোহ কাটাবার জন্য দেবতার পায়ে মাথা কপাল কুটে সে আর্ত্তনাদ করত! ঘুমের ঘোরে পাশ বালিশকে আঁকড়ে ধরার মত তাকে আশা জড়িয়ে ধরেছে, তার মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য ধ্বংসকারী উন্মত্ত কামনা কল্পনা করে সে হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিল! আশার হৃদ্‌পিণ্ডের ধীর অচঞ্চল স্পন্দন অনুভব করতে করতে প্রসাদের বুকের ঢিপ্‌ঢিপানি শান্ত হয়ে গেল, ছেলেদের ভিজে ঢ্যাপসা রবারের বলের মত তার দুটি স্তনের চাপে আগুন ধরা রক্ত তার হয়ে গেল শীতল।

প্রায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশা বলল, 'সাফসুফ হয়ে নাও গে। আমার চানের ঘরে ভাল করে সাবান মেখে চান করবে যাও। একটা বড় বোতল এনেছে, সবটা আজ খাইয়ে দেব। বারটা বাজতে না বাজতে ঘুমিয়ে পড়বে।'

আশার স্নানের ঘরে গোলাপের গন্ধ, একটানা, অনিবার্য্য, জমজমাট গন্ধ। তিন আনা দামের একটি সাবানে এত গোলাপের গন্ধ পাওয়া যায়, গোলাপের আরক কত সস্তা। মনটা প্রসাদের আশ্চর্য্য রকম সাফ মনে হয়, ঝড় সাফ করে দিয়েছে মৃত্যু ভয়, ভূষণ সাফ করে দিয়েছে মানুষের ভয়, আশা সাফ

করে দিয়েছে মাছির মত অন্যের চটচটে ঘন কামনায় আটকা পড়ার ভয়। ঘষে ঘষে সাবান মেখে প্রসাদ স্নান করল। রান্নাঘরের এক কোণে বসে ঠাকুরের পরিবেশন করা ভাত পেঠ ভরে খেয়ে নিল। ঝড়বাদল তখন অনেকটা কমে এসেছে। প্রসাদ সদরে গিয়ে দাঁড়াতে তাকে ভয় দেখাতেই যেন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বাতাস হঠাৎ প্রবল হয়ে চারিদিকে সাঁ সাঁ রবে শব্দিত হয়ে উঠল। প্রসাদের নবলব্ধ সাহসও এতক্ষণে অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত: করে বাতাস অনেকটা শান্ত হয়ে এলে সে পথে নেমে গেল। রেল লাইনে এখনো ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে। লাইন পার হয়ে যে পথে পেনোর মাঠ থেকে সে পালিয়ে এসেছিল সেই পথে ভূষণের দামী বড় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে সে এগিয়ে চলল। টাকার পুঁটুলিটা খুঁজে পাওয়ার পরেও যদি ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, এই ট্রেনেই সে উঠে পড়বে। নয়তো ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করবে, যে কোন দিক থেকে প্রথম ট্রেনের প্রতীক্ষায়।

ভাবতেও প্রসাদের বুক কেঁপে ওঠে। কে জানে কোন ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে সে গিয়ে পড়বে! তবে তার আশা আছে, একবার গিয়ে পড়লে, অজানা জগতের সঙ্গে পরিচয় হলে, ভয় তার কেটে যাবে। সাতশো তেইশ টাকা মূলধন নিয়ে একটা দোকান টোকান খুলেও সে কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার একটা ব্যবস্থা করতে পারবে না? এমন একটি বৌও কি তার জুটবে না যে কিশোরী, পূর্ণযৌবনা, কয়েকটা ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে তোলা জমকালো সংসারের গৃহিণী?



শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না

কফি খাওয়া আমার জীবনে সেই প্রথম। একটি হাল্‌কা কাঠের ছবি-আঁকা টিপয়ের উপর এক পেয়ালা কফি আর এক প্লেট বিলাতী মিষ্টি। কফিটা পেয়ালা থেকে পিরিচে ঢেলে বেশ একটু আওয়াজ করেই খেয়েছিলুম। তখন তো আমার ইনি ছিলেন না যে আদবকায়দার ভুল ধরতেন।

মা শুনে বললেন, "গেল জাত! গেল ধম্ম!" তাঁর শুচিবাতিক মাত্রাতিরিক্ত। "কিরস্তান বাড়ীতে কাফি খেয়ে এসেছিস। এর পরে শুনব ব্রাণ্ডি।" তিনি কানেই তুললেন না যে কফিটা চায়েরই মতো নেশাহীন পানীয়। "চায়ের মতো হলে হিন্দুরা খেত। কই, কেউ খায়, কখনো শুনেছিস?"

আমার দশ এগারো বছর বয়সে বাস্তবিক কখনো শুনিনি। তা ব'লে নোটনদিরা সত্যি ক্রিশ্চান ছিলেন না। ওঁরাও আমাদেরই মতো হিন্দু। দোষের মধ্যে ওঁরা কফি খান, আর ওঁদের বাড়ীতে ছোট জাতের লোক রাঁধে, আর ওঁদের মেয়ের অর্থাৎ নোটনদির বয়স যদিও উনিশ কুড়ি তবু বিয়ের নামগন্ধ নেই। তখনকার দিনে ওটা কল্পনাতীত।

বাবা বলতেন, "বিয়ের তো সব ঠিকই ছিল, কিন্তু বরকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল কী একটা স্বদেশী মামালায়। নোটনও আর কাউকে বিয়ে করবে না!"

মা বলতেন, "হিন্দুর ঘরে এমন হয় ব'লে শুনিনি। ওরা কিরস্তান।"

তিনি ভুলেও ওঁদের বাড়ী যেতেন না, আমাদেরও যেতে দিতেন না। কে জানে আমরা কী মনে ক'রে কী খেয়ে আসব, কোন্‌ মাংস ভেবে কোন্‌ মাংস! এই যে আমি নিষেধ না মেনে কফি খেয়ে এলুম, কে বলবে ওটা কফি না ব্রাণ্ডি না মাংসের সুপ।

অথচ বাড়ীটা খুব কাছেই। একটা মাঠ পেরিয়ে একটু ঘুরে যেতে হয়। বাংলো বাড়ী, চার দিকে নানা জাতের গাছ, বিলিতী লতাপাতা ও ঝোপ।

খুব কাছে হ'লেও আমার মতো বালকের চোখে কেমন যেন অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন, রহস্যময়। ও বাড়ীতে কারুর আসা যাওয়া না থাকায় ওখানে যে কী হতো তা নিয়ে খুব জল্পনাকল্পনা চলত।

নোটনদিকে কোনো দিন বাড়ী থেকে বেরোতে দেখতুম না। কারুর বাড়ী যাওয়া দূরে থাক নিজেদের বাগানে কি বারান্দায় তাঁর পা পড়ত না। বাইরের বাগানের ও বারান্দার কথা বলছি, ভিতরের নয়। যত দূর মনে পড়ে সেই কফি খাওয়ার দিন তাঁকে প্রথম দেখি।

আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শুধু বললেন, "আরো?"

আমি ঘাড় নাড়লুম। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তা জানতুম না। তিনি বোধ হয় উল্টো বুঝলেন, গম্ভীরভাবে আরো কয়েক রকম লজেঞ্চ দিয়ে গেলেন। কোনোটা রঙীন মার্বেলের মতো, কোনোটা স্বচ্ছ আমলকীর মতো। মুড়কির মতো একরকম ছিল, তার কিছু আমি লুকিয়ে পকেটস্থ করলুম। সব যদি পেটস্থ করি সমবয়সীরা বিশ্বাস করবে না যে আমার কপালে ওসব জুটেছিল।

"কেমন দেখলি নোটনকে?" মা শুধালেন।

"ভালো।" ও ছাড়া ও বয়সে আর কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করতে শিখিনি মেয়েদের বেলায়।

বাবার সঙ্গেই সেদিন ওঁদের বাড়ী যাওয়া। বাবা আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আমার এই ছেলেটির নাম খোকা, বইয়ের পোকা। আপনার এখানে তো মস্ত লাইব্রেরী। ও যদি মাঝে মাঝে আসে বই পড়তে—"

জ্যোতিবাবু মৃদু হেসে বললেন, "পোকা শুনে ভয় করে। যদি কাটে!" তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কত দূর পড়েছি।

আমি লজ্জায় নিরুত্তর। বাবা বললেন, "বঙ্কিম বাকী নেই। গিরীশ শেষ করেছে। রবি ঠাকুরের বই চায়। সেই যিনি নভেল লিখে প্রাইজ পেয়েছেন।"

"নোবেল প্রাইজ," আমি সংশোধন করলুম।

তা শুনে জ্যোতিবাবু চমৎকৃত হলেন। "তাও জানো? আচ্ছা, তুমি রোজ এসে রবিবাবুর বই পড়তে পারো। কেটো না কিন্তু।" তিনি শাসালেন।

সেদিন খানকতক ইংরাজী বাংলা পত্রিকা ধার দিয়ে ও কফি খাইয়ে তিনি

আমার ভয় ভেঙে দিলেন। লোকটি যে আদৌ ভয়ঙ্কর নন সেটা আমি আর একটু বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলুম, তখন কিন্তু সব ছেলের মতো আমিও তাঁকে জুজুর মতো ডরাতুম।

ক্রমে ক্রমে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হলো। আমার মা কেন তাঁর বাড়ী যান না তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না। তাঁকেও বলতে পারলুম না যে, আমাদের বাড়ী আসবেন। জানতুম, মা যেমন ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন তাঁকে হয়ত অপদস্থ হ'তে হবে।

বইয়ের ভিড়ে হারিয়ে গেলুম। একটা ঘর যেন বই দিয়ে ঠাসা। আমার সাড়া শব্দ কেউ পায় না, বাড়ী ফিরেছি না চুপ করে পড়ছি খোঁজ করতে এসে নোটনদি সুধান, "খোকন, এখনো পড়ছ? কী বই ওটা? 'সোনার তরী।' বুঝতে পারো?"

আমি লজ্জায় নীরব থাকি। তিনি বলেন, "আমি তো পারিনে।"

তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান, সেখানে ফলমূল খাই। দেখি, তিনি যে কেবল বইটই পড়েন তা নয়, ব্যায়ামও করেন। এক জোড়া গ্রিপ ডাম্বেল ছিল তাঁর টেবলে, একটি চার্ট ঝুলছিল দেয়ালে। তিনি কাছা দিয়ে কাপড় পরতেন, মরাঠী ধরণে। বীরাঙ্গনা বলে মনে হতো। কেমন একটা শুষ্কতা ছিল তাঁর মুখে ও শরীরে, রুক্ষতা তাঁর চুলে ও চোখে। তাঁর ঘরের এক কোণে পুজোর সরঞ্জাম। পূজার পাত্রটি কোনো দেবদেবী না, একটি যুবক। যুবকটি বেশ তেজীয়ান, হয়ত একটু নিষ্ঠুর।

নোটনদি একবেলা আহার করতেন, মাছমাংস খেতেন না, ব্রহ্মচারিণীর মতো থাকতেন। তবু লোকে বলত কিরস্তান। তাঁর বাবা জ্যোতিবাবু ছিলেন পরম শাক্ত। তাঁর খাওয়ার সময় আমাকে দেখলে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মুরগী চাখতে দিতেন। বলতেন, "তোরা তো বৈষ্ণব। এটিও রামচন্দ্রের বাহন।"

মা শুনে বলতেন, "আমার এ ছেলেটা মেলেচ্ছ হবে।" মাতৃবাক্য ব্যর্থ হবার নয়। অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে।

তার পরে কেমন ক'রে কী হলো ভালো মনে পড়ে না। জীবনের সব পর্য্যায়ের স্মৃতি সমান তীক্ষ্ণ নয়। নোটনদিরা চলে যান আগে, জ্যোতিবাবু

যান তার কয়েক মাস পরে। ইস্তফা দিলেন, না অবসর নিলেন, ঠিক জানিনে। লাইব্রেরীর পড়া শেষ করে আমি তাঁদের বাড়ী যাওয়া প্রায় বন্ধ করে এনেছিলুম। তাঁদের প্রস্থান আমাকে তেমন স্পর্শ করেনি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগে অসহযোগ করেছিলুম, কিন্তু পরীক্ষাটা পাঁচজনের অনুরোধে দিয়েই ফেললুম। দিয়েই চললুম ভাগ্যপরীক্ষা করতে কলকাতা। বাবা একখানা চিঠি লিখে দিলেন জ্যোতিবাবুর নামে। জ্যোতিবাবুর চাকরী নেই, পদমর্য্যাদার মিথ্যে মুখোস খসে পড়েছে। দেখলুম তিনি চমৎকার লোক। যেমন হাসিখুশি, তেমনি স্নেহপ্রবণ। আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন সম্পাদক মহলে। সুরু হলো শিক্ষানবিশী।

খবর নিয়ে জানতে পেলুম নোটনদির বিয়ে হয়েছে সেই যুবকটির সঙ্গে। ভারতসম্রাটের মার্জনা পেয়ে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে তিনিও আন্দামান থেকে ফিরেছেন। ফিরে কিছু দিন বসে থেকে সম্প্রতি অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন। প্রায়ই মফঃস্বলে সফর ক'রে বেড়ান, কলকাতায় থাকেন কম সময়। নোটনদি কিন্তু শাশুড়ী ননদ ইত্যাদির সঙ্গে কলকাতায়।

ঠিকানা জোগাড় ক'রে গেলুম একদিন দিদিকে দেখতে। গড়পার না বেলেঘাটা ঠিক স্মরণ নেই, বাড়ীটা পুরানো ও ভাঙা, বাড়ীর মেয়েদের পরণের কাপড় ময়লা ও মোটা। নোটনদি চরকা ঘটর ঘটর করছিলেন, আমাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের পরিবারে হালচাল, কেন কলকাতা এসেছি, কোথায় উঠেছি, এমনি কত কথা। না খাইয়ে ছাড়বেন না, কী করি! মেসের খাওয়া খেয়ে আমারও তো ন্যাড়ার মতো ভাব। খেতে বললে আঁচাবার প্রশ্ন তুলি। আর বস্তুতঃ তখন আমি ন্যাড়াই ছিলুম, কারণ তার কিছু দিন পূর্বে আমার মাতৃবিয়োগ হয়।

খুব দুঃখ করলেন আমার মা নেই শুনে। বললেন, "আমার সাধ্যি থাকলে তোমাকে আমি মেসে থাকতে দিতুন না, খোকন। কিন্তু—"

আমি বুঝতে পেরেছিলুম কিন্তুর পরে কী। কথা কেড়ে নিয়ে বললুম, "না না, আমার অসুবিধা কিসের? মেসে কি কেউ থাকে না?"

নোটনদির সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না হ'লেও তাঁর মানসিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হলো। প্রিয়প্রাপ্তির আনন্দে সেই তাপসী অপর্ণা যেন ভিখারী শিবের অন্নপূর্ণা। মনের আনন্দ যেন শরীরেও সঞ্চারিত হয়েছে। ভরন্ত গড়ন। শ্রীমন্ত আকৃতি। আমি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলুম।

কথা ছিল কলকাতায় যত দিন থাকি মধ্যে মধ্যে দেখা করব ও খেতে পাব। কিন্তু মেসের খাওয়া তবু সহ্য হয়, চৌদ্দ পয়সার হোটেলের খাওয়া একেবারে অরুচিকর। খরচ বাঁচানোর জন্যে আমাকে তাও মুখে দিতে হয়েছিল। তার পরে ডাল রুটির দোকানে, চিড়ে মুড়ির দোকানে মুখ বদল করতে করতে ক্রমে ক্রমে করতে হলো সজল উপবাস। ঘুরে ঘুরে শেষে একটা কুঁচকি নিয়ে শয্যাশায়ী—মেসে নয়, অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একটি কুঠরিতে। কাজেই কলকাতা ছাড়তে বাধ্য।

কাকার কাকুতিমিনতি শুনে অসহযোগে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর কাছে থেকে কলেজে ভর্ত্তি হই। মফঃস্বলের কলেজে। ভাগ্যপরীক্ষার সেইখানেই ইতি।

নোটনদির কথা অচিরেই ভুলে গেলুম। মনে রাখবার তেমন কোনো কারণও ছিল না। তার পরে যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমরা জনকয়েক সতীর্থ মিলে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয়ের নেতৃত্বে দিল্লী আগ্রা বেনারস্ বেড়াতে যাই। সারনাথে সাক্ষাৎ হলো জ্যোতিবাবুর সঙ্গে। তিনি কিছু দিন থেকে কাশীবাস করছিলেন, তাঁর সঙ্গে নোটনদিও। বললেন, "নোটন যদি শোনে তুমি কাশী এসেছিলে, ওর সঙ্গে দেখা না ক'রে চলে গেলে, তা হ'লে খুব দুঃখিত হবে।"

অগত্যা অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে জ্যোতিবাবুর টাঙ্গাতেই তাঁর কাশীর বাসায় গেলুম। দিদি আমাকে প্রত্যাশা করেননি, প্রথমটা চিনতে ইতস্ততঃ করলেন। পরিচয় পেয়ে বললেন, "ও! তুমি! খোকন!"

দেখলুম তাঁর কোলে একটি নতুন মানুষ এসেছে। মানুষটির নাম চামেলী মা হয়ে নোটনদির চেহারা বদলে গেছে। হৃদয়ের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য যেন শত ধারে ঝ'রে পড়ছে—চাউনিতে, কথায়, চলনে। খদ্দর টদ্দর নয়, সাধারণ গৃহস্থঘরে যা পরে তাই পরেছেন।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলুম, "কবে কলকাতা ফিরছেন?"

"ফিরব না ব'লেই এসেছি।" তিনি উদাস সুরে বললেন।

"কেন, জানতে পারি?"

"গোপন করবার কিছু নেই।" তার পরে ভেঙে বললেন, "ওঁর সঙ্গে এব পথে চলা অসম্ভব হয়ে উঠল। অহিংসার ভেক প'রে পুলিশের চোখে ধূলে

দিয়ে হিংসাবাদীর দল গঠন করা আমি পছন্দ করিনে। আমিও হিংসাবাদী, কিন্তু আমার মন মুখ এক।”

ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে তিনি বলেন, “ওঁর কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে ইংরেজের সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ তখন যুদ্ধে সব কিছু ন্যায়সঙ্গত। শিবাজী যেমন আফজল খাঁর বিশ্বাস অর্জন ক'রে তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করলেন, তেমনি অহিংসার দ্বারা ইংরেজের বিশ্বাস উৎপাদন ক'রে তাদের ধ্বংস করতে হবে।”

আমি শিউরে উঠলুম! তিনি বললেন, “এই মতবাদ আমার বিবেকবিরুদ্ধ। যত দিন পেরেছি সহ্য করেছি, কিন্তু ঘাতকের চেয়ে অশ্রদ্ধা করি বিশ্বাস-ঘাতককে। কী ক'রে সে অশ্রদ্ধা চেপে রাখি? এই নিয়ে শেষ কালে রাগা-রাগি হয়ে গেল। না হ'লেই ভালো হতো।”

তিনি হঠাৎ উঠে গেলেন। মনে হলো ও ঘরে গিয়ে কাঁদলেন।

জ্যোতিবাবুর সেই টাঙাওয়ালা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হোটেলে সাথীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাশী থেকে যাত্রা করলুম পাটলীপুত্র। নোটনদির স্মৃতি আবার ছায়া হয়ে গেল।

আরো তিন বছর পরে এলাহাবাদ গেছি নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগীতায় মস্তিষ্কের বল পরীক্ষা করতে। পথে বেনারসে নামতে হলো একজন বন্ধুর আগ্রহে। মনে পড়ে গেল নোটনদিকে, জ্যোতিবাবুকে। ভাবলুম, এখনো কি তাঁরা সেখানে আছেন? কে জানে! একবার দেখাই যাক না।

দেখা হলো নোটনদির সঙ্গে। কিন্তু এ কোন্ নোটনদি! এ তাঁর রুদ্রাণী রূপ। ভিতরে আগুন জ্বলছে, তাই জ্বলছে তাঁর শাড়ীর পাড়, সিঁথির সিঁদুর, হাতের রুলি। আমাকে বসতে না ব'লে চলে যেতে বললেন।

“খোকন, বড় অসময়ে এসেছ। এখুনি এ বাড়ী খানাতল্লাস হবে। মাকে আর চামেলীকে নিয়ে বাবা কলকাতা রওনা হয়ে গেছেন। পুলিশ যদি ধরা করে, আমিও রওনা হব জেল হাজতে।”

আমি তো তাজ্জব বনলুম। কাঁপতে কাঁপতে একটা চেয়ার ধ'রে বসে পড়লুম। তখন তিনিও বসলেন। বললেন, “সময় থাকলে শোনাতুম সব কথা। আবার কবে দেখা হবে জানিনে, হয়ত এ জীবনে এই শেষ।”

আমার চোখ ছলছল করছিল। তিনি কোমল স্বরে বললেন, “এতে মন

খারাপ করবার কী আছে! যারা এ পথে পা দেয় তাদের পায়ে কাঁটা ফুটবেই তো। আমি তো এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই জীবন আরম্ভ করেছি।"

"কিন্তু আপনি না ও পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন, নোটনদি?"

"কে বলল? না, আমার পথে আমি ঠিকই আছি। ছেড়ে দিয়েছি আমার স্বামীর পথ। তুমি ভুল বুঝেছিলে।"

তিনি আমাকে এক রকম জোর ক'রে তাড়ালেন। বাড়ীটাতে আরো কয়েকজনের পায়ের শব্দ পাচ্ছিলুম। তারা ছিল নেপথ্যে।

তাড়াতাড়ি একখানা খামের উপর ঠিকানা লিখে তাতে এক টুকরা কাগজ ভ'রে তিনি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "সামনে যে ডাক বাক্স দেখবে তাতে ফেলে দিয়ো। কাছে রেখো না।" এই ব'লে আমাকে এক ঠেলা দিলেন।

এর পরে আমি বিলেত যাই, নোটনদির যে কী হলো সে খবর জানতে পাইনে। জ্যোতিবাবুর কলকাতার বাড়ীর নম্বরও ভুলে গেছলুম। যে ভোলা মন!

বিলেত থেকে ফিরে পুরোদস্তুর সংসারী হলুম, সমস্ত সংসারটা সংকীর্ণ হয়ে আপিস ও বাংলো এই দুই বিন্দুতে ঠেকল। দিন যায় আপিসের কাজে, রাত কাটে বাংলোয়। ছুটি ক্বচিৎ মেলে। এমন কি পুজোর ছুটিতেও আমি আটক — বড়দিনেও আমি বাঁধা।

নোটনদির নাম এক বার যেন কাগজে পড়েছিলুম। শক্ত অসুখে ভুগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, তার পরেই কিন্তু কোন এক গ্রামে অন্তরীণ। দিদিকে একখানা সহানুভূতিভরা পত্র লিখি এমন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন যে দিনকাল, টেররিস্টের প্রতি সহানুভূতিকে কেউ হয়ত ভুল বুঝত টেররিজমের প্রতি সহানুভূতি। মনের ইচ্ছা মনেই বিলীন হলো।

কয়েক বছর পরে কলকাতা গেছি এক দিনের ছুটিতে। এক বন্ধু বাড়ী কী একটা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণটা দুপুরে। দেখি নোটনদি ও তাঁর স্বামী। দিদি যে আমার সাহেবী পোষাক সত্ত্বেও আমাকে চিনতে পারলেন এতে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। ধরতে গেলে এটা আমার সাহেবিয়ানার পক্ষে

গৌরবের বিষয় নয়। সাহেবের মতো সাহেব হলে কি কেউ আমাকে বাঙালী বলে চিনত ?

নোটনদি যখন শুনলেন যে আমি পরের দিন কলকাতা ছাড়ব তখন আমাকে সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে একবার হাজিরা দিতে বললেন। আমার অন্য এনগেজমেণ্ট ছিল, গ্রাহ্য করলেন না।

অগত্যা যেতে হলো তাঁদের সেই শ্যামবাজারের বাড়ীতে। সেটা জ্যোতি-বাবুর বাড়ী ! তিনি ইতিমধ্যে মারা গেছেন, তার স্ত্রী বেঁচে। নোটনদি মা'র কাছেই থাকেন। তাঁর স্বামী করপোরেশনে চাকরি ক'রে সাত বছরে তিন-খানা বাড়ী করেছেন, কিন্তু স্বামীকে সহ্য হ'লেও স্বামীর উপদলটিকে দিদির সহ্য হয় না। কাজেই দুজনে আপোষে আলাদা হয়েছেন। চামেলী থাকে মা'র কাছে এক মাস তো ঠাকুমার কাছে এক মাস। দিদিও মাঝে মাঝে শ্বশুর-বাড়ী যান, কিন্তু থাকেন না। কানাঘুষা শোনা যায়, দিদির নাকি সতীন জুটেছে, অসামাজিক সতীন।

সন্ধ্যাবেলা বাঙালী সেজে দিদির ওখানে গিয়ে দেখি—আরে রাম, সবাই সাহেব হাফ সাহেব ! আমি যেন হংসো মধ্যে বকঃ। ওটা অবশ্য কক্‌টেল পার্টি নয়, কিন্তু যা চলছিল তা বিশুদ্ধ পানীয় জল নয়, অভ্যাগতরা চুরুট কিংবা সিগারেট টানতে টানতে এক একবার গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলেন। খুব রাজা উজির মরছিল। পরে শুনেছিলুম এই মহাপুরুষরা নাকি লেফ্‌টিস্ট।

ব্যাপার দেখে দিদিকে বললুম, "আমি কিন্তু বেশীক্ষণ বসব না, আমার আর একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে।"

তিনি তখন তার দলবলকে বোঝালেন যে আমি তাঁর নিরুদ্দিষ্ট সোদর, প্রায় দশ বছর পরে অবির্ভূত হয়েছি, তাও এক রজনীর তরে। ভদ্রলোকরা বিদায় হলেন। আমিও দিদির দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ পেলুম।

তিনি কোনো কালে এতটা সৌখীন ছিলেন না। পায়ের চপ্‌পল থেকে চোখের চশমা পর্য্যন্ত সব ফ্যাশনেবল। চেহারাও আগের চেয়ে ঢের চলনসই। ফিগার আগের মতোই শ্লিম।

"তার পর, খোকন।" তিনি আমার মুখোমুখি বসলেন। "এখন তুমি একজন বড় সাহেব, না ? কই, তোমার মেমসাহেবটি কোথায় ? তাঁকে কেন আনলে না ? ছেলেমেয়ে ক'টি ? তোমাদের তো লাভ্‌ ম্যারেজ্‌, না ?"

এমন অসংখ্য খুঁটিনাটি। আমার এনগেজমেণ্টের কথা তুলতেই তিনি

কাকে যেন একটা হাঁক দিলেন, বললেন আমায় বন্ধুর বাড়ী থেকে আমার বিছানাবাক্স আনিয়ে নিতে। তার পরে চিঠির কাগজ আনিয়ে বললেন "লিখে দাও, অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার সেই এনগেজমেণ্ট ক্যানসেল করিতে বাধ্য হইলাম।" ধমক দিয়ে বললেন, "তোমার জন্যে আমার কমরেডদের সঙ্গে দুটো কাজের কথা কওয়া হলো না, আর তুমি কিনা যেতে চাও আড্ডা দিতে। আজ তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, রাত বারোটা বাজবে; সেইজন্যে তোমার বিছানা আনতে পাঠালুম। কে জানি যদি এ বাড়ীর বিছানা তোমার মতো সাহেবলোকের নামঞ্জুর হয়!"

সত্যি সেদিন রাত বারোটা বাজল। নোটনদি আমাকে সেই কাশীর আখ্যান ব্যাখ্যা ক'রে শোনালেন। তার পরে বললেন কারাকাহিনী, অন্তরীণ প্রসঙ্গ। শেষে তাঁর বর্ত্তমান মতবাদ, মনোভাব ও কাউকে যা বলেননি এমন একটি রহস্য। "তুমি সাহিত্যিক ব'লেই তোমাকে বিশ্বাস ক'রে বলা।" তিনি কৈফিয়ৎ দিলেন।

দিদি আমার লেখা পড়েননি, শুধু সাহিত্যিক ব'লে কার কাছে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড খবর পেয়েছিলেন। তাতে আমার সাহিত্যিক অভিমানে আঘাত লাগলেও সাহিত্যিক কৌতুহল উজ্জীবিত হয়েছিল। ভাবলুম, যাক্, কোনো দিন দিদির গল্প লিখে দিদিকে পড়াব।

যে স্বামীকে তিনি দেবতার মতো পূজো করতেন তাঁর কাছ থেকে কাশী চলে গিয়ে তিনি যা চেয়েছিলেন তা শান্তি। তাঁর কোনো প্রোগ্রাম ছিল না সে সময়। কিন্তু দেখতে দেখতে তাঁকে ঘিরে একটি দল গড়ে উঠল। দলটি আন্তঃপ্রাদেশিক।

সে দলে যারা ছিল তাদের মধ্যে মাথুর বলে একটি যুবককে তিনি সকলের চেয়ে পছন্দ করতেন। মাথুর যখন বাংলা বলত তখন তা'কে বাঙালী ব'লে ভ্রম হতো, যখন মারাঠী বলত তখন মারাঠা ব'লে। ভারতবর্ষের সাত আটটি ভাষায় তার সমান দক্ষতা। তার রংটিও ছিল যথেষ্ট ফরসা। সাহেবী পোষাক পরলে য়্যাংলোইণ্ডিয়ান ভেবে লোকে সেলাম করত।

তা ছাড়া মাথুর ছিল যেমন দুঃসাহসী তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতি। তার দোষের মধ্যে সে বলিষ্ঠ নয়। কিন্তু বাহুবলের কাছে সে হার মানত না। বহুবার সে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছল।

এমন যে মাথুর, যার কাছে নোটনদির কিছুই লুকানো ছিল না, সেই কিনা অবশেষে স্বীকারোক্তি ক'রে দলশুদ্ধ লোককে ধরিয়ে দিল। কী ক'রে যে সে অমন কাজ করল—মারের চোটে না মদের নেশায় না ধনের লোভে না রূপের কুহকে—তা এখনো অগোচর। মাথুর অবশ্য নেই, স্বীকারোক্তির প্রতিশোধ কাশীর গুণ্ডারা নিয়েছে। মাথুরের শব গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু স্বীকারোক্তির দ্বারা সে যা ক্ষতি ক'রে গেছে তার জের এখনো চলছে। নোটনদির কর্মীরা এখনো জেল খাটছে।

স্বীকারোক্তির দ্বারা সে সব চেয়ে ক্ষতি করল নোটনদির। কেননা, এর পরে তিনি মানুষমাত্রকেই অবিশ্বাস করতে সুরু করলেন। কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করতে নেই, এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে ঘোরতর সীনিক হয়ে উঠলেন। তাঁর মনের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহের স্বাস্থ্যও গেল।

বেঁচে থাকতে তাঁর রুচি ছিল না, চামেলীর জন্যেও না। তিনি মরতেই চেয়েছিলেন, আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছিলেনও। এমন সময় তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে অন্তরীণ করা হয়। তাতেও কি তিনি বাঁচতেন! কিন্তু কেমন ক'রে তাঁর প্রত্যয় জন্মাল যে বুর্জোয়ারাই বিশ্বাসঘাতী, কিষাণ শ্রমিকরা নয়। বুর্জোয়াদের বিশ্বাস ক'রে তিনি ভুল করেছেন, সে ভুল অন্যান্য শ্রেণীর প্রতি আরোপ করা আরো ভুল।

কিষাণ শ্রমিকদের বিশ্বাস করতে শিখে তাঁর মনের অসুখ সারল। শরীরের ব্যাধিও ক্রমে আরোগ্য হলো। কমিউনিজম সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ ক'রে তাঁর সন্ত্রাসবাদে এলো সম্পূর্ণ অনাস্থা। যেদিন চাষী মজুর এক হয়ে বিপ্লব বাধাবে সেদিন সব আপনা আপনি হবে, সেই সুদিনের জন্যে নিজেকে নিজের দেশকে প্রস্তুত করা ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো কর্মপন্থা নেই। যাঁদের আছে তাঁদের তিনি অশ্রদ্ধা করেন। নিজের স্বামীকেও।

"উনি একজন ক্যাপচারওয়ালা। কংগ্রেস ক্যাপচার করব, করপোরেশন ক্যাপচার করব, কাউন্সিল ক্যাপচার করব, এই ওঁর প্রোগ্রাম। কার জন্যে ক্যাপচার করব? একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র উপদলের জন্যে। কিসের জন্যে ক্যাপচার করব? মধু লুটবার জন্যে। এই গোষ্ঠীগত স্বার্থপরতাকে আদর্শবাদ

ব'লে চালিয়ে বাবুরা নিজেরাই চালমাৎ হয়েছেন। কম্যুনাল এওয়ার্ডের আর কোনো মানে নেই, খোকন।"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার কমরেডদের দেখে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী বলে মালুম হয় না। ওঁরাও হয়ত আর একটা উপদল। কংগ্রেসে করপোরেশনে কাউন্সিলে কর্তৃত্ব করবার এক নতুন ছল আবিষ্কার করেছেন, বিপ্লবের অভিপ্রায় নেই।"

"বাঃ! আমি কি ওদের সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি নাকি? ওরা হাড়ে হাড়ে বুর্জোয়া, ঐ মাথুরের মতোই এক দিন ভেঙে পড়বে মারের চোটে কি মদের নেশায় কি ধনের লোভে কি রূপের কুহকে। আমার আশা ভরসা ওরা নয়, চাষী মজুর।"

"তা হ'লে চাষী মজুরদের সঙ্গে খুব মিশছেন, বলুন।"

তিনি মাথা নাড়লেন। না, খুব না। মিশতে তো চাই, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়। যত দিন অন্তরীণ ছিলুম বেশ মিশেছি।"

এর পরে কখন এক সময় তাঁর রিক্শওয়ালার কথা উঠল। সভা সমিতিতে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে তিনি একটি রিক্শ করিয়েছেন।

"আমার আশাভরসা ফাগুয়ার মতো মজদুর।" তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন। "একদিন একটা মোটর লরীর সামনে পড়ে অক্কা পেয়েছিলুম আর কী! ফাগুয়া তখন রিক্শটাকে এমন সুকৌশলে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল যে তেমন হাত সাফাই তোমার বুর্জোয়া ম্যাজিসিয়ানদেরও কর্ম নয়। ভারতের ভাগ্য ওরাই ঘোরাবে, তুমি দেখো। ওরাই ঘোরাবে ঠিক অমনি অবলীলাক্রমে মনে হবে যেন একটা মিরাক্ল!"

ততক্ষণে আমার খাওয়া সারা হয়েছিল। আমি দিদির খাওয়া লক্ষ্য করছিলুম। একবেলা খাওয়ার অভ্যাস কবে ঘুচে গেছে, এখন তিনি রাত্রেও খান। যা খান তার সমস্ত নিরামিষ নয়, আমিষেই তাঁর সম্যক তৃপ্তি অনুমিত হলো। এ নিয়ে আমি একটু রসিকতা করতেই তিনি ফোঁস ক'রে উঠলেন "তোমরা পুরুষেরা সব খেতে পারো, আমরা মেয়েরা পারিনে? কেন, এ বৈষম্য কেন? আমি সম্যবাদী, জীবনের আর দশটা ব্যাপারের মতো আহারেও।"

"কিন্তু আপনি তো এখনো সংস্কারমুক্ত হ'তে পারেননি, নোটনদি। আমার সঙ্গে টেবলে খেলেন না, মেজের উপর আসন পেতে খেতে বসেছেন!"

"এটা এ বাড়ীর দস্তুর। মা বেঁচে থাকতে দস্তুর বদলাবে না। তা ব'লে তো তাঁর মরণ কামনা করতে পারিনে।"

আহারাদির পর ফাগুয়ার গল্প আবার চলল।

"সেদিন দেখি ওদিক থেকে একটা রিকৃশ আসছে। তাতে চ'ড়ে বসেছেন এক বিপুলকায় ভদ্রলোক, সঙ্গে একটি বিরাট মোট। এসব লোকের জন্যে রিকৃশ নয়, মোষের গাড়ী রয়েছে। একটি মহিষাসুর বিশেষ।" দিদি হাসলেন।

আমি বললুম,"তার পর ?"

"তার পর, দেখলুম বেচারা রিকৃশওয়ালা বেদনায় বিবর্ণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বার মতো ভঙ্গী করছে। নিশ্চয় মাইল চার পাঁচ টেনেছে। আমি ফাগুয়াকে বললুম, তোর জাতভাই মরছে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস! তোর শ্রেণীশত্রুর কী আসে যায় ? একটা মরলে সে আরেকটাকে পশুর মতো হাঁকাবে। যেই এ কথা বলা অমনি সে লাফ দিয়ে বাবুর ঘাড়ে হাত দিয়ে তাঁকে নামাল। বাবু তো রেগে টং। ছাতা উঁচিয়ে মারতে যান, যেমন মহিষাসুর তার শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে। তখন ফাগুয়া তাঁর ছাতা কেড়ে নিয়ে তাঁর পিঠে ভঙল।"

আমি ফাগুয়ার য়্যাডভেঞ্চার কাহিনী শুনে বিশেষ পুলকিত হইনি। কাজটা বেআইনী। আমার এজলাসে আসামী হয়ে এলে আমি তাকে অমনি খালাস দিতুম না।

"আঃ! সে একটা দৃশ্য! এমন তেজ আমি ভদ্রলোকদের মধ্যে দেখিনি। সেইজন্যেই তো বিশ্বাস করি যে ভদ্রলোকেরা ওদের সঙ্গে পারবে না, শ্রেণীসংঘর্ষের দিন এক তরফা মার খেয়ে ভাগবে।" তিনি উল্লসিত স্বরে বললেন।

শ্রেণীসংঘর্ষ বলতে কী বোঝায় ও কী বোঝায় না, এ বিষয়ে তাঁকে দু'চার কথা বলতে হয়েছিল। ওটা যদি একটা দেশব্যাপী দাঙ্গাই হতো তবে সব দেশেই সফল হ'তে পারত, কারণ সব দেশেই ফাগুয়ারা বলিষ্ঠ ও ভূয়িষ্ঠ। অথচ একমাত্র রাশিয়ায় সফল হয়েছে. তাও ফাগুয়াদের গুণে নয়, বহু জটিল যোগাযোগে।

নোটনদি শুনলেন না। তিনি তো বুঝতে চান না, তিনি চান না বুঝেই বীর পূজা করতে। একদিন তাঁর বীর ছিলেন উৎপলাক্ষ্য তাঁর স্বামী।

আর একদিন তাঁর বীর হলো মাথুর, তাঁর সহকারী। এখন তাঁর বীর হয়েছে ফাগুয়া, তাঁর রিক্‌শ চালক।

পরের দিন ফাগুয়া আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল, নোটনদি ট্যাক্‌সি করতে দিলেন না। লোকটা বাস্তবিক গুণী। গাড়ীঘোড়ার পাশ কাটিয়ে এমন জোর কদমে দৌড়ায় যে প্রাচীন গ্রীকদের ম্যারাথন রেস মনে প'ড়ে যায়। গ্রীক ষ্ট্যাচুর মতো পরিপাটী গড়ন, তেমন সৌষ্ঠব একটা ঐশ্বর্য্য।

একটা টাকা বকশিস দিতে গেলুম। হাত জোড় ক'রে বলল, "মাইজীকা হুকুম নেহি!" কিছুতেই নিল না।

এর পরে তাঁর খোঁজ রাখিনি বহুকাল। নিজের ধান্দায় ব্যস্ত ছিলুম। মনে আছে একবার একখানা বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র এসেছিল, নিমন্ত্রণকর্ত্তা উৎপলাক্ষ সেন। যার সঙ্গে চামেলীর বিয়ে সে ছেলেটির নাম পড়ে মালুম হয়নি যে সেটি একটি কিষাণ বা মজুর। ভাবছিলুম নোটনদিকে তামাসা ক'রে লিখব, বুর্জোয়াকে জামাই করলেন কেন? কিন্তু কে জানে, হয়ত এ বিয়ে দিদির অমতে! সেবার কিন্তু চিঠি লিখে উঠতে পারিনি। একখানা শাড়ী কি বই, কী উপহার দিয়েছিলুম মনে নেই। সেও তিন চার বছর আগের ঘটনা।

সম্প্রতি মাস কয়েক আগে যখন কলকাতায় বোমার হুজুগ উঠল, গুজব শুনে মান্যবর মহোদয়রাও মধুপুর গিরিডিতে ধনজন সরালেন ও সপ্তাহান্তে স'রে পড়তে লাগলেন, তখন নোটনদিও আমাকে হঠাৎ পত্রযোগে স্মরণ করলেন। লিখলেন, "ভাবছি আমরা দিন কতক তোমার ওখানে কাটিয়ে সুবিধামতো একটা বাড়ী খুঁজে নেব তোমার শহরে। কোনো অসুবিধা হবে কি তোমার গৃহিণীর? তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ো। স্নেহাশীর্ব্বাদ দিলে কি তিনি নেবেন?"

উত্তরে আমাদের দু'জনের প্রণাম ও আমন্ত্রণ জানালুম। বাড়ীর সন্ধানে লোক লাগিয়ে দিলুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখলুম নোটনদি এসেছেন বটে, কিন্তু বহুবচনের সার্থকতা নেই। জিজ্ঞাসা করলুম, "কই, আর কেউ আসেননি?"

"না, আর কে আসবে! মা নেই, তা বোধ হয় শোননি! চামেলীর

য়ে হয়ে গেছে, তা বোধ হয় জানো না। আর উনি — উনি ওঁর চাকরি না াড়লে কলকাতা ছাড়তে পারেন না।"

"তা হ'লে", আমি জেরা করলুম, "কেন লিখেছিলেন, আমরা ?"

"ও:।" তাঁর খেয়াল হলো। "আমরা মানে আমি আর আমার চাকর-াকর। তা কী করি, বল! সব ক'টাই পালিয়েছে। ফাগুয়াটা শেষ পর্য্যন্ত ছিল, সেও যেই সাইরেন শুনেছে অমনি উধাও হয়েছে।"

তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। লক্ষ্য করলুম তিনি আবার কিছু কাহিল হয়েছেন। তমন জলুস নেই। তবে ফিগার ঠিক আছে।

কানে কানে বললুম, "নোটনদি, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি ?"

"নির্ভয়ে বল।"

"বীরকে বিশ্বাস করতে পারলে কি ?"

তিনি উত্তর করলেন না, আমার একখানা হাত ধ'রে হৃদয়ের চাঞ্চল্য নিঃশব্দে সঞ্চালিত করলেন।

তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম, "বাউলরা গান গায়, 'মন মেলে তো মনের মানুষ মেলে না।' যা মিলবার নয় তা তোমার ভাগ্যে মিলবে কী করে!"

তিনি ভগ্নকণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলেন, "মিলবে কী করে!"

এ গল্পের এইখানে শেষ হলে নামকরণের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা তার চেয়ে বড়। তাই নীচেরটুকু লিখছি।

নোটনদি থাকতে আমার বাড়ীতে কয়েকজন মিলিটারি অফিসার Call করতে এলেন। সকলেই ভারতীয়। কেউ ল্যাণ্ড ফোর্সের, কেউ এয়ার ফোর্সের, কেউ নেভীর। এই যাঃ, নেভীর উল্লেখ করতে হয় সর্ব্বাগ্রে। আমি ভুল করেছি। এঁরা একটা স্পেশাল ট্রেনে ভারতময় রণকৌশল ও রণসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন।

নোটনদি তাঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন, যেন কত কালের চেনা। তিনি তাঁদের স্বহস্তে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করলেন, আমাদের কাউকে কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। বিদায়ের সময় তাঁদের প্রত্যেকের কপালে চন্দনের টীকা দেওয়াও ার নিজস্ব আইডিয়া। পরে যখন এই নিয়ে তাঁকে ক্ষেপালুম তিনি বললেন াবাকুল কণ্ঠে, "এরা আছে ব'লেই আমরা বেঁচে আছি, এরাই আমাদের । দেশ কাদের ? যারা রাখতে পারে তাদের। এরাই একদিন দেশকে

জয় ক'রে নেবে, স্বাধীন ক'রে দেবে। এতদিনে আমার বিশ্বাস হলো যে ভারত সত্যিই স্বাধীন হবে, হবে এই উপায়ে।"

তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু।

তখন তাঁকে বিরক্ত করলুম না। পরে এক সময় তাঁর কানে কানে বললুম, "নোটনদি, তা হ'লে কি তোমার সমস্যার সমাধান হলো? মিলল তোমার মনের মানুষ?"

তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, "মিলেছে।"

"কোন জন, যদি জানতে চাই বেআদবি হবে?"

তিনি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, "এয়ার ফোর্স।"

"তার মানে, পুরুষোত্তম লাল?"

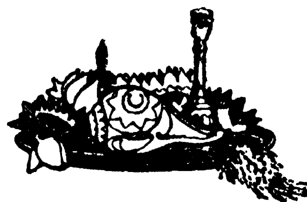
তিনি সগৌরবে বললেন, "মেরে লাল।"

"তা যেন হলো," আমি জেরা করলুম, "কিন্তু মন কি মিলেছে?"

"তাও মিলেছে। শুনলে না, ও কেমন ডাকছিল, এ বহিন, এ বহিন!"

আমি রঙ্গ ক'রে বললুম, "আমিও তো কতবার ডেকেছি, ও দিদি! ও দিদি! আমার উপর তোমার তো কৃপাদৃষ্টি পড়েনি!"

তিনি সিরিয়াস ভাবে নিলেন। বললেন, "তুই কি পুরুষোত্তম!"



শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ব্যাঘ্র-দেবতা

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণাংশে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এদিকে কেবল মাঠের
[ও]র মাঠ, ধান-জমি। মাঝে মাঝে তাল ও আমের বাগান। তাও মাঠের
[ম]ধ্যে নয়, গ্রামের কোলে। কোথাও জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নাই। শীতকাল।
[ধা]ন কাটা হইয়া গিয়াছে। শুধু মাঝে মাঝে আখের ক্ষেত মাঠের শূন্যতা দূর
[ক]রিতেছে। এদিকে বাঘ আসার কথা নয়, আসেও না। কেবল ক্ষেতের
[আ]খগুলিকে ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে লোকে
[গু]জব তোলে, অমুক মাঠে বাঘ আসিয়াছে। এমন একটা গুজবের মুখে
[সে]বার একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার কয়েকটি ছোক্‌রা পাড়ার কয়েকটি খেজুর গাছে রস লাগায়।
গুড় তৈরী করিবার মতো প্রচুর রস এদিকে হয় না। শুধু নিজেদের উষাপান,
[পাঁ]চজনের মধ্যে বিতরণ এবং খানিকটা আমোদ—এই লাভ। কিন্তু তাহার
[জ]ন্য কম কষ্টও করিতে হয় না। রাত্রে লোকে আসিয়া রস খাইয়া চলিয়া
[য]ায়। সকালে ইহারা গিয়া দেখে ভাণ্ডে রস নাই। সেজন্য প্রায়ই রাত্রি
[জ]াগিয়া পাহারা দিতেও হয়। এই কয়দিন কেবল পাহারা দিতে হইতেছে
না। বাঘের ভয়ে কেহ আর রাত্রে বাহির হইতে সাহস করে না।

খুব ভোরে। আর রাত নাই, কিন্তু ভোর হইতেও বিলম্ব আছে। তাঁতী-
পাড়ার ছোক্‌রা কয়টি বেশ করিয়া কাপড় মুড়ি দিয়া থুর থুর করিয়া কাঁপিতে
কাঁপিতে হন্‌ হন্‌ করিয়া পথ চলিতেছিল। হঠাৎ একজন থমকিয়া দাঁড়াইয়া
পড়িল।

—কি!

ছোকরা কথা কহিল না, শুধু আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল,—পথের ধূলায়
[স্প]ষ্ট বাঘের থাবার দাগ! একটি, দুটি, তিনটি, অনেকগুলি ব্যাঘ্রপদচিহ্ন
[ও]দিকের ডোবার পথ ধরিয়া গিয়াছে। ওইখানেই একটা খেজুর গাছে রস
লাগানো হইয়াছে যে!

—সর্বনাশ!

—আর রসে কাজ নেই ভাই; চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

—যা রে যা! গিয়ে পরিবারের আঁচল ধরে বসে থাক গে। বাঘ না ইয়ে!

—কিন্তু কত বড় থাবা দেখেছিস্!

—দেখিছি! আমাদের বাঘা কুকুরটার থাবা ওর চেয়ে বড়।

বলিতেছিল বটে, কিন্তু সকলেরই কণ্ঠস্বর নামিয়া গিয়াছে। বাঘ হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে। বাঘা কুকুরটার পায়ের দাগ হওয়াও অসম্ভব নয়। সেটাও প্রকাণ্ড বড় কুকুর। দেশী জাতের অত বড় কুকুর প্রায় দেখা যায় না।

অকস্মাৎ দূরে নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিল,—ওরে বাঘরে বাঘ, বাঘ!

এক সেকেণ্ডে সকল তর্কের অবসান হইল। হাতের ভাঁড় দুম্ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, সকলে একলাফে পাশের প্রাচীরটার উপর উঠিল। নীচে মাটির ভাণ্ড ভাঙিয়া রস পড়িয়া কর্দমাক্ত হইয়া গেল। আর উপরে তাঁতীপাড়ার ছোকরা কয়টি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রাচীরটি মোড়লদের খামারবাড়ীর। একপ্রান্তে তাহাদের গোয়াল ঘর, আর প্রান্তে রান্নাঘর। ভয়ের আধিক্যে তাহারা দেখিতে পায় নাই, প্রাচীরের ঠিক নিচেই মোড়লদের বাড়ীর ছোট্ট বৌটি গোবর মাখিতেছিল। অতগুলি লোক দুম্দাম্ করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিতেই সে ভয় পাইয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া শাশুড়ীকে খবর দিল।

শাশুড়ী বাড়ীর ভিতরে উঠান ঝাঁট দিতেছিল। ঝাঁটা হাতেই বাহিরে আসিয়া কাংস্যকণ্ঠে হাঁকিল,—কে রে মুখপোড়া! মরবার আর জায়গা পাস নি? আমার বাড়ীতে এসেছিস উপদ্দরুপ করতে?

মুখপোড়ারা একদল তখন সরিতে সরিতে গোয়ালঘরের কাছে পৌঁছিয়াছে আর একদল রান্নাঘরের কাছে।

বুড়ী চীৎকার করিতেই তাহারা ধমকাইয়া কহিল,—চুপ! বাঘ!

—বাঘ! দিনের বেলায় বাঘ! আমাকে ছোট ছেলে পেয়েছিস্, না রে! নাম বলছি।

প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ তো এক লাফেই সব কয়টাকে সাবাড় করিয়া দিবে। তাহারা সকলেই চালের উপর উঠিবার চেষ্টা

করিতেছিল কিন্তু শিশিরে খড়ের চাল এমন পিছল হইয়া উঠিয়াছে যে, উঠিতে বড়ই কষ্ট হইতেছে। আর সেই সময়েই বুড়ী টিস্‌টিস্‌ আরম্ভ করিয়াছে।

—আরে, এ মাগী করে কি? ব'লছি বাঘ…!

—বাঘ বার করছি দাঁড়া রে মড়া! ডাকি লস্‌নাকে, সে এসে দেবে তোদের মুখে নুড়ো জেলে। ওঠ তো রে লসনা, মড়ারা এসেছে সকালবেলায় আমার বাড়ীতে বাঘ দেখাতে!

মাতার বারম্বার আহ্বানে লসন চোখ মুছিতে মুছিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। দাওয়ায় দাঁড়াইয়া নজর পড়িল সুমুখে রান্নাঘরের চালের উপর কয়েটি লোক ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া আছে, আর সভয়ে বারবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

—কী হে পেল্লাদ!

প্রহ্লাদ একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিল না। যেমন অবস্থায় বসিয়াছিল, তেমনি অবস্থায় শুধু অস্ফুট স্বরে কহিল,—বাঘ!

বাঘের গুজব কয়দিন হইতেই উঠিতেছিল। লসন সভয়ে কহিল—কোথায় হে?

প্রহ্লাদ সাড়া দিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

লসন আবার উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় পেল্লাদ্‌?

ভয়ের সময় বেশী কথা কহিতে বিরক্ত লাগে। প্রহ্লাদ ঝাঁঝিয়া কহিল,—কোথায় তা কি দেখতে পাচ্ছি না কি? এইখানেই আছে কোথাও।

পরক্ষণেই কে যেন চীৎকার করিয়া উঠিল। কি বলিল বোঝা গেল না। কিন্তু আওয়াজটা অত্যন্ত কাছেই মনে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন কর্কশ কণ্ঠে পাড়া মাতাইয়া চীৎকার করিল—পালারে বাঘ, বাঘ।

এবং তাহার চীৎকার বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে কি যেন একটা ভারী জন্তু—সে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া লসন ব্যাঘ্রের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল, সেই ঘরের চালের উপর দুম্‌ করিয়া লাফাইয়া পড়িল, বোধ করি পাশের তেঁতুল গাছটা হইতে।

বাঘ!

চক্ষের নিমেষে লসন ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া খিল লাগাইয়া দিল। তাহার স্ত্রী দাওয়ার এক কোণে অন্তরালে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেও কাল বিলম্ব না করিয়া পশের ঘরে খিল লাগাইয়া দিল। কেবল লসনের বৃদ্ধা

জননী ছুটিয়া দাওয়ায় উঠিতে গিয়া সিঁড়িতে হোঁচট খাইয়া আবার উঠানেই গড়াইয়া পড়িল এবং হাত-পা ছুঁড়িয়া জড়িত কণ্ঠে এমন ভাবে কাৎরাইতে লাগিল যে, শুনিলে মনে হয়, বাঘটা তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

আর গোয়াল ও রান্নাঘরের উপরের লোকেরা প্রাণপণে চালের খড় আঁকড়াইয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে বড় ঘরের চালের উপর যে জন্তুটা লাফাইয়া পড়িয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে তখন থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। রান্নাঘরের উপর হইতে প্রহ্লাদের দল স্পষ্ট দেখিতেছে, সেটা সত্যই বাঘ নয়, একটা হনুমান মাত্র। কিন্তু তথাপি কেন কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া স্খলিত কণ্ঠে কেবলই চীৎকার করিতেছে—বাঘরে, বাঘ, বাঘ!

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। মেয়েরা স্নান, ঘরের কাজ, রান্নাবান্না বন্ধ করিয়া রুদ্ধ ঘরে ছেলেপুলে লইয়া বসিয়া রহিল। ঘাটে যাওয়ারও উপায় নাই, ঘরের বাহিরে আসিবারও উপায় নাই! বাঘটা যে কোনো মুহূর্ত্তে যে কোন স্থান হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। অথচ মুস্কিলের কথা এই যে, বাঘটা যে ঠিক কোথায় আছে তাহাও ঠাহর করিবার উপায় নাই। এই দক্ষিণপাড়া হইতে চীৎকার আসিল, বাঘ, বাঘ পরক্ষণেই পূর্বপাড়া হইতে তেমনি চীৎকার আসিল। কোথাও খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইতেছে কি লোকে ভয়ে বাঘ, বাঘ, বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

গ্রামের চৌকিদার পরাণ হাজরার বয়স হইয়াছে। তবু এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ আছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিজের কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিঃশব্দে তামাক টানিতেছিল। ঘরে তাহার দরজা নাই, রাত্রে একটা ঝাঁপ বন্ধ করিয়া থাকে তাহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে বসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া পরাণকে ঘরে আসিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছিল। সে ঘরে না আসিলে বেচারা ঝাঁপ বন্ধ করিতে পারিতেছিল না। আবার ঝাঁপ বন্ধ না করাও নিরাপদ নয়।

—মিন্‌সে নিজেও মরবে, সাতগুষ্ঠিকেও মারবে। ঘরে আস্‌বি তো আয় নইলে দিলাম ঝাঁপ বন্ধ করে।

এবার পরাণ ঝাঁঝের সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—দে ক্যানে ঝাপ বন্ধ ক'রে মানা ক'রছে কে?

তাহার স্ত্রী মুখ ভেঙচাইয়া বলিল—মানা ক'রছে কে? একটা মানুষ ঘরের বাইরে ব'সে থাকলে ঝাঁপ দেওয়া যায়?

—তবে মর্।

বলিয়া পরাণ বিরক্ত ভাবে হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরের এক কোণ হইতে একটা বড় টাঙি এবং তাহার চৌকিদারী পেটিটা বাহির করিয়া উঠানে নামিল।

—আবার টাঙি নিয়ে চললি কোন্ চুলোয়?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পরাণ বাহির হইতে শুধু বলিয়া গেল,—দে এইবার। ঝাঁপ বন্ধ ক'রে।

তাহার পরিবার হাউ মাউ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে। সুমুখেই বৈঠকখানায় একটা মোড়ার উপর বসিয়া রায়েদের বড় বাবু পাটের দড়ি কাটিতেছিলেন। পরাণ উঠান হইতেই গড় হইয়া তাঁহাকে প্রাতঃপ্রণাম করিল।

বড় বাবু বিপুল শক্তি ও অসীম সাহসের জন্য বিখ্যাত। বয়স ষাটের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি হুঙ্কার দিলে বড় বড় জোয়ানেরও বুক কাঁপিয়া উঠে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সম্মুখে লাঠি ধরে, এমন লোক এ অঞ্চলে বেশী নাই।

তিনি পরাণের দিকে বঙ্কিম নেত্রে একবার চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এদিকে চল্লি কোথায় হারামজাদা? বাঘ এসেছে যে।

পরাণ করজোড়ে নিবেদন করিল,—আজ্ঞে তাই শুনেই একবার বেরুলাম বাবু। মাগীকে বললাম—তুই ঝাঁপ দিয়ে ছেলেগুলোকে নিয়ে বোস, আমি বাঘের খবরটা একবার নিয়ে আসি।

বড় বাবু হাসিয়া বলিলেন,—তাই যা, মাগীর হাতে শ্মশান খরচাটা রেখে এসেছিস্ তো?

পরাণ একগাল হাসিয়া কোমরের পেটিটার উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। কহিল,—আজ্ঞে আমরা মহারাণীর চাকর, আমাদের ওপর তো তেনার হস্ত উঠবে না।

এমন সময়ে কাছেই বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কলরব উঠিল,—এই যে, এই যে। মার, মার।

মনে হইল মুখুয্যেদের খামারবাড়ীতে।

বড় বাবু ডান হাত দিয়া মেঝে হইতে কাস্তেটা উঠাইয়া লইয়া মোড়াটিকে একেবারে দরজার গোড়ায় টানিয়া আনিলেন। যেন প্রয়োজন বোধ করিলে, এক লম্ফে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন অথচ বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন,—তা, সংবাদ নিতে হয় তো যা। নইলে ঘরের মধ্যে ঢোক্! বাঘটা মনে হচ্ছে মুখুয্যেদের খামারবাড়ীতে ঢুকেছে।

পরাণ খাঁ হাতটা একবার পেটিতে একবার কপালে ঠেকাইয়া টাঙ্গিটা কাঁধে ফেলিয়া কহিল,—আজ্ঞে না, ঘরে আর প্রবেশ করব না, খবরটা নিয়ে আসি।

বলিয়া মুখুয্যেদের খামারের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

বড় বাবু উদ্বিগ্ন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এখান হইতে মুখুয্যেদের খামারবাড়ী মিনিট তিনেকের পথ। একাকী, এত কাছে একখানি মাত্র কাস্তে সম্বল করিয়া বসিয়া থাকা নিরাপদ হইবে কিনা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এক কালে তাঁহার নিজের বন্দুক ছিল, শিকারের সখও ছিল। পরিণত বয়সেও তিনি নিজের হাতে ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। তাই বাঘ যে কত হিংস্র তাহাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু কিছুদিন হইল কোন অজ্ঞাত কারণে সরকার তাঁহার বন্দুক, এমন কি, বহুকষ্টে সংগৃহীত কয়েকখানি গুপ্তি এবং তরবারিও বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত অস্ত্র না লইয়া বাঘের সম্মুখীন হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই বলিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া ছিলেন। অথচ, ছাড়া বাঘ দেখিবার সখটুকুও ষোলো আনা আছে। এত কাছে বাঘ আসিয়া পড়ায় তিনি ভাবিতেছিলেন, এখানে বসিয়া থাকা সঙ্গত হইবে কি না।

এমন সময় পাঁচু সেখ আসিয়া অভিবাদন করিল,—সেলাম বাবু।

লোকটা উৎসাহের আধিক্যে একেবারে শুধু হাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

—কি হে সেখজি?

—জি, আপনাদের পাড়ায় নাকি বাঘ আল্ছে?

—আল্ছে। তাই শুধু হাতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছিস্?

পাঁচু একগাল হাসিয়া কহিল,—জি, আমরা জাত পাঠান। একটা

নংটে বাঘ মারতে আমাদের হাতিয়ার লাগে না। ধরব, কি কল্লা মুচুড়ে লুব।

দাঁত খিঁচাইয়া বড়বাবু বলিলেন,—ভারি মরদ!

পাঁচু সেইখানেই সিঁড়ির উপর বসিয়া মেঝের একটা চাপড় দিয়া কহিল,—জি, পাঁচু সেখের মর্দানি সেবার বিলের লড়ায়ে তো দেখলেন। পঁচিশটা জোয়ান আমি একা ভাগিয়েছি।

পাঁচু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে দেখিয়া বড় বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ওরে হতভাগা, এ তোর লেঠেলি নয়। বাঘ লাঠি মানে না।

পাঁচু লাঠিয়ালি ঢঙে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—কোনখানে বাঘটা আছে বলুন। পাঁচু সেখের কেরামতি আর একবার হুজুরকে দেখিয়ে দিই।

পাঁচু বড়বাবুর পেয়ারের লাঠিয়াল। নিজের হাতে তাহাকে লাঠি খেলা শিখাইয়াছেন। তাঁহার বহু দুঃসাহসের বিশ্বস্ত সঙ্গী সে। তাহাকে বাঘের মুখে পাঠাইতে মন সরিতেছিল না। কিন্তু সে যে এ ব্যাপারে নিষেধ মানিবে না, তাহাও বুঝিলেন।

একটু দ্বিধার সঙ্গে বলিলেন, যাবি? তা যা। বোধ করি মুখুয্যেদের খামারেই আছে। তবে শুধু হাতে যাস নে। এই কাস্তেখানা নিয়ে যা।

পাঁচু ওস্তাদের দেওয়া কাস্তেখানি পরম সমাদরে মাথায় ঠেকাইল।

বড় বাবু আবার বলিলেন, দেখিস্, যার তার ঘাড়ে বসাস্ না যেন। ওতে বিষ পান দেওয়া আছে। রক্ত বার হলে আর নিস্তার নাই।

পাঁচুর উল্লাস দেখে কে! কাস্তেখানা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া পাঁচু বলিল, জি, তা হলে ও শালার মিত্যু নিঘ্যাৎ আমার হাতে।

বলিয়া পাঁচু ওস্তাদকে আর একবার সেলাম করিয়া কাস্তেখানা উর্দ্ধে তুলিয়া লাঠিয়ালি ঢঙে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

তাঁতীপাড়ার ছেলেগুলি ঠিক দেখিয়াছিল।

বাঘের পায়ের থাবাই বটে। অনুমান হইতেছে বাঘটি সেই দিক দিয়া সোজা চাটুয্যেদের কলাবাগানে ঢোকে। চাটুয্যেদের কলাবাগান তাহাদের অন্দরেরই এক প্রান্তে। চাটুয্যেগিন্নী সেদিকে গোবরছড়া দিতে গিয়া দেখিতে পান, বাঘটি সুমুখের দুই থাবায় মুখ ঢাকিয়া ঝোপের মধ্যে সম্ভবত নিদ্রা যাইতেছে। তিনি ছুটিয়া ঘরের

মধ্যে আসিয়া প্রাণপণে বাঘ, বাঘ, বলিয়া চীৎকার জুড়িয়া দেন। সে চীৎকারে পাড়ার লোক উঠিয়া পড়ে। যাহারা সাহসী তাহারা ছুটিয়া বাহিরে আসে। কিন্তু এরূপ সাহসী লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। অধিকাংশ লোকই নিরাপদে গৃহকোণে বসিয়া বলিতে থাকে—বাঘ না আরও কিছু দেখেছে হয়ত উদ্‌বেড়াল, অমনি ভয়ে ভিম্‌রি খেয়েছে। তবে আর মেয়ে-মানুষ বলেছে কেন?

তথাপি পাড়ায় একটা সোরগোল ওঠে। এবং সে চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ জনিত বিরক্তিতে গাত্রোত্থান করিয়া, ব্যাঘ্র মহাশয় পদ্মগড়ের দক্ষিণ এবং বন্দীগড়ের উত্তর দিয়া সোজা পশ্চিম মুখে হাঁটিতে থাকে। বন্দীগড়ের ঘাটে দত্তদের সেজ বৌ বাসন মাজিতেছিল। সে বাসন লইয়া একরূপ বাঘের সুমুখ দিয়া বাড়ী ঢোকে। বাঘ হয়তো তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, নয় তো অন্য কোন খেয়ালে ছিল, অবলা মানবীকে আক্রমণ করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। দত্তদের সেজ বৌও অতটা খেয়াল করে নাই। করিলে সেইখানেই মূর্চ্ছা যাইত।

বলে,—দেখলাম যেন মা, কি একটা পদ্মগড়ের পাশ দিয়ে এই দিকেই হেলেদুলে আসছে। কে জানে মা বাঘ! আমি তো সুমুখ দিয়েই চলে এলাম।

বলে আর তাহার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে।

দত্তদের সেজ ছেলে তখনও লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। এই শীতের রাত্রে এত ভোরে উঠিয়া স্ত্রী যে বাসন মাজিতে যায়, তাহা তাহার ভালো লাগে না।

মুখের উপর হইতে লেপটা সরাইয়া তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল,—উঃ। রাত পোয়াতে না পোয়াতে নিত্যি নিত্যি বাস্‌ন মাজার ধুম প'ড়ে যায়! নিত মাগীকে গপাং করে তো বেশ হ'ত!

মাগী সভয়ে শিহরিয়া বলিল,—বাবাঃ। এত বড় মাথাটা। আমি তখনি জানি, উনি সহজ পেরাণী লয়।

—উঃ! তুইত সবই জানিস। নিত্যি বলি অত ভোরে যাস না, গাঁয়ে বাঘ এসেছে। আমার কথা গেরাহ্যিই হয় না। এইবার যা।

—আবার!

বলিয়া সেজবৌ স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া আসিল।

এখান হইতে বাঘ বরাবর গিয়া মুখুয্যেদের খামারে ঢোকে। শীতকাল। খামারে সারি সারি অনেকগুলি ধানের পালা। পাশাপাশি তুইটি পালার মধ্যে যে সরু ফাঁক আছে, সেই স্থান দিন যাপনের পক্ষে নিরাপদ হইবে মনে করিয়া বাঘটা তাহারই মধ্যে আশ্রয় লয়। লোকে আর বাঘ খুঁজিয়া পায় না। শেষে মুখুয্যেদের রাখাল আসিয়া সংবাদ দেয়, বাঘ তাহার মনিবের খড়ের পালার ফাঁকে আশ্রয় লইয়াছে। খামার পরিষ্কার করিতে আসিয়া সে ছোক্‌রা দেখিতে পায়, বাঘের লেজের কিয়দংশ বাহিরে থাকিয়া লট্‌পট্‌ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বহুলোক খামারবাড়ীর চারিদিকের বাড়ীগুলির চালের উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বেলা বাড়ে, তবু বাঘ বহিরাগমনের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। লোকে চালের উপর বসিয়া বসিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এমন কি, কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিল যে, এত সোরগোলের পরও যখন জন্তুটা বাহিরে আসে না, তখন ওটা নিশ্চয় বাঘ নয়, উদ্‌বেড়াল কিম্বা অমনি একটা কিছু হইবে।

অবশেষে সরকারদের ওরম্বাপদ সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া লাফ দিয়া খামার বাড়ীর মধ্যে পড়িল। ওরম্বা দেখিতে বেঁটে-খাটো, কিন্তু গায়ে অসীম জোর — প্রকাণ্ড বুক, সুদৃঢ় পেশীবহুল বাহু এবং সাহসও যথেষ্ট। ছোকরা গায়ে ডজন খানেক জামা চড়াইয়া, বুকে-মাথায় বেশ করিয়া কম্ফার্টার জড়াইয়া আসিয়াছে। বিশ্বাস বাঘ তাহার কিছু করিতে পারিবে না।

ওরম্বা অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, লেজটি বাঘেরই কিনা। বাঘ সে কখন দেখে নাই। বড় বাবুর বাড়ীতে কতকগুলো বাঘের চামড়া আছে বটে, কিন্তু তাহাদের লেজ কি রকম ছিল ঠিক মনে পড়িল না। তবু তাহার মন বলিল, এ লেজ বাঘের না হইয়া যায় না।

উপর হইতে তখন ক্রমাগত প্রশ্ন আসিতেছে,—বাঘ বটে ত হে? না উদ্‌বেড়াল?

সাড়া দিবার উপায় নাই। ওরম্বা ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে লাগিল বাঘই বটে!

শুনিয়া লোকগুলা চালের উপর বেশ সাবধান হইয়া বসিল।

ওরম্বার মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। যদি আস্তে আস্তে খড় চাপা দিয়া ফাঁকটুকু বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাঘটার নিশ্চয়ই পলাইবার

পথ বন্ধ হইবে। তখন তাহাকে কায়দা করা সহজ হইবে। আগুন লাগাইয়াই হউক, আর সকলে মিলিয়া চাপ দিয়াই হউক, বাঘটাকে মারিয়া ফেলিতে কষ্ট হইবে না।

এইরূপে সংকল্প করিয়া ওরম্বা বাঘের লেজের দিকে আঁটি আঁটি খড় চাপা দিতে লাগিল। পিছনের ফাঁকটা কেবল বন্ধ হইয়াছে, অকস্মাৎ একটা ভীষণ গর্জন উঠিল। তেমন গর্জন এ অঞ্চলের লোক জীবনে শোনে নাই। চালের উপরের লোকগুলি পড়িতে পড়িতে কোন রূপে চালের খড় ধরিয়া বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাদের কাঁপুনি আর থামে না।

ভীষণ গর্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরম্বা লক্ষ্য করিল বাঘটা দুই পা তুলিয়া সোজা হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। প্রকাণ্ড মাথা, তাহাতে চোখ দুইটা জল্ জল্ করতেছে, আর হাঁ-মুখটা এতই বড় যে ওরম্বার কম্ফার্টার সমেত মাথাটা অবলীলাক্রমে তাহার ভিতর চলিয়া যাইতে পারে।

পলকের মধ্যে ওরম্বার চক্ষুর সম্মুখ হইতে খড়ের পালা, ঘরের দেওয়াল, আকাশ, মাটি, গাছ পালা লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। তাহার সমস্ত বাহ্য চৈতন্য লোপ পাইল। কিন্তু ভগবান মানুষের মনে আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রেরণা দিয়াছেন, বোধ করি সেই প্রেরণার বসেই সে বাঘের উর্দ্ধোত্থিত সম্মুখের দুইটা পা প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিল।

তারপর আরম্ভ হইল, মানুষে বাঘে লড়াই।

ওরম্বার দেহে অমিত শক্তি। বাঘটা তাহার দৃঢ়মুষ্টি হইতে সুমুখের পা দুইটা ছাড়াইয়া লইতে পারিতেছে না। কিন্তু এমন ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছে যে, আর বোধ হয় বেশীক্ষণ সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি ওরম্বার থাকিবে না। তাহার পিঠ একটা খড়ের পালায় না ঠেকিলে এতক্ষণ বোধহয় সে পড়িয়া যাইত। পিছনের পা দিয়া বাঘটা তাহার পায়ের হাঁটু হইতে নীচ পর্য্যন্ত কয়েকটা স্থান চিরিয়া দিয়াছে। ক্ষতমুখ দিয়া ঝর ঝর ধারে রক্ত পড়িতেছে। ওরম্বা বাঘের সুমুখের পা দুইটা ধরিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ফারিত চোখে সে যে কি দেখিতেছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এক মিনিট······দুই মিনিট······

এমন সময় চৌকিদার পরাণ হালদার আসিয়া টাঙি দিয়া বাঘের পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া বলিল,—হেট্, হেট্।

যেন তাহার দুষ্টু হাঁসা বলদটা গলাঙ্কি খুলিয়া খামারে ঢুকিয়াছে, ধান খাইতে!

বাঘটা এক মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপর এক 'ঝট্‌কায় ওরস্বার মুষ্টি হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া পরাণের উপর লাফাইয়া পড়িল—এবং সরকারী পেটির মর্য্যাদা কিছুমাত্র রক্ষা না করিয়া মহারাণীর ভৃত্যের ঠোটের দক্ষিণ পাশ হইতে গালের খানিকটা মাংস উঠাইয়া লইয়া, এক লাফে খামার বাড়ীর অনুচ্চ প্রাচীর ডিঙাইয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সেটা বড় রাস্তা নয়। ডান দিকে মুখুজ্যেদের বাড়ী, তারপরে মহান্তদের গোলাবাড়ী, তারপরেই একটা ছোট ডোবা। সেখানে হইতে একটা ছোট রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামসীমান্তে হাড়ী-পাড়ায় পৌছিয়াছে, আর একটা বাঁয়ে বেঁকিয়া রায়েদের বৈঠকখানার পাশ দিয়া তাঁতীপাড়ার দিকে গিয়াছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পাঁচু সেখ ডোবাটা পার হইয়া মহান্তদের গোয়াল বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত লাফাইতে লাফাইতে গিয়াছে। কাস্তেখানা তখনও তাহার ডান হাতে তেমনি শূন্যে নাচিতেছে!

এমন সময় চারি চক্ষে সম্মেলন!

সঙ্গে সঙ্গে জাত-পাঠানের মুখ শুকাইয়া গেল। কে জানিত বাঘের চোখ এমনি করিয়া জল্ জল্ করে! বাঘটা তাড়াইয়া আসিতেই, সে কাস্তেখানা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়াই ডোবায় লাফ দিল,—সেখানা বাঘের গায়ে লাগিল কিনা, অথবা লাগিলেও ফল হইল কি না, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলও না। কেবল অনুমানে বুঝিল ঠিক তাহার পিছনে পিছনে আরও কটা কি যেন জলে লাফ দিয়া পড়িল।

পাঁচু সেখ ডুব-সাঁতার কাটিয়া ও-পারে গিয়া উঠিল, এবং দুরন্ত শীতে ভিজা কাপড়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতেই ওপাশের পদ্মগড়েতে আবার লাফ দিয়া পড়িল।

বাঘটা খানিক জলে সাঁতরা-সাঁতরি করিয়া আবার এ-পারেই উঠিয়া আসিল, এবং মহান্তদের গোয়ালঘর ও মুখুয্যেদের বাড়ীর মধ্যে যে সরু গলি আছে সেইখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল বড় বড় বাব্‌রী চুলওয়ালা কে একজন একটা রাম দা হাতে করিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। বাঘটা ইচ্ছা করিলে এক নিমেষে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে শেষ

করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু সে কিছুই করিল না। শুধু সুমুখের বড় বড় ঝকঝকে দাঁত দুইটা বাহির করিয়া শব্দ করিল,—গ্যাঁও-ও।

ব্যস। আর দেখিতে হইল না। বাবরীওয়ালা লোকটি ছিট্‌কাইয়া প্রথমে মহান্তদের গোয়ালঘরের দেওয়ালে পড়িল, সেখান হইতে আছড়াইয়া পড়িল মুখুয্যেদের ঘরের দেওয়ালে। দুইটা গাল এবং হাঁটুর চামড়া খানিকটা উঠিয়া রক্তাক্ত হইয়া গেল, কিন্তু তখনও তাহার থামিবার উপায় নাই। লোকটা গড়াইতে গড়াইতে ডোবার জলে গিয়া পড়িল।

বাঘ কিন্তু আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। হেলিয়া দুলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে মহান্তদের গোয়ালঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোয়ালের এক কোণে গুটি তিনেক গরু বাঁধা ছিল। বাঘ দেখিয়া সেগুলা তখন কোণ ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দড়ি ছিঁড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। গোকুল মহান্ত খবরটা শুনিয়া রুদ্ধ শয়ন কক্ষের মধ্যে বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল,—গেল রে, গেল গেল, হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল। বাঘটা এতক্ষণে গরুগুলিকে বুঝি সাবাড় করিয়া ফেলিল।

কিন্তু ডোবার জল হইতে উঠিবার পর হইতে বাঘটা যেন মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। গরুগুলির হাম্বারব এবং ছুটোপাটিতেও তাহার জলযোগের স্পৃহা দেখা গেল না। সে আর এক কোণে স্থির হইয়া বসিয়া প্রসারিত জিহ্বা দিয়া পদতল লেহন করিতে লাগিল।

অনেকগুলি লোক সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালঘরের চালের উপর উঠিয়া পড়িল। একজন বুদ্ধি করিয়া চালের খড় খানিকটা ফাঁক করিয়া, সেই পথে একখানা কাস্তে বাঁধা বাঁশের লগি দিয়া গরুগুলির গলার দড়ি কাটিয়া দিল। ছাড়া পাইয়া গরুগুলি যে লাফ দিয়া কোন দিকে পলাইল তাহার আর দেখা গেল না।

বাঘ শুইয়া শুইয়া অপাঙ্গে চাহিয়া সব দেখিল। কিন্তু একটা গরুও ধরিবার চেষ্টা করিল না। সেই অবস্থায় শুইয়া শুইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

এইবারে বাঘটাকে বন্দী করা যায় কি করিয়া? গোয়ালঘরের শিকল সাধারণতঃ আল্‌গাই হয়। কিন্তু নামিয়া গিয়া শিকল লাগাইবে কে? আবার কয়েকজন লোক সেইখানকার চালের খানিকটা অংশের খড় সরাইয়া ফেলিয়া এবং বার কয়েক চেষ্টা করার পর সেই কাস্তে বাঁধা লগিটা দিয়া অবশেষে শিকল তুলিয়া দিতে সক্ষম হইল। প্রথমে উপর হইতেই বেশ ভালো করিয়া

দেখা হইল শিকল ঠিক লাগিয়াছে কি না। কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, শেষে একজন সাহসী ব্যক্তি নামিয়া আসিয়া, তাহার উপর একটা ভারী তালা বেশ শক্ত করিয়া লাগাইয়া দিল।

এত বড় সাফল্যে চালের উপর মহোৎসব লাগিয়া গেল। কতকগুলো ছোকরা চালের মট্‌কার প্রায় সমস্তটারই খড় উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল।

সে খবর শুনিয়া গোকুল মহান্ত আবার চীৎকার করিতে লাগিল, ওরে বাবারে, ছোঁড়ায়া মিলিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিল রে। একে তাহার খড় নাই। খড়ের অভাবে বহুকাল গোয়ালঘর সংস্কার করিতে পারে নাই। তাহার উপর যে সামান্য আচ্ছাদন ছিল, তাহাও পাঁচ শয়তানের পাল্লায় পড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

গোকুল শাসাইতে লাগিল, নষ্টামি দেখিয়া দেখিয়া তাহার চুল পাকিয়া গেল। সে আর নষ্টামি বোঝে না? ও সব বাঘ-মারা তো নয়, তাহার সর্বনাশ করা। একবার কাছারী খুলুক, তারপর সে সকলের নামে এক এক নম্বর ঠুকিয়া খেসারত আদায় করিয়া ছাড়িবে, তবে তাহার নাম গোকুলচন্দ্র দাস মহান্ত।

কিন্তু গোকুলের কণ্ঠ রুদ্ধগৃহের বাহিরে এতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছিল না। পৌঁছিলে তাহাতে কর্ণপাত করিবার মতো মনের অবস্থাও কাহারও ছিল না। তাহারা উপর হইতে বাঘের উপর বড় বড় ইঁট, পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। তাহাতে অবশেষে বাঘ যেন অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চালের উপরকার লোকদের প্রতি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঘরের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। লোকে মাঝে মাঝে বর্শা ছুঁড়িয়া মারে। কোনোটা গায়ে আসিয়া টপ্ করিয়া পড়ে, কোনটা মোঝয় বিঁধিয়া যায়। বাঘটা মাঝে মাঝে লাফ দিবার ভয় দেখায়। কিন্তু লাফ দিয়া তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না জানিয়াও লোকেরা ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করে। তাড়াতাড়িতে পরস্পরের মাথায় মাথা ঠুকিয়া যায়, মাথা ফুলিয়া ওঠে।

অবশেষে স্থির হইল, এমন করিয়া কিছুই হইবে না। গ্রামের মধ্যে একটি মাত্র লোকের কাছে বন্দুক আছে। তাহাকেই ডাকিয়া আনা হউক।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিল কাশী হালদারের

বাড়ী। হালদার বাড়ীতেই ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর তাহার বড় ছেলে আসিয়া বলিল,—বাবা মাথার অসুখে শয্যাগত।

—তা হোক। তাকে উঠতেই হবে। বাঘটাকে মহান্তদের গোয়ালে বন্দী ক'রেছি। গুলি ক'রে মারতে হবে।

ছেলেটি বাড়ীর ভিতরে গেল। ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে, কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না।

লোকগুলিও নাছোড়বান্দা, তাহারা বলিল,—উঠতে পারবে না কি রকম! এখান থেকে আমরা তার গলা শুনতে পাচ্ছি। সে তো উঠেই আছে।

ছেলেটি আবার বাড়ীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, না তিনি কিছুতেই উঠতে পারিবেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে, গুলির নিশানা হইবে না।

—তবু বন্দুকটা দিতে বল। আমরা অন্য লোক দিয়ে গুলি করাবো। বড় বাবুই করতে পারবেন, কি বল হে চন্দরা?

এমন সময় কাশী হালদার মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। মিষ্টি হাসিয়া বলিল,—বন্দুক দোব কি ক'রে হে? আমি ছাড়া আর কারও ও বন্দুক ছোঁবার 'লাইসেন্' আছে?

লোকগুলি সকাল হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল। এখন চটিয়া বলিল,—তা হ'লে বাঘ মারার কি হবে?

হালদার অবলীলাক্রমে হাতের তালু উল্‌টাইয়া বলিল,—তা আমি কি জানি!

এ কথায় লোকগুলি চটিয়া আগুন হইল। বলিল,—তুমি জান না, বটে? তোমাকে গাঁয়ে বাস ক'রতে হবে না? ছেলেমেয়ের বিয়ে পৈতে দিতে হবে না? পাঁচজনকে কাজকর্মে ডাকতে হবে না? তখন দেখে নোব জানো কি না।

এবারে হালদার যেন অনেকটা নরম হইল। কহিল,—তুমি তো বলছ বটে হে, চন্দরা। কিন্তু তিনটি বুলেটের দাম একটি টাকা। টাকাটা দেবে কে শুনি? তুমি দেবে?

—আমি কেন দেব? দরকার যদি হয়, গায়ের ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে।

—ওঃ! ষোলো আনা চাঁদা তুলে দেবে। তবেই হ'য়েছে!—হালদার ঠোঁট উল্টাইয়া হাসিল।

চন্দরা অসহিষ্ণু ভাবে তাহার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়া কহিল,—আচ্ছা, একটা টাকা তুমি আমার কাছেই নিও হে। তারপর সে চাঁদা তুল্‌তে হয়, যা ক'রতে হয় আমি বুঝবো।

মানুষের বিপদের সময় মোচড় দিয়া অমনি ভাবে টাকা আদায়ের অভ্যাস হালদারের চিরকালের। সন্দিগ্ধ ভাবে চন্দরার পানে চাহিয়া বাড়ী যাইতে যাইতে বলিল,—দেখো ভাই চন্দরা, বত্রিশ বন্ধনের মধ্যে কথাটা বল্‌লে। তোমার ধর্ম তোমার কাছে। আমি আর কি ব'লবো?

হালদার বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইতেই চন্দরা পাশের লোকটির গা টিপিয়া বলিল,—তিনটি বুলেটের দাম একটাকা শুনেছ হে! কার্য্য তো উদ্ধার হোক্, তারপর দেখা যাবে কত জলে কত মুসুরী ভেজে।

হালদারকে পরম সমাদরে গোয়ালঘরের চালের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে তিনটি বুলেট। কিন্তু নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়াও ব্যাঘ্রের চাল-চলন, সক্রোধ দৃষ্টি দেখিয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

উহুঁ, অমন ক'রে নয়—অমন ক'রে নয়। একটা দাবা বাঁশ চালের ভেতর দিয়ে নামিয়ে দাও। দিয়ে জন পাঁচেক বলবান লোক সেইটি বেশ বাগিয়ে ধরো,—যেন নড়ে না। আর আমার মাজায় দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বাঁধো। দেখছো না, বাতের যন্ত্রনায় মাজা হিল্‌ছে।

তাহাই করা হইল। বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া হালদারকে বাঁধা হইল, যাহাতে তাহার কোমর না নড়ে। তারপরে হালদার বেশ করিয়া বন্দুক ওচাইতেই বাঘটা থাবা পাড়িয়া বসিয়া নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল। সে চাহনিতে তাহার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কোন রকমে ঘোড়াটা টিপিতেই গুড়ুম করিয়া একটা আওয়াজ হইল। এই পর্য্যন্ত হালদারের মনে আছে। তারপর কখন যে গুলি খাইয়া বাঘটা ভীষণ গর্জন করিয়া চালের মটকা পর্য্যন্ত লাফাইয়া উঠিল, আর কখনই বা তাহার বন্দুকটা হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল, সে সকল কিছুই মনে পড়ে না।

যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিল বাঘটা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মুখ দিয়া অঝোরে রক্ত গড়াইতেছে,—সে রক্তে গোয়ালঘরের মেঝে কর্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। লোকগুলো সেই ভারী বাঁশটা দিয়া বাঘের মধ্যে-

পেটে ক্রমাগত গুঁতাইতেছে। কিন্তু সে সমস্ত দেখিয়াও সে কিছু মাত্র উৎসাহিত হইল না। যেন শুধু বলিল,—একটু জল।

কথাটা শুনিয়া মানুষের দেহে প্রাণ আসিল। যে যাহাকে দেখে, সেই তাহাকে উৎসাহের সঙ্গে সংবাদটা দেয়, যেন সে-ই বাঘটা মারিয়াছে। মেয়েরাও সমস্ত দিনের পর বাহিরে আসিয়া আলোর মুখ দেখিয়া বাঁচিল। সমস্ত দিন কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়ে লইয়া দুরু দুরু বক্ষে ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ছেলেদের মনে এমন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল যে, কেহ একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে নাই।

অপরাহ্ন বেলায় একখানি মহিষের গাড়ীতে বাঘের মৃতদেহ লইয়া লোকে গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হইল। ছেলেরা মরা বাঘের উপর অকারণেই মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। যে জন্তুটা এত লোককে জখম করিয়াছে এবং গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সমস্তদিন এক প্রকার অনাহারে রাখিয়াছে তাহার প্রতি ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। মরার পর জানা গেল, বাঘের বসন্ত হইয়াছিল। সেই জন্য সে বেশ কাবু হইয়াছিল। নহিলে তো গ্রামে আর লোক রাখিত না। তাহাকে যে এখন সকলে খোঁচা দিবে তাহা আর বিচিত্র কি ?

মহান্তদের গোয়াল হইতে মিছিল বেগে পাড়ার ভিতর দিয়া ঠাকুর পাড়ায় পৌঁছিল। প্রথমে হরিহর ঠাকুরের বাড়ী, তারপরেই চাটুয্যে বাড়ী। বাঘের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই চাটুয্যেগিন্নী একটা ঘটি হাতে করিয়া আসিয়া একবার সাশ্রুনেত্রে বাঘটার সর্বাঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়া অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন—কার শাপে এসেছিলি বাবা! বাঘ তো নোস্। বাঘ হ'য়ে ছলতে এসেছিলি। আমি যে তোকে দেখেই চিনেছি।

চাটুয্যেগিন্নী ঘটির জল দিয়া বাঘের চারিটি পা ধুইয়া দিয়া, পথের উপরেই গড় হইয়া প্রণাম করিলেন।

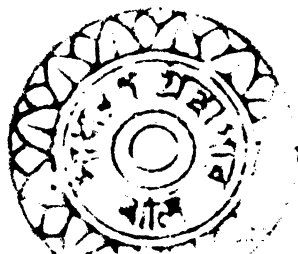
হরিহর ঠাকুরের স্ত্রী এমনি মজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চাটুয্যে-গিন্নীর কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার ঠোঁটের হাসি মিলাইয়া গেল। তিনিও ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে এক ঘটি জল আনিয়া বাঘের চরণ প্রক্ষালন করিয়া ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া, পুত্র কন্যার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

এক মুহূর্ত্তে বাঘ দেবতা হইয়া গেল। কাহার শাপে তিনি ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়াছেন, কেনই বা এই গ্রামের নিরীহ বাঙালী সন্তানকে এতক্ষণ

ধরিয়া ছলনা করিলেন এবং চাটুয্যেগিন্নীই বা শকটারূঢ় মৃত ব্যাঘ্রদেহ দেখিয়া কি করিয়া চিনিলেন, এ সকল বিষয়ে চাটুয্যেগিন্নীকে কেহ কোনো প্রকার প্রশ্ন করারও প্রয়োজন বোধ করিল না। যে পথে বাঘ যায় তাহার দু-পাশে কাতার দিয়া মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল এবং বিসর্জনের প্রতিমাকে যেমন মহা ভক্তিভরে গলদশ্রু লোচনে বিদায় দেয়, তেমনি করিয়া বিদায় দিতে লাগিল। বাঘের বড় বড় থাবা সধবা মেয়ের দেওয়া সিন্দুরে রাঙা হইয়া উঠিল।

যে কয়টা ছোঁড়া এতক্ষণ খোঁচা দিতেছিল, বড়দের তাড়া খাইয়া তাহারা পিছনে হটিয়া গেল এবং বড়দের মুখ দেখিয়া মনে হইল, বাঘটাকে চালচিত্র দিয়া ঘিরিয়া প্রতিমার মতো সাজাইয়া লইয়া যাইবার উপায় থাকিলে, তাহারা কাঁধে করিয়াই গ্রাম-প্রদক্ষিণ করিত।





শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সৈনিক

ডুম ডুম ট্র্যম—

সাঁওতালদের নাগাড়া বেজে উঠল। বরেন্দ্রভূমির ঘুমন্ত আকাশে অনেকদিন পরে জাগরণের ছোঁয়া লেগেছে।

আশ্চর্য দেশ। বাঙলা দেশই বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের নয়। মৃত বাঙলার অস্থিকংকাল রাশি রাশি ইঁট-কাঁকরে ভাঙা জাঙ্গাল আর মজা নদীতে ছড়িয়ে রয়েছে, একটা বিরাটের মহাশ্মশান যেন। চারিদিকে ধূ ধূ করছে অনুর্বর মাঠ, বিরল-বসতি গ্রামগুলোর উপর দারিদ্র্যের নগ্নতা; মাথার উপর ক্ষুধার্ত্ত চিল চীৎকার করে উড়ে যায়; আর লাল মাটির ছোট বড় অসংখ্য টিলার এখানে ওখানে বিরাটকায় সঙ্খিনী সাপ পেট টেনে টেনে মন্থর-গতিতে এগিয়ে চলে।

ডুম ডুম ট্রুম ট্রু—সাঁওতালদের নাগাড়া বাজতে লাগল। যাযাবর। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নতুন উপনিবেশের সন্ধানে। যেখানে মিলবে নির্জনতা, মিলবে খাদ্য। বিমুখ প্রকৃতিকে ওদের ভয় নেই এতটুকুও। মাটির বুক থেকেই ওরা ছিনিয়ে আনতে পারে প্রতিদিনের উপকরণ, বুনো ওল সেদ্ধ করেই ওদের একবেলা চলে যায়, গো-সাপের পোড়া মাংসেই ক্ষিধে মেটে। নাগাড়া বাজিয়ে ওরা বাঘ মারে আর যুদ্ধ করে, মাদল বাজিয়ে ওরা নাচে, আর বাঁশী বাজিয়ে ওরা ভালবাসে।

মৃত বাংলার বুকে বহুদিন পরে জীবন্ত মানুষের দল এসে দেখা দিয়েছে। এই শ্মশান ওদের ভালো লেগেছে, এইখানেই ঘর বাঁধবে ওরা। মজে যাওয়া দীঘিতে ওদের চোখে পড়েছে কুমীরের ছায়া; ঘাস বনের ভেতর থেকে বুনো শুয়োরের গায়ের উগ্র গন্ধ ওদের নাকে লেগেছে; শিকড়ে শিকড়ে পাথর জড়ানো বট গাছের কোঠরে ওরা দেখেছে লকলকে গো-সাপের জিভ।

সামনের বড় মাঠখানা পেরিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল এগিয়ে গেলে কুমারদহ গ্রাম। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে এসে দেবীকোট রাজবংশের কে

একজন এখানে আস্তানা নিয়েছিলেন। তাঁর উত্তর-পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী এখানকার জমিদার।

এই কাহিনী যখন আরম্ভ, তখন চন্দ্র চৌধুরীর বয়স অতিক্রম করেছে পঞ্চাশের সীমারেখা। টকটকে লাল চেহারা, রক্তের চাপে সমস্ত মুখ যেন ফেটে পড়েছে। কপালের দু'পাশে শিরা দু'টো অত্যন্ত স্ফীত। বাঁ-হাতে তিনটে আঙুল নেই। হিজল বনে একবার বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন তিনি—বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বাঘের সঙ্গে কুস্তিতে লড়তে হয়েছিল তাঁকে। শোনা যায় আছাড় মেরেই বাঘটাকে তিনি বধ করেছিলেন — এমন শক্তিমান পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী।

কিন্তু একক চন্দ্র চৌধুরী অসম্পূর্ণ। তাঁর নামের সঙ্গে আর একটি প্রাণী জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য হয়ে—সে নীল বাহাদুর।

হাতী। কাল বৈশাখীর জমাট ঘন-নীল মেঘের মত তার চেহারা—নীল বাহাদুর, নাম তার সার্থক। আসামের পাহাড়ে নিজের দলবলের মধ্যে সে ছিল গজেন্দ্র। শুঁড়ের টানে আকাশ-ছোঁয়া সরল গাছগুলোকে মড় মড় করে দেশলাইয়ের কাঠির মতো নামিয়ে দিত সে, ভরা-বর্ষায় সানন্দে অবগাহন করত তরঙ্গ-মাতাল ব্রহ্মপুত্রের জলে। বসন্তে তার মদস্রাবের গন্ধে পাহাড়ে পাহাড়ে চঞ্চল হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচারিনী হস্তিনীর দল।

তারপর যূথপতির পায়ে একদিন শৃঙ্খল পড়ল। তখন ফাল্গুন মাস। মহুয়ার গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে গেছে—সমস্ত দিন বপ্রক্রীড়া করেও এতটুকু স্বস্তি নেই নীল বাহাদুরের। স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরীর মতো সামনে এসে দেখা দিল অপরিচিতা হস্তিনী, নীল বাহাদুর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। কয়েক দিন পর যখন চমক ভাঙল তখন আর উপায় নেই—'কুনকি'র ছলনায় সে খেদার মধ্যে বন্দী।

অসহায় আক্রোশে কলা গাছগুলোকে উপড়ে ধারালো দাঁতে মাটিকে বিদীর্ণ করে সে পাগলের মত ছুটোছুটি করলে। তারপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখে ধীরে ধীরে সমস্ত বীর-বিক্রম তার শান্ত হয়ে এল। নীল বাহাদুর আজ চন্দ্র চৌধুরীর বাহন। মাহুতের নির্দেশে সে সসম্ভ্রমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, ডাঙসের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে তার মন। পায়ের দিকে পাহাড়ীদের গ্রামগুলোকে একদা দলে চুরমার করে দিয়েছে—সে সব এখন গত জন্মের স্মৃতি মাত্র।...

বাইরের দেউড়িতে তখন নীল বাহাদুরের পিঠে হাওদা-কষা চলছিল। চন্দ্র চৌধুরী যাচ্ছেন মহালে। দেউড়ির সামনে জমেছে মাঝারি গোছের একটা ভিড়। ঠিক এমনি সময়ে মৃদু-গম্ভীর মাদল বেজে উঠল দূরে।

চন্দ্র চৌধুরী চকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, শব্দটা কিসের?

সদর নায়েব নৃসিংহ মুখুজ্জে খবরটা আগেই পেয়েছিলেন। বললেন, রাজ-মহলের গঙ্গা পেরিয়ে সাঁওতাল এসেছে একদল।

—সাঁওতাল? কি চায় ওরা?

—পালগ্রামে ঘর বেঁধে থাকবে, তারই অনুমতি চাইতে এসেছে।

—পালগ্রামে? চন্দ্র চৌধুরীর চোখে মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল: সেখানে থাকবে—খাবে কি? মাটিতে তো লাঙল বসবে না।

—খাবে কী? নৃসিংহ মুখুজ্জে হাসলেন: ওদের খাবার ভাবনা আছে নাকি হুজুর? পালগাঁয়ের টিলায় তো আর সাপের অভাব নেই, তাই মেরেই পুড়িয়ে খাবে।

—সাপ খাবে?

—খাবে বই কি। সাপ তো সাপ হুজুর, বাঘের মাংস পেলে তাও কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে। বলে কী, জানেন? বাঘে যখন আমাদের মাংস খাবে, তখন আমরাই বা বাঘকে ছেড়ে দেব কেন?

অকৃত্রিম আনন্দে চন্দ্র চৌধুরী হেসে উঠলেন।

বললেন, এ একটা কথার মত কথা বটে। হাঁ, এরাই পালগ্রামের যোগ্য বাসিন্দা।

সাঁওতালদের দলটি তখন ছোটখাটো একটা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে আসছিল। তার সঙ্গে বাজনা। তবে এবার আর নাগাড়া টিকারা নয়, মাদল। ধিতাং তাং ধিতাং তাং। এটা ওদের বিজয়োৎসবের আনন্দ উল্লাস। সাত আট জন কাঁধে বাঁশ ঝুলিয়ে কী একটা মহাকায় জীবকে বয়ে আনছে।

সকৌতুকে এবং কৌতূহলে চন্দ্র চৌধুরী তাকিয়ে রইলেন। মাদলের ধ্বনি ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। বাঁশের তূণে বোঝাই তীরের ঝকঝকে ফলা, গো-সাপের চামড়া দিয়ে বাঁধানো ধনুক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালো পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো গ্র্যানাইটের তৈরি কিরাতের দল।

বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে এনেছে সদ্যোনিহত প্রকাণ্ড একটা দাঁতালো শূয়োরকে। মহিষের শিঙের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণ দাঁত ঠেলে উঠেছে প্রসারিত নাকের তলা দিয়ে। গায়ের অপ্রচুর ধূলিধূসর লোমগুলো দীর্ঘ এবং শানিত। অপরিচ্ছন্ন কালো শরীরে আট দশটা তীর শরশয্যার মত বিঁধে রয়েছে। সর্বাঙ্গে থকথকে গাঢ় রক্ত রোদের তাপে শুকিয়ে গিয়ে আলকাতরার মতো চট্‌চট্‌ করচে।

চন্দ্র চৌধুরীকে সামনে দেখে সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন জানাল।

—কিরে, কী চাই তোদের ?

কালো মুখে সাদা সাদা দাঁত বার করে তারা হাসল। তাঁর প্রজা হতে চায় তারা। সেই উপলক্ষে শূয়োরটা তাদের উপঢৌকন।

—তাই বলে শূয়োর দিয়ে কি করব রে !

—খাবি বাবু।

—শূয়োর খাব ? বলিস কি—তোদের মত সর্বভুক্ পেলি নাকি ? যা যা ওটা তোরাই নিয়ে যা।

সাঁওতালেরা মলিন এবং বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওদের শ্রেষ্ঠ উপচার ওরা জমিদারের জন্যই সাজিয়ে এনেছে। তাই প্রত্যাখানের ছায়া স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওদের চোখে মুখে।

—তবে তোকে আমরা কি দেব, বাবু।

চন্দ্র চৌধুরী সস্নেহে বললেন, কিছু দিতে হবে না। পালগাঁয়ের জঙ্গল তোরা সাফ করে দিবি, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাঁওতালদের মাদল বাজতে লাগল সোৎসাহে। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ যেন কত কালের গভীর একটা আচ্ছন্নতার তলা থেকে জেগে উঠল নীল বাহাদুরের ঘুমন্ত চেতনা। এ সুর কতদিন সে শোনেনি। চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে সে কুমীর শিকার করতে গেছে, ইকড় ঘাসের মধ্যে থেকে সোনালি বাঘকে গুলি খেয়ে লাফিয়ে উঠতে দেখেছে আগুনের হল্‌কার মতো। কিন্তু আসামের পাহাড়ে সেই উন্মত্ত যৌবন। হড়পা বান নেমে ব্রহ্মপুত্র হাজার হাজার হাতীর মতো গরজে উঠেছে। সে যেন জন্মান্তরের কথা।

জন্মান্তর ? আজ এই মাদলের ধ্বনি যেন নীল বাহাদুরকে আবার জাতিস্মর করে তুলল। কোন ঝড়ের রাত্রে মর্মরিত অরণ্যের সুর। বানের জলে বড় বড় গাছ ভেসে চলেছে, পাথরের চাঙ্গাড় নামছে হুড় হুড় শব্দে। নদীর

বুকের উপর অনেকটা জুড়ে ফেনিল জলের বাষ্প-কুয়াশা, আর সেই কুয়াশায় রোদ পড়ে যেন ইন্দ্রধনুর মায়া জ্বলছে।

নীল বাহাদুরের ছোট ছোট চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল। চঞ্চল শুঁড়টা দুলতে লাগল বাজনার তালে তালে। উত্তেজনায় বেরিয়ে এলো একটা প্রবল বৃংহন ধ্বনি।

মাহুত বললে, এদের নাচ দেখে হাতীটার ভারী স্ফূর্তি হয়েছে, হুজুর।

চন্দ্র চৌধুরী সকৌতুকে বললেন, হাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। গান গাইবারও চেষ্টা করছে।

সাঁওতালেরা কী বুঝলে কে জানে। কিন্তু নীল বাহাদুরকে ঘিরে তারা নাচতে লাগল। উষ্ণ একটা আভিজাত্যের অনুভূতিতে ঝিমিয়ে এলো নীল বাহাদুরের চোখ। কতদিন পরে সে অনুভব করছে, শুধু ডাঙ্গস্ খেয়ে দিন কাটানোই তার শেষ কথা নয়; সে গজেন্দ্র, সে যূথপতি। আর অরণ্যের প্রতিধ্বনি হয়ে অরণ্য-মানুষ এই লোকালয়েও বয়ে এনেছে তার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা।

পালগ্রামের মৃত সমৃদ্ধি কোন অলিখিত যুগের যে কাহিনী যে বহন করছে, ইতিহাস তার কোন হদিশ দিতে পারে না।

বাঙলার পাল রাজাদের তলোয়ার একদিন সমগ্র উত্তর-ভারতের আকাশে বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠেছিল। দেবপাল, ধর্মপাল, চক্রবর্ত্তী রাজাদের দুর্দান্ত প্রতাপে বাঙলার সমৃদ্ধি উছলে উঠেছিল সহস্র ধারায়। হয়ত তারি কোনো বিস্মৃত বুদবুদ এই পালগ্রাম। মজে যাওয়া দীঘির শীতল কাদার তলায় অজ্ঞাত শিলা লেখন হয়তো বিস্মৃত ইতিহাসের বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে পারে। উত্তর বাংলার মাঠে ঘাটে, বরেন্দ্র ভূমির কাঁকর মেশানো রাঙা মাটিতে অতীতের চূর্ণ কঙ্কাল।

স্বাধীনতার শ্মশানে এসে নতুন করে বাসা বাঁধল স্বাধীন মানুষের দল। কুঁচিলার বিষ মাখানো তীরের ফলা। নাগাড়া টিকারার রণ-দুন্দুভি।

সময় গড়িয়ে চলল। ভাঙা-পাথর আর গুঁড়ো ইঁটের তলা থেকে বেরিয়ে এল প্রকৃতির রসধারা—বর্ষার নতুন জলে লক লক করতে লাগল ধানের শীষ। তীর ছাপিয়ে কাঞ্চনের জল এসে নামল দুদিকের বিলে, সেই জলে টান ধরলে বোরোর ক্ষেতে যেন সোনা ফলতে লাগল। বনে জঙ্গলে এখন আর শুয়োর শিকার করতে হয় না, ভুট্টা আর আখের ক্ষেতে মাচা বেঁধে পাহারা দেয়

সাঁওতালেরা। টুকরো টুকরো শাকের জমি চোখে স্নিগ্ধতার অঞ্জন বুলায়, ছোট ছোট তামাকের ক্ষেতে খসখসে পাতাগুলো হাওয়ায় কাঁপে। আর তারি মাঝখানে কলা বাগানে ঘেরা সাঁওতালদের গ্রাম। মাটি দিয়ে নিকানো পরিচ্ছন্ন দেওয়াল, বাবলার খুঁটি। বারান্দার খাঁচায় দোয়েল শিস দেয়, পচাইয়ের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে বাঘের মত তেজী কুকুর উঠোনে পড়ে ঝিমোয়।

ছবির মত গ্রাম।

ঠুন-ঠুন-ঠুন। ঠুন ঠুন ঠুনাঠুন। হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ বহু দূর থেকে ভেসে এলো। চক্ররেখার মাঠের ওপারে একটা হাতী দেখা দিয়েছে। নীল মেঘের মত প্রকাণ্ড চেহারা। বিরাট দুই দাঁত সামনের দিকে দুখানা তলোয়ারের মত বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়ের সঙ্গে মস্ত একটা গাছের ডাল, মাঝে মাঝে সেটাকে মুখে পুরে দিয়ে চর্বণ চলছিল।

—জমিদার, জমিদার এসেছে।

মন্ত্রবলে যেন সাঁওতাল-পাড়া জেগে উঠল। ঢেঁকির কাজ ফেলে বেরিয়ে এল রূপোর নথ পরা মেয়েরা, আদমের প্রথম পুত্রের মতো বোরোর জমি থেকে উঠে এলো কর্দম-মলিন আধা উলঙ্গ পুরুষের দল। আধপোড়া ভুট্টা হাতে নিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে রইল মূঢ় আগ্রহে।

স্তম্ভের মত মস্ত মস্ত পা ফেলে এগিয়ে আসছে নীল বাহাদুর। গলায় বাজছে পিতলের ঘণ্টা। মাহুতের পেছনে হাওদার উপর দেখা গেল চন্দ্র চৌধুরীর মূর্তি।

নিয়মিত পাদক্ষেপে নীল বাহাদুর এসে ঢুকল। ক্ষুদে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে যেন একবার সকলের কুশল সে জিজ্ঞাসা করে নিলে। পরিচিত পুরাতন বন্ধুমণ্ডলী। নীল বাহাদুরের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের। কেবল নাচের তালেই ওরা নীল বাহাদুরকে সম্বর্ধনা করে না, তার সঙ্গে আছে কলা-মুলো-ভুট্টার প্রীতি উপহার।

—বৈঠ্ বৈঠ—

অঙ্কুশের তাড়া পড়ল মাথায়। বিশাল শরীরটা অতি কষ্টে সঙ্কুচিত করে পিছনের পা দুটো ভেঙে বসে পড়ল নীল বাহাদুর। তলোয়ারের মতো, দাঁত দুটো মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে। পুরোণো শ্লেটের মতো কালো গলার চামড়া ঝুলে পড়েছে নিচে। একথা আর অস্বীকার করার জো নেই যে, নীল বাহাদুরের বয়স বেড়েছে আগেকার চাইতে। গজেন্দ্রের চোখে তন্দ্রাবিলতা।

হাতী থেকে চন্দ্র চৌধুরী নামলেন। এই বারো বছরে তাঁকেও আর চেনা যায় না। বহুদিন জরাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, এতটুকু আমল দেন নি। তাই জরা এসে যেদিন অধিকার বিস্তার করেছে, সেদিন এতটুকু ফাঁক রাখেনি।

মাথার চুলগুলো শাদা। মুখটা অনবরত আপনা থেকেই নড়ছে। হাতের সিল্কের মতো পাতলা শাদা চামড়ার তলা থেকে ঠেলে উঠছে মোটা মোটা নীল শিরা। তবুও ঈষৎ পিঙ্গল চোখের তারায় আজও সেদিনের সেই বহ্নি দৃষ্টি।

সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

—ভালো আছিস তোরা সব ?

ওদের মুখভরা কৃতার্থতার হাসি। ক্ষেতে কাজ করতে করতে এগিয়ে এসেছে। সারা গায়ে জল আর কাদা, প্রকৃতির স্নেহ-নিবিড় স্পর্শ।

—ফসল কেমন রে এবার ?

—খুব ভালো ফসল, বাবু। তিন বছর এমন বোরো হয় নি।

চার পাঁচটা কাঠ আর বেতের আসন চারিদিক থেকে এসে জড়ো হয়েছে তখন। চন্দ্র চৌধুরী জাঁকিয়ে বসলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, এবার তাহলে খাজনা দিবি আমাকে ?

—খাজনা ? উদ্দীপনায় সাঁওতালদের চোখ জ্বলে উঠল একসঙ্গে ; তোর যা খুশি তাই নে না বাবু। তুই চাইলে—

—থাক থাক, অত ভক্তি দেখাতে হবে না আর—চন্দ্র চৌধুরীর দুই চোখে পিতৃস্নেহ ; তোরা পালগাঁয়ের পোড়ো জমিতে ফসল ফলিয়েছিস, এই আমার যথেষ্ট খাজনা। বাঘ আর ডাকাতের ভয়ে আগে ত এখান দিয়ে মানুষ চলতে পারত না। তোরা হচ্ছিস আমার নিজের লোক, আমার জঙ্গী পলটন। তোদের কাছে আবার খাজনা কিরে।

গর্বে, আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় সাঁওতালদের উজ্জ্বল চোখগুলো ছলছল করে এলো।

ওদিকে নীল বাহাদুরকে ঘিরে আর এক পর্ব চলছে তখন। শিশু বালক আর মেয়ের দল এসে ব্যূহ রচনা করেছে তার চারপাশে। নীল বাহাদুর তার বিশাল শুঁড়টাকে ভিক্ষার্থী একখানা হাতের মত বাড়িয়ে দিয়েছে, দৈনন্দিন নিয়ম মতো খাদ্য প্রার্থনা করছে সকলের কাছে। ছেলেদের হাসি এবং আনন্দ ধ্বনির মাঝখানে একটা কলা অথবা একটা ভুট্টা এসে পড়ছে

তার শুঁড়ের আগায়। আর নীল বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিজের মুখের ভিতর দিয়ে পুরে দিচ্ছে—আনন্দে তৃপ্তিতে ক্ষুধে ক্ষুধে চোখ দুটো বুজে এসেছে তার।

ফেরার পথে কেন কে জানে অত্যন্ত অহেতুকভাবে উদাস আর আচ্ছন্ন হয়ে উঠল চন্দ্র চৌধুরীর মন। হাতীর পায়ে পায়ে পুরানো ইঁটের টুকরো মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ছে দু'পাশে। বিজয়ী বিধর্মী শত্রুর মশাল কবে একদিন সহস্র শিখায় পালগ্রামের মাথার উপর জ্বলে উঠেছিল। বিদীর্ণ শবদেহ—লাঞ্ছিতা নারী। তারপরে স্তব্ধতা—সেদিনের মৃত্যু অতিক্রম করে এতটুকু আলো এপারে এসে পৌঁছায় না। চন্দ্র চৌধুরীর মনে হ'ল, বার বার মনে হ'ল, সেদিনের পালগ্রাম আবার জেগে উঠেছে নীরবতার সঞ্জীবনীতে, অত্যাচারী রাজার একক প্রতাপে নয়—বহু মানুষের, বহু মাটির মানুষের লৌহকঠিন পেশীর শক্তি মুখে।

নীল বাহাদুরের গলার ঘণ্টাটা বাজতে লাগল ছন্দময় দ্রুততালে। ঠন্-ঠন্-ঠন্। ঠন্-ঠন্-ঠনাঠন্। নির্জন মাঠ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ঘণ্টার শব্দে।

কিছুদিন পরে পাগলা ঘোড়া থেকে আছড়ে পড়ে চন্দ্র চৌধুরী মারা গেলেন।

তারপর ইতিহাসের এম, এ, ইন্দ্র চৌধুরী গ্রামে জমিদারী করতে এলেন। চন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রের কাছে জমিদারী করবার মতো দুঃসহ ব্যাপার আর কিছুই নেই, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখেই গ্রামে বাস করতে এলেন ইন্দ্র চৌধুরী।

পিলখানায় মোটা শিকলে বাঁধা নীল বাহাদুরের চোখে ঘুমের জড়তা। তার কোন কাজ নেই এখন। মদস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলো শুকিয়ে মরে গেছে তার—শ্লেটের মতো কালো চামড়া আরো অনেকখানি ঝুলে নেমেছে। তলোয়ারের মতো দাঁত দুটো একটু বাড়লেই কেটে নেওয়া হয় আজকাল, সেই দাঁতের আঘাতে আসামের পাহাড়ে আকাশ ছোঁয়া শালগাছগুলো যে একদিন মড় মড় করে উঠত সে কথা নীল বাহাদুরের মনেও পড়ে না।

তার জায়গা দখল করেছে ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্‌টিন। গ্রামের পথে বড় গাড়ি চালানো যায় না, কিন্তু দরকার হলে পাঁচ সাত জনে মিলে অস্‌টিন

ঠেলে নদী নালা পার করে দেওয়া যায়। পল্লী জীবনের নিঃসঙ্গ প্রবাসে অস্‌টিনই একমাত্র সান্ত্বনা।

পিলখানার সামনে দিয়েই মৃদু গর্জন করে বেরিয়ে যায় মোটরটা। কৌতুক এবং কৌতূহলে নীল বাহাদুর তাকিয়ে থাকে এই অদৃষ্টপূর্ব যানটার দিকে। পেট্রোলের গন্ধ ভারী বিচিত্র মনে হয় তার। শুঁড়টা সামনে বাড়িয়ে শব্দ করে নীল বাহাদুর, নাকের মধ্যে টেনে নেয় গন্ধটা—জীবনটার প্রকৃতি নির্ণয়ে চেষ্টা করে।

মাঠের পথে, গোরুর গাড়ী চক্র বিদীর্ণ অসমতলের উপর ঝাঁকুনি খেতে খেতে অস্‌টিন এগিয়ে চলে। জমিদারীর কাজকর্ম দেখা শোনা করবার চাইতে পথ-ঘাট বন জঙ্গলের প্রতিই ইন্দ্র চৌধুরীর কৌতূহল প্রবল। মুখের পাইপ থেকে কড়া বিলাতী তামাকের গন্ধ আসে, ষ্টিয়ারিঙের ওপরে রাখা স্থূল আঙ্গুলে হীরের আংটি ঝকঝক করে, আদ্দির পাঞ্জাবী হাওয়ায় উঠতে থাকে। আর পেছনের আসনে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন নৃসিংহ মুখুজ্যে—তাঁকে নইলে ইন্দ্র চৌধুরীর বেড়ান হয় না। অথচ মোটর জিনিসটার সম্পর্কে একটা অহেতুক ভীতি আছে নৃসিংহের মনে। পাগলা ঘোড়ার চাইতেও এই কলকব্জাগুলোকে তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হয়। ধরো, মোটর যদি উলটে যায়; গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগাই বা আশ্চর্য কি ? গ্রামের যা পথ — পিছলে পুকুরে যদি গিয়ে পড়ে তাহ'লে ?

কিন্তু ইন্দ্র চৌধুরীর ভয় নেই। নৃসিংহের ভীরুতা ভারী উপভোগ্য মনে হয় তাঁর—জোর করেই অনেকটা তাঁকে তুলে আনেন তিনি। তাছাড়া পাকা লোক নৃসিংহ। পথঘাট নদীনালার খবর তাঁর চাইতে বেশী আর কে জানে ?

ব্রাস-স-স—আচমকা শব্দ হ'ল একটা। মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে বেবি অস্‌টিন থেমে গেল। নৃসিংহ ভয়ানক চমকে উঠলেন—কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটল নাতো ?

কিন্তু দুর্ঘটনা কিছু নয়। চলতি মোটরকে হঠাৎ ব্রেক কষে থামিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্র চৌধুরী। দামী চশমার নিচে তাঁর ঐতিহাসিকের চোখ লোলুপ হয়ে উঠেছে

পাশেই পাহাড়ের মত উঁচু জায়গা একটা। ভাঙা ইঁট আর পাথরে

টুকরোয় অলিখিত ইতিহাস। মজে যাওয়া দীঘির পারে তালের বীথি শনশন শব্দে মাথা নাড়ছে।

—এটা কোন জায়গা মুখুজ্যে মশাই?

—পালগাঁয়ের টিলা।

পালগাঁয়ের টিলা! ইন্দ্র চৌধুরীর চোখেমুখে কৌতূহল প্রখর হয়ে উঠল: আমার জমিদারীর ভেতর এমন একটা জায়গা যে থাকতে পারে সে তো ভাবতেই পারি নি।

নৃসিংহ বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন: আজ্ঞে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

—বাঃ বলেন কী! টিলাটাকে দেখে কি মনে হয় না যে ওর তলায় পাহাড়পুরের মতো একটা প্রচ্ছন্ন বিহার কিংবা ওই রকম একটা বিরাট কিছু—

—আজ্ঞে?

নৃসিংহের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র চৌধুরী সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, চলুন, চলুন ওই পাহাড়টা একবার দেখে আসি।

সাঁওতালদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে মোটরটার চারপাশে। কড়া তামাকের একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে ইন্দ্র চৌধুরী তাদের ধমকে উঠলেন:

—যা, যা পালা সব। দেখছিস তো, মোটর গাড়ি? চাপা দিয়ে একদম মেরে ফেলব, ভাগ।

মোটরগাড়ি, নীল বাহাদুর নয়।

বাড়ি ফিরে ইন্দ্র চৌধুরী নৃসিংহকে বললেন, ওই সাঁওতালগুলোকে তাড়িয়ে দিন।

নতুন জমিদারের ব্যবহার নৃসিংহের দুর্বোধ্য। চন্দ্র চৌধুরীর প্রায় সমবয়সী তিনি, এতটা বয়স পর্যন্ত প্রাণপণে জমিদারীর অন্ধি-সন্ধি আয়ত্ত করেছেন। দলিল জাল থেকে দাঙ্গার লাস গুম করা পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে তাঁর বিচক্ষণতার অভাব হয়নি! কিন্তু—

—আজ্ঞে, ওদের তাড়াবেন কেন?

অপ্রসন্ন মুখে ইন্দ্র বললেন, খাজনা তো দেয় না, পুষেই বা কী লাভ। কিন্তু

সে সব ভাবছি না। দুশো টাকার জন্যে আমার হাহাকার নেই। কথা হচ্ছে, ওই টিলাটা আমি এক্সক্যাভেট করাব।

—আজ্ঞে?

—এক্সক্যাভেট করার মানে, খোঁড়াব। দশ হাজার বিশ হাজার—যা লাগে। কে জানে হয়তো : একটা আনন্দ ও উৎসাহের দীপ্তিতে ইন্দ্র চৌধুরী উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন : হয়তো ওই টিলাটার তলা থেকে এমন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে—যার ফলে বাঙলার ইতিহাসই লিখতে হবে নতুন ক'রে—কথার শেষ দিকটায় তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

উচ্ছ্বাসটা বুঝতে না পারলেও মূল ব্যাপার এতক্ষণে নৃসিংহের বোধগম্য হ'ল।

—ওই টিলাটা খুঁড়তে হবে বুঝি?

—হাঁ, এতক্ষণে বুঝেছেন।

নৃসিংহের কণ্ঠে সংশয় প্রকাশ পেল : কিন্তু ওদের তাড়ানো কি ঠিক হবে?

—ঠিক হবে মানে? উত্তেজনায় ইন্দ্র চৌধুরী সোজা হয়ে উঠে বসলেন : জানেন, ইতিহাসের কতবড় একটা তথ্য, হয়তো ওই টিলাটার নিচে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে? হয়তো পাল রাজাদের মূল্যবান কোন তাম্রশাসন, হয়তো তাঁদের দিগ্বিজয়ের—হয়তো কত কী আমি আর ভাবতে পারছিনা।

নৃসিংহও কিছু ভাবতে পারলেন না।—কিন্তু ওদের উচ্ছেদ করে দিন। একমাস সময়—ফসল কাটা শেষ হয়ে যাবে। আর এর ভেতর কলকাতায় চিঠি লিখে সব ঠিক করে ফেলছি আমি। আমার কী ভেবে আনন্দ হচ্ছে জানেন?

নৃসিংহ মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি জানেন না।

—আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, হয়তো টিলাটা এক্সক্যাভেট করিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার নাম!

—তা বটেই তো।

কিন্তু নৃসিংহ বুঝতে পারলেন না। অতীতের ইতিহাস! অতীতেই যা শেষ হয়ে গেছে, মাটির তলায় যা আত্মগোপন করেছে, বাইরের আলোকে তাকে টেনে আনবার, উদ্ঘাটিত করবার সার্থকতা কোথায়। মৃত যে, তাকে মৃত্যুর মধ্যে শেষ করে দেওয়াই তো ভালো। আজ অতীতের ভাঙা কবরের উপর নতুন যুগের মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে, ফলে-ফসলে তাকে জাগিয়ে

তুলেছে নতুন প্রাণের মধ্যে। সেই জীবন্ত মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর কঙ্কালকে পুজো করতে হবে—এ কোন দেশী খেয়াল ?

যথাসময়ে খবর এল। সাঁওতালেরা অবাধ্য হয়ে উঠেছে—বেশি চাপ দিলে বিদ্রোহী হওয়াও আশ্চর্য নয়।

লাঙ্গলের ফলা দুমড়ে বন্ধ্যা মাটিকে উর্বর করেছে তারা। তীরের আগায় নির্বংশ করেছে দাঁতালো শূয়োরের পাল! বল্লমের মুখে তুলেছে দীঘির পারে ঘুমন্ত কুমীরকে। এত সহজেই তারা ছেড়ে দেবে না তাদের ঘর-বাড়ি।

কথা শুনে ক্রোধে ইন্দ্র চৌধুরী পাংশু হয়ে উঠলেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে জমিদারী চালানোর বাসনা তাঁর নেই, প্রজার উপর জোর করে নিজের আত্মমহিমা প্রচার করবার মনোভাবও তাঁর নয়। কিন্তু বাঙলা দেশের বিস্মৃত ইতিহাস—জ্ঞান জগতের দাবি। এর চাইতে বড় কর্ত্তব্য কী থাকতে পারে ?

নৃসিংহ সবিনয়ে বলিলেন, কর্ত্তামশাই ওদের বড় ভালোবাসতেন—

উগ্রস্বরে জবাব এলো, তাইতেই তো মাথায় চড়েছে। যান আপনি।

নৃসিংহ চলে গেলেন। কিন্তু খুশি হয়ে গেলেন না।

দিনের পর দিন অবস্থাটা তিক্ত আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আকাশে বাতাসে খণ্ডযুদ্ধের আভাস। ইতিহাসের এম এ, ইন্দ্র চৌধুরীর শিরাস্নায়ুতে দেবীকোঠ রাজবংশের রক্ত ফেনিয়ে উঠেছে। কেবল ঐতিহাসিক জ্ঞান-লিপ্সাই নয়, শক্তিটাকেও একবার যাচাই করা ভালো।

আর পিলখানায় তন্দ্রাতুর নীল বাহাদুর কী একটা সন্দেহ করে। মাহুত আর তাকে তেমন সেবাযত্ন করে না আজকাল। অপ্রচুর খাদ্যে পেট ভরে না। চারদিকের আবর্জনা আর দুর্গন্ধে তার সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। চন্দ্র চৌধুরীর আমলের সেই দিনগুলি। জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদাও সে সমানভাবে ভাগ এবং ভোগ করে এসেছে। জমিদারকে দেখে পথের দু'ধার থেকে যারা সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়েছে, তাদের অভিবাদনের অনেকটা যে তারও উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে, এ কথা নীল বাহাদুর জানে।

কিন্তু এক বছরে কি পরিবর্ত্তন! কী বিস্ময়কর ভাবে নিরর্থক হয়ে গেছে তার সমস্ত মূল্য। দিন কয়েক আগে দু-তিন জন লোক তাকে দেখতে এসেছিল। কী কথাবার্ত্তা বলেছে কে জানে, কিন্তু তাদের সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ চোখ নীল বাহাদুরের ভালো লাগেনি। কেন কে জানে তার সন্দেহ হয় এখানকার

প্রয়োজন হয়তো তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা অশুভ সূচনার মতো মনে হয়, এখান থেকে হয়তো বিদায় নিতে হবে তাকে—সে অনাবশ্যক।

মৃদু গর্জন করে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা ছুটে যায় পিলখানার সম্মুখ দিয়ে। ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অসটিন। কত ছোট অথচ কি আশ্চর্য গতিবেগ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধটা এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি শুঁড়ের ভিতর টেনে নেয় নীল বাহাদুর—ভারী বিচিত্র মনে হয় তার।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা যেন তার ঘুমন্ত চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করে তোলে। কেন করে কে জানে: সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আসামের পাহাড়ে সেই হিংস্র মদমত্ত যৌবন যেন বহুদিন পরে ফিরে আসে নীল বাহাদুরের শিথিল শরীরে। মদস্রাবী গ্রন্থিতে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। পায়ের নিচে খাশিয়াদের পাড়া সে দলে পিষে চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু সে কবে—সে কবে! এক আছাড়ে ওই জানোয়ারটাকে কি ধুলো করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না?

ওদিকে ইন্দ্র চৌধুরী অধৈর্য হয়ে উঠেছেন আর সমানভাবে বিপন্ন করে তুলেছেন নৃসিংহকে। ওই টিলা তাঁর চাই। মামলামোকদ্দমা করে নয়, আইনের আশ্রয় দিয়েও নয়। অবাধ্য কতকগুলো বন্য প্রজাকে যদি বাহুবলেই বশীভূত না করা যায়, তা হলে কিসের জমিদারী।

কিন্তু সাঁওতালদের ভয় করেন নৃসিংহ। উত্তর বাঙ্গলার শান্ত নির্বিরোধ রাজবংশী নয় ওরা। গলায় তুলসীর মালা পরে না, কৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে থাকে না। ওদের নাগাড়া টিকাড়া, ওদের রণডঙ্কা। ঝড়ের মেঘের মন্দ্র জাগে তার নির্ঘোষে।

মুখের উপর অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে ইন্দ্র চৌধুরী বললেন, বেশ ব্যবস্থা করব।

দেউড়ির সামনে পায়চারী করতে করতে তাঁর চোখে পড়ল নীল বাহাদুরের বিশাল অবয়ব। শিকলে বাঁধা এই অতিকায় প্রকাণ্ড জানোয়ারটা মূর্তিমান অপচয় মাত্র। হাতীটাকে বিক্রী করবার চেষ্টায় আছেন তিনি, কিন্তু খরিদ্দার মিলছে না। অথচ দিনের পর দিন হাতীটার ভোজ্য সংগ্রহ করতে—

মুহূর্তে মগজের মধ্যে চমৎকার একটা মতলব খেলে গেল।

পিলখানার সামনে এসে ইন্দ্র চৌধুরী দাঁড়ালেন। কী কুশ্রী কদাকার

ানোয়ারটা বিধাতার সৃষ্টিতে কী পরিমাণ অস্থি মাংসের অপব্যবহার। র্বাঙ্গে লোল স্থবিরত্ব। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে শারীরিক অস্বস্তি বোধ রতে লাগলেন তিনি।

হাতীটার ছোট ছোট চোখ দুটোর দিকে তিনি তাকালেন। মনে হ'ল, এই নির্বোধ বিশাল জানোয়ারটার চোখে কী একটা কথা মুখর হয়ে উঠেছে—যন একটা মর্মভেদী দৃষ্টি পাঠিয়ে সে তার নিভৃত অন্তরের সমস্ত সন্ধান জেনে নিয়েছে।

চকিতে হাতীটার চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তিনি। তারপর াহুতকে ডেকে আদেশ দিলেন, আজ থেকে তিন দিন হাতীটার খোরাক বন্ধ।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নীল বাহাদুর অস্থির হয়ে উঠল। তিন দিন থেকে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেয় না তাকে। সমস্ত দেহে মনে তার বিপ্লব। এরা কি তাকে অনাহারেই মেরে ফেলবার মতলব করেছে? বার্ধক্যের শেষ শক্তি দিয়ে নীল বাহাদুর বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করে, লোহার শিকলের আংটাগুলো টমট করে ওঠে, পাথরের স্তম্ভটা নুয়ে পড়তে চায়। ব্যর্থ ক্ষুধা আর ক্ষোভে চোখের দুই কোন দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, থেকে থেকে বেরিয়ে আসে কাতর আর্তনাদের মতো এক একটা বৃংহণ ধ্বনি। সেই পাহাড় গুঁড়োনো শক্তি আজ আর নেই—নীল বাহাদুর আজ স্থবির, মৃত্যুর পথিক।

তৃতীয় দিনে ইন্দ্র চৌধুরী আর নৃসিংহ এসে দাঁড়ালেন সামনে।

—আপনি হাতী নিয়ে বেরিয়ে যান মুখুজ্যে মশাই, আমি মোটরে আসছি। নৃসিংহের সমস্ত মুখ পাংশু এবং পাণ্ডুর।

—ব্যাপার একটু কেমন—

ইন্দ্র চৌধুরী কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, আর দেরী করবেন না। তারপর বড় বড় পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

বহুদিন পরে নীল বাহাদুরকে আবার বাইরে বের করে আনা হ'ল। ড়ির হাওদা কষা হতে লাগল তার পিঠে। অসহ্য ক্ষুধায় দৃষ্টি অভিভূত—রাশি রাশি ওনকি উড়ছে শুধু। তবু ধৈর্য ধরে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। হাওদা কষা হচ্ছে, যাত্রার আগে নিশ্চয়ই খাদ্য মিলবে।

কিন্তু খাদ্য মিলল না। দুর্গানাম জপ করতে করতে ভয়ার্ত নৃসিংহ হাওদায় উঠে বসলেন আর পরক্ষণেই মাহুতের সুতীক্ষ্ণ ডাঙ্গস এসে বিঁধল নীল বাহাদুরের মাথায়।

ক্ষিপ্তের মতো নীল বাহাদুর চলতে সুরু করল। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত ধারণা তার অবলুপ্ত হয়ে গেছে—মাথার উপর ডাঙ্গসের তীব্র অনুভূতি। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা দুলছে—অস্পষ্ট, আর ছায়ায় আচ্ছন্ন। নীল বাহাদুরের নীল মেঘের মতোই মহাবপুটা দুলতে লাগল—এক সঙ্গে জেগে উঠেছে বুভুক্ষা আর বার্ধক্য। তবু আজ সমস্ত শক্তিকে শেষবার সংহত করে সে চলতে লাগল লক্ষ্যহীন অন্ধ চোখে। আর মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, পিছনে বহুদূর সে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটার অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে—হাওয়ায় আসছে পোড়া পেট্রোলের বিচিত্র গন্ধ।

সামনে পালগাঁয়ের টিলা। কলাবনে ঢাকা সাঁওতালদের গ্রাম। মজে যাওয়া দীঘির পাড়ে তালের বন বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে। পুরোণো পৃথিবীতে নতুন মানুষের সার্থক তপস্যা দেখা দিয়েছে ফলে ফসলে। নৃসিংহ মুখুজ্যে ভাবতে লাগলেন: এদের নির্বাসিত করে প্রাচীনের কঙ্কালকে উদ্ধার করা—কী তার প্রয়োজন?

কিন্তু নীল বাহাদুর কিছু ভাবতে পাচ্ছে না। অসহ্য ক্ষুধায় সে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এমন সময়ে তার নাকে ভেসে এল অপূর্ব একটা সৌরভ।

অপূর্ব সৌরভ বই কি। মুহূর্তে দেহের শিরা স্নায়ুগুলো প্রখর হয়ে উঠেছে তার। পাকা ফসলের গন্ধ—পরিপুষ্ট সোণালি ধানের গন্ধ। অন্ধ চোখ দুটো মেলতেই সে দেখল, সামনেই বিলের ধার দিয়ে বোরোর ধানে লক্ষ্মীর অজস্র করুণা। দু'পাশে যতদূর দেখা যায়, পাকা ধানের সানন্দ বিস্তার—মধুগন্ধী খাদ্যের আমন্ত্রণ।

তিন দিনের অভুক্ত নীল বাহাদুর পাগলের মত ক্ষেতে গিয়ে পড়ল। মাহুত তাকে বাধা দিলে না, বরং আরো ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে গিয়েই নামিয়ে দিলে তাকে।

পিছনে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা এসে থেমেছে। ইন্দ্র চৌধুরীর উত্তেজনা কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল: খাইয়ে দে সমস্ত ধান, দলে পিষে শেষ করে দে। জমি ছাড়বে না—রামরাজত্ব পেয়েছে।

—ড়ুম ড়ুম ট্র্যাম।

সমস্ত সাঁওতাল পাড়াকে মুখর করে নাগাড়া বাজাতে লাগল। পালগ্রামের টিলার উপর সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন যুগের সৈনিকের দল। হাতে তাদের উদ্যত তীর আর ধনুক। সংশপ্তকের অস্ত্রের লক্ষ্য আজ বদলে

গিয়েছে। জমিদারের হাতী এসে তাদের বুকের রক্তে ফলানো ধান নিঃশেষ করে দিয়ে যাচ্ছে—দলে দিয়ে যাচ্ছে সারা বছরের জীবন সঞ্চয়।

নাগাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ে আসতে লাগল : শাঁ-শাঁ-শাঁ। শাণিত দীর্ঘ ফলাগুলো নির্মমভাবে বিঁধতে লাগল নীল বাহাদুরের সর্বাঙ্গে। একটা অস্ফুট চীৎকার করে নৃসিংহ মুখুজ্যে নিচে লাফিয়ে পড়লেন।

ক্ষিপ্ত নীল বাহাদুর পাকা ধানের গোছাগুলো উপড়ে উপড়ে মুখে পুরতে লাগল। তার সমস্ত শরীরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই। দুই চোখের ওপর দিয়ে রক্ত নেমে আসছে, সারা গায়ে তীর বিঁধে রয়েছে সজারুর কাঁটার মতো। কিন্তু কোনটাতেই কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

দুম দুম করে দুটো শব্দ হ'ল বন্দুকের—দেবীকোটে রাজবংশের শেষ প্রতাপ। আকাশ ফাটানো মানুষের কলরব জেগে উঠল। আর নীল বাহাদুরের সামনে অকস্মাৎ পৃথিবীটা একটা চাকার মত ঘুরতে সুরু করে দিলে। তীরের ফলায় কুচিলা তার রক্তের মধ্যে ক্রিয়া সুরু করে দিয়েছে—তার তীব্র আর্সেনিকের ক্রিয়া।

টলমল করে দুলতে লাগল যুথপতির দেহটা। শেষ শক্তিতে আর এক গুচ্ছ ধান মুখে পুরে দিয়ে সে টলতে টলতে হটে এলো, তারপর শুঁড়টাকে আকাশে তুলে একটা প্রকাণ্ড চীৎকার করে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিস্ফোরণের মতো যান্ত্রিক জানোয়ারটার অন্তিম আর্তনাদ। নীলবাহাদুরের বিরাট শরীরের চাপে পাখীর বাসার মতোই গুঁড়িয়ে গিয়েছে।



শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

গভীর

গয়া লাইনের একটা জংসন ষ্টেশনে একখানা ট্রেণ এসে থাম্‌ল। গাড়ীখানা আস্‌ছে পশ্চিম থেকে, যাবে কল্‌কাতায়।

গ্রীষ্মকালের গভীর কালো রাত্রি, ফুর্‌ ফুর্‌ ক'রে হাওয়া বইছে। অত রাতে ভিড় তেমন বিশেষ নাই। দু-একজন উঠল, চার পাঁচজন মাত্র নাম্‌ল। গাড়ীর জানালাগুলির কাছ দিয়ে একটা পানওয়ালা হেঁকে গেল, আর একজন এসে হাঁকল, 'পুরী-মিঠাই',—একটি ছেলে ঝুমঝুমি বাজিয়ে তার মণিহারি জিনিষগুলির বিজ্ঞাপন করে গেল, কিন্তু গাড়ীর ভিতরকার নিদ্রিত, অর্দ্ধজাগ্রত ও নিস্পৃহ যাত্রীদের কাছ থেকে কোনো সাড়াই এল না।

বাঁশী বাজিয়ে ধীরে ধীরে প্লাট্‌ফরম্‌ ছেড়ে যখন ট্রেণখানি পার হয়ে বহুদূর চলে গেল, তখন আবার চারিদিকে নেমে এল রাত্রির নিঃশব্দ ছায়া। ঝিঁঝিঁর একঘেয়ে আওয়াজ সেই নিস্তব্ধতাকে আরও গভীরে ডুবিয়ে দিতে লাগ্‌ল, এবং প্লাট্‌ফরমের উদাসীন প্রদীপগুলি তেমনি করেই অপলক চোখে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে।

যে-তিনটি যাত্রী এইমাত্র নামল, তাদের সঙ্গে মালপত্র অতি সামান্যই। তিন জনের মধ্যে দুটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। পুরুষ দুটির মাথায় বড় বড় পাগ্‌ড়ি বাঁধা। পরণে তিনজনেরই ঢিলা পায়জামা। জাতিতে বোধ করি তারা শিখ। পায়জামা ছাড়া মেয়েটির গায়ে একটি পাত্‌লা কাপড়ের পাঞ্জাবী, মাথায় একটি সবুজ রংয়ের ওড়না কাঁধের উপর দিয়ে গা বেয়ে নীচে নেমে এসেছে, এবং তারই পাশ দিয়ে মেয়েটির মাথার বেণী ঝুলে পড়েছে একেবারে কটির নীচে। পায়জামাটিতে তার ধূলোবালি এবং ট্রেণের দাগ লাগা। পায়ে একজোড়া কালো চটিজুতো। পুরুষ দুটির মধ্যে একটি ছোক্‌রা, আর একটির কিছু বয়স হয়েছে। কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে তার বয়স সহজে ঠাহর কর্‌বার উপায় নেই।

ঝুম্‌ঝু মওয়ালা তার মণিহারির ঝাঁপির দুই দিকের দুই আংটার সঙ্গে কাপড়ের দড়ি পাকিয়ে গলায় বেঁধে এতক্ষণ তাদের লক্ষ্য করছিল। আজ বোধ হয় তার বিক্রি বেশী হয়নি, ঝুম্‌ঝুমিটা একবার বাজিয়ে সে তাদের দিকে

এগিয়ে গেল। ষ্টেশনের আলোয় তার সেই বিস্তৃত ঝাঁপির মধ্যে সৌখীন খেলনা ও মণিহারিগুলি ঝলমল্ করছিল। আনন্দদীপ্ত দুটি চক্ষু নিয়ে মেয়েটি সেদিকে ফিরে দাঁড়াতেই বয়স্ক পুরুষটি চোখ রাঙিয়ে বল্ল, এত্না রাত্মে ফেরি...যাও ভাগো...

ছেলেটি তার ঝাঁপি নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। তিনটি নরনারী জিনিষপত্রগুলি হাতে নিয়ে তারপর খুঁজ্তে খুঁজ্তে প্লাট্ফরমের একান্তে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর 'ওয়েটিং রুম'-এ এসে প্রবেশ করল।

ভিতরে আর কোনো প্রতীক্ষমান যাত্রী ছিল না। দুটো বেঞ্চি এবং ইজি চেয়ারটা তারা এসে দখল কর্‌ল। মালপত্রগুলি গুছিয়ে রাখ্‌ল মাঝখানের গোল টেবিলটার ওপর। মেয়েটি অতি চঞ্চল। ঘরের মধ্যে ঘুরে ফিরে, চেয়ার ও বেঞ্চির চারিদিকে পায়চারি করে, বড় আয়নাটায় মুখ দেখে, সঙ্গের যুবকটিকে বয়স্ক লোকটির অলক্ষ্যে একটি ঠোনা মেরে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে এই মৃতকল্প পরিত্যক্ত ঘরখানিকে জীবনের মুখরতায়, উল্লাসে, দীপ্তিতে, গৌরবে একেবারে রোমাঞ্চিত করে তুল্‌ল। দীর্ঘ পথ গাড়ীর মধ্যে অতিক্রম ক'রে এসে সে যেন মুক্তির আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে।

যুবকটি তন্দ্রায় কাতর হয়ে পড়েছিল, এই মেয়েটির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে সে আস্তে আস্তে একটা বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বয়স্ক লোকটি স্নেহের হাসি হেসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সুন্দর পাঞ্জাবী ভাষায় বল্‌ল,—সমস্ত পথটা তুমি ঘুমিয়েছ, আর আমরা জেগে বসেছিলাম! এবার ঘুম পাচ্ছে, বিরক্ত করো না কিন্তু, চুপটি করে বসে থাক লক্ষ্মীটি, গাড়ী আসতে এখন অনেক দেরী!

মেয়েটি ইজি-চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল। হাসি তার সব-কিছুতেই। ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়েও তার হাসি থামে না।

কতক্ষণ কেটে গেছে। যুবকটীর নাক ডাকার বিচিত্র শব্দ শুনে মেয়েটী সকৌতুকে তার দিকে একবার তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার চঞ্চল দুটি চোখের তারা স্থির হয়ে গেল 'স্প্রীংয়ের' দরজাটার দিকে তাকিয়ে। সোজা হয়ে সে উঠে বসল। মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌ল, তার 'চাচা' তন্দ্রায় কাৎ হয়ে পড়েছেন। পাছে শব্দ পেয়ে তিনি জেগে ওঠেন এজন্য চটিজুতোটি সে আস্তে আস্তে ছাড়্‌ল, তারপর পা টিপে টিপে উঠে সে দরজার কাছে এল।

দরজার দুটি পাল্লার ঠিক নীচেই বাইরে সেই মণিহারির ঝাঁপিটা নামিয়ে ঝুমঝুমিওয়ালা তার পাশেই বসেছে। এতবড় লোভ আর সে সম্বরণ করতে পারল না, একটুখানি সে হাসল, তারপর মাটিতে হেঁট হয়ে পড়ে দরজার নীচে দিয়ে একটি হাত গলিয়ে চুপি চুপি টপ্ করে একটি কাঁচের পুতুল তুলে হাত সরিয়ে নিল। ঝুমঝুমিওয়ালা কোন সাড়াই দিল না।

মেয়েটির কিন্তু আগে তা মনে হয় নি। সে ভেবেছিল এ চুরি তার হাতে হাতে নিশ্চয় ধরা পড়বে, তারপর খানিকক্ষণ হবে কাড়াকাড়ি, এবং ঠিক তার পরেই জোর করে হাতটা ছিনিয়ে সে পালিয়ে আসবে। ছেলেটি চেঁচামেচি করে ঘরে এসে ঢুকবে, সে তখন বলবে, ইস্ তুমি কি আমাকে নিতে দেখেছ? আমিত ছিলাম দরজার এদিকে! কে হাত বাড়িয়েছিল তা আমি কি জানি?—ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হতে দেখলে তবে সে পুতুলটা ফিরিয়ে দেবে! সমবয়সী ছেলেকে জব্দ করতে তার ভারি ভাল লাগে।

মুখের হাসি তার মিলিয়ে গেল। চাচার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার একটা পাল্লা টেনে বাইরে সে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ল, দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে অকাতরে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝাঁপিশুদ্ধ চুরি গেলেও তার সে ঘুম হয়ত ভাঙ্‌ত না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের একটি করুণ ক্লান্তির ছায়া তার নিদ্রিত মুখের ওপর ফুটে উঠেছে।

এ অবস্থায় কেউ যে এমন ক'রে ঘুমুতে পারে মেয়েটির তা ধারণায় এল না। হেঁট হয়ে সে তার স্বাভাবিক অপরূপ কোমল কণ্ঠে ডাক্‌ল, 'ইয়ারা'?

ফেরিওয়ালা জেগে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বস্‌তেই সে বল্‌ল,—তোমার জিনিস যদি চুরি হয়ে যেত এক্ষুনি?

ছেলেটি তার মাতৃভাষায় বল্‌ল, চুরি? এঃ মাথা ভেঙে দেব না?

তারপরেই সে একটা রবারের পাখী তুলে তার পেট টিপে বাঁশী বাজিয়ে বল্‌ল, লেও, ছে প্যায়সা!

মেয়েটি একটু হেসে পায়জামাটা গুটিয়ে ঝাঁপির কাছে উবু হয়ে বসে, বল্‌ল—তোমার সব জিনিস ঠিক-ঠিক আছে? দেখ দেখি?

ছেলেটি একবার সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বল্‌ল,—তুমি নাও না কি চাও,...এই নাও 'মণি ব্যাগ'—দো আনা!

—ও আমার চাইনে।

—আচ্ছা, এই নাও জর্দার কৌটো—এক আনা। জরির ফিতা নেবে? সাত আনা গজ! তবে এই লাট্টু আছে, লাট্টু, দো দো পয়সা!

—লাট্টু আমার কি হবে,—মেয়ে মানুষ!

—তোবে কি লেবে? 'সিসা' চাই? মুখ দেখবার জন্যে? তোমার মুখ সুন্দোর আছে!

মেয়েটি তার বল্‌বার ভঙ্গী দেখে মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেল্‌ল। বল্‌ল,—চাইনে—তুমি দেখো তোমার মুখ, দুষ্টু!

নতুন 'লাইসেন্স্' পেয়ে ছেলেটি প্রথম কারবার সুরু করেছে, ক্রেতা চেনবার অভিজ্ঞতা এখনও তার ভাল ক'রে হয়নি। সে বলল্, তবে ত' মায়রাণি, তোমার কাছে কত পয়সা আছে বল, সেই মত জিনিস বেছে দিচ্ছি।

পয়সা? আমি পাব কোথায়?

ছেলেই তার মুখের দিকে তাকাল, তারপর শ্লেষের হাসি হেসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল, যাও গিয়ে ঘুমোওগে। মিছামিছি এতক্ষণ—

মেয়েটি নড়্‌ল না, নানা রকমের চক্‌চকে ঝল্‌মলে খেল্‌না এবং নানা সৌখীন জিনিসের মধ্যে তার দৃষ্টি গিয়েছিল হারিয়ে। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে কাচের পুতুলটি সে বুকের কাছে চেপে ধরেছিল। হয়ত ভাবছিল, চুরির জিনিষ ফিরিয়ে দেবার লজ্জা সে কেমন করে সাম্‌লাবে!

ছেলেটি আবার মুখ ফিরোল। এত বড় অবজ্ঞা সয়েও যে এমন ক'রে ব'সে থাকতে পারে তার প্রতি কেমন যেন একটু মায়া হ'ল। দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। একজনের কাছে এই বিশাল পৃথিবী শুধুই রূপকের কল্পলোক, আনন্দের মোহমন্দির, স্বপনের অমরাবতী; আর একজন ধূলিকণ্টকাকীর্ণ রূঢ় বাস্তবের পথচারী, জীবন সংগ্রামের অসহায় পদাতিক,—এ পৃথিবী তার কাছে অপরিসীম দুঃখের, অসহনীয় অভিজ্ঞতার, অনন্ত বেদনার!

দুজনে প্রায় পাশাপাশি বস্‌ল। একটি নদী যেন এক বিস্তৃত মরুভূমির প্রান্ত সীমায় এসে থেমেছে। তার সেই সুন্দর চোখের ভিতর তাকিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, নাম কি?

—নাম? শুনবে? শেয়াস্তি দেবী। তোমার নাম?

ছেলেটি সেই নির্জন ষ্টেশন আর অন্ধকার রেল-পথের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ঈষৎ হেসে বল্‌ল—কি হবে আমার নাম শুনে? তোমার ত' মনে থাক্‌বে না!

শান্তি বল্‌ল,—আমার নাম তবে জেনে নিলে কেন ? বল শিগ্‌গির।

ছেলেটি এড়িয়ে গেল। নাম ব'লে এই নিভৃত আলাপের যবনিকা সে টান্‌তে চাইল না। বল্‌ল,—তুমি কিছু কিন্‌লে না, আমার কেমন ক'রে চলে বল ত ? আজ সারাদিন বল্‌তে গেলে কিছুই...তোমার মুলুক কোথায় ?

শান্তি বল্‌ল—পান্‌জাব ; অমিরৃত্‌সর্‌।

—এদিকে এলে যে ?

শান্তি এবার মুখ রাঙা করে মাথা হেঁট করল। যে-প্রশ্নটা ছেলেটি উত্থাপন ক'রে বস্‌ল, সে প্রশ্ন যেন কোনো নিকটাত্মীয়ের। ছোট মেয়ে, ইতিমধ্যে ভুলেই গেছে ছেলেটি পথের একটি সামান্য ফেরিওয়ালা, পূর্ব-পরিচয় তার সঙ্গে একবিন্দুও নেই !

—চুপ করে রইলে যে ?

শান্তি বল্‌ল—আমি এই প্রথম এলাম এ মুলুকে চাচার সঙ্গে।—আর ওই ছেলেটা, ওই যে গাঁ-গাঁ ক'রে নাক ডাকৃছে—ও-ও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।—বলে সে দরজার ভিতর দিয়ে নিদ্রিত যুবকটিকে দেখাল।

—ও কে তোমার ?...আবার যে চুপ করলে ? বলবে না ?

শান্তি শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হল, যুবকটির সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। কাকা ওই ছেলেটাকে চাক্‌রী দিয়ে সংসার পেতে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন কালীমাটীতে। চাচা তার টাটা কোম্পানীর বড় চাকুরে কি-না।

ছেলেটি তার জিনিসগুলির দিকে তাকিয়ে কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা করল, তারপর একটি ছোট্ট অলক্ষ্য নিঃশ্বাস ফেলে বলল্‌, এবার আমাকে যেতে হবে, ও-লাইনে গাড়ী আস্‌বে এখুনি। আর শোন, নাম জান্‌তে চাইছিলে না তখন ? আমার নাম বদ্‌রি।

এই কথা ক'টি বলে সে উঠ্‌বার চেষ্টা করতেই শান্তি বল্‌ল, এত রাতে কেউ তোমার জিনিস কিন্‌বে না। আমিই-বা এখানে একলা ব'সে ব'সে কি করব ?

এ একেবারে অদ্ভুত প্রশ্ন ! সামান্য আধঘণ্টার পরিচয়ে এত বড় দাবী যে খাটানো যেতে পারে একথা বদ্‌রির জানা ছিল না। তার মনে হ'ল, শান্তি ত কম স্বার্থপর নয়। খেয়ালের খেলার মত তাকে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে গাড়ী এলেই ত সে স্বামীর সঙ্গে পালিয়ে যাবে ! তার জন্য শুধু রেখে যাবে

নির্জন উদাসীন ষ্টেশন, ক্রেতার জন্য ব্যর্থ খোজাখুঁজি, এবং একটি নিঃশ্বাস! আর একদিনের কি একটা গল্প তার মনে পড়ল। না, এ হ'তেই পারে না! ক্ষুব্ধ অভিমানের সঙ্গে সে বল্‌ল,—তুমি যাও ভাই তোমার চাচার কাছে।

—যাব না, কি করবে তুমি?···এই আমি বসে রইলাম।—বলে শান্তি খেল্‌নার ঝাঁপির একটা কানা হাতে চেপে বসে রইল।

বদ্‌রি বল্‌ল, আমার লোকসান্ দেবে কে?

শান্তি বল্‌ল—তোমার জিনিস, তুমিই দেবে?

বদ্‌রি আবার তাকাল তার মুখের দিকে। বিদেশিনীর দুটি দীর্ঘায়ত গভীর কালো চোখে এক নির্লিপ্ত চাহনি। মাথার বেণীটি তার ঝুলে পড়েছে কোলের মধ্যে। নধর সুপুষ্ট হাতখানিতে একগাছি চিক্‌চিকে সোণার চুড়ি, ক'ড়ে আঙ্গুলে একটি ছোট্ট আংটি, পা দুখানি ধূলো-বালি মেখে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। শীতপ্রধান দেশের মেয়ে বলে মুখখানিতে রক্তের আভা স্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছিল। বহু যাত্রীগাড়ীতে বদ্‌রি বহু সুন্দরী মেয়েকেই দেখেছে, কিন্তু এত কাছাকাছি এমন রূপবতী নারী আর কোনোদিন তার চোখে পড়েনি। এই কিশোরীটির হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার মানসিক দৃঢ়তা সে হারিয়ে ফেলেছিল।

বদ্‌রি অনেকক্ষণ তার চোখের ভিতর তাকিয়ে বল্‌ল,—আমি তোমাকে চিনি!

—দূর, কোনোদিন দেখেছ নাকি যে চিন্‌বে?

অভিভূত হয়ে বদ্‌রি বল্‌ল,—হ্যাঁ চিনি, নিশ্চয় চিনি, আমি তোমাকে দেখেছি এর আগে।

—কোথায় দেখেছিলে?

ঘাড় ফিরিয়ে বদ্‌রি একবার রেল-পথের দিকে তাকালো। কোথায় দেখেছে তা সে কেমন করে বল্‌বে? স্মরণের পরপার পর্য্যন্ত সে একবার হাতড়ে দেখ্‌ল। সসাগরা ধরিত্রী আর নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ সে মনে মনে তোলপাড় ক'রে এল। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে বল্‌লে, হুঁ, ঠিক আমি চিনি তোমাকে—দেখেছি যে আগে।

তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে শান্তি হাস্‌ল। হেসে বল্‌লে,—তাহলে এ জন্মে নয়!

দুজনে বসে গল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। শান্তি বলল, তাদের বাড়ি অমৃতসরে

'জালিয়ান-বাগের' কাছেই, আর একটু গেলেই 'ঘণ্টাঘর',—ওই যেখানে রয়েছে সরোবরের মাঝখানে 'সোনেকা মন্দির'। পিতা তার রেশমের কারবার করেন। একবার কবে সে লাহোরে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখে এসেছিল! —বদ্রি বল্‌ল,—তাদের বাড়ি এই কাছেই গোয়ালা-মহল্লায়। বাপ তার দুধ বিক্রী করে। তার মামা হচ্ছে 'ধরমশালার' দারোয়ান। একবার ঝড়ে তাদের বাড়ি পড়ে গিয়েছিল। মা তার পাগ্‌লি। চম্পা নদীতে তারা প্রায়ই মাছ ধরতে যায়।

একজন থামে আর একজন বলে; এমনি করেই তাদের আত্ম-কাহিনী গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌ল। যে-বন্ধু নতুন এসে জোটে সে আনে নতুন বিস্ময়! তার হৃদয়টিকে আবিষ্কার করবার জন্য সমস্ত মনের কৌতূহলের আর সীমা থাকে না! মুখোমুখী দু'জনে বসে নিজ নিজ অন্তরের কপাট খুলে পরস্পরকে অভিনন্দিত করল। পথচারী ও গৃহবধূর মাঝামাঝি কোনো পার্থক্যই আর রইল না। সমবয়সের নিঃসঙ্কোচ আলাপের ভিতর দিয়ে এমনি করেই তাদের হ'ল গভীর পরিচয়, প্রীতি, সখ্যতা এবং ভাবের আদান-প্রদান।

হঠাৎ তাদের আলাপে বাধা পড়ল একটি কুকুরের প্রাণপণ করুণ চীৎকারে। বেচারা বোধ হয় আহার সংগ্রহ করতে নেমেছিল লাইনের ধারে, একখানা চলন্ত মাল গাড়ীর চাকায় লেগে গেল ধাক্কা। কুকুরটা চীৎকার করতে করতে এক দিকের প্লাটফরমে যখন উঠে এল, শান্তি দেখল, একটি পা সে উঁচু করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিকৃত আর্ত্তনাদ করতে করতে পালাচ্ছে, ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ছে তার সেই পা খানি বেয়ে।

ভয়ে উত্তেজনায় বিবর্ণ আহত মুখে সে বদ্রির দিকে তাকাল। সর্বাঙ্গ তখন তার থরথর করে কাঁপ্‌ছে। কিন্তু এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেও মাল গাড়ীর গতি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হ'ল না, আগের মতই মন্থর গতিতে নিজের পথে চল্‌তে লাগ্‌ল।

বদ্রি তারা দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌ল। বল্‌ল, এ ত' দু বেলাই হচ্ছে। কত কুকুর এমনি···সেদিন একটা কুলী মোট্ নিয়ে পার হবার সময়—বাস্, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই একটি পা তার আট্‌কে গেল চাকার তলায়।

শান্তি সাড়া দিল না। দূরে কোথায় গিয়ে থেকে থেকে কুকুটা তখনও আর্ত্তনাদ করছিল, সেই দিকে সে তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল, নিষ্ঠুর পৃথিবী! একটি অসহায় প্রাণী চির জীবনের জন্য যে পঙ্গু হয়ে গেল, কেউ একবার সে

দিকে ফিরেও তাকাল না! যে প্রতিবাদ করতে পারে না, যার বেদনার কোনো ভাষা নেই; তার জীবন কি এত তাচ্ছিল্যের, এতখানি অনাদরের?

অশ্রুতে শান্তির চোখদুটি পরিপূর্ণ হয়ে এল। এ শাস্তি যেন তাকেই সইল, এ আঘাত যেন তারই বুকে বাজ্‌ল। পরের ব্যথা যে বুঝতে পারে সে চিরদিনই দুঃখ পায়। শান্তি জীবনে সুখী হতে পারবে না!

বদ্‌রি বল্‌ল—আরও আছে, তুমি ত জানো না, কীই-বা দেখেছ। আমরা ওদিকে আর ফিরেও তাকাইনে!

ওড়্‌না দিয়ে চোখ মুছে সোজা হয়ে বস্‌তেই বদ্‌রি তাকে বোঝাতে লাগ্‌ল, এ দুনিয়ার কত দিকে কত করুণ দৃশ্যই প্রতিদিন দেখা যায়। এর চেয়ে তারা আরও নিষ্ঠুর, আরও ভীষণ, আরও মর্মান্তিক!—বদ্‌রি হেসে বল্‌ল, তোমার মতন দুর্বল হ'লে দুনিয়ায় আমাদের ঠাঁই হ'ত না।

বদ্‌রি বোধ হয় আপন বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী আরও কিছু বক্তৃতা দেবার চেষ্টা কচ্ছিল, সহসা চাচাকে শান্তির পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

চাচা শান্তির হাত ধরে তুলে বল্‌লেন, এবার গাড়ী আসছে! 'কাপ্‌ড়া বদ্‌ল কর্‌ লেও জল্‌দি। সোহন সিংকো উঠায় দেও।'

শান্তি গিয়ে নিদ্রিত সোহন সিংকে একটা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে কাপড়-চোপড় নিয়ে গোসলখানায় ঢুক্‌ল। সে যে কেঁদে ফেলেছে এ জন্যে তার লজ্জার আর সীমা রইল না। ছেলেটা নিশ্চয়ই তাকে হেনস্তা করবে!

চাচা বল্‌লেন, আবার বুঝি জিনিস বিক্রী করতে এসেছিলি আমার মেয়ের কাছে?, বদ্‌মাস্‌!

বদ্‌রি বল্‌ল, গরীব আদ্‌মী, সর্দারজী, এমনি করেই ত আমার রোজগার! —এই বলে সে তার ঝাঁপি নিয়ে উঠে কিয়দ্দূর চলে গেল। চাচা যেন তাকে মনে করিয়ে দিলেন, শান্তির সঙ্গে তার অবস্থার কী তফাৎ, কতখানি সে কৃপার পাত্র!

জিনিষপত্র হাতে নিয়ে সবাই যখন আবার প্লাট্‌ফরমের ওপর বেরিয়ে এল, রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। দূর থেকে শান্তিকে দেখে বদ্‌রি অবাক্‌ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে পরিচ্ছদ বদল করেছে। পরণে তার বেগুনী মখ্‌মলের ওপর সোনালী জরির বিচিত্র কাজ-করা পায়জামা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী,

মাথায় এবার নীল রংয়ের ওড়না, পায়ে জরির জুতো। শান্তি একবার চারিদিকে তাকালো। বদ্রির দিকে তার দৃষ্টি পড়ল না, কেনই-বা পড়বে! ব্যবধান যে তার সঙ্গে অনেকখানি! বদ্রি ভাবলো, এই মহীয়সীর সঙ্গে একটু আগে তার অনধিকার ঘনিষ্ঠতার কি কোনো যুক্তি আছে? অখ্যাত নগণ্য তার জীবনে শান্তি শুধু ভিক্ষার মত দিয়ে গেল সামান্য বন্ধুত্বের যৎসামান্য গৌরব, যৎকিঞ্চিৎ সৌভাগ্য! তুচ্ছতার ক্ষুদ্রতার লজ্জা ওই মেয়েটি যে তার গায়ে লেপে দিল, এ সে লুকোবে কেমন করে? বদ্রি কাঙাল, কিন্তু নিজের স্পর্দ্ধাকে সে মার্জনা করতে পারল না, রাজকন্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখাল বালকের? এ যে মিথ্যা, এ যে অসম্ভব, এ গল্প কেউ যে বিশ্বাস করতে চাইবে না!

কাঠের সাঁকোটা পার হয়ে ধীরে ধীরে সে ওদিকে চলে গেল। ছোট লাইনের গাড়ীটা এক্ষুনি ছাড়বে। বদ্রি ঘুরতেই লাগ্‌ল, যাত্রীদের কাছে মিনতি জানিয়ে; তার খেল্‌না ও মণিহারী বিক্রি করবার আর রুচি ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিয়ৎক্ষণ পরে তার চোখের সুমুখ দিয়ে গাড়ীখানা ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল!

এক জায়গায় সে এসে বস্‌ল। মুখের ভাষা তার যেন ফুরিয়ে গেছে! তার কোনো উৎসাহ নেই; সে ক্লান্ত! এই কদর্য্য ফেরিওলাগিরি বেশীদিন সে হয়ত আর করতে পারবে না। বদ্রির মনে হল, এইখানে কিছুক্ষণ শুয়ে চোখ বুজ্‌তে পারলে সে যেন বাঁচে।

ওদিকের লাইনে ততক্ষণে ডাকগাড়ী এসে গেছে।

তিন মিনিট মাত্র দাঁড়াবে। ওঠো বদ্রি, সময় নেই! তোমার এই অকারণ অবসাদের মূল্য কি! কে বুঝ্‌বে এক পলকে কার জীবন কখন্‌ ব্যর্থ হয়ে গেল! তোমার গোয়ালা-পিতার নির্দয় শাসনকে স্মরণ করে উঠে দাঁড়াও! কে বলেছে তুমি ক্লান্ত?

বদ্রি ঝাঁপি নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি ছুট্‌ল।

কাঠের সাঁকো বেয়ে দ্রুতবেগে সে নেমে আস্‌ছিল, যাঃ—গেল তার ঝাঁপি একেবারে কাৎ হয়ে! ছড়্‌ছড়্‌ করে তার মণিহারীগুলি সিঁড়ির ওপরেই ছড়িয়ে পড়্‌ল। পিছন থেকে যারা আস্‌ছিল তারা কেউ গেল সেগুলি মাড়িয়ে, পা দিয়ে কেউ দিলে ঠিক্‌রে, কেউ দিলে গালি, কেউ বলে গেল, আহা!

একে একে সেগুলি কুড়িয়ে সে যখন সবগুলি একত্র করল তখন ঘণ্টা পড়ে গেছে। কাছিটি গলার সঙ্গে ভাল করে জড়িয়ে সে আবার নীচে নেমে এল। গাড়ীর কাছে আসতেই একজন তাকে দাঁড় করিয়ে এক প্যাকেট্ সিগারেট্ কিনল। তারপর নিল একটা দেশালাই।

—পয়সা দাও জল্‌দি, বাঙালী বাবু!

আরে দাঁড়া বেটা, একদম লাটসায়েব।—ব'লে বাবুটি প্যাকেট্ খুলে সযত্নে একটি সিগারেট বার করে দেশালাই জ্বেলে ধরিয়ে বললেন, কত?

—তেরো পয়সা!

—ভাগ্, সবাই দেয় এগারো পয়সা আর তুই...সবসুদ্ধ তিন আনা দেবো।

—বেশ তাই দাও।

বাবুটি একটা টাকা বার করলেন। বোধ হয় টাকাটি ভাঙাবার উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল। বদ্‌রিকে আবার বগ্‌লি বার করে টাকার ভাঙানি গুণে গুণে দিতে হল। একটা সিকি অচল বলে বাবুটি আবার সেটি বদ্‌লে চারিটি এক আনি নিলেন।

আবার কয়েক পা এগোতেই আর একটা লোক তাকে বাধা দিয়ে বল্‌ল, এনামেলের চাম্‌চে কত করে?

শান্তি যে তাকে ও-গাড়ী থেকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে বদ্‌রির তা দৃষ্টি এড়ায়নি। সেদিকে একবার তাকিয়ে নিঃশ্বাস রোধ করে সে বল্‌ল, দু-আনা, নেবেন?

—বেশ ট্যাক্‌সই হবে ত? ছ' পয়সা পাবি।

তখন বাঁশী বেজেছে। বাবুটির কাছে চাম্‌চেখানি রেখেই সে দৌড়লো শান্তির দিকে, পয়সা নেবার আর সময় হল না। গাড়ী তখন খুলে দিয়েছে!

কিন্তু শান্তির কাছে পৌছল সে অনেক দেরীতে। আর কিই-বা তার বল্‌বার ছিল! কাছাকাছি পৌছতেই বিব্রত এবং বিপন্ন হয়ে শান্তি হাত বাড়িয়ে কাঁচের পুতুলটি তার ঝাঁপির মধ্যে ফেলে দিল। তারপর হেসে বল্‌ল, চুরি করেছিলাম!

ঝাঁপিটা পথের ওপরেই নামিয়ে কি জানি কেন বদ্‌রি ছুট্‌তে লাগল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে—নিতান্ত শিশুর মত, অর্বাচীনের মত। শান্তি গলা বাড়িয়ে বল্‌ল—কোথা ছিলে এতক্ষণ···আহা হা, পড়ে' যাবে, থামো থামো···পাগলের মতন···

গাড়ী তখন ছুটছে। বিদেশিনী মেয়েটি জান্‌লা দিয়ে আধখানি দেহ বাড়িয়ে হেসে কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকে জানালো বিদায়-অভিবাদন! মাঝখানের ব্যবধান ততক্ষণে দীর্ঘ হয়ে গেছে!

ফিরে এসে বদ্‌রি পুতুলটির দিকে একবার তাকাল। শান্তির হাতের ঘামে সেটি তখনও আর্দ্র ও উষ্ণ। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল এটি আর সে বিক্রী করবে না, তার পাতার ঘরের বাঁকারির বাঁধুনির মধ্যে গুঁজে রেখে দেবে। কেউ যেন জান্‌তে না পারে এ পুতুলটি তার জীবনের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতার চিহ্ন!

গাড়ীটা যে-পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেইদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত সে একবার তাকাল। কিছুই দেখা গেল না; কেবল সেই পথের দুধারে বাব্‌লার ঘন জঙ্গলের সীমানায় ভোরের আকাশ একটু একটু ক'রে রাঙা হয়ে উঠ্‌ছিল।

নূতন দিবসের ফিরি করবার জন্য বদ্‌রি ঝুমঝুমিটি তুলে নিয়ে একবার বাজাবার চেষ্টা করল কিন্তু কেবল হাতই তার কাঁপ্‌ল, ঝুমঝুমিটি আর বাজ্‌ল না।



শ্রীমনোজ বসু

বন্দে মাতরম্

গ্রামের সীমানায় বিল। এখন অগ্রহায়ণ মাস, জল-কাদা নেই, যত দূর তাকাও ধানবনে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে। গহর আলির দাওয়া থেকে বিল দেখা যায়। কিন্তু সে আর কদিন বা! বড়-পুকুরের ধার দিয়ে সার-বন্দি আমের চারা পুঁতেছে, এই এবারের বর্ষাতেও আট-দশটা পুঁতেছে—চারাগুলোর নধর সবুজ শ্রী, পাল্লা দিয়ে ডাল-পালা মেলেছে, বছর কয়েকের মধ্যে সমস্ত জায়গা জুড়ে ওদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে।

ধান কাটা লেগেছে। দু'বেলাই কাজ হয়। যতক্ষণ নজরে কুলোয় গহর ক্ষেতে থাকে। উঠানে এসে দাঁড়াতেই পরী তামাক সেজে আনে। কাস্তে ফেলে গহর তখন হুঁকা নিয়ে বসে; আরও খানিক পরে হাত-পা ধুয়ে ভাত খায়। পরী ততক্ষণ মাদুর বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যে বিশ্রাম নেবে, তার উপায় আছে! মন বাজিয়ে বউ অমনই হাজির। বলে—একটা গীত গাও না, শুনি।

খঞ্জনি বাজে, গান আরম্ভ হয়। সখীসোনার বারমাসি—ঝিকরগাছার পুল-ভাঙার গান—মুগ্ধ শ্রোতটি বসে বসে শোনে। ঝিরঝিরে বাতাসে আম-চারাগুলো নড়ছে, বড়-পুকুরের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে, শীতের আমেজ লাগছে। গহর আলি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে জেগে ওঠে, বলে—বউ, অনেক রাত হল; তোর এখনও খাওয়া হয় নি—আজ এই অবধি।

পরীর নেশা লেগে গেছে, উঠতে চায় না। মৃদু হেসে বলে—ক-ঘড়ি বাজল? বারোটা—চৌদ্দটা?

—তা বাজল বই কি। এখন তুই খেতে যা।

তাচ্ছিল্যের সুরে পরী বলে—বাজুকগে। যা বাজবার বেজে যাক, তারপর ধীরে সুস্থে খেতে বসব। তুমি আর একখানা ধরো।

গহর গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবে। তারপর বলে—এই শেষ কিন্তু; এর পর আর গাইতে নেই।

বলেই গেয়ে উঠল—

সুজলাং সুফলাং মাতরম্—

মাত্র তিনটি কথা, তার বেশি জানা নেই। বিশ্রী সুর, উচ্চারণ আরও বিশ্রী। পুণ্য-নাম দেশসেবক যারা, গহরের গান শুনলে তারা ক্ষেপে যেতেন—বলতেন, জাতীয় সঙ্গীতের অপমান হচ্ছে। পরীও হেসে খুন, বলে—অং বং—কি রকম গীত হচ্ছে গো? ভাল দেখে কিছু গাও।

গহর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—হাসিস নে বউ, এ আমাদের মাটির গান। বাপজান বড়-পুকুর কেটে গিয়েছে, চাষীরা লাঙ্গল ছেড়ে ঘাটে এসে বসে, আঁজলা ভরে জল খায়—ঐ হল গিয়ে সুজলা। নতুন ধানে আমাদের বিল ঐ ভরে গেছে, এত যে আমগাছ লাগিয়েছি ওতেও কি রকম ফল ফলবে দেখিস; চাষীরা এখন শুধু জল খায়, তখন আম খাবে; এই সব কথা দিয়েই গান বেঁধেছে—সুফলা। তারপর গহর প্রশ্ন করল—আমার বীরু-ভাইকে দেখিস নি বউ, নাম শুনেছিস তো?

পরী নামটাও শোনে নি।

গহর বলল—শহরের ফাটকের মধ্যে এখন হয়তো সে ঘানি ঘুরিয়ে মরছে।

বলতে বলতে একটু উন্মনা হয়ে পড়ে। জেলের ভিতরকার ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা তার স্পষ্ট নয়। হয়তো বীরুকে তারা পেট ভরে খেতে দেয় না, এত যে লেখাপড়া শিখেছে তার কোন মর্যাদা দেয় না, হয়তো হাতে পায়ে শিকল বেঁধে রেখেছে। নিশ্বাস ফেলে গহর বলতে লাগল—বীরু-ভাই 'বন্দে মাতরম্' গাইত, আমি হাসতাম। একদিন সে মানে বুঝিয়ে দিল, আমার তাজ্জব লাগল। মাটিকে ওরা মা বলে জানে—গাছপালা, ধানবন পুকুরের জল, বাড়ি-ঘর-দোর সমস্ত মিলে ওদের মা। সেই মাকে ওরা 'বন্দে মাতরম্' বলে ডাকে।

পরী জিজ্ঞাসা করল—অমন লোকের ফাটক হল?

গহর বলল—ঐ তো মজা। আমরা চাষার ছেলে, মাটি মেখে দিন কাটে। আমার বীরু-ভাই ভদ্দর হলেও মাটির পরে দরদ আমাদের চেয়ে বেশি। সেই মানুষকে মাটি থেকে সরিয়ে ইটের পাঁচিলে আটকে রেখেছে।

গহর আলি চুপ করল। পরী রান্নায় গিয়েছে। দূরের জ্যোৎস্না-মগ্ন

বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে গহর তার বীরু-ভাইয়ের কথা ভাবতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেন মানুষের এ রকম দুর্বুদ্ধি হয়! চাকরি বাকরি করবি, ঘর-আলো-করা বউ আসবে, মায়ের হাসি মুখে ফুটবে, পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে! তা নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের দুঃখের কথা শুনে বেড়ানো, হেরিকেন জ্বেলে পাড়ার এখানে সেখানে সভা করা—

রান্নাঘরে শিকল টেনে দিয়ে পরী শুতে যাচ্ছিল। গহর বলল—কাল মা-ঠাকরুণকে দেখতে যাব। যাবি রে বউ? আমার বীরু-ভাইয়ের মা, দেখলে পুণ্যি হবে।

পরদিন মনে তাড়া রয়েছে, মা ঠাকরুণের ওখানে যেতে হবে,—দুপুর না হতেই গহর আলি ক্ষেত থেকে ফিরে এল। খাওয়া-দাওয়া সেরে পরীর হাত ধরে বলল—চল্।

চল্ বললেই অমনি যাওয়া যায় বুঝি! পরীর এখনো কত কি বাকি! কাঁসার মল সে তেঁতুল দিয়ে মাজতে বসল; কপালে কাচপোকার টিপ পরল; বিয়ের ঢাকাই শাড়িখানা ফেরতা দিয়ে পরে ঝুমঝুম করে সে আল বেয়ে গহরের পিছনে চলল।

—মাগো!

—গহর? বস বাবা, আসছি এক্ষুনি।

বয়স হয়েছে কিন্তু মা দুপুরে ঘুমোন না। কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছিলেন, সূঁচ-সুতো সাবধান করে রেখে তিনি বাইরে এলেন। পরীকে দেখেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—ওকি, ওকি! গহর বাধা দিয়ে উঠল—ওকি করছ মা?

বিস্মিত হয়ে মা প্রশ্ন করলেন—কি বলছিস, গহর? এ আমার মা-লক্ষ্মী নয়?

—হ্যাঁ মা, এদ্দিন ছোট ছিল,—আজ দিন কুড়িক একে বাড়ি নিয়ে এসেছি।

মা চটে উঠলেন—তবে যে তুই হাঁ-হাঁ করে উঠলি? আমার মাকে একটু আদর করছিলাম, তাতে তোর হিংসে হচ্ছিল বুঝি! দেখ্ দিকি, ছেলেমানুষ—কি রকম জড়সড় হয়ে গেছে!

গহর আলি অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগল—মাগো, সে কথা নয়। আমরা হলাম মোছলমান, তোমরা বামুন। এই অবেলায় ছোঁয়াছুয়ি হলে—

মা বললেন—ওঃ! গহরের আমার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, এ খবর তো জানতাম না! হাঁরে, বামুন-মোছলমান তোরা কবে থেকে হলি? তুই আর বীরু পাঠশালা থেকে কালি-ঝুলি মেখে আসতিস, মুড়ির মোয়া কাড়াকাড়ি করে খেতিস, তখন তো এ সব ছিল না। মনে পড়ে, পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে এলি,—তার উপর আমি আবার আচ্ছা করে কান টেনে দিলাম। এখন হলে বোধ হয় বলতিস,—দেখ মোছলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারটা দেখ একবার!

এ কথার জবাবে গহর আলি একটুখানি মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে—খুব মনে পড়ে মা, কান টেনে দিয়ে তারপর সমস্ত দুপুর কোলের মধ্যে রেখে হাঁটুতে মলম মালিশ করলে। সে সব দিন কি আর আসবে?

মা বলতে লাগলেন—আমার ছেলে যে এত দুঃখ সইছে, সে বুঝি মোছলমান বাদ দিয়ে কেবল বামুন-জাতের জন্যে?

এ কথায় গহরের চোখে জল এসে গেল। বলল—মাগো, দোষ হয়েছে—তোমার বীরুর মতো তো বিদ্যে শিখি নি; কথাবার্তা বলতে জানিনে। রাজপুত্র হয়ে কেন যে ওরা বনে যায়, আমি বুঝতে পারি নে। কিন্তু মা, এটা জানি—যে মাটির জন্যে ওরা মরছে সে হিন্দুর মাটি, মোছলমানেরও মাটি। ওরা মাটি দেখে, জাত দেখে না। তারপর জিজ্ঞাসা করল—বীরু-ভাই আসবে কবে, মা?

মা বললেন—আসবে তো ভাদ্র মাসে। এসে আবার কদিন থাকে, তাই দেখ!

মা কিছুতে ছাড়লেন না, বললেন,—গহর বাবা, ঐ দাওয়ার উপর পাতা পেতে তোরা দুই ভাই খেতিস, মনে আছে? কতদিন কেউ মা বলে ডাকে না, ছেলের পাতে ভাত বেড়ে কতদিন দিই নি! আজকে তোদের ছাড়ছি না, খেয়ে যেতে হবে। তোর বীরু ভাই নেই, তেমনই আমার মা-লক্ষ্মী রয়েছে। দুটো পাতাই পাতব আজও।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, চাঁদ উঠল। মা নিজের হাতে কি কি রান্না করলেন, দুজনের জায়গা পাশাপাশি করে দিলেন। পরীর তো পুরুষ মানুষের সামনে খাওয়া অভ্যাস নেই, আড়ষ্ট হয়ে হাত কোলে করে বসে থাকে। মা বললেন—ও মেয়ে, খাচ্ছিস্ না কেন? রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি! বুড়ো মানুষ—তোদের মতো কি পারি?

গহর তাড়া দিয়ে ওঠে—কেন খাচ্ছিস না? এ জিনিস বেশী জুটবে না—খেয়ে নে। যতদিন বাঁচবি, মুখে স্বাদ লেগে থাকবে।

আরও জ্যোৎস্না ফুটেছে, দিনের মত স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। মা রাঙচিতের বেড়া অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার আ'লপথে নয়, বাঁধের রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওদিক থেকে একখানা গরুর গাড়ি আসছে, তারই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছিল। খানিক পথ গিয়ে গহর কথা বলে উঠল—মা দেখলি, বউ?

পরী জবাব দিল না। গহর বলতে লাগল—শোন্ আমার বীরু ভাইয়ের গল্প। সভা ভেঙে সবাই তো হুড়মুড় করে পালাল। লাঠির পরে লাঠি পড়ছে। তেঁতুলগাছের উপর থেকে আমি চেঁচাচ্ছি—পালা ভাই, পালা। সে নড়ে না চেঁচিয়ে বলে—বন্দে মাতরম্। তারপর খানার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আর্তকণ্ঠে পরী বলে উঠল—আহা!

গহর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে—আমরাই ব্যথা পাই, তার ওসব বালাই নেই। বুকের মধ্যে এত জোর কোত্থেকে আসে জানিস, বউ?—ঐ মা রয়েছে বলে। আমার মা যদি ছোট বয়সে না মরে যেত, আমি কি সেদিন ঐ রকম পালাতাম? বীরু-ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বলতাম—

—বন্দে মাতরম্।

তারপর গহর তার জানা সেই একটা মাত্র কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারম্বার গাইতে লাগল—

সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্—

পরীর বুক ভরে উঠল। গানের মধ্যে কেবলই তার মায়ের কথা মনে হচ্ছে—কাল রাতে গহর যে মানে করেছিল, সে তার মনে ধরে না। স্নিগ্ধ সুগৌর একখানি মুখ, পরনে সাদা থান—নিরলঙ্কার, দু-চারটে চুল পেকেছে—আর তাতে অপরূপ শ্রী খুলেছে, বন্দে মাতরম্!

গরুর গাড়ী নিকটে এসে পড়ল। গাড়ি থেকে হাঁক এল—হোই গো, যার ডাইনে সেই—

গলা শুনে গহর চিনতে পারল। বলে—মুন্সিসাহেব নাকি? নবাবপুরের মক্তবে যাওয়া হচ্ছে?

মুন্সিসাহেবও চিনলেন।—গীত গাচ্ছ, গহর মিঞা? তা একটা ভাল গীত গাইলে হয়—

গহর আলি লজ্জিত হয়ে বলল—গলাটা সুবিধের নয়। তা এই রকম মাঠে ঘাটে গাই, মানুষ-জন দেখলে চুপ করি।

মুন্সিসাহেব বললেন—গলার কথা হচ্ছে না; ঐ গীতটাই যে ভাল নয়। ও হিঁদুর গান—মোছলমানের ছেলে গাইলে যে ধর্মে পতিত হবে।

গহর আলি অবাক হয়ে বলে—সে কি কথা, মুন্সিসাহেব? মা কি কেবল হিঁদুর—মোছলমানের মা নেই?

মুন্সি শ্লেষের হাসি হাসতে হাসতে বললেন—কোন মা সেটা ঠাহর করে দেখেছ, মিঞা? ও যে হিঁদুর ঠাকুরের গান, দশহাতওয়ালা—

গাড়ি এগিয়ে গেল। গহর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়। বলে কি! বিশ্বাসী সরল মানুষ—যত কাজকর্মে থাকুক, পাঁচ বার নমাজ করতে কোন দিন ভুল হয় না তার। ধর্মের হানি হবে, তার চেয়ে জীবন যাওয়াই ভাল।

পরী তার হাত ধরে টানে। বলে—ছুত্তোর, বাজে কথা।

সর্বনেশে কথা রে, বউ! তারপর গহর চিৎকার ক'রে বলে উঠল—মুন্সিসাহেব, আমি নবাবপুরে যাবো একদিন। সব কথা আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এরই প্রায় দিন-কুড়ি পরে, একদিন গঙ্গাচরণ সর্দার বেড়াতে এল। গঙ্গার বাড়ি খালের ওপার, বকডোবার আবাদে। ওরা এক গানের দল করেছে; গহর তাতে ঢোলক বাজাতে পারবে কিনা, জানতে এসেছে। গহর মহা উৎসাহে বলে—পারব, খুব পারব। কিন্তু ভাই, এই ক'টা মাস। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে আর হবে না, লাঙল নিয়ে ভুঁয়ে নামতে হবে।

বকডোবার আবাদ জুড়ে এখন নোনা জলের তরঙ্গ খেলে। আগে ধান হত, এখন জলকর হয়েছে—দিন-ভোর মাছ ধরা হয়, শেষ রাতে ডিঙা বোঝাই হয়ে শহরে চালান যায়।

গঙ্গাচরণ এক নূতন খবর দিল। বলে—শোন নি বুঝি? সে গুড়ে বালি লাঙল বেচে এবার খেপলা জাল কেনো গে যাও। তোমাদের বিলও ভাসিয়ে দেবে, শুনলাম। নীলমণি সাঁপুই সতর হাজার ডাক দিয়েছে। দেবে না! জলকরে লাভ কত!

এত বড় ভয়ানক কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। গহর অর্থহীনভাবে খানিক তাকিয়ে থাকে।—বল কি!

গঙ্গাচরণ হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে—তাতে ঘাবড়াবার কি আছে, মিঞা ? সে তো ভাল কথা। রোদে পুড়ে সমস্ত দিন লাঙল ঠেলে বেড়াতে হবে না; রাত্তিরবেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। কপালে লেগে গেল তো এক দণ্ডের মধ্যে পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজগার। তারপর দিনমানটা ঘুমিয়ে তাড়ি খেয়ে যে রকম খুশি কাটিয়ে দাও।

গহর ব্যাকুলকণ্ঠে বলে—ছিলাম চাষা, শেষকালে কি চোর হতে হবে ?

গঙ্গা বলে—কোন্ সুমুন্দি নয় শুনি ? বলি, পেটে খেতে হবে তো ! আর চোরই বল, যা-ই বল—আগের চেয়ে ভাল আছি ভাই। এখন পানে তাম্বুল-বিহার, সকালবেলা মিছরির জল—নানা রকম বেয়াড়া অভ্যেস হয়ে গেছে।

চেহারা দেখেই সুখের অবস্থা অনুমান করা যায় বটে ! এদের বাপ-দাদা বকডোবার আবাদে একদিন সোনা ফলিয়ে গেছে; এদের কাজ গভীর রাত্রে। চারিদিক একেবারে নিশুতি হয়ে যায়; দূরের আলায় টিমটিম ক'রে লণ্ঠন জ্বলে, সেই সময়ে আবছা আঁধারে বাগদিপাড়া থেকে একের পর এক প্রেতের মতো সব বেরিয়ে আসে। বাদার খোলে ঝুপঝাপ শব্দে জাল পড়ে, হয়তো আলা থেকে কোন পাহারাদার শুয়ে শুয়ে হাঁক দেয়—হোই গো—ও—ও—। ছুটাছুটি করে এরা আবার পাড়ার গহ্বরে ঢুকে পড়ে; আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

গঙ্গাচরণের খবর মিথ্যা নয়, একদিন সকল প্রজার কাছারিতে ডাক পড়ল।

নায়েব বললেন—ভুঁয়ে কেউ লাঙল দিও না, বাছারা। নীলমণি সাঁপুইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

বিশ-কুড়ি জন যেন হাহাকার করে উঠল—আমরা খাব কি, হুজুর ?

নায়েব বললেন—সে কথা বললে জমিদার শুনবে কেন, বাবা ? জমি তাঁর; তোমরা বছর বছর কেবল ঠিক চাষ করে যাও বইতো নয়! এবারে সুবিধা হয়ে গেল, সাড়ে সাত হাজার টাকা বেশি মুনাফা—তার উপর টাকাটা একসঙ্গে এসে যাবে, কোন হাঙ্গামা-হুজ্জুত নেই।

—জমিদার কেবল নিজেরটাই দেখলেন ?

নায়েব শেষ করতে দিলেন না। বলতে লাগলেন—কেন, শুধু নিজেরটা দেখবেন কেন ? তোমার ঐ নীলমণিও লাল হয়ে যাবে, এই বলে দিলাম। শহর যে রকম জেঁকে উঠেছে, মাছের দরকার খুব—মাছের সেখানে সোনার দাম।

—শহরে লোকে কি কেবল মাছই খায়? ভাত খায় না? ধান চালের তাদের দরকার নেই?

নায়েব বললেন—ধান তো কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে আসতে পারে। মাছ যে পচে যায়—

গহর আলি বলল—শহরের লোকের টাকা আছে, সোনার দামেও তারা কিনে খেতে পারে। আমরা যে ক্ষেতের তলানি খেয়ে বাঁচি। নায়েব মশায়, তোমরা নিজের আর নীলমণি সাঁপুয়ের দিকটাই দেখলে, ষাট ঘর চাষার দিকে চেয়ে দেখলে না!

খালের মুখের বাঁধ কেটে দিল। টুকরো টুকরো যত আ'ল ছিল, নোনা জলের ঢেউয়ে তাদের আর চিহ্ন রইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে গহরের দক্ষিণ ঘরের কানাচে দিনরাত জলের ধাক্কা লাগে। বড় পুকুরের কালো জল এরই মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আগে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও লোকে নৌকা করে কলসি কলসি ভরে নিয়ে যেত; এখন পরীকেই বামুনপাড়া থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। সতেজ লাবণ্যভরা ধানগাছে যে সব জায়গা আঁটা থাকত, মাছের নৌকা সেখানে খটাখট বৈঠা চালিয়ে বেড়ায়। গহর আলি বিলের ধারে বসে বসে দেখে, যখন-তখন এসে চুপটি করে বসে থাকে।

পরী হাত দু'খানি ধরে বলে—তুমি অত কি ভাব বল তো?

—যা ভাবি, সে মুখে বলবার নয়, বউ। বলতে বলতে গহর আলি গর্জন করে ওঠে—জানিস, তুই তখন আসিস নি,—এখানে পোড়ো জমি ছিল। নিজের হাতে কারকিত করেছি, জঙ্গল কেটেছি, ভূঁয়ে মাটি তুলেছি। আজ এক হুকুমে সেখানে নোনা জলের বন্যা বইয়ে দিলে। এ সব কি চোখ মেলে দেখা যায়?

পরী বলল—দেখো না, চল যাই এখান থেকে। যদি আবার কখনও এসে পড়, চোখ বুজে থেক।

—ইচ্ছে করে কি বউ, ওদের একটুখানি দেখিয়ে দিতে পারতাম!

বউ তাড়াতাড়ি গহরের মুখে হাত চাপা দিল। একটুখানি হেসে গহর বলল—দেখিস কি! আর ভাত জুটবে না, নোনা জল খেয়ে থাকতে হবে। আর এমনই কপাল, বীরু-ভাইও এ সময়টা বাইরে নেই। এত লোকের দুঃখ কখনও সে চুপ করে সইত না, উপায় একটা কিছু করতই।

যাই হোক, আপাতত অবশ্য কোন চিন্তা নেই—আলা বাঁধা হচ্ছে। এই

উঁচু টিলাটা গহরের খামার-বাড়ি, এখানে সে ধান তুলত। এখন সমান চৌরস করে টোঙের মত বড় বড় খড়ের ঘর উঠেছে। মাটি কেটে চারি পাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যা চাষীরা সব কোদাল নিয়ে বেরোয়। মাস দুই ধরে এই সব চলবে ; সে ক'টা দিন এক রকম নিশ্চিন্ত।

সন্ধ্যার সময় মাটির মাপ হয়। কারকুন গোলাম হোসেন মাপকাঠি নিয়ে মাপ করে ; পূর্ণ গায়েন থলি-ভর্তি পয়সা-সিকি-দুয়ানি নিয়ে বসে।

গোলাম হোসেন হাঁক দেয়—তিন—তিরিশ।

পূর্ণ বলে—তের পয়সা, নাও মিঞা—গুণে গেঁথে নাও।

গোলাম হাঁকে—চার—পুরো।

পূর্ণর সঙ্গে সঙ্গে হিসাব—সাড়ে চৌদ্দ পয়সা, ধর—

একুনে কার কত হল, রাস্তায় এসে সকলে হিসাব করতে করতে চলে। গহর আলি এত খাটে, তার চার কি পাঁচ আনার বেশি কোন দিন হয় না। অথচ আর সকলের কারও হয়েছে দশ আনা, কারও বারো আনা—এই রকম।

একদিন সে গোলামকে কথাটা বলল। গোলাম হি-হি করে হাসে। বলে—তুই বড্ড ন্যাকা, গহর মিঞা। পয়সা কামাই করতে হলে ইয়ের বন্দোবস্ত করতে হয়। জুড়ন মাঝি কত পার্বণি দেয়, জানিস ? সিকিতে আনা হিসাবে।

গহর বলে—বন্দোবস্ত হয় নি বলে আজ তিন হপ্তা ধরে এই রকম ফাঁকি দিয়ে আসছিস ? মাটি মাপ্—আবার দেখব।

গোলাম হাসতে হাসতে বলে—খুব—খুব। একবার কেন—হাজার বার। মনে সন্দো রাখিস নে।

সে মাপ করতে লাগল—এই এক কাঠিতে হল ছ'ফুট, আর এক কাঠি হল বারো, আর এক কাঠি পনর, আর এক কাঠি—

মাপকাঠি গোলামের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গহর মারল তার চোয়ালে এক বাড়ি। আর্তনাদ করে গোলাম মাটিতে বসে পড়ল। বিশকুড়ি জন আলার দিক থেকে ছুটে এল, গহরকে এসে চেপে ধরল ; কেউ ধরল হাত, কেউ কান, কেউ চুলের মুঠি···

প্রহরখানেক রাত্রে গহর ক্লান্ত দেহে বাড়ী এল। পরী কাঁদো-কাঁদো গলায় জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে ?

—কিছু না, তুই তামাক সাজ।

পরী বলল—হুঁ, সাজতে যাচ্ছি—বয়ে গেছে আমার! কাঁদতে কাঁদতে সে তেলের বাটি নিয়ে এল। পিঠের উপর মুখের উপর দড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠেছে, পরী তেল মালিশ করতে লাগল। এক পশলা বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে গহরের চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নেমে এল; কি মনে হল—চোখের জলের মধ্যে অতি অস্পষ্ট কণ্ঠে বারম্বার সে বলতে লাগল—মা, মা, বন্দে মাতরম্—

গভীর রাতে গহর টিপিটিপি বেরুচ্ছে। পরীর সজাগ ঘুম, সভয়ে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় যাও গো?

গহর ফিসফিস করে বলে—বকডোবার আবাদে, একটা খেপলা জালের খোঁজে গো। আজ ওরা পিঠেই দিয়েছে, পেটের তো কিছু দেয় নি। কাল যে নিরম্বু উপোস, তা ঠাহর করছিস?

বাগদিপাড়ায় গিয়ে গহর প্রথমেই গঙ্গাচরণের দাওয়ায় উঠল।

গঙ্গাচরণ শুনে লাফিয়ে উঠল—বল কি, মিঞা? আট ঝুড়ি মাছ মজুত রয়েছে, আর বেটারা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে? পেটে জুত থাকলে ঘুম আসে ঐ রকম! চল—চল, খাসা হবে—আমাদের যাত্রাদলের সাজের টাকাটা হয়ে যাবে এইবার।

খাল পেরিয়ে ছায়ামূর্তিরা চলেছে টিপিটিপি, অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে কেউ নেই। আলার উপর তীব্র একটা আলো জ্বলছে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বাগদিরা বিলের খোলে নেমে দাঁড়াল। মাছের ঝুড়ি রয়েছে বটে! কিন্তু সকলেই যে ঘুমিয়ে আছে তা নয়, ঝুড়িগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে জন দুই লোক পাহারা দিচ্ছে।

গহর ফিসফিস করে বলল—দেশলাই আছে রে?

গঙ্গা বলিল—উহুঁ, এখন কি বিড়ি ধরাবার সময়?

গহর বলল—বিড়ি নয় রে, আলায় আগুন ধরালে কেমন হয়? ঐ জায়গাটায় আমি ধান তুলতাম এখন ওরা ঘর তুলেছে।

যুক্তিটা সকলে অনুমোদন করল। সবাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত থাকবে, মাছ নিয়ে সেই ফাঁকে সরে পড়বার সুবিধা হবে।

দাউ-দাউ করে আলা জ্বলে উঠল। ঐ অত রাত্রে বিলের মধ্যে তখনও মাছ ধরা হচ্ছিল। আগুন দেখে আর চীৎকার শুনে যে যেখানে পারল,

নৌকা রেখে বাঁধ ধরে ছুটল। নূতন জলকর হয়েছে, চাষীরা সব ক্ষেপে আছে, কখন কি করে বসে বলা যায় না,—জেলেদের সকলের সঙ্গে তাই সড়কি রাখবার হুকুম আছে। সকালবেলা শোনা গেল, আলায় মাছ লুঠ করতে এসেছিল, সুবিধা করতে পারে নি, তিন-চারজন ধরা পড়েছে, আর তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে গহর মিঞা।

সেই রাত্রেই গহরকে শহরের হাঁসপাতালে পাঠান হল। সেখান থেকে আদালতে। একদিন হাজতের মধ্যে চুপি চুপি সে পরীকে বলল—তোর জন্য ভাবিনে বউ,—ইচ্ছে হয় বাপের বাড়ী যাস, না হয় মা ঠাকরুণের ওখানে গিয়ে থাকিস। বীরু ভাই ভাদ্র মাসে বেরিয়ে আসছে, তবে আর কি! কিন্তু আমার দুঃখ, সমস্ত কথা শুনে ভাই আমার বলবে কি! চোর-ডাকাতকে ওরা ঘেন্না করে। ওরা ফাটকে যায় ফুলের মালা প'রে, আর আমি চললাম ডাকাতি ক'রে। এখন সেখানে দেখা না হলে বাঁচি। কি করে তার মুখের দিকে তাকাব!

গহর আলির দু-বছর জেল হয়ে গেল।

বছর দুই পরে এক সকালে বীরনারায়ণ জেলের গেটের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। গহর বেরিয়ে এল। বীরু বলে—আমায় চিনতে পার গহর-ভাই?

—পারি বই কি ভাই? এত বড় হয়েও আমাদের সকলের জন্য তোমার কত দুঃখ! চিনব না? বন্দে মাতরম্—

বীরু প্রতিধ্বনি করল—বন্দে মাতরম্। আরও অন্য কয়েক লোক সেখানে ছিল, নানা দরকারে তারা জেলের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও হেঁকে উঠল—বন্দে মাতরম্।

রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায়। একজন বলে—কোন্ স্বদেশি বাবু বেরুল বুঝি? থাম, একটুখানি দেখে যাই।

তাদেরই পাশ দিয়ে গহরের হাত ধরে বীরনারায়ণ গরুর গাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বলল—হ্যাঁ ভাই, বড় স্বদেশি আমাদের গহর আলি। কিন্তু বাবু নয়—মজুর। দু'বছর পরে এই বেরুচ্ছে। বল ভাই, বন্দে মাতরম্।

গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে অসমান মেঠো পথে চলেছে। গহর ছলছল চোখে বলল—মিছে কথা কেন বললে, বীরু-ভাই?

বীরু বলল—কোন্‌টা মিছে?

—এই যেমন আমি স্বদেশী করে ফাটক গিয়েছি। আমি তো ভাই, আলা লুট করেছিলাম।

বীরনারায়ণ বলল—ও তো একটা ছুতো। আসলে, তোমার প্রাণ কাঁদছিল। সুজলা সুফলা আমাদের গাঁয়ের ঐ দশা তুমি দেখতে পারছিলে না। বড় পুকুরে নোনা জল উঠেছে, ধান বন খাঁ-খাঁ করছে, একি তোমার সহ্য হয়? আলা লুঠ করে, যা হোক করে তোমার প্রাণ কোথাও আড়ালে গিয়ে জিরোতে চাচ্ছিল, আমি কি বুঝি নে ভাই?

একটুখানি চুপ করে থেকে গহর বলল—কিন্তু এ তো একেবারে আমাদের নিজেদের ব্যাপার। এতে কি স্বদেশী হ'ল?

বীরু বলল—স্বদেশ কি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে? দেশের মানুষ দাবি বুঝে নিতে পারে না বলেই ত দু-চার জনের কাঁধে বোঝাটা বেশি হয়ে চাপে।

পাশাপাশি তারা চুপ করে রইল। গাড়ি খালের ধারে ধারে চলেছে। গহর হঠাৎ বীরুর হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরল। বলল—গাঁয়ে তো ফিরছি, একটা কথা বল, ভাই—এদ্দিনে আপদ চুকে গেছে তো? নীলমণি সাঁপুই বিদায় হয়েছে? আবার ধান হচ্ছে? ছেলেমেয়েরা বড় পুকুরে চান করতে আসে তেমনি করে? আমার আম-চারায় এবার আম হয়েছিল? তুমি যখন ফিরে এসেছ, সমস্ত আবার ঠিক হয়ে গেছে—নয়?

বীরনারায়ণ ম্লান দৃষ্টিতে গহরের চোখের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল। বলল—হয়ে গেছে বই কি, ভাই। তুমি ভেব না, সব ঠিক আছে।

গরুর গাড়ি বাড়ির সামনে আসতেই অনেকে এসে দাঁড়াল। ভিড় সরিয়ে বীরু হাত ধরে তাকে দাওয়ায় নিয়ে বসাল। গহর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে—বীরু-ভাই, মা এসেছেন তো? তারপর জোর গলায় হাঁক দেয়—ও মা মাগো, দুটো মুড়ি দেবে না? কতদিন খাই নি তোমার হাতে! আমার বীরু ভাই আছে—দু'জনে কাড়াকাড়ি করে খাব।

মৃদু পায়ে পরী এসে দাঁড়াল। যত পালিয়ে অসুক, গহর তা টের পায়। হাসতে হাসতে বলল—কেমন আছিস বউ?

পরীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল; কথা বলতে পারে না—ভয় হয়, বুঝি বা কেঁদে ফেলবে। তারপর বলল—তুমি কেমন ছিলে গো?

—ভাল। তবে কষ্ট হত খুব—চারিদিকে ইট আর ইট! আহা-হাঁ, আজ চোখ জুড়োচ্ছে। আমরা হলাম চাষীর ছেলে, ধানবন না দেখলে বাঁচি?

পরী চমকে উঠল। ও কি পাগল হয়ে গেছে। বলল—কি দেখছ ?

—ধানবন কি রকম মিশ্ কালো হয়েছে, দেখ্! কত গাছপালা! আমার আমচারাগুলো কত বড় হয়েছে রে ? এবার আম হয়েছিল ?

পরী ভাল করে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। তার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হল। হায় রে, নোনা জলের তুফান লেগে গহরের নিজের হাতে পোতা আমচারাগুলো যে কোন্ কালে মরে গেছে ?

গহর বলল—কি ভাবিস রে বউ ? আমার কথার জবাব দিলিনে ?

পরী ধরা গলায় বলল—অনেক আম হয়েছিল, আমসত্ত্ব করে রেখেছি—তুমি খেয়ো।

—আর, বড় পুকুরের জল মিঠে হয়েছে তো রে ? খেতে নোনা লাগে না ? আমার জন্যে এক ঘটি নিয়ে আয় দিকি!

আচ্ছা—বলে বউ ছুটে পালাল।

গহর তখন বলছে—ও বউ, বলি সেই গীতটা মনে আছে—সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্ ? এখন ভাল লাগে ? তার মানে বুঝিস ?

পরী তখন ও-ঘরের মেজেয় পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মার কাছে গিয়ে বলে—মাগো, ও অন্ধ হয়ে গেছে।

মা বললেন—সে তো অনেক আগেই শুনেছি, মা। তাই শুনে বীরু ওকে জেলে দেখতে গিয়েছিল। তুই দুঃখ পাবি বলে তোকে জানায় নি। সেই যে সড়কির খোঁচা লেগেছিল, তারপর ক্রমেই খারাপ হয়ে গেল। কাঁদিস না বেটি, ও এই বাড়ি-ঘরদোর বড় ভালবাসত কি না, তাই তাদের এ দশা ভগবান ওকে আর দেখতে দিলেন না।

বীরু বলল—মা, অন্ধ হয়ে গেছে গহর ভাই, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে। ও দেখছে—বড় পুকুরে কাকের চোখের মত জল, বিল-ভরা সবুজ ধান, গাছে গাছে ফুল, মানুষের মুখে চোখে হাসি, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের মা। আমাদের চেয়ে ও ভালই দেখছে। আসতে আসতে গহর বাড়িতে সেই সব কত গল্প করল! মাগো, ভাগ্যবান আমার গহর ভাই—আমরা সব মরে আছি যে, যদি বেঁচে থাকতাম, সবাই ঐ রকম অন্ধ হতে চাইতাম।

বেলা পড়ে এল। কাজকর্মের পর বাড়ি ফিরবার মুখে অনেকে গহরের উঠানে এসে বসেছে। নবাবপুরের মুন্সিসাহেব গহরকে খুব ভালবাসতেন, খবর পেয়ে তিনিও এসেছেন। আসতেই তর্ক সুরু হয়েছে। তিনি বলছেন—

বেশ তো, বন্দে মাতরম্ বললে আমরা যখন চটে যাচ্ছি—জেদাজেদি কি দরকার? আর একটা নতুন কিছু গাইলেই তো হয়! অবশ্য দেবতা-টেবতা সব বাজে— দশভুজাকে কখন সুজলা বলে না, সে সবাই বোঝে। কিন্তু আর কিছু না হোক—এই গান যিনি লিখেছেন, আমাদের জাতকে তিনি গালি দিয়েছেন, এটা তো মানতে হবে!

বীরনারায়ণ উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না…

শান্তকণ্ঠে বললেন—সে তর্কের দরকার কি বাবা? আমরা তো কেউ বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ গাই না।

—বঙ্কিমের গান নয়?

মা বলতে লাগলেন—না, মুন্সিসাহেব। আনন্দমঠের সন্তানেরা বইয়ের পাতায় আছে, আমার এই সন্তানেরা রক্তে মাংসে চোখের সামনে বেড়াচ্ছে। এদের গান ভোলবার জো নেই। এই বন্দে মাতরম্ আমার বীরুর রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে, এই গান আমার অন্ধ গহরের চোখের জলে ভিজে গেছে। সত্যি যদি গানের জন্মগত দোষ কিছু থাকে, চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে তাতে আর এক কণিকাও ময়লা নেই! আর একটা নতুন কিছু গাইবার প্রস্তাব করছিলেন, তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে কে? রাজি আছেন আপনারা?

গহর রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠল—তুমি বলবে বই কি, মুন্সিসাহেব! তুমি থাক নবাবপুরে—সেখানে ধান বনে নোনা জলের তুফান বয় না, চোখ মেলে উঠানের উপর মরা আমচারাও দেখতে হয় না। তোমরা সুখের মানুষ—মাকে চিনবে কি করে! তুমি বাড়ী যাও মুন্সিসাহেব, আমরা এখন বন্দে মাতরম্ গাইব।

সুরহীন কণ্ঠে বন্দে মাতরমের একটি কলি গাইতে গাইতে গহর আলির চোখ ভরে গেল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নাস্তিক

পুত্রের নামকরণের সময় উমাশঙ্করের পিতা এ কথা স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, যে-পুত্রের নামের মধ্যে তিনি একাধিক দেবতার নাম অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, কালক্রমে সে, সকল প্রকার দৈবপ্রভাব অতিক্রম করিয়া, নাস্তিক হইয়া উঠিবে। যে বয়সে সাধারণত মানুষের ধর্মলক্ষণ প্রকট হয় না, উমাশঙ্করের সেই বাল্যকালে তাহার পিতা পরলোক গমন করিয়া একটা কঠোর আঘাতের হাত হইতে বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু জীবনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে যাইবার অপরাধে জননী সারদেশ্বরীকে একদিন সে শাস্তি ভোগ করিতে হইল।

উমাশঙ্কর তখন কলেজে এম-এ পাঠ-কালে কয়েকজন সহপাঠী এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া 'নিরীশ্বর সঙ্ঘ' খুলিয়া একান্ত মনে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর বিষয়ক গবেষণায় রত হইয়াছে। ঈশ্বর নাই, অন্ততঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোনো প্রমাণ নাই, সমস্ত ঈশ্বরবাদ মানুষের দুর্বল চিত্তের সংশয়, অথবা কৌশলী চিত্তের কল্পনার উপর স্থাপিত, এইরূপ একটা ধারণা যখন তাহার মনের মধ্যে শিকড় গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন একদিন সে তাহার পারিবারিক সংসারকেও 'নিরীশ্বর সঙ্ঘের' এলাকাভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইল।

দৈনন্দিন নারায়ণ পূজা শেষ করিয়া কুলপুরোহিত প্রস্থান করিবার পর আহ্নিক এবং পূজা সমাপন করিয়া সারদেশ্বরী সবেমাত্র জলযোগ সারিয়াছেন,—এমন সময়ে উমাশঙ্কর আসিয়া বলিল, "মা, মিথ্যার পেছনে অনেক অর্থ আর সময়ের অপব্যয় হয়েছে,—এবার বন্ধ করা যাক।"

বিস্মিত নেত্রে উমাশঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সারদেশ্বরী বলিলেন, "তোর কথা আমি বুঝতে পারছিনে, উমা! কিসে অপব্যয় হ'ল?"

উমাশঙ্কর বলিল, "দেবসেবায়, তোমাদের নারায়ণ সেবায়! নারায়ণই যখন নেই, তখন নারায়ণের একটা পাথুরে প্রতিনিধির উপর সময় আর অর্থ নষ্ট ক'রে কি লাভ হবে, মা?"

কথা-বার্তা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া পুত্রের মতিগতির কিঞ্চিৎ পরিচয় সারদেশ্বরী পূর্বে পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যে এতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মনে করিতে পারেন নাই। মনে মনে 'নারায়ণ নারায়ণ' স্মরণ করিয়া আহত স্বরে বলিলেন, "এ কি কথা বলছিস্ তুই, উমা! তুই ঈশ্বর মানিসনে? ধর্ম মানিস নে?"

মৃদু হাসিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "মানব না কেন মা, মানি। কিন্তু আমার ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর নয়, আমার ধর্মও তোমাদের ধর্ম নয়। আমার ঈশ্বর হচ্ছেন ন্যায়, আর আমার ধর্ম হচ্ছে নীতি। আমার ঈশ্বরের আসন হচ্ছে আমার বুদ্ধি,আর আমার ধর্মের আশ্রয় হচ্ছে আমার জীবন।"

পুত্রের কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সারদেশ্বরী বলিলেন, "তুই কি বলতে চাস, ন্যায় আর নীতি শুধু তোরই আছে, আমাদের নেই?"

উমাশঙ্কর বলিল, "থাকবে না কেন মা, তোমাদেরও আছে; তবে তোমাদের ন্যায় আর নীতির অনেকখানি অংশই বন্দী হ'য়ে আছে তোমাদের তেত্রিশ কোটি পাষাণ দেবতার কারাগারে। কিন্তু সে কথা যাক। তুমি যদি অনুমতি কর, তাহ'লে নারায়ণকে বিসর্জন দিয়ে আসি তোমাদের মা গঙ্গার গর্ভে।"

উমাশঙ্করের প্রস্তাব শুনিয়া একটা গভীর বেদনায় সারদেশ্বরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "আমার আপত্তি নেই উমা, তুই যদি নারায়ণের সঙ্গে আমাকেও বিসর্জন দিয়ে আসিস্। কিন্তু 'তোমাদের মা গঙ্গার গর্ভে' বলছিস কেন? তোরও কি মা গঙ্গা নয়?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া উমাশঙ্কর বলিল, "নিশ্চয়ই নয়। গঙ্গাও আমার মা গঙ্গা নয়, গাভীও আমার মা গাভী নয়। আমার একটি মাত্র মা হচ্ছেন মা জননী, যাঁর স্নেহের নীরে ডুব দিয়ে আমি বারে বারে পবিত্র হই। গাভী আমার কাছে চতুষ্পদ জন্তু, আর গঙ্গা সুবৃহৎ নদী" বলিয়া উমাশঙ্কর হাসিতে লাগিল।

যাহা হউক, জননীর অভিমানের খাতিরে এবং স্ত্রী মন্দাকিনীর ওকালতির জোরে সে যাত্রায় নারায়ণ গঙ্গাযাত্রা হইতে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

গুরুর নিকট সদুপদেশ পাইলে হয়ত উমাশঙ্করের মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস এব

ধর্মভাব জাগ্রত হইতে পারে, এই বিশ্বাসে কিছুকাল পরে সারদেশ্বরী কুলগুরু অমরনাথ বিদ্যাভূষণের শরণাপন্ন হইলেন।

অমরনাথ আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ হচ্ছে ইংরাজি শিক্ষার কুফল। আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করিবার অভিপ্রায়ে উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অমরনাথ বলিলেন, "সময় হয়েছে তোমার; তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর, উমাশঙ্কর।"

অমরনাথের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "কিসের দীক্ষা ?

অমরনাথ বলিলেন, "গুরু মন্ত্রের।"

উমাশঙ্কর বলিল, "ও! কিন্তু গুরুমন্ত্র দেবে কে ?

প্রশ্নের ভঙ্গি শুনিয়া 'আমি দোব' বলিতে অমরনাথের ঠিক সাহস হইল না। বলিলেন, "কেন, গুরু দেবেন।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "আপত্তি নেই, যদি সত্যি সত্যিই তিনি গুরু হন,—অর্থাৎ যদি তাঁর তুলনায় আমি লঘু ব'লে প্রমানিত হই।"

উমাশঙ্করের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন, "তুমি কি নিজেকে এতই গুরু বলে বিবেচনা কর, উমাশঙ্কর ?"

উমাশঙ্কর বলিল, "আজ্ঞে না,—আমি নিজেকে এত লঘু ব'লে বিবেচনা করিনে, যাতে বিনা প্রমাণে কাউকে গুরু ব'লে স্বীকার করতে পারি।"

"কি প্রমাণ তুমি চাও ?"

"ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণ। আপনি হয়ত জানেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। যিনি আমার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন, তাঁকে আমি গুরু ব'লে গ্রহণ করব।"

"তুমি কি ইয়োরোপীয় নিরীশ্বরবাদের সাহায্যে তর্ক করবে ?"

"আজ্ঞে না, আমি ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের মধ্য দিয়েই বিচার কামনা করি।"

তখন আরম্ভ হইল প্রশ্নের পর উত্তর, উত্তরের পর প্রত্যুত্তর, বিচারের পর তর্ক এবং তর্কের পর বিতর্ক, ন্যায় এবং বৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জল লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চলিল; কিন্তু সেই তর্কের ধূলিজালের মধ্যে দিকভ্রান্ত

হইয়া কোনো দিকেই অমরনাথ ঈশ্বরকে খাড়া করিবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রমাণের অভাবে দিকে দিকে ঈশ্বর অসিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উমাশঙ্করের যুক্তিজালে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে অমরনাথ বলিলেন, "তুমি কুট তার্কিক। তোমাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তোমার কুলগুরু, আমার ক্ষেত্রে যাচাই করবার প্রয়োজন নেই, উমাশঙ্কর। আমার কাছে তুমি দীক্ষা নাও,—তোমার মঙ্গল হবে।"

যুক্তকরে উমাশঙ্কর বলিল, "ক্ষমা করবেন আমাকে। বিনা যাচাইয়ে ভগবানকে যে গ্রহণ করেনি, সে পাষণ্ড বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করবে এমন ভরসা আপনাকে আমি দিতে পারিনি।"

মনে মনে কয়েকবার উমাশঙ্করকে পাষণ্ড বলিয়া গালি দিয়া সারদেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হইয়া অমরনাথ বলিলেন, "তোমার ছেলের ব্যাধি কঠিন। আজ আমি কিছু ওষুধ দিয়ে গেলাম। কিছুকাল পরে আবার আসব।"

অন্তরালে থাকিয়া সারদেশ্বরী সব কিছুই শুনিয়াছিলেন এবং কাহার ঔষধ কে পান করিয়াছিল, তাহাও কতকটা বুঝিয়াছিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "আসবেন।"

কিন্তু গুরু আসিবার পূর্বেই সারদেশ্বরীর নিকট পরলোকের ডাক আসিয়া পৌঁছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্বে পুত্রবধূর কাণে কাণে তিনি বলিলেন, "আমি ত' চললাম বউমা, কিন্তু অনেক দুঃখে কষ্টে তোমার সংসারের মধ্যে কল্যাণের যে ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বলিয়ে রেখে গেলাম, তুমি তাতে সাধ্যমত তেল-সলতে জুগিয়ো।"

মন্দাকিনীর কণ্ঠ তখন বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়াছিল, কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

২

বৎসর ছয়েক পরের কথা। এম,এ এবং আইন পাশ করিয়া উমাশঙ্কর তখন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে। নিরীশ্বর সঙ্ঘের কোনো চিহ্নই আর কোথাও দেখা যায় না এবং উমাশঙ্কর ব্যতীত সে সঙ্ঘের অপর সকল সদস্য নিরীশ্বরবাদের সাময়িক সঙ্ঘ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রসন্নচিত্তে ঈশ্বরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছে।

উমাশঙ্কর কিন্তু ইত্যবসরে তাহার মত পরিবর্তিত করিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। পরন্তু সমধিক অধ্যয়ন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা পুষ্টতর হইয়া সে মত এমন একটা সহজ এবং শান্তরূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা প্রতিপক্ষকে তত ক্ষুব্ধ করেনা, যত চিন্তিত করে। এই প্রতিপক্ষের মধ্যে আবার এমন এক ব্যক্তি আছে, যে উমাশঙ্করের বলিষ্ঠ মতবাদকে বাহিরে আক্রমণ করে যে পরিমাণে, ভিতরে ঠিক সেই পরিমাণই অশ্রদ্ধা করে না। সে তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী।

এ কথা মন্দাকিনীর দিদি আমোদিনী একদিন বেড়াইতে আসিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, যখন উমাশঙ্করের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্দাকিনী বলিয়াছিল, "না দিদি, ওঁর জন্যে সংসারের আবহাওয়া ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠবে,—এ ভয় তুমি একেবারেই কোরো না। ওঁর অবিশ্বাস কি সাধারণ বাজে লোকের অবিশ্বাস যে তার ফল মন্দ হবে? আমার ত' মনে হয় ভগবান ওঁর যুক্তি বিচার দেখে যতটা প্রসন্ন হন, অনেকের ফুলচন্দনেও ততটা হন না। মতের জোর ওঁর যত বেশি, জুলুম ওঁর তত কম। তাই এতবড় নাস্তিকের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো থেকে আরম্ভ ক'রে চাপড়া ষষ্ঠি পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে না।"

মন্দাকিনীর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আমোদিনী বলিয়াছিল, "তা হ'লে আমি আর মিথ্যে ভয় করছিলাম কোথায়, মন্দা? উমাশঙ্করের মতের ওপর যে রকম তোর ভক্তি দেখছি, তাতে তো ওর দলে তুই যোগ দিলি ব'লে।"

উত্তরে মন্দাকিনী বলিয়াছিল, "ক্ষেপেছ দিদি! আমি চলি বিশ্বাসের সহজ পথে, উনি চলেন জ্ঞানের কঠিন পথে;—আমার সাধ্য কি যে, ওঁর দলে যোগ দিই।"

আমোদিনী বলিয়াছিল, "সে তোদের কথা তোরা বুঝবি, কিন্তু আমাদের একটু লজ্জা করে ভাই। দুর্গাপুজোর সময়ে নিমন্ত্রণে গিয়ে উমাশঙ্কর প্রতিমার সামনে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু একবার মাথা হেঁট করলে না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু অসুরের মুখভঙ্গির সুখ্যাতি করতেই লাগল। ও চ'লে আসার পর শ্বশুর আমাকে বললেন, সেজ বউমা, তোমার ভগ্নীপতিটি দেখছি দ্বিতীয় চার্বাক মুণি।"

ইহার উত্তরে মন্দাকিনী বলিয়াছিল, "তোমাদের যদি লজ্জা করে তা হ'লে

পুজো-পার্বণের সময়ে ওঁকে না হয় আর নিমন্ত্রণ কোরো না ;—কিন্তু তোমার শ্বশুর ওঁকে চার্বাক মুনি বলেছেন শুনলে উনি খুসিই হবেন, চার্বাক মুণির ওপর ওঁর শ্রদ্ধার অন্ত নেই।"

৩

হাইকোর্টের দীর্ঘ ছুটি চলিয়াছে। অফিস ঘরে বসিয়া উমাশঙ্কর একটা ফাষ্ট আপিলের ব্রিফ দেখিতেছিল, মন্দাকিনী আসিয়া বলিল, "বাসি কাপড় নয় ত?

সহাস্যমুখে উমাশঙ্কর বলিল, "না না বাসি কাপড় নয়। নাস্তিক স্বামীকে নিয়ে তুমি যে সর্বদা সিঁটিয়েই আছ, মন্দা!

সে কথার উত্তর না দিয়া মন্দাকিনী বলিল, "নাও, হাঁ কর।"

বিনা অনুসন্ধানে এবং বিনা প্রতিবাদে হাঁ করিয়া মন্দাকিনীর হস্তবিচ্যুত দ্রব্য গ্রহণ এবং গলাধঃকরণ করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "মন্দ লাগল না। কিন্তু এটি কোন পদার্থ?"

"ইতু পুজোর প্রসাদ।"

"ইতু পুজোর? ইতুও একজন দেবতা নাকি?

"হ্যাঁ, জাগ্রত দেবতা।"

উমাশঙ্কর বলিল, "তোমাদের তেত্রিশ কোটিই ত' ঘুমন্ত দেবতা; ইতু কি তা হ'লে তেত্রিশ কোটির বাইরে?"

চক্ষে ভ্রুকুটির শাসন হানিয়া মন্দাকিনী বলিল, "সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।"

উমাশঙ্কর বলিল, "আচ্ছা, তা না হয় না-ই করলাম, কিন্তু মাকে নিয়ে তবু পার ছিল, তুমি যে মাকেও হার মানালে, মন্দা। আজ মঙ্গলবার কাল তালনবমী, পরশু শীতল ষষ্ঠী, তারপর দিন ইতুপুজো,—কি ব্যাপার বল দেখি?

স্মিতমুখে মন্দাকিনী বলিল, "কি করি বলো? সংসারের দাঁড়িপাল্লায় তুমি আছ একদিকে, আমি আছি আর একদিকে। এখন তুমি যদি তোমার দিকে অবিরত বাটখারা চাপাতে আরম্ভ কর, তা হ'লে আমাকেও ত তেত্রিশ কোটি থেকে একটি একটি ক'রে আমার দিকে চড়িয়ে পাল্লা সমান রাখতে হয়। আমার দিকটা বেশী হাল্কা হয়ে গেলে তুমি যে একেবারে মাটিতে ঠেকবে!"

সহাস্যমুখে উমাশঙ্কর বলিল, "মাটিকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু স্বর্গকে

রিনে! দোহাই মন্দা, তোমার তেত্রিশ কোটি দেবতাকে পাল্লায় চড়িয়ে আমাকে স্বর্গে ঠেলে তুলোনা,—সেখানে, তোমাদের ভগবানের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় আছে!"

মন্দাকিনী বলিল, "মাটিতেই ভগবানের সঙ্গে তোমার দেখা হবে।" তাহার পর সহসা আমোদিনীর কথা মনে পড়িয়া গিয়া উৎফুল্ল মুখে বলিল, কাল দিদি এসেছিলেন। কি বলছিলেন জান?"

"কি বলছিলেন।"

"বলছিলেন, দিন দিন তুমি যে রকম প্রবল নাস্তিক হয়ে উঠছ, একদিন ভগবানই তোমাকে এসে দেখা দেবেন।" বলিয়া মন্দাকিনী হাসিতে লাগিল!

উমাশঙ্কর বলিল, "বেশ ত, তোমার দিদির বাড়িতে ভগবানের সর্বদা যাতায়াত আছে, একদিন পাঠিয়ে দিতে বলো, কোলাকুলি করা যাবে।"

দিন দুয়েক পরে উমাশঙ্কর সেই ফার্ষ্ট আপিলের ব্রিফটা লইয়া তাহার অফিস ঘরে বসিয়াছে। কোর্ট খুলিলে মকদ্দমাটা প্রথম সপ্তাহেই উঠিবার সম্ভাবনা।

নিম্ন আদালতের রায়ের সুবিধার এবং অসুবিধার অংশগুলা সে লাল নীল পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিতেছিল, এমন সময়ে একটি গৌরবর্ণ বৃদ্ধ আসিয়া বলিল, "জয় হোক বাবা!"

ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "কে আপনি?"

"আমি ভগবান।"

"ভগবান? ভগবান, কি?"

বিস্মিত নেত্রে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভগবান কি'র মানে?"

উমাশঙ্কর বলিল, "অর্থাৎ, ভগবান দাস, ঘোষ, চাটুজ্যে, না কারফরমা তাই জানতে চাচ্ছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভগবান কারফরমা নই; আমি শুধু ভগবান।"

"নিবাস কোথায়?"

"গোলকে।"

"কোন জেলা?"

"জেলা অমরাবতী।"

"বুঝেছি ; বেরার। কিন্তু আমাদের হাইকোর্টের ত' বেরারের আদালতের উপর জুরিস্‌ডিক্সন্ নেই। কি মকদ্দমা আপনার? দেওয়ানি, না ফৌজদারি?"

উমাশঙ্করের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে হাসি দেখা দিল ; বলিলেন, "আমি তোমার মক্কেল নই উমাশঙ্কর ; আমি ভগবান, ঈশ্বর, আদিনাথ, প্রণব!"

এবার উমাশঙ্করের মুখেও মৃদু হাস্য দেখা দিল ; বলিল, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা?"

"হ্যাঁ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা।"

ইহা আর কিছুই নহে শ্যালিকা আমোদিনীর পরিহাস কাণ্ড, একজন বৃদ্ধ আত্মীয়কে সাজাইয়া গুছাইয়া ভগবান করিয়া পাঠাইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া উমাশঙ্কর বিশেষ কৌতুক অনুভব করিল। একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "বস্‌তে আজ্ঞা হোক।" ব্রাহ্মণ উপবেশন করিলে বলিল, "আপনি যখন আদিনাথ, প্রণব—তখন ত আপনি সর্বজ্ঞ। তা খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত একজন নাস্তিকের গৃহে দেখা দিলেন কেন প্রভু?"

ভগবান বলিলেন, "আমি তোমাকে দীক্ষিত করতে এসেছি, উমাশঙ্কর।"

"কিসে দীক্ষিত করতে এসেছেন?"

"ঈশ্বর মন্ত্রে।"

"কপিল দর্শন পড়া আছে প্রভুর?"

"আছে।"

"কপিল ত প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ করেছেন।"

"সেই অপরাধে কপিলকে আমি সিদ্ধ করেছি।"

"কি করে সিদ্ধ করেছেন জানতে পারি কি?"

"ফুটন্ত জলে ফেলে।"

উমাশঙ্কর বলিল, "আমিও আপনাকে ফুটন্ত জলে ফেলব ; যদি সিদ্ধ হন তা হলে বুঝব আপনি ভগবান কারফরমা, আর যদি অসিদ্ধ হন তাহলে বুঝব আপনি দেবাদিদেব মহাদেব। ফুটন্ত জলে সময় লাগবে, আপাতত একটা সামান্য প্রমাণ গ্রহণ করি। জানেন ত বিনা প্রমাণে আপনাকে আমি ঈশ্বর বলে স্বীকার করব না।"

"কি প্রমাণ গ্রহণ করবে বল?"

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া উমাশঙ্কর

বলিল, "এই শিখার মধ্যে আপনার একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিন, তারপর কি প্রমাণ চাই তা নিজেই বুঝতে পারবেন।"

ভগবানের মুখে পুনরায় হাস্য দেখা দিল; বলিলেন, "তুমি এত অল্পে সন্তুষ্ট হবে উমাশঙ্কর? তোমার ঐ অগ্নি শিখায় আমি আঙুল দিলে ও শিখা ত তখনি জল হ'য়ে ঝরে পড়তে থাকবে।"

ভগবানের বাক্য এবং কার্য্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য রহিল না,—অগ্নি শিখায় অঙ্গুলি স্থাপন মাত্র সেই শিখা আকারে শত গুণ হইয়া জলরূপে ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল।

বিস্মিত, চকিত, বাক্‌শক্তি রহিত উমাশঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবান বলিলেন, "একটা ভাল প্রমাণ দেখতে চাও উমা?"

স্খলিত কণ্ঠে উমাশঙ্কর বলিল, "কি বলুন।"

"গীতা পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"একাদশ অধ্যায় মনে আছে?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "আছে বিশ্বরূপদর্শন।"

"তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন করবে?"

ভীত ত্রস্তভাবে বিহ্বল কণ্ঠে উমাশঙ্কর বলিল, "করব।"

"তবে কর।" বলিয়া সহসা ভগবান বহু বাহু, উদর, বহুমুখ হইয়া বিরাট অবয়ব ধারণ করিলেন। সেই অবয়বের না দেখা যায় আদি, না দেখা যায় মধ্য, না দেখা যায় অন্ত; দুই চক্ষের মধ্যে চন্দ্র সূর্য জ্বলিতেছে; ভীষণ দন্ত শ্রেণীর দ্বারা ভয়ানক মুখমণ্ডল যেন বিশ্বগ্রাসী অনলের রূপ ধারণ করিয়াছে!

শয্যাত্যাগ করিয়া মন্দাকিনী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর দেহে নাড়া দিতে লাগিল।

ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া উমাশঙ্কর বিহ্বল ভাবে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মন্দাকিনী বলিল, "স্বপ্ন দেখছিলে?"

মন্দাকিনীর মুখে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে ত্রাস্ত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, ভীষণ দুঃস্বপ্ন।"

"কি স্বপ্ন ?"

এক মুহূর্ত নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উমাশঙ্কর আনুপূর্বিক স্বপ্নের কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে মন্দাকিনীর দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল। বিবৃতি শেষ হইলে বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "ওগো একে তুমি দুঃস্বপ্ন বলছ ? এ যে মহা সুস্বপ্ন ! তুমি ভাগ্যবান, তাই স্বপ্নে ভগবানের দর্শন পেলে। উষা-স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। এবার জাগ্রত অবস্থাতেও তুমি দর্শন পাবে।"

গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মন্দাকিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকাল আবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উমাশঙ্কর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। তাহার পর মুখ হাত পা ধুইয়া চা পান করিয়া সাংখ্য দর্শন খুলিয়া বসিল।

পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সে মনে মনে বলিল, "হে ভগবান, সত্যই যদি তুমি থাক, তা হলে আমার মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করবার পূর্বে আমার মনকে দুর্বল কোরো না।"



"বনফুল"

তিলোত্তমা

এক

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমিষে বদলাইয়া যায়। উত্তর-বাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ পর্ব্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মত সেও বিয়ে পাস করিয়া এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া শখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারেণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে, গোকুলেরও তেমনই আসিতে লাগিল। বিবাহের বাজারে গোকুল সুপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি, পিতার তেজারতি ব্যবসায়, মাতুলালয়ের বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে কোন কালে গোকুলকে উদরান্নের জন্য চাকুরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারা জীবন শখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ লোক। কুষ্টি, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী মহাশয় যে পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন, তাহার ডাকনাম তিলু, ভাল নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে ছবিটি আঁকিতে লাগিল, কাব্যের তিলোত্তমা তাহার কাছে কিছু নয়।

দুই

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে! তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশনধ্বনি, নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পাণিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই। কিন্তু ঘাবড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটা হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচ শত টাকা পণ কম দিয়াছে; বলিতেছে, এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকি টাকা পরে পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে, অত্যন্ত খেলো। চেলীর রঙ উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। আংটিটা সোনার কি না কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মত। তিনি শেষে একটা ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি? তখন তিনি যাহা যাহা দাবি করিয়াছিলেন, লোকটা তাহাতেই রাজি হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশিই করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিৎ হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেনই বা কেন তিনি? সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো! কিন্তু এ কি কাণ্ড? ওই অতি বিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার কে প্রত্যাশা করিয়াছিল। বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বার বার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে, নকুলের 'ভীমরতি' ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে? ছি ছি ছি ছি! নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন—'ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ, গোল গোল গড়ন। চোর—চোর, জোচ্চোর, ধড়িবাজ ব্যাটা। ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।' সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমন কি গোকুল পর্যন্ত।

তিন

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বইকি! একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভাল মানুষ। মুক্তোকেশী বেগুনের মত তাহার মুখখানিতে ভালমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ-ব্যাপারে এসব হইয়াই থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যাভাষণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত। কিন্তু সে করিল না। সসঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইয়া সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কি? সে প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকারী হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ-কোলাহল তুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্ব্বাসিত হইতে সে চায় না।

গোকুল বলিল, বাবা-মা বলছেন, আবার আমার বিয়ে দেবেন।

তিলু চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

বেশ তো। হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।

তোমার কষ্ট হবে না?

আমার? না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, হ'লেও, তোমার যদি তাতে সুখ হয়, সে কষ্ট সহ্য করব।

গোকুলের মনে হইল, ইহা অভিমানের কথা। কিছু বলিল না।

চার

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

তিলুর সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর সময়। না জানে

লেখাপড়া, না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে। কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই। মা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেন না, সে বাহিরের কাজকর্ম্ম লইয়াই থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ উঠিল কি না, বকুল-বনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এসবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত!

নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনও বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষের মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত। এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পাঁচ

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও আন্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পোষাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতা যাইতেছিল। স্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, একজন বিধবা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দ্দিক হইতে ধাকাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমন কি একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশ খালি হইা গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চকচকে একটি রূপার কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না,

অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিত মুখে নিজের মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন একে একে সবই ছাড়তে হ'ল। এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা।

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমন কি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, তুমি যে আবার বিয়ে করব বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও?

এখনও হয় নি।

আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, দেখ বাবা, তা হ'লে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মত একটি পাত্র আমি খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পাল্‌টি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়—যদি বল, তা হ'লে—

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

উষাকে আগে দেখ তুমি। তোমার যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে—

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, আমার একটি স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।

আমার কথার ওপর কথা কইবে উষা! তেমন মেয়েই সে নয়। তাকে লেখাপড়া গান-বাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মত অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তা ছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ, তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

তা হ'লে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

ছয়

উষা উষা নয় দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে চলনে-বলনে হাস্য-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌড়সারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিট-কিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কুল হারাইল।

সাত

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্ত্তা চালু করিয়া দিলেন। উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা শুধু মুগ্ধ নয়—আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটখাটো একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি কলঙ্ক নাকি আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্য্যন্ত দিলেন না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়। যৌবনকালে অমন পদস্খলন দুই-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। উষা একটি শর্ত্ত করিল এবং সে শর্ত্তেও গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলে রাজি হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আট

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কই, তিলোত্তমা তো এখনও আসিল

না! এত কাণ্ড হইয়া গেল, তিলোত্তমা একটি কথাও বলে নাই। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। গোকুল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়াই শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জ্জনে দেখা হয় নাই, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বইকি। গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

শোন, শোন।

কি ?

আজ আশীর্ব্বাদ, মনে আছে তো ?

আছে।

দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো ?

না।

বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে—শুনেছ সে কথা ?

শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া ক'রে, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ গুম হইয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

নয়

আশীর্ব্বাদের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা

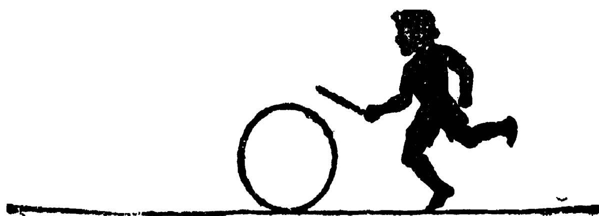
পরিয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে এমন সময় গোকুলের মা বলিলেন, শাঁখটা বাজায় কে, আমার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ হয়েছে আবার। ও বউমা, কোথা গেলে তুমি ? শাঁখটা বাজাও।

শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।

আমাকে মাপ করবেন।

দুই হাতে মালাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।



শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বাঁশবাজি

খোড়গাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে!

এবার লোকজন বিশেষ জমেনি, মাল-পত্রও বিশেষ কিছুই নেই। তেলেভাজা দুর্গন্ধ পাঁপর, বিন্নে ধানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুরফুরি নেই একখানাও। মাটির পুতুল—কুকুর-বেরাল, হাতি-ঘোড়া—সক্কলের এক রঙ, শুধু চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোঝাবার জন্যে কালোর দু'একটা ফোঁটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছু চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, ঝুড়ি-চ্যাঙাড়ি, খারা-খালুই। আর আছে হাঁড়িকুড়ি সরা-মালসা, কলকে-ধুনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাঁচের চুড়ি।

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, ঢলকো, ঝিম-মারা। যেন কি একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে মরতে। চলা-বলায় ফুর্তি নেই এক রতি। পরনের কাপড় কানি হয়ে আসছে দিনে দিনে।

পাকড়া গাছের তলায়ই বেশি ভিড়। আর বেশি গোলমাল। কাছেই কোথায় একটা ট্যামটেমি বাজছে।

এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না। "আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব।" আকুল আফুট চোখে কাঁদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়েস, পেঁকাটির মত হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টেনি আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মত অসহায়।

ব্যাপার কি? কাঁদছে কেন?

সবাই বললে, বাঁশবাজি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে বুঝি ছেলেটাকে তাই কাঁদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা!

বাঁশগাড়ি করে আদালতে দখল নেয় শুনেছি, তখনও নাকি ঢোল বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখিনি তখনো।

"মাটীতে পুঁতে নেবে তো বাঁশটা ?" কে একজন জিগ্‌গেস করলে।

না এ সে মামুলি খেলা নয়। ওয়াকিবহাল কে একজন বললে, ভারিক্কি গলায় 'না, বাঁশটা বুড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর সেই বাঁশ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে ও বাঁশের মুখ পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নীচু করে ঝুঁকে পড়বে। আর, বুড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন বন করে আর ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মত ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা।'

'ঐ বুড়ো বুঝি ?'

'হাঁ, ওই মস্তাজ।'

শনের দড়ির মত পাকিয়ে গেছে বুড়োর শরীর, থুতনির উপর হলদেটে ক'গাছ দাড়ি রয়েছে উঁচিয়ে। বুকটা টিপলে মতন, পেটটা দ পড়া, হাতে পায়ের মাংসগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কোঁকচান চোখ দুটো তার চক্‌চক্‌ করছে—সেইটুকুই তার যা কিছু সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে মস্তাজ সবাইর কাছ থেকে পয়সা কুড়োচ্ছে।

"খেলা সুরু হল না, আগেই পয়সা ?" কে একজন ধমক দিয়ে উঠলো।

'খেলা হয় কি করে ? বাঁশে যে চড়বে সেই তো কেঁদে রসাতল করছে 'পড়ে যাব, মরে যাব'—এ কেমনতর কান্না ? পড়েই যদি যাবি তবে কে আসতে বলেছিল তোদের খেলা দেখাতে ?

ছেলের কান্নাতে মস্তাজের ভ্রুক্ষেপ নেই। 'হবে, হবে, সুরু হচ্ছে এখুনি। সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে শূন্য মগ দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে যায়।

'খেলা তো আর ওরা নতুন দেখাচ্ছে না, তবে কাঁদছে কেন ঐ ছেলেটা ?' জিগ্‌গেস করলাম পাশের লোককে।

'এতদিন ও ছিল না। ও নতুন।'

'তবে কে ছিল এতদিন ?'

'ওর দাদা—'

'না, না, ঐ ছেলেটাও দেখিয়েছে দু'-একবার।' কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে। 'সরস্বতী পূজার সময় তেঁতুলের ইস্কুলের মাঠে এই ছেলেটাই উঠেছিল বাঁশ বেয়ে। এখনো তত রপ্ত হয়নি—বেয়ে বেয়ে চুড়োয় উঠে

াসাটাই সেদিনকে ওর খেলা ছিল। আসল খেলা দেখিয়েছিল অবিশ্যি ওর াদাই। আর যাই বলুন আসল কসরৎ যে বাঁশ বেয়ে উঠে আসে তার নয়, য বাঁশটা পেটের ওপর চেপে ধরে রাখে তার—মস্তাজের।'

'কই ওর দাদা?'

'কে জানে!'

টুং করে একটিও আওয়াজ হল না মস্তাজের মগে। খেলা না দেখে কেউ য়েসা দিতে রাজি নয়।

অনন্যোপায় হয়ে মস্তাজ ছোট ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। পিছনে দয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ছলেটা। 'না, না, আমি না। আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব—'।

বাপ একবার তার হাতে ধরে টান মারলো হেঁচকা। মারবার জন্যে হাত উঁচালো একবার।

'হেঁঃ ভয় দেখ না ছেলের। তোর বাপ কত খেলা দেখিয়ে এল কত জায়ান জোয়ান ছেলে নিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে পারবে না, পুঁচকে একরত্তি ছেলে।' বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ কেউ তিরস্কার করলে।

মস্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

'পড়েই যদি যাস, বাপ তোকে দু হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না? ন, উঠে আয়।'

যে লোকটা ট্যামটেমি বাজাচ্ছিল সে আরো জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজি হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কান্নাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তাহলে। দু'একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মস্তাজ অসহিষ্ণুর মত গলা উঁচিয়ে তাকালো একবার ভিড়ের বাইরে। কতক্ষণ পরে কে আরেকটা ছেলে দুর্ব্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে একটা আধ-খাওয়া পাঁপর।

'ওই ওর দাদা।' জানা লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

বছর দশেকের রোগা-পটকা ছেলে। লিকলিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। ঠোঁটের চারপাশে, গালে ও থুতনির নীচে

কাটা ঘা, একটা ঢণ্ঢনে মাছি বারে বারে উড়ে এসে বসছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা ভাসা চোখে কেমন একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাই'র কাছে এগিয়ে গেল। বললে, 'তোকে কাঁদতে হবে না আকু, আমিই খেলা দেখাব।'

আকু চুপ করল। চোখের জল শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে!

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটেমির বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল.

কোমর ও হাঁটুর মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো খাটো ও আঁট করে নিল মস্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাই-কুণ্ডলের গর্তে। কি যেন বললে বিড়বিড় করে। বোধ হয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বুলিয়ে মুখের খুব কাছে টেনে এনে কি বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখেনি কোনো দিন। এতটা চলবিচল হয়ে যাওয়া।

'চলে আয়, ইস্তাজ।' ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।

ইস্তাজ মুহূর্তে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল।

কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টেটা ঢুকিয়ে দিল—এমনি আঁৎকে উঠলাম। ছেলেটার বুকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগ দগ করছে, কোথাও খোসা পড়েছে, কোথাও বা পুঁজ উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই ঢণ্ঢনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছি ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইস্তাজ, তখন খানিক স্বস্তি পেলাম। কেননা পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।

'কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি ঘা?' জিগ্‌গেস করলাম জনতাকে।

কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালির বাবুদের বাড়ীতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইস্তাজ। বুড়ো তার কতদিন আগে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পান্তাও নাকি জোটাতে পারেনি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারেনি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইস্তাজ সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বুক পেট ছড়ে কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলেটা একটু কাবু হয়ে পড়েছে।

'ত্যাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না?' জিগগেস করল মস্তাজ।

'না।' 'ছু' হাতে ধুলো মেখে ইস্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের পেটে, বাঁশ

ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে বেয়ে উঠতে লাগল। দু' হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মস্তাজ।

'দেখুক, দেখুক এবার আক্কাছ। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।'

আক্কাছ বা আকু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে তার দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই! সে এখন ট্যামটেমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।

বাঁশের চূড়ার কাছে এসে ইস্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, পেটের কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্যে। তখন তার ঘাগুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখালাম। অসহ্য লাগল। ভাবলাম চলে যাই।

কে একজন বাধা দিল। বলল, তারপর যখন ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শূন্যে, তখন ওসব ঘা-টা কিচ্ছু দেখা যাবে না।'

'বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরাবে নাকি?'

'কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোচড় খেয়ে-খেয়ে আপনিই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।'

'নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগবাজি খাওয়াটা তো সেকেলে। তাতে আর বাহাদুরি কি!' আরেকজন ফোড়ন দিল।

ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে সুরু করেছে মস্তাজের দু'হাতে। চোট খাবার পর ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ফুরফুরির মত। হাত পা ছড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাদুড় না চামচিকে!

এতক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম, এবার তাকালাম মস্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ ঘুরন্ত বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশী দেখবার মত। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্যে মস্তাজের পেটেএ সাময়িক গর্ত তৈরী হয়নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘুঁটে ঘুঁটে ঘুরছে না জানি কোন জলন্ত মন্থনদণ্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কতদূর পর্য্যন্ত চেপে ঠেলে দিয়েছে পেটটাকে নিজের

চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। পেটে-পিঠে এক, এমনিতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে কোথায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে খেতে খটাখট শব্দে চলেছে বাঁশের ঘুরুনি।

প্রতি মুহূর্তে যা ভয় করছিলাম! ইস্তাজ ফসকাল না, মস্তাজই টলে পড়ল। শেষ মুহূর্তে দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করেছিল মস্তাজ কিন্তু যতই ফুরফুরে পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু আশ্রয় দিতে পারল না ইস্তাজকে।

আজকাল বারেবারেই বুড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে, কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মস্তাজ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। তাড়ি-খাওয়া পাকতেড়ে ঘোড়ার মত ধুঁকছে, আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তারি জন্যে হয়তো খেলা স্থরু হবার আগেই মগটা সে তুলে ধরেছিল সবাইর কাছে। কয়েকটা পয়সা আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পাঁপর কি চামদড়ির মত শুকনো দু-একটা ফুলুরি। পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এর চোটেই পিঠ হয়ে পড়ত না, খুখুরে বাহু দুটোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছুই সওয়ানো যায়, শুধু বুঝি ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহু, ছেলে, ঘা—সব কিছুরই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইস্তাজ আরো দূরে। উত্থিত গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনতে পেলাম না। কেউ বললে হয়ে গেছে। কেউ বললে, বুকের কাছটাতে ধুকধুক করছে এখনো।

কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূর সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ইস্তাজকে ধরাধরি করে, কারা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়। ঘটনাটা সদ্য-সদ্য ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা প্রতিবারের ওষুধ নেবার সময় এক আনা করে পয়সা দিতে পারত না মস্তাজ

যদি এক-আধ আনা পয়সা তার হাতে আসে, সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের ঘা শুকোবে, না, পেটের ভিতরের ঘা ?

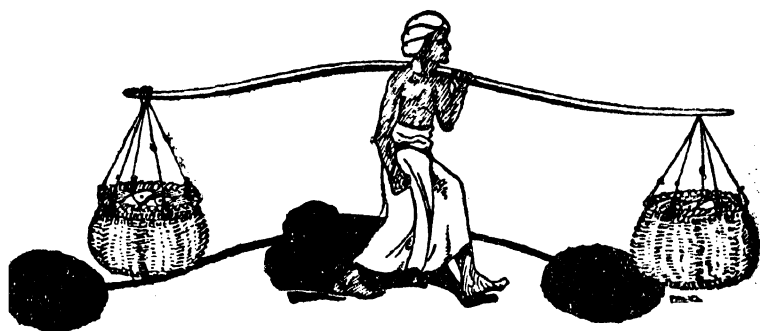
মস্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে আক্কাছ কাঁদছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জন্যেই বুঝি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আর্ত্তনাদ, এবার আরো নিঃসহায় কণ্ঠে, 'এবার আমার পালা। এবার আমার পালা। আমি নির্ঘাত পড়ে যাব, মরে যাব আমি—'

মস্তাজ কিছুই বলল না। আকুর হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আল্লার কাছে শিশুকণ্ঠের করুণ অথচ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি।

মস্তাজ কিছুই বলছে না। পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কি, তাকে খেতে হবে তো।



শ্রীঅনুরূপা দেবী

দেবদাসী

[১]

ত্রিণাবেলীর সুপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলেশ্বর মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত আপ্পে চিদম্বরম্ যখন শিশু বিশোকার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাহার মুমূর্ষু জননীকে নিশ্চিন্ত চিত্তে মরিবার অবসর দিলেন, তখন হইতেই সকলে বুঝিয়াছিল যে, এ মন্দিরে এক জন দেবদাসীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল।

মন্দিরে পাঁচ জন দেবদাসী বাস করিত। ইহার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা চম্পা শিশু বিশোকার লালনভার গ্রহণ করিলেন। শিশুর মুখে যখন প্রথম কথা ফুটিল তখন সে চম্পার ক্রোড়ে বসিয়া ডাকিল, "মাম্ মা।" অমনি চমকিয়া দ্বিতীয়া দেবদাসী অচলা শিশুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "চুপ! চুপ! মা তোর আবার কে? মা তোর নাই!"

দেবদাসী দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিতা। এ পৃথিবীর সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক পাতানো চলে না। সে কাহারও কন্যা নয়, বনিতা বা মাতা,—কিছুই সে নয়, শুধু সে—দেবদাসী, ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়।

ইহার পর হইতে যখনই শিশু না বুঝিয়া পালনকর্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতে গিয়াছে, তখনই সে বাধা পাইয়াছে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা বুলি সে ভুলিয়া গেল। সকলের কাছে শুনিয়া শিখিয়া সেও চম্পাকে 'বড় ঠাকুরাইন্' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচ জন দেবদাসী। দেবমন্দির সংশ্লিষ্ট উদ্যানের প্রান্তে তাহারা বাস করে। লম্বা টানা দালানের ধারে ধারে পাঁচ জনের জন্য অনতি-বৃহৎ পাঁচটি কুঠরি। তাহার আশেপাশে সে ধরণের আরও দুই-চারিটা ঘর খালি পড়িয়া ছিল। দেবদাসীর সংখ্যা সব সময় ঠিক এক রকমই তো থাকে না।

বিশোকার বয়স যখন আট বৎসর—তখন এক দিন চম্পা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তুমিও আমাদের মত নিজের একটি আলাদা ঘর পাবে। এস, তোমায় তোমার ঘর দেখিয়ে আনি।" বালিকা কিছু না বলিয়া চম্পার অনুসরণ করিল।

অল্পবয়সে স্বাধীনতার প্রতি অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটা আত্যন্তিক টান থাকে। এই বয়সেই নিজের একটি স্বতন্ত্র ঘর পাইবে শুনিয়া, বিশোকা তাই যথেষ্ট আনন্দ বোধ করিল। প্রথমে সে ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল। প্রথম দর্শনেই নবজাত সন্তানের প্রতি জননীর যেরূপ বাৎসল্য সঞ্চারিত হয়, যাহার আপনার বলিতে এ পৃথিবীতে কিছুই নাই, তাহার এই আপনার জিনিষ গৃহটির প্রতিও তেমনই এক অভিনব আকর্ষণ সে অনুভব করিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া চারিধারে সে খানিক নড়িয়া ফিরিয়া বেড়াইল, আপনার ক্ষুদ্র শয্যাটির উপর একবার বসিল, জানালা দিয়া চির-পরিচিত উদ্যান-সীমানার দৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনীটিও একবার নূতন করিয়া দেখিয়া লইল, তার পর ফিরিয়া দড়ির আলনায় ঝুলান নিজেরই ঘাঘরি-আঙ্গিয়া কয়টি নাড়িয়া চাড়িয়া গুছাইতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া এমনই মনে হইতেছিল, যেন এক বৃহৎ সংসারের কর্ত্রীরূপে সে আজ তাহার নূতন গৃহস্থালীর মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এ আনন্দ নিতান্তই ক্ষণিক! যখন সে শুনিল; এই ঘরে রাত্রে তাহাকে একা শয়ন করিতে হইবে, তখনই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। চম্পার ওড়না চাপিয়া সে কহিল, "আমি তোমার কাছে শোব।"

"না, ছিঃ আব্দার ক'রো না। তোমায় তো আব্দার করতে নেই।"

"কেন ঠাকুরাইন্?"

"আস্‌ছে পূর্ণিমায় তুমি দেবদাসী হবে যে!"

এ কিছু নূতন কথা নয়। বাল্যাবধি চিরদিনই উঠিতে বসিতে এ কথা বিশোকা শুনিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যৎ দেবদাসীকে অনর্থক হাসিতে নাই, দৌড়িয়া চলিতে নাই, আব্দার করিতে নাই, এক কথায় তাহার কিছুই করিতে নাই, শুধু দুইটি খাইতে হয়, আর নিজের দেহ মাজিয়া ঘষিয়া, চোখে কাজল টানিয়া, চরণে অলক্তরাগ আঁকিয়া নৃত্য-গীত শিক্ষা করিতে হয়। জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি এ কথা সে অন্ততঃ সহস্রবার শুনিয়া আসিয়াছে; শুনিয়া শুনিয়া সেই ভাবেই কাজ করিয়াও আসিতেছে,—তবুও এ বিস্মৃতি! তবে এই আগামী পূর্ণিমার কথাটাই সে এবার এই যা নূতন শুনিল। কিন্তু আজিকার এ উপদেশ গ্রহণ করা তাহার মত এতটুকু একটি বালিকার পক্ষে বড় সুবিধার নহে। বাহিরে কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকারে চারিধার তখন ভরিয়া গিয়াছে,— সকলের শেষের ঘরটায় সে সারারাত্রি একা থাকিবে,—এই কথা মনে করিতেই

তাহার পায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। একা থাকিবে? না না, সে তা পারিবে না! সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "ভয় করবে যে ঠাকুরাইন্! আমার যে বড্ড ভয় করবে।" বলিতে বলিতে সে তাঁহার কাছে আরও একটুখানি ঘেঁসিয়া আসিল। ভয়! সে কথাটা মনে পড়িলেই যে মানুষের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়ে উঠে।

দেবদাসী চম্পার মনে কোমলতা আদৌ ছিল না, এমন কথা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু চিত্ত নির্ব্বিকার রাখাই দেবদাসীর কর্ত্তব্য! সেই কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ তো আর তিনিও করিতে পারেন না। কাজেই জোর করিয়া বালিকার ভয়কাতর মিনতির পানে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি গম্ভীর মুখে কহিলেন, "ভয় কি! দেবদাসীর প্রাণে ভয় থাকতে দিতে নেই। যাও, কোন দিকে না চেয়ে নিজের ঘরে চ'লে যাও, দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ো গে। একদিন চিত্ত নির্ব্বিকার করতে অভ্যাস ক'রে নাও, পূর্ণিমার আর তো দেরী নেই!" অনিচ্ছুক বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে তিনি ভিতরে লইয়া গেলেন,—ঘরের ভিতরে তাহাকে রাখিয়া ফিরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মন তাঁহার এ কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কাঁদিতে চাহিল, বিশোকাকে ফিরাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল,—আহা, ভয়চকিতা বালিকা!—কিন্তু না,—উভয়েরই ইহাতে ব্রতভঙ্গ-পাপ হইবে! সে পাপ বহন করিবে, কে? সংসার-জীবের প্রতি দেবদাসীর মায়া শোভা পায় না।

কত রাত্রি পর্য্যন্ত চক্ষে নিদ্রা আসিল না। মন কেবলি পাশের দিকে বিছানা হাতড়াইয়া কাঁদিতে চাহে, কর্ণও উৎকণ্ঠিত হইয়া বাহিরের কাল্পনিক শব্দ শুনিতে থাকে। এক সময় বাহিরের দিক্ হইতে যেন একটা ভয়ার্ত্ত কাতরোক্তি, পরক্ষণে আবার যেন কাহার দ্রুত পদধ্বনি, নীরব রজনীর ঘন অন্ধকার চিরিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে শয্যায় পড়িয়া বিনিদ্রা চম্পা ছট্‌ফট্ করিয়া শুধু প্রহর গণিল, তথাপি নিয়মভঙ্গ হইতে দিল না।

ওখানে নির্জন গৃহে আড়ষ্ট বালিকা পেচকের কর্কশ শব্দে শিহরিয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিল। অলক্ষ্যে তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ ফাটিয়া সভয়-কাতরোক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, "মা গো!"

হায়, কোথায় কে! কোথায় তাহার মা! মা বলিয়া ডাকিয়া, কোন

অনির্দেশ্ত সুদূর লোকে তাহার শরীরিণী অথবা অশরীরী মাতৃবক্ষে সে কোন অজ্ঞাত আকুলতা জাগাইয়া তুলিতে পারিল কি না, কে জানে! কিন্তু এ জগতের কাহাকেও সে এই মধুময় 'মাতৃ' সম্বোধনে টলাইয়া নিজের পানে টানিতে পারিল না। ভাষাহীন অব্যক্ত কাতর ক্রন্দনে তাহার সারা প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি কেহ আসিল না। উৎকণ্ঠিত বক্ষে কোন মতে সে রজনী যাপন করিল।

ভোরের আকাশ তখনও নির্মল হয় নাই, শুক-তারা ঈষৎ ম্লান চোখে চাহিয়াছিল। পূর্বদিক্ একটা ভাবী সৌভাগ্যের সূচনায় অরুণ রক্তবর্ণে রাঙ্গিয়া উঠিতেছিল—সহসা বাহিরে মনুষ্য-পদধ্বনি শ্রুত হইল। এতক্ষণে সেই পরিচিত ধ্বনিটুকু শুনিয়া যেন মৃতদেহে জীবনলাভের মতই তাহার অর্দ্ধলুপ্ত সংজ্ঞা আবার ফিরিয়া আসিল; তবে আবার সে মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে! তবে সে বাঁচিয়া আছে,—মরে নাই!

বাহিরে আসিতেই, সে বুঝিল, সতর্ক দ্রুত-ত্রস্ত পদে কে যেন চলিয়া গেল। বিদ্যুতের মতই ক্ষিপ্র সে গতি!—কে ও? বিশোকা চিনিল, ডাকিল, "মা,—বড় ঠাকুরাইন্!" ঠাকুরাইন্ ফিরিলেন না। মনের কোণে যদি কোথাও এক ফোঁটা একটু মানবীয় দুর্বলতা গোপনে লুকাইয়া থাকে, তাহাকে লোক-লোচনের দৃষ্টিপথে প্রকাশ করা কেন?

পরীক্ষার কয়টা দিন কাটিয়া গেলে যথাসময়ে সাড়ম্বর সমারোহে অষ্টমবর্ষীয়া বিশোকা ষষ্ঠ দেবদাসীর স্থান অধিকার করিল! সে দিন সে কি আনন্দ! নূতন অলঙ্কার-বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা বালিকা বিগ্রহকণ্ঠে মালা পরাইয়া আপনাকে দেব-চরণে উৎসর্গিত করিল। পার্থিব জগতের সকল সুখ-দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া অপার্থিব জীবনের মধ্যে সে আপনাকে বিকাইয়া দিল। ক্ষুদ্রা মানবী আপনাকে দেবীত্বে অভিষিক্ত করিয়া এক বিপুল গৌরবে নিজেকে বিমণ্ডিতা ও আপনার জন্ম সার্থক বোধ করিল।

[২]

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সংসারে অনেক পরিবর্তনই ঘটিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত চিদম্বরম্ আপ্পে গতিশীল জগতের চক্রনেমির আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবর্তিত হইয়া কোন্ এক নূতন পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে সদাশিব দেশপাণ্ডে এখন প্রধান আচার্য। চতুর্থা দেবদাসী রঞ্জিলা

কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা, অচলা অপহৃতা এবং বালিকা বিশোকা এখন পূর্ণ ত্রয়োদশবৎসরবয়স্কা, অতুল লাবণ্য-শ্রী-বিভূষিতা নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী।

এখন নিজের ঘরে আর একা থাকিতে তাহার মনে কিছুমাত্র ভয় ছিল না। শুভ্র শয্যাতলে সুন্দর তনু এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম সুখ-ভোগে যামিনীযাপন এবং সেই চারুদেহ মাজিত শোভিত করিয়া তুলিতেই দিবসের অধিকাংশ সময় তাহার কাটিয়া যায়। সন্ধ্যায় যখন সে হরিদ্রা, গোলাপী ও নীলবর্ণের পেশোয়াজ, বিচিত্র আঙ্গিয়া ও ফিরোজী ওড়না পরিয়া ঠাকুরের নাট্য-মন্দিরে নাচিতে যায়, তখন দর্শকের দল বিপুল বিস্ময়ে প্রশংসমান নেত্রে তাহার পানেই চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া তাহারা যেন বিহ্বল উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহার সঙ্গীত, এস্‌রাজ বীণায় তাহার মধুর আলাপ,—সেই অপূর্ব নৃত্যলীলা সে সমস্ত যেন ইন্দ্রালয়ের নর্তকীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তরঙ্গময়ী গিরি তটিনীর ন্যায়ই তাহার গতিটুকু অত্যন্ত লঘু, তেমনই লীলা-চঞ্চল! দর্শকের মনে হয়, এ যেন বাস্তবিকই একটি বিদ্যুতের বিকাশ, তেমনি দাহশক্তিসম্পন্ন আর তেমনই কি সুন্দর! সমগ্র ত্রিণাবেলী জুড়িয়া দেশবাসী কিশোরী বিশোকার লাবণ্য ও কৃতিত্বের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রতিদিনই মন্দিরের নাট্যশালায় দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল বহু গণ্যমান্য ধনী, এমন কি, স্বয়ং মহারাজাধিরাজও এক দিন তাহার দর্শনে আসিয়া সেই অবধি প্রত্যহই প্রায় দর্শকরূপে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

বিশোকা কিন্তু এ সবের কিছুই খোঁজ রাখিত না। সারাদিন বিবিধ বিচিত্র বেশে নিজেকে সে সাজাইত, বিবিধ ছাঁদে কবরী রচনা করিত, নবীন সুরে তন্ত্রী আঁটিয়া নব নব সঙ্গীতসাধনা করিত! সেই সারাদিনের সমস্ত শ্রম-বিনিময়েও নিজের জন্য সে এতটুকু সুখাবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখিত না। কাহারও প্রশংসাবাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। সকল প্রাণ-মন, যাঁহার পরিতোষের জন্য সে উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁহারই পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকিত!

অবশেষে যখন চারিদিকে দর্শকের দল হইতে প্রশংসার করতালি, পুষ্পমাল্য ও স্বর্ণরজত-বর্ষণের ঘটা পড়িয়া যাইত এবং অপর দেবদাসীগণ এই সকল সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত, বেহালাবাদক সঘন বেগে ছড়ি টানিয়া বাদ্য-শেষের সূচনা প্রকাশ করিত, তখন স্পন্দিতবক্ষে সে যুক্তপাণি হইয়া বিগ্রহের পানে

নিমেষে চাহিত। আন্তরিক ব্যাকুলতায় তাহার সারা চিত্ত বিগ্রহ-চরণে খন যেন লুটাইয়া পড়িত—যেন সে বলিত, "এতটুকুও প্রসন্ন হইলে তো! ওগো আমার জীবন-দেবতা! দাসী তোমায় মুহূর্তের জন্যও একটুখানি তৃপ্তি দিয়াছে কি? তার পর কোলাহল হুড়াহুড়ির ভিতর দিয়া কোন দিকে ক্ষ্যমাত্র না করিয়া যথার্থ দেবলোকচারিণীর মতই সে নিজ স্থানে ফিরিয়া াইত। চৌদিকস্থ কৃপাপ্রার্থীর দল অশেষ-বিশেষ চেষ্টাতেও তাহার দৃষ্টি-াকর্ষণে সমর্থ না হইয়া অপমানে, অভিমানে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। রোষে ক্ষোভে তাহাদিগের চিত্তগুলা যেন গর্জিয়া গর্জিয়া বলিতে থাকিত,—"এতই ক অহঙ্কার! কাহাকেও একটু দৃকপাত পর্যন্ত নাই।"

বাস্তবিকই যে বিশোকার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অহঙ্কার সগর্বে ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া না দাঁড়াইয়াছিল তাহা নহে। মর্তচারী মানবের তুলনায় আপনাকে সে কোন সুদূর ঊর্দ্ধলোকের জীব বলিয়াই মনে করিত। সে জানিত, ইহারা মানুষ, কিন্তু সে—দেবী। দেবতা ভিন্ন এ জগতের কাহারও সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এ সংসারে কোনখানে কি ভাবে কে চাহিয়া আছে, সে সংবাদে তাহার কি প্রয়োজন?

এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল। দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর আসিয়া ক্রমে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ক্রীড়াশীল নদী-তরঙ্গের মতই কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সে অবিরাম স্রোতোধারা কাহারও পানে চাহিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায় না। তট ভাঙ্গিয়া গ্রাম ভাসাইয়া নিজের গতিপথকে নদী যেমন ঠিক রাখে, সময়ও তেমনই শিশুকে বালকত্ব, কিশোরকে যৌবন ও প্রৌঢ়কে বৃদ্ধত্ব দান করিয়া সমতালে নিজের পথ ধরিয়া বহিয়া যায়। তাহার স্পর্শে, কোথায় কোন্ তরুণ লতায় ফুল ধরিল, কোন্ জীর্ণ শাখা শুকাইল, এ সংবাদ লইবার জন্য তাহার গতি ফেরে না।

বসন্তের নব-মুখরিত মাধবীর ন্যায় নূতন শোভাসম্পদের মধ্যে বিশোকার দেহও অভিনব নিটোল মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। নীল বসনে সাজিয়া সেদিন বসন্ত-সায়াহ্নে দেবারতির পর যখন সে নিজের গৃহে ফিরিতেছিল, তখন তাহার প্রাণের মধ্যে বসন্তের উতলা হাওয়ার মতই একটা অত্যন্ত এলোমেলো ভাবের বাতাসও সহসা যেন কোথা হইতে গুঞ্জরিয়া উঠিল। চারিদিকে তখন চাঁদের আলোর ঢেউ লাগিয়াছে। যতদূর দেখা যায়,

আকাশে কেবল আলোর মালা গাঁথা। দেব-মন্দিরের সুরভি জলে সিঞ্চিত পুষ্প-পরাগের স্নিগ্ধ গন্ধ বায়ুর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বিশোকার প্রাণের মধ্যে তখনও সে দিনকার সন্ধ্যার সুরের হাওয়া একটি মিষ্ট আবেশে সুখ-স্বপ্নের মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।—কিন্তু তাহার মাঝখানে আবার এ কি? গান যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এক মুগ্ধ চিত্তের অর্দ্ধস্ফুট বাণী—"সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হইল না!" অতি মৃদু-উচ্চারিত এ স্তুতিটুকু তাহার উদ্দেশ্যে—কে পাঠাইল? সেই এক তরুণ নেত্রের সতৃষ্ণ-দৃষ্টি, সে আজ কত মুগ্ধভাবেই না তাহার পানে নিবদ্ধ ছিল। ভাষা যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, প্রকাশ করিতে গিয়া সরমে জড়াইয়া নীরব হয়, তাহার দৃষ্টিতে বুঝি সেই কথাই প্রকাশ পাইতেছিল।

বিশোকার সর্ব শরীর সে নেত্রপাতে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সকল শিরার সহজ শোণিত-প্রবাহ সেই দৃষ্টির তাড়িত-আকর্ষণে ছুটিয়া উভয় গণ্ড বাহিয়া বাহির হইতে চাহিয়াছিল। সে তাহার সরল দৃষ্টি, আজ দর্শকের মুখে তেমন নিঃশঙ্কভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, শুধু সলজ্জসঙ্কোচে নেত্র নত করিয়াছিল।

ঘরে ফিরিয়া সে বসন ত্যাগ করিল না, শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া নীরবে কত কথাই ভাবিতে লাগিল।—দেশের অধিপতি কেন আজ এমন করিয়া তাহার দিকে চাহিতেছিলেন?—কণ্ঠে তাঁহার আজ কেন সে সুর।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। গাছের আড়ালে জ্যোৎস্নাজাল ক্রমে ক্ষীণ হইল। চাঁদ ম্লান হইয়া আসিল। নিরালা পথে গ্রামের কুকুর ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া গেল। এই অভিনব সংশয় হইতে আপনার অনভিজ্ঞ সুকুমার হৃদয়কে মুক্ত করিতে না পারিয়া বিশোকা আস্তরণতলে শ্রান্ত দেহ অলসভাবে বিছাইয়া দিল। চক্ষে তাহার ঘুম আসিল। স্বপ্নে আবার সেই সুর বাস্তবের মতই সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়া কাণের কাছে মৃদু গুঞ্জনে কুহরিয়া গেল, "সুন্দরি, এ সুর কেন অনন্ত হইল না!"

প্রভাতে চক্ষু মেলিতে সে দেখিল,—এ কি দৃশ্য! এ আলো, এ কিরণ, এ কি কোন নূতন লোকের? নূতন সূর্য্যের? বাহিরে মধুর বাতাস যেন অযুত পাখীর গানে ভরিয়া গিয়াছে। ফুলের বর্ণে-গন্ধে এ কি নব মাধুর্য্য! ধরণী-বক্ষ কি মনোমোহন শ্যামলতায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে।—এ কি নূতন! —না এতদিন সেই অন্ধ ছিল,—আজ প্রথম তাহার দৃষ্টি খুলিয়াছে?

আজ সবার মাঝে, সকল কাজে সেই একটি চাহনি, সেই একটি সুরই অখণ্ড বিচিত্র তালে-ছন্দে বাজিয়া ফিরিতেছিল—এবং তাহা সুন্দরীকে তাহার অজ্ঞাতসারেও যেন স্মৃতির সরমে রাঙাইয়া তুলিতেছিল।

প্রধান পুরোহিত এত দিন শুধু লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ সার্থক হইয়াছে। আজ তিনি দেখিয়াছেন, তরুণ পিপাসু লোচনের মুগ্ধ দৃষ্টি কিশোরীর প্রতি তেমনই আবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিকে কিশোরী আজ অবহেলা করিতে পারিতেছে না, সে দৃষ্টির সম্মোহনে,—সেও বুঝি আজ মুগ্ধ। রাজ-নেত্রেও সরলতার সে স্বচ্ছতা আর নাই, সে দৃষ্টিও যেন কি এক সংশয়ভাবে ক্ষণ-কম্পিত! কিশোরীরও কণ্ঠে আজ বিহঙ্গীর আত্ম-নিবেদনের সে আপনাভোলা সুর আর নাই, আপনাকে ঢাকিবার একটা প্রবল চেষ্টা সে সুরে বিদ্যমান ছিল। মৃদু হাসিয়া সদাশিব ভাবিলেন, দেবপ্রসাধনের স্থান মানবচিত্তের দুরাকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই এই কৃত্রিমতার সৃষ্টি

সে দিন সভা ভাঙ্গিবামাত্র বিশোকা নাটমন্দির ত্যাগ করিল, দেবতার দিকেও আজ ভাল করিয়া সে চাহিতে পারিল না। কি যেন এক গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই সে কিছু না জানিয়া না বুঝিয়াও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল।—অননুভূতপূর্ব কি এক গভীর স্পন্দনে তাহার বুকখানা মুহুর্মুহুঃ আজ কাঁপিয়া উঠিতেছে—মনে হইতেছে, জীবনে তাহার কি একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছিল, আজ প্রথম সেই ভুলটুকু যেন ধরা পড়িয়াছে। এত দিনে সে যেন একটা আলো দেখিতে পাইয়াছে, কিন্তু তাহার আবার ভিতর হইতেও যেন একটা অস্পষ্ট অন্ধকার, একটা আতঙ্কের ছায়াও সেই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সে দিনও সেই জ্যোৎস্না-স্বর্ণখচিত ওড়নায় অঙ্গ ঢাকিয়া রজতাম্বরা নিশীথিনী বাসক-শয়নে চলিয়াছে, নীলচন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া প্রজ্বলিত দীপহস্তে পূর্ণিমার চন্দ্র মর্ত্ত্যপানে চাহিয়াছিল, — এমন সময়, অতি নিকটে মৃদু স্বরে কে ডাকিল, "সুন্দরি!"

চমকিয়া বিশোকা ফিরিল। তাহার সর্বশরীর বেতসের লতার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। সম্মুখে স্বয়ং রাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য!

রাজা এক পদ অগ্রসর হইলেন, কহিলেন "ভয় নাই,—তোমাকে আমি শুধু এই কথাটি বলিতে আসিয়াছি, তুমি স্বর্গের পবিত্র ফুল,—তাই ভয় হয়,

পৃথিবীর পাপ-পঙ্কে পাছে কোন্ দিন মলিন, কলুষিত হও। যদি অভয় পাই ত একটি কথা নিবেদন করি—”

বিশোকা যেন তড়িতাহত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার শরীরে বুঝি তখন কিছুমাত্র চেতনা ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে শুধু চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন বুঝিল না, উত্তরও সে খুঁজিল না। শুধু একটা তীব্র আনন্দে সে যেন কেমন একপ্রকার বিহ্বলপ্রায় হইয়া পড়িল। কিসের এ আনন্দ,—তাহাও সে বুঝি বুঝিল না।

নৃপতি আর এক পদ অগ্রসর হইলেন,—কহিলেন, “এ দেবমন্দির পুণ্যভূমি সন্দেহ নাই,—কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে তাহার জীবনটাকে পবিত্র রাখা একান্তই সুকঠিন। দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে তাহারা মন্দিরেরই পুরোহিত যাজকগণের সেবিকা—শিহরিতেছ? তুমি নিতান্ত সরলা, তাই আজও যে জীবনের মাঝখানে তুমি বর্দ্ধিত, সে জীবন চিনিতে পার নাই, তাই নিজের অবস্থাও অনুভব করিতে পারিতেছ না। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য! আর তোমার দুঃখের দিনও এইবার আগতপ্রায়। যদি এমনই পবিত্র নির্মল থাকিতে চাও, তবে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর।”

বিশোকা এখনও কিছু বুঝিল না, কিন্তু একটা অজানা বিপদাশঙ্কায় তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। “তাহার বিপদের দিন আসন্ন?’—কি বিপদ! দেবদাসীর বিপদ। মহারাজ আজ এ কি নূতন কথা বলিতেছেন! ‘পুরোহিতের সেবিকা? নামে শুধু দেবদাসী?’ কম্পিত দৃষ্টি তুলিয়া সে যেন কি একটু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাত্র একটা অস্ফুট মর্মরে তাহার নিবেদন-টুকু ভাষা হারাইয়া থামিয়া গেল। কি বলা যাইতে পারে, তাহাও সে আর ভাবিয়া পাইল না।

রাজা তাহার অন্তরের ভাব যেন বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিকে চাহিয়া আর একটু নিকটবর্ত্তী হইলেন, বলিলেন, “বিশোকা, এ বুকের মধ্যে যাহা আছে, তাহা চিরদিন এমনই অব্যক্তই থাক। দেব-নির্ম্মাল্য মানুষ শুধু মস্তকে ধারণ করবারই অধিকারী, আর কিছুই নয়, সেই অধিকারই শুধু আমায় তুমি দাও। এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমায় রক্ষা করি, যেখানে—এমন কি, আমি নিজেও তোমায় আর কখনও না দেখিতে পাই। আমার মা কাশী-বাসিনী, সেখানে তাঁর কাছে তুমি যাবে কি?”

বিশোকা নীরবে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তরই সে দিল না।

রাজা আবার কহিলেন, "ত্বরা নাই,—না হয়, কিছু সময় নাও, কাল এইখানে আবার সাক্ষাৎ হইবে। যথার্থ কথা বলিতে কি, নিজের উপরও আমার তেমন বিশ্বাস নাই। কি জানি, মনে কখন্ কি ভাব আসিয়া পড়ে—দেবতার ধনে মানুষের লোভ হয় কেন? সে লোভ শুধু ধ্বংসই আনে। কিন্তু হায়, এখানে দেবতাই বা কোথায়? তুমি পুরোহিতের,—সে তোমার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। তাহার হাত হইতে তোমায় রক্ষা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই,—কাহারও নাই। তাই অনেক ভাবিয়া শেষে এই উপায়টাই আমি স্থির করিয়াছি,—তোমায় নিরাপদ করিয়া তোমার সহিত পার্থিব জগতের সমস্ত বন্ধনই আমি ছিন্ন করিব, নহিলে বুঝি পারিব না—"

কে যেন সরিয়া গেল! একটা ছায়া!

"আজ তবে বিদায় বিশোকা—" চকিতে উৎপলাদিত্যের দীর্ঘ মূর্ত্তি অন্ধকার স্তম্ভান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল! সকল শরীরের তড়িতাঘাত, মনের মধ্যে সুখ দুঃখ-ভয়ের মিশ্রণে একটা বিপুল আলোড়নের বেগ বালিকাকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন-আকাশে পূর্ণ-গ্রাসী সূর্য্যগ্রহণের মতই, বিপুল তীব্র আলোর মাঝখানে,—অকস্মাৎ আজ এ কি বিরাট অন্ধকার!

[৩]

শয্যায় পড়িয়া বিশোকা রাজার কথাই ভাবিতেছিল। কি মুগ্ধ চাহনি, কি মিষ্ট সুর, কি সরল তাঁর প্রাণ! কিন্তু এ কি এ কি হেঁয়ালির কথা! সে দেবতার নয়,—পুরোহিতের! না, সে দেবী—সে দেবী!—দেবতার চরণে বিক্রীত এ দেহ,—ইহাতে অপর কাহারও অধিকার নাই। নৃপতি হয় ভ্রান্ত, না হয়,—না ইহাও অসম্ভব! সে কণ্ঠে তো ছলনার আভাষ নাই! তবে,—এ কি তবে? এ কথা তবে কেন তিনি বলিলেন? ভ্রান্তি—? বোধ হয়, তাঁর ভ্রান্তিই!

গৃহ-দ্বার মুক্ত ছিল, আহার্য্য সে স্পর্শও করে নাই; শয্যার আস্তরণ স্থানচ্যুত হয় নাই! তাহারই উপর বালিকা আপনার সুসজ্জিত তনুখানি ঢালিয়া দিয়া ছিল। সদাশিব দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বিশোকা!"

কে ও! ও কে ডাকে? ধড়মড়িয়া কিশোরী উঠিয়া বসিল। না, ভয় নাই! এ যে প্রধান পুরোহিত স্বয়ং আসিয়াছেন!

সদাশিব অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "রাজা তোমায় কি পরামর্শ দিতেছিলেন,

দেবদাসী ? নিশ্চয়ই এমন কোন গূঢ় কথা নয়, যাহা আমার কাছে তুমি গোপন রাখিবে ? কি কথা ?"

বিশোকার মনে নিমেষে সেই কণ্ঠ, সেই সুর বাজিয়া উঠিল,—'দেবদাসী', 'যথার্থ তাহারা…,—' অন্তরে সে শিহরিল। হয় তো এ কথা মিথ্যা না হইতেও পারে! রঙ্গিলা, অচলা—এমন কি, স্বয়ং চম্পা!—সদাশিব তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি দেবদাসী, চুপ করিয়া রহিলে যে ? রাজার কথাটা বড়ই গোপন না কি ?"

এ ব্যঙ্গোক্তিতে বিশোকা জ্বলিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সগর্বে সে কহিল, "কাহারও সহিত আমার কোন গোপন-কথা নাই। তিনি আমাকে শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমার বিপদের দিন আগতপ্রায়, যদি পবিত্র থাকিতে চাই তবে যেন শীঘ্রই এ মন্দির ছাড়িয়া যাই।"

"মন্দিরের চেয়ে রাজোদ্যানটা বড় বেশী পবিত্র বুঝি ?" পুরোহিত বক্র হাসি হাসিলেন। সে হাসির ইঙ্গিত না বুঝিলেও বিশোকার কানে তাহার সুরটা তেমন ভাল লাগিল না। সে কহিল, "না, রাজোদ্যানে তিনি আমায় তো ডাকেন নাই, তাঁহার মায়ের কাছে কাশীধামে পাঠাইতে চাহেন, তিনি বলেন, 'দেবদাসী শুধু—নামে দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে সে পুরোহিতেরই সেবিকা' —এ কথা—"

"তা তিনি ঠিকই তো বলিয়াছেন,—ও কি!—অমন করিতেছ কেন ? যে দিন বিগ্রহের কণ্ঠে তুমি মাল্যদান করিয়াছ, সেই দিনই কি বুঝ নাই, সে মালা কাহার কণ্ঠে পড়িয়াছে। পুরোহিত দেব-প্রতিনিধি, সমুদয় দেবসম্পত্তিতে তাহারই অপ্রতিহত অধিকার। ইহাতে রাজার কোন হাতই নাই। রাজার সাধ্য কি যে, তিনি এখান হইতে তোমায় সরাইয়া লইয়া যান। তুমি সর্বতোভাবে আমার।"

নিমেষে তখন সমস্ত ব্যাপার বিশোকার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে সবই বুঝিল। সে তবে যথার্থই তাহার! দেবতার নয় ? এই মানবের,—এই সদাশিব দেশপাণ্ডের—? অনেক কথাই আজ তাহার মনে পড়িল। স্বপ্ন টুটিয়া সত্য আজ ভীষণ মূর্তিতে তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

পুরোহিত শয্যার নিকটবর্তী হইয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি নিতান্তই বালিকা, এবং অত্যন্তই নির্বোধ, তাই ইহাতে এত চঞ্চল হইয়াছ, তা নহিলে আশ্চর্য্য হইবার কথা এর মধ্যে এমন কিছুই নাই। আসল কথা

াই যে, তুমি রাজার রূপে মুগ্ধ, রাজাও নিজে তাই—কিন্তু তার কি আবশ্যক ছিল?—রাজার অনেক আছে। মন্দির-সেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা াকে ত্যাগ করিতেই হইবে, আর তুমিও ইহা ত্যাগ কর, রাজরাণী হওয়া তামার পক্ষে সম্ভব নয়। যে পদ তুমি চাইবে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদই আছে। াজার সহস্র চেষ্টাও তোমায় এই গণ্ডীর এক চুল বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম ইবে না, ইহা তুমি স্থির জানিও। বরং প্রয়োজন বুঝিলে এখানে তাঁহার াগমন আমিই বন্ধ করিয়া দিতে পারি। তুমি দেবদাসী,—ধরিতে গেলে, দবপ্রতিনিধিত্বে আমারই তুমি স্ত্রী! আমি সে অধিকার আজ হতে গ্রহণ করিলাম। তুমি আমারই!"

বিশোকার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত স্বর বাহির হইল। ঘৃণায় সে ঈষৎ দূরে সরিয়া আসিল, সকোপে বলিল,—"না, আমি দেবতার। পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী। আপনি আমায় অমন কথা বলিবেন না।"

"বটে? আমি বলিব না,—আর রাজা যখন বলিতেছিলেন, তখন তো শুনিতে দিব্য লাগিতেছিল?"

"তিনি অমন লোক নহেন, তিনি আমার ও সব কথা কিছুই বলেন নাই! আপনি যান, নহিলে আমি বড়ঠাকুরাইনকে সব কথা বলিয়া দিব।"

পুরোহিত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কি বলিবে? চিরকালই এই প্রথা,—দেবদাসীমাত্রেই চিরদিন ধরিয়া পুরোহিতেরই সম্পত্তি—এ কথা কে না জানে? তোমার বড়ঠাকুরাইনই কি দেবদাসী ছাড়া? পুরোহিতের পত্নীপদ বড় নগণ্য নয়। বেশ আজ আমি চলিলাম! রাজার আশা ছাড়িয়া এখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও। কা'ল যেন তোমায় এ সব দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামাইতে না দেখি। তুমি আর কাহারও নও,—তুমি কেবলমাত্র আমার।"

ইন্দ্রজালে সব যেন কেমন পরিবর্তিত হইয়া গেল। স্বর্গযাত্রী চাহিয়া দেখিল,—কোথায় স্বর্গ? সে রসাতলে! সে দেবতার দাসী ছিল, তাহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না,—দেবতাই তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কোথায় সেই দেবতা! তিনি তাঁহার মন্দিরে ভক্ত, সাধকের পূজা গ্রহণে ব্যাপৃত, আর সে, দুর্বলচিত্তা মানবী, নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব নিঃসহায়! কাতর অবসাদে তাহার শরীর-মন যেন এককালে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

এক গৃহস্থ রমণী কোলের সন্তান লইয়া ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। নিত্যই সে আসে,—কোন দিনই তাহার আসিবার ভুল হয় না, সে দিন আসিয়া হাস্যরহস্যময়ী সুবেশ-ভূষিতা এই চঞ্চলা হরিণীকে মন্দিরে একাকিনী স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ধীরে ধীরে সে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগো, তোমার কি হয়েছে ?"

শিশু কলহাস্যে ডাকিল, "মা-ম্‌-মা !"

বিশোকা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল। আহা, কি সুন্দর,—কি নধর কান্তি, এই সহাস শিশু! সাগ্রহে দুই বাহু বাড়াইয়া সে শিশুকে মুহূর্ত্তে তাহার মাতৃ-অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া লইল। শিশু কলহাস্যে মুখে মুখ দিয়া ডাকিল, "মা!" আহা কি মধুর! কি মধুর এই মাতৃ-সম্বোধন রে! প্রাণ যে ইহার তালে তালে নাচিয়া উঠে, বুক যে একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া জুড়াইয়া যায়! চুম্বনের পর চুম্বনে শিশুকে সে বিব্রত করিয়া তুলিল।

নারী কহিল, "তুমি খুব ছেলে ভালবাস বুঝি ? আচ্ছা, এখন ওকে দাও। কেউ আবার দেখবে,—লোকে হয় তো এতে আমাদের নিন্দা করতে পারে।"

এ কথার কূট অর্থ বিশোকা বুঝিল না। শিশুকে সে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নিন্দা করবে কেন ?"

"তা করবে না! তোমরা হচ্ছ নাচওয়ালী, তোমাদের সঙ্গে কি ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের মিশতে আছে ? তবে তুমি কি না নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর দেখতে বড় সুন্দর, কাজেই তোমায় একটু ভাল না বেসে থাকা যায় না। আহা, এ ব্যবসা না ক'রে যদি বিয়ে করে ঘরসংসার করতে তো কেমন হতো! দেখ দেখি, মেয়েমানুষ হয়ে এমন পোড়া কপাল! তোমাদের বুঝি বিয়ে থাওয়া হয় না ?"

"পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী।"

"ও মা! মানুষের আবার কখনও ঠাকুর স্বামী হয় বুঝি ? ও তো কোন কাজের কথাই না, আসলে হচ্চো তোমরা নাচনেওয়ালী! বড় ছোট কাজ বাপু, রূপ বেচা মন্দিরে বসে! বুকের পাটাও তোমাদের খুব বাপু! ভয় করে না ?" বলিয়া বিশোকার শিথিল বাহুমধ্য হইতে শিশুকে টানিয়া লইয়া জননী চলিয়া গেল।

পিঙ্গলেশ্বর! এই তাহার পদ ? ইহা লইয়াই সে এত দিন নিজেকে দেবীত্ব দান করিয়া আপনাকে এত উর্দ্ধে রাখিয়াছিল! সে নর্ত্তকী! গৃহস্থ

ধু ঘৃণায় তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে চাহে না। পবিত্রতম শিশুদেহও তাহার পিপাসাতপ্ত বক্ষস্পর্শে কলঙ্কিত হয়? কি দুর্বিসহ এ জীবন! পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী—না, কোথায় স্বামী? তুমি দেবতা! দেবতার সহিত মানুষের এ পার্থিব জগতে বাসনা, কামনাময় এই মানব জীবন কিসের সম্পর্ক? পিতা-মাতা নাই, স্বামী নাই,—সন্তানও থাকিবে না! গৃহ, বান্ধব, আরামস্নিগ্ধ –সেবাশীতল একটি মৃত্যুশয্যাও তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না! তবে হায়, কিসের আশা আছে? কিছুরই না! সে দেবতার নহে, মানবেরও নহে, শুধু দেবনামে উৎসর্গিতা, মানবের ক্রীড়াদাসী মাত্র! হায় মহারাজ! হায় ক্ষুদ্র শিশু! এ অনভিজ্ঞ শূন্যতার মধ্যে এ কি দুরন্ত ক্ষুধা আজ তোমরা জাগাইয়া দিয়াছ! এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার মধ্যে এমন শূন্য জীবন লইয়া কি মানুষ কখনও বাঁচিতে পারে?

সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে লতামণ্ডপের অন্তরালে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে রাজা ডাকিলেন, "বিশোকা।" কেহ সাড়া দিল না। রাজার প্রাণ কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সহসা কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া তিনি আবার ব্যগ্রস্বরে ডাকিলেন, "বিশোকা—"

সহসা দূর হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিল। বিস্ময় উত্তেজনার বিমিশ্র ধ্বনি! কোলাহল লক্ষ্য করিয়া সতর্ক ধীরপদে রাজা অগ্রসর হইলেন। মন্দিরের নিকট আসিয়া তিনি দেখিলেন, দ্বারের নিকটে অত্যন্ত ভিড় জমিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজ আরতির শঙ্খঘণ্টা এখনও বাজিয়া উঠিল না, কেন? ভক্তবৃন্দের সে বন্দনা-গুঞ্জনও তো কই শুনা যায় না! কেন, কেন? ব্যাপার কি? দ্বারসমীপবর্ত্তীদের প্রশ্ন করিয়া রাজা জানিলেন, দেবতার আরতি-পূজায় আজ দারুণ বাধা পড়িয়াছে!

সন্ধ্যার পূর্বে দেবসেবকগণ মন্দির-সংস্কারে আসিয়া দেখে,—মন্দির মধ্যে পূজার আসনে বসিয়া কনিষ্ঠা দেবদাসী বিশোকা মহাধ্যানে নিমগ্না। তাহার সে ধ্যান এখনও কেহ ভাঙ্গাইতে পারে নাই!

শ্রীশান্তা দেবী

ফুটকী

গলির মোড়ে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ী বোঝাই করিয়া সাতটি সন্তানসহ একজন প্রৌঢ়-বয়স্ক ভদ্রলোক ফুটপাথের উপর সদ্য নামিয়াছেন। গাড়ীর মাথায়ও ভাঙা তক্তাপোষ, টিনের বাক্স, দেয়াল আল্‌না, ছেঁড়া মাদুর, লণ্ঠন, বাল্‌তি, একঝুড়ি শিশিবোতল ও চটে-জড়ানো ময়লা খেরোর তোষক প্রভৃতি হরেক-রকম জিনিষ এতক্ষণ শোভমান ছিল। তাহার কিছু-কিছু এখন ছেলেদের হাতে-হাতে ঝুলিতেছে, কিছু বা গলির মুখ জুড়িয়া পথরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাড়া লইয়া গাড়োয়ানের মতদ্বৈধ হইয়াছে, তাই এত তুমুল কোলাহল। ছয় আনা পয়সায় এতগুলি সজীব ও নির্জীব মাল যে তাহার পিতৃপুরুষেরাও কেহ কখনও পার করে নাই, ইহাই ছিল গাড়োয়ানের প্রধান বক্তব্য। তবে সে মূল বক্তব্যটা যথাসাধ্য উপমা ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া শ্রবণসুখকর করিয়াই নিবেদন করিতেছিল। ছয় আনা পয়সার আবর্জনা ঘাঁটিয়া সে হাত ময়লা করিতে চায় না, শুনিয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পয়সা-ক'আনা পকেটে ফেলিয়া খুশী মনেই গলিতে ঢুকিতেছিলেন। এক দিনের বাজার খরচ ইহাতে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া এতক্ষণের বাক্‌বিতণ্ডা তাঁহার সার্থক বোধ হইতেছিল।

কিন্তু গাড়োয়ানের বৈরাগ্য বহুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না; বাবুকে ঘরমুখো দেখিয়া সে তার কোচবাক্স হইতে নামিয়া আস্তিন গুটাইয়া ছুটিল। শিশুদলে মহা আর্তনাদ পড়িয়া গেল। একটি দশ-এগার বৎসরের মেয়ে কোলে একটি বছর দেড়েকের ছেলেকে লইয়া এবং ডান হাতে দুইটা চিম্‌নি-ফাটা লণ্ঠন ঝুলাইয়া এতক্ষণ কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া হাতের লণ্ঠন-দুইটা ফুটপাথে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে বাবারে, আমার বাবাকে মেরে ফেল্লেরে ওরে কি হবে রে!"

গলির ভিতরে একটা ছোট বাড়ীর সম্মুখের রোয়াকে বসিয়া একদল ছেলে একটা দৈনিক কাগজ লইয়া জটলা করিতেছিল। তাহারা যখন এক-এক

মুহূর্তে দেশের এক-একটা সমস্যার সমাধানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় মেয়েটির তীব্র চীৎকার তাহাদের কানে আসিল। মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া মাণিকলালের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির এস। লোকটা আমার বাবাকে মেরে ফেল্‌লে।"

এমন কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ হতভম্ব হইয়া গেল। মাণিকলাল সদলে মেয়েটির পিছন-পিছন ফুটপাথে গিয়া হাজির হইল। তাহাদের দেখিবামাত্র অশ্বচালকের মর্মবেদনা আবার জাগিয়া উঠিল। মাণিকলালের বুঝিতে দেরী হইল না যে, ব্যাপার আট আনার মামলা মাত্র। সে আর কিছু না ভাবিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি টানিয়া ঠন্ করিয়া ফেলিয়া দিল। রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পড়িয়া গেল।

কিন্তু মাণিকলালের মুখ অকস্মাৎ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া সে যে চট্ করিয়া পরের হইয়া গাড়ীভাড়া দিয়া দিল, ইহাতে অপরিচিত ভদ্রলোকের যে কতবড় অপমান হইতে পারে তাহা তাহার মাথায় আসিল এতক্ষণে। সে লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিতে যাইবে অথচ কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইতে ছিল না, এমন সময় শুনিল ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিতেছেন, "আরে ছোকরা, তুমিও যেমন, খামকা কতকগুলো পয়সা নষ্ট করিলে। ওর যা পাওনা তা আমি কোন্ কালে চুকিয়ে দিয়েছি। মাঝের থেকে তোমায় ছেলেমানুষ পেয়ে কিছু লাভ ক'রে নিলে।"

মাণিকলাল খানিকটা সপ্রতিভভাবে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল বাবুটি আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাহারই পাশের বাড়ীর "টু-লেট্" লেখা ঘরখানা দখল করিতে অগ্রসর হইতেছেন। মেয়েটির মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। সে চিম্‌নিহীন লণ্ঠন-দুইটা কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত।

মাণিকলালকে দেখিয়া সে বেশ সহজ সুরেই বলিল, "তুমি কিছু জান না। বাবা মিছে কথা বলেছে, বাবা পয়সা দেয়নি।"

পিতার সম্বন্ধে সন্তানের এরূপ মতামত শুনিতে মাণিকলাল অভ্যস্ত ছিল। তবে ব্যাপারটা তাহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিলেও অবিশ্বাস্য বোধ হইল না, কারণ সে দেখিল তাহার পয়সাটা তাহাকে দিবার কোনো রকম ক্ষীণ প্রয়াসও ভদ্রলোক করিল না। বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘর গুছাইতে সে ব্যস্ত।

মেয়েটি তাহার সঙ্গে ভাব জমাইতে উৎসুক দেখিয়া মাণিকলালও তাহার কথায় নানাকথা তুলিল। তাহাকে দেখিলেই যেন কেমন গল্প করিতে ইচ্ছা

হয়। রোগা পাতলা মেয়েটি ছেলেদের মত ছাঁটা চুল, পোষাকও তেমনি, ছোট হাতের পাঞ্জাবী কোর্ত্তা ও পায়জামা। হাত দুখানি খালি, কোন গহনা নাই। চোখ দুটি আশ্চর্য উজ্জ্বল ও বড়-বড়; মুহূর্ত্ত পূর্বের ভীতির চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই; হাসি ও আলো যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু শরীর অর্দ্ধাহারে শীর্ণ, দেখিলে আট বছরের মেয়ে মনে হয়।

মাণিকলাল বলিল, "তোমার নাম কি খুকী?"

মেয়েটি খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া মাণিকলালের গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তাহার হাসি আর থামে না।

মাণিকলাল তাহার মিষ্টি গলার স্বরে পুলকিত হইয়া উঠিল। পিয়ানোর পর্দার মত মধুর কোমল স্বর; তাহার বালকোচিত বেশভূষার সহিত মোটেই থাপ খায় না। মাণিকলাল কৌতূহল দেখাইয়া বলিল, "ও কি, অত হাসছ কেন?"

মেয়েটি আরো হাসিয়া দুলিয়া-দুলিয়া বলিল "ও মা, তুমি আমার নাম জান না? সে ভ—য়া —ন—ক অদ্ভুত! আবার হাসির ফোয়ারা ছুটিল।

মাণিকলাল বলিল, "কি বলই না —"

মেয়েটি দুই হাতে মুখ চাপিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ফুট্‌কী।" তাহার পরই তাড়াতাড়ি মাণিকের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "হাস্‌তে পাবে না কিন্তু, খবর্দার বল্‌ছি।" ফুট্‌কীর চোখ-দুইটি রোষে ও কৌতুকে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিয়া উঠিল।

ফুট্‌কীর কোলের ছোট ছেলেটি এতক্ষণ গলির মুখে গাদা-করা জিনিষপত্রের ভিতর বসিয়া নির্জীব ভাবে আঙুল চুষিতেছিল। অন্য ছেলেরা একটা একটা করিয়া জিনিষ টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাইতেছিল। মাণিকলালের সঙ্গে ফুট্‌কীকে ভাব করিতে দেখিয়া তাহারও দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া উহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে কে গর্জন করিয়া উঠিল, 'মট্‌কা, ফুট্‌কী, দুনী, কুনী, ভোনা!"

ছেলেগুলি দুড়্‌-দুড়্‌ করিয়া দৌড় দিল। ফুট্‌কী "যাই বাবা", বলিয়া ভোনাকে কাঁকালে তুলিয়া লইল, কিন্তু তখনও নড়িল না। তাহার কথার জের তখনও ফুরায় নাই। সে বলিল, "তোমার নাম কি বল্‌লে না যে বড়?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার নামও তোমারই মত, মানূকে!"

ফুট্‌কী হাসিয়া বলিল, "আহা, ওটা ত ডাক নাম, ভাল নাম ত মাণিক!

আমার যে মোটে ভাল নামই নেই। ভাগ্যে ইস্কুল যাই না, তাহলে খাতায় কি লিখতুম ?”

ভিতর হইতে নাকি সুরে কে চেঁচাইয়া উঠিল, “ফুট্‌কী, ক্ষিদে পেঁয়েছে। উনুনে আঁগুন দিঁবি না !”

ফুট্‌কী এইবার পলাইল। বলিল, “যাই কুনীটার জ্বর হয়েছে, বার্লি রেঁধে দিতে হবে। তোমার বাড়ী ঐদিক্‌ পানে বুঝি ! দুপুর বেলা আস্‌ব ’খন।”

যেন তাহার আসাটা নিতান্তই দর্‌কার।

মাণিকলাল বড়লোকের ছেলে ; কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে। মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে সে ঠিক দশজনের পথ অনুসরণ করিয়া চলিত না, কারণ মানুষের সঙ্গে মেশার অভ্যাসটাই ছিল তাহার অত্যন্ত কম। সে লোকের সঙ্গে নিজে গিয়া আলাপ করিতে কি খুঁটিনাটি ঘরোয়া গল্প করিতে কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া যাইত। তাহার কথা বলা মানে ছিল হয় বক্তৃতা নয় সমস্যা-সমাধান। কোনো মানুষ তাহার সহিত কথা সুরু করিলেই, পাছে সে একটু কাছে আসিয়া পড়ে এই লজ্জায় বিব্রত হইয়া মাণিক স্বরাজ কি চরকা, কি বাল্যবিবাহ, কি বেকারসমস্যা, কি আরো কিছু উৎকট ও দুর্বোধ্য রকম রকম একটা আলোচনায় ঝাঁপাইয়া পড়িত। বেশীর ভাগ কথাই সে নিজে বলিয়া যাইত, সুতরাং কাহারও তাহার সহিত ঠিক আলাপ করিবার সুবিধা হইত না। অবশেষে কথা শেষ করিয়াই মাণিক কোঁচার খুঁটে চশমাটা মুছিতে একটা কিছু দুর্বোধ্যতর কৈফিয়ৎ দিয়া বিনা ভূমিকায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। ছোট ছেলে মেয়েরা তাহাকে দূর হইতে একটি আজব চীজ মনে করিয়া পর্যবেক্ষণ করিত, কিন্তু কেহ কাছ ঘেঁসিত না।

এত লোক থাকিতে ফুট্‌কী এই মানুষটাকেই তাহার বন্ধু বলিয়া কেন নির্বাচন করিল জানি না। মাণিক কিন্তু ফুট্‌কীকে তাহার অটল গাম্ভীর্য, অসীম লজ্জা ও অপরিসীম, মনুষ্যজাতির ব্যূহ এমন অনায়াসে ভেদ করিয়া ঢুকিতে দেখিয়া খুশী হইল। তাহার প্রাণটা এই ব্যূহের মাঝখানে পড়িয়া সঙ্গতৃষ্ণায় শুখাইয়া উঠিতেছিল। বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কেবল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সে তৃষ্ণা মোটেই মিটিত না, অথচ ছোট ছেলেমেয়েকে কেমন করিয়া যে কাছে টানিতে হয় সে বিদ্যাটা তাহার মোটেই জানা ছিল না।

ফুট্‌কী নিজেই তাহার ঘরবাড়ী খুজিয়া বাহির করিল, নিজেই যাওয়া-আসার সময় ইচ্ছা-মত ঠিক করিয়া লইল। তাহার উপর গল্পের খোরাক ত

তাহার অফুরন্ত ছিলই। মাণিক হয়ত অর্থনীতির অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতেছে ফুট্‌কী ভোনাকে টানিতে টানিতে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা ভোনাটা কি বোকা দেখেছ! তবু বলবে জিলিপি খাব। পারিনে বাপু এমন বেয়াড়া ছেলে নিয়ে।

একটু পরেই গিন্নিপনা ভুলিয়া সে মাণিকের বই টানিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিত, বলিত, "বইগুলো ফেলে দাও না। তোমার ত একশ' দু'শ' টাকা আছে। তবে আবার কেন লেখাপড়া করছ?"

মাণিক বলিত, "কে বলেছে আমার একশ' দু'শ' টাকা আছে?"

ফুট্‌কী বলিত, "আহা, আমি যেন আর কিচ্ছু বুঝি না। তোমার কি পঞ্চান্ন টাকা মাইনে? তুমি কি গরীব লোক? তা' হলে তোমার ঘরে কেন টেবিল চেয়ার, তুমি কেন পেয়ালাতে চা খাও? তোমার যে হাতে ঘড়ি বাঁধা আছে। বাবার ত নেই, দাদারও নেই। কখখনো তোমার পঞ্চান্ন টাকা মাইনে নয়।"

ফুট্‌কীর কাছে মাণিক ছিল ঐশ্বর্যের, বিদ্যার, সৌন্দর্যের, এমন কি আচার ব্যবহারেও আদর্শস্থল। এহেন মানুষকে বন্ধুরূপে দখল করিতে পারাকে সে গর্বের বিষয়ই মনে করিত। সাধারণ শিশুমহলে ততটা না হইলেও তাহার ভ্রাতৃমহলে এইজন্য তাহার একটা খাতির ছিল।

সাতটি সন্তান রাখিয়া ফুটকীর মা আজ ছয়মাস হইল সংসারের মায়া কাটাইয়া গিয়াছেন, তখন হইতে এই দশ বছরের মেয়েটিই হইয়াছে বাড়ীর গৃহিনী। গৃহকর্তার মাসিক বেতন ছিল পঞ্চান্ন টাকা, অবশ্য উপরি পাঁচ-দশ টাকা এদিক্ ওদিক্ হইতে তিনি যে সংগ্রহ না করিতেন তা নয়। কিন্তু তাহাতেও সাতটি ছেলেমেয়েকে খাইতে পরিতে এবং থাকিতে দিতে ভাল করিয়া কুলাইত না। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গৃহিণীটির সহায়রূপে কোনো দাসী-চাকরের বালাই ছি না। উপরন্তু অর্থের অভাবে এত বয়সেও তাহার সাজপোষাক ছেলেদের মত থাকিয়া গিয়াছিল।

তাহাতে ফুট্‌কীর আপত্তি ছিল না; কারণ শাড়ী পরিয়া হাঁড়ি নামাইতে ছেলে কোলে করিতে এবং মধ্যে-মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া এ-বাড়ী সে-বাড়ী লাফ-ঝাঁপ করিতে তাহার অত্যন্ত অসুবিধাই হইত। গায়ের জামার উপর প্যাঁচ দেওয়া শাড়ীর অনাবশ্যক অংশটা ক্রমাগত গড়াইয়া পায়ে আসিয়া জড়াইত, পায়ে পায়ে হোঁচট্ খাইতে হইত। কাজেই শাড়ীর দুঃখে সে মোটেই কাতর ছিল না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাহার দুঃখের অভাব ছিল না। ভোর না হইতে ভোনা কান্না জুড়িয়া দিত, মট্‌কা তাহার খাটো চুল ধরিয়াই হ্যাঁচ্‌কা টান্‌ দিত, "ওঠ না বাঁদ্‌রী, রান্না কর্‌তে যে বেলা হয়ে যাবে।" কুনী নাকি সুরে কাঁদিয়া উঠিত, "আগে আঁমি বাঁলি খাঁব।" চুনী বিনা বাক্যব্যয়ে লেপের ভিতর হইতে নিষ্ঠুর ভাবে তাহার পা ধরিয়া টান দিত; আর সকলের বড় ভাই মিষ্টু ফুট্‌কির বহু-যত্নে-সঞ্চিত দুই-চার আনা পয়সা, কি টিনের বাক্স, ছোট আর্সী কিম্বা রঙীন ফিতাগুলি আত্মসাৎ করিয়া সকলের আগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। ফুট্‌কীর ইচ্ছা করিত বিছানাটা আর একটু আঁক্‌ড়াইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু ঢালা বিছানায় সব-ক'টি ভাইএর সঙ্গে তাহাকে শুইতে হইত, সুতরাং তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে তাহার নিস্তার পাওয়া শক্ত ছিল। কাজ করিবার ও আপনার ধনদৌলত সাম্‌লাইবার জন্য আলস্য তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইত।

তবুও তাহারই মধ্যে এক একদিন সে পাখীর মত হঠাৎ কখন যেন উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইত। সারা বাড়ী খুঁজিয়াও তাহাকে না পাইয়া মট্‌কা আসিয়া মাণিকলালের ঘরে দেখিত ফুটকী ভোনাকে কোলে করিয়া সকাল বেলা বেশ দিব্য আরামে চেয়ারে পা ঝুলাইয়া ডিমভাজা খাইতেছে। মটকা আসিয়া পড়িলে অবশ্য ভাগ পাইত; কিন্তু মাণিকলাল চশমা তুলিয়া পরিয়া তৎক্ষণাৎ এমনই কাজের ভাণ করিয়া ভোজে মন্দা পড়াইয়া দিত যে নবাগত অতিথি মোটেই খুশী হইত না। সুতরাং সে রাগে ও হিংসায় জলিয়া গায়ের জোরে ফুট্‌কীকে টানিতে টানিতে বাড়ী লইয়া যাইত আর বলিত,"বাবা বলেছে আজ পাড়াবেড়ানি-মেয়েকে মেরে পিঠের ছাল তু'লে দেবে।"

মিষ্টু সচরাচর বাড়ীতে থাকিত খুব কমই, কিন্তু যদিই বা কোনদিন অসময়ে হঠাৎ আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে সেও মট্‌কার সহায় হইয়া ফুট্‌কীকে শাস্তি দিবার নানা অভিনব উপায় আবিষ্কার করিত।

ফুট্‌কী কিন্তু দমিত না। ছাড়া পাইলেই আবার ছুটিয়া আসিয়া মাণিকলালের বাড়ী হাজির হইত এবং বলিত, "ওরা আমাকে ধ'রে-ধ'রে ছেঁচ্‌ছিল। আচ্ছা দাঁড়াওনা, বড় হ'লে আমিও ওদের ধরে ছেঁচ্‌ব, ওর সব জিনিষ কেড়ে নেব; কাল তুমি আমার পয়সা দিয়েছিলে, মিষ্টু লক্ষ্মীছাড়ী নিয়ে নিয়েছে। ওকে দাদা বলবে না কচু বলবে!"

মাণিকলাল উপহার দিবার একটা মানুষ পাইয়া প্রায় প্রত্যহই ফুট্‌কীকে

হয় লজঞ্চুস, নয় ফিতা, নয় পেন্‌শিল কলম, কি পয়সা-সিকি-দুয়ানি, কিছু-না কিছু একটা দিত। মটকা দুনী কুনীরা এই কারণে তাহার খানিকটা স্তাবক ছিল, কিন্তু মিঠু করিত জুলুম। পরদিন প্রায়ই শোনা যাইত, "আহা, মটকা বেচারী চাইলে," অথবা "কুনীটা ছেলেমানুষ, ওকে যে কেউ দেয় না," নয়ত "দাদা লক্ষ্মীছাড়া হাড়জ্বালানে আমায় মেরে কেড়ে নিলে।"

সুতরাং এত পাইয়াও ফুটকীর সম্পদ্‌ বাড়িত না।

মাণিক কলেজ যাইতেছিল, ফুটকী পিছন হইতে ডাকিল, "মাণিকদা, শুনে যাও, বিনি বল্‌ছে তুমি বেশ সুন্দর দেখ্‌তে, ও তোমার সঙ্গে বন্ধু পাতাবে।"

বিনি নাম্নী বালিকাটি ফুটকীর পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মারিয়া বলিল, "মেরে ফেল্‌ব যদি ফের একটা কথা বলিস।"

মাণিক একবার মাত্র পিছন ফিরিয়া ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের সবেণী ও অবেণী বালিকার দল দেখিয়া হন্‌-হন্‌ করিয়া ছুটিয়া গলির বাহিরে চলিয়া গেল। মেয়েরা ঠাট্টা করিয়া উঠিল, "ওঃ ভারি তোর বন্ধু রে, ডাক্‌লেও তাকায় না।"

ফুটকী রাগে অভিমানে গাল ফুলাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। একবার মাণিকের খালি বাড়ীটায় ঢুকিয়া কি সব হিজিবিজি কাটিল, তাহার পর নিজের বাড়ী চলিয়া আসিল।

বাড়ীতে এমন সময় মিঠু কোনোদিন থাকে না। সস্তা চায়ের দোকানের দরজায় দাঁড়াইয়া, যাকে-তাকে বন্ধু পাকড়াইয়া পরের পয়সায় কিছু বাসি মাছের চপ্‌ খাইয়া ও বিড়ি ফুকিয়া, ট্যাক্সী-ড্রাইভারদের সঙ্গে আড্‌ডা দিয়া গায়ে হাওয়া লাগাইয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রাত্যহিক কাজ। ইহা ছাড়াও আর তাহার যা-সব কাজ ছিল তাহাকে ভদ্র কোনো আখ্যা দেওয়া শক্ত।

ফুটকী বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিল মিঠু তাহাদের ঘরের একমাত্র আস্‌বাব বাবার তক্তাপোষখানার উপর পা তুলিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। ফুটকী বলিল, "দাদা, বাড়ী এসেছ যে। অসুখ করেছে বুঝি!"

মিঠু লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "একটু মাথা ধরেছিল সে এখ্‌খুনি সেরে যাবে।"

ফুটকী নাচিয়া উঠিয়া বলিল, "আরে দূর! মাথাধরা বুঝি অমনি সারে!

াণিকদা বলেছে ওডিকোলন দিতে হয়। দাঁড়াও আমি এনে দিচ্ছি মানিকদার নেক আছে।"

মিষ্টু বলিল, "তোর মাণিকদা বড় নবাব দেখ্‌ছি, সবই তার আছে?"

ফুট্‌কী গর্বিতভাবে মাথা দোলাইয়া বলিল, "ওমা, তা থাক্‌বে না? ওরা য বড়লোক। সব আল্‌মারী বাক্স বোঝাই প'ড়ে রয়েছে, তাতে কতো— াপড় জামা, বই, টাকা-পয়সা। ঘরে কেমন সুন্দর আলো, পাখা; তুমি ে দেখোইনি।" মিষ্টুর লুব্ধদৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "আমাকে দখাবি?"

ফুট্‌কী একটু লজ্জা পাইয়া বলিল,"তুমি এত বড় ধেড়ে ছেলে, ইংরিজী জান া, কলেজে যাও না, শুধু-পায়ে রাস্তায় বেড়াও, তোমাকে আমি মানিকদার াছে নিয়ে যেতে পার্‌ব না। আমার বিচ্ছিরী লাগে।"

মিষ্টু মুখটা বাঁকাইয়া বলিল, "ওরে আমার বিদুষী রে! তুই বড় ইংরাজী ানিস্, আর লেড-লর বাড়ীর জুতো-জামা পরিস্, না? নিজের পেত্নীরূপ দখাতে ত বেশ সুচ্ছিরি লাগে।"

ফুট্‌কি বলিল,"আমার সঙ্গে যে চেনা হয়ে গেছে,ও যে আমার মাণিকদা!"

এই যুক্তির কাছে হার মানিয়া মিষ্টু বলিল, "আচ্ছা চল্ না, চুপি চুপি দখে আসি। তোর মাণিকদাকে বলিস্ না যেন।"

গিন্নির মতো স্বরে ফুট্‌কী বলিল, "তাই চল। চাকরটাকে বল্‌ব এখন, াতে আমার লজ্জা করে না।"

মিষ্টু উঠিয়া ফুট্‌কীর সঙ্গে মাণিকের বাড়ী চলিল। চাকর তাহাদের দখিয়া বলিল, "কি খোকা দিদিমণি! বাবু নেই, উপরে কুথা যাচ্ছ?"

ফুট্‌কী বলিল, "তুই থাম্ না। তোকে অত সর্দারী কর্‌তে হবে না। ামার উপরে কাজ আছে, আমি যাচ্ছি।"

চাকরটা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ফুট্‌কী পরম উৎসাহে ঘর-বাড়ী দেখাইতে সুরু করিল। এই মাণিকদার পড়্‌বার ঘর। ইংরিজী বইয়ে পেন্‌সিলের দাগ দিয়ে ক্‌জামিনের পড়া এখানে পড়্‌তে হয়। তার গায়ে মাষ্টারের সব কথা লিখে াখ্‌তে হয়। কেবল একপাতা দুপাতা পড়া নয়, কলেজে অনেক পড়া দ্যায়; াদি-গাদি মোটা মোটা বই একদিনেই পড়ে।

"এই যে মাণিকদার খাবার টেবিল। এর উপর চাদর বিছিয়ে খায়, আর

বাটির ভেতরে হাত ধোয়। চাদরের ওপর জল ফেল্‌তে নেই, ছিব্‌ড়েও না। কেমন রূপোর ফুলদানি দেখেছ ? আর টেবিলের ঘড়িটা ভাখ, ওটা গান গায়।"

ফুট্‌কীর বক্তৃতা কেহ শুনিতেছিল কিনা এবং তাহার নির্দেশমত সকল জিনিষ দেখিয়া যাইতেছিল কি না, সেদিকে তাহার কোনোই লক্ষ্য ছিল না। সে আপন মনেই মাণিকের ঐশ্বর্য-সম্ভার দেখাইয়া ও তাহার বর্ণনা করিয়া চলিয়াছিল। মিষ্টু মাঝে-মাঝে "হ্যাঁরে, এটা কি, ওটা কি ?" বলিয়া তাহার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছিল বটে, কিন্তু প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বে ফুট্‌কী প্রায় সব উত্তর শেষ করিয়া রাখিতেছিল। নিজের ধন-দৌলতেও মানুষের এত গর্ব হয় না, যত তাহার মাণিকের সম্পদে ছিল।

মাণিক যখন বাড়ী ফিরিল, তাহার অনেক আগেই ফুট্‌কী ও মিষ্টু চলিয়া গিয়াছে। মাণিক আর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল পড়িবার টেবিল জুড়িয়া ফুট্‌কী খড়ি দিয়া বড়-বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, "মাণিকদা বড় দুষ্ট। আমার কথা শোনে না ; মাণিকদার সঙ্গে আড়ি, এক শ', দুশ' তিন শ' বার।" তাহার পর টেবিলে ১ এর পিঠে যতগুলি ০ ধরে তত শূন্য দিয়া লিখিয়াছে, "যার চেয়ে বেশী বলা যায় না ততবার।"

সকালে ফুট্‌কীর ডাকে সাড়া না দিয়া চলিয়া যাওয়ার অপরাধেই যে তাহার এই শাস্তি হইয়াছে বুঝিয়া মাণিক হাসিল। কিন্তু তখন রাত হইয়াছে, রাগ ভাঙাইতে যাইবার মত সময় নয় এবং বাড়ী গিয়া ফুট্‌কীকে ডাকাডাকি করা কোনোদিন তাহার অভ্যাসও ছিল না, তাই মাণিকলাল শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া মাণিকলাল চাকরটাকে ডিম কিনিতে পয়সা দিতে যাইবে দেরাজে টান দিয়া দেখিল খুচরা পয়সাগুলো পড়িয়া আছে কিন্তু পাঁচখানা দশ টাকার নোট নাই।

মাণিক বিস্মিত হইল। চিরকাল খোলা দেরাজে কিম্বা পড়িবার টেবিলের উপর চিঠি-পত্রের সঙ্গে টাকা ফেলিয়া রাখাই তাহার স্বভাব ; কিন্তু কখনও এ একপয়সা তাহার লোক্‌সান হয় নাই। আজ হঠাৎ এতগুলো টাকা গেল কোথায় ? মাণিক চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, "এই লক্ষ্মীছাড়া, দিন-দিন বুঝি তোর বিদ্যে বাড়্‌ছে ? দেরাজ থেকে টাকা কোথায় রেখেছিস্ ?"

সে বলিল, "রাম রাম, বাবুজি, ই সরমকে বাত ! টাকা আমি লিলে গলা দিয়ে খুন উতারকে মর্ যাব না !"

মাণিক বলিল, "তুই নিস্‌নি ত কি ভূতে এসে নিয়ে গেছে নাকি ?"

"চাকরটা বলিল, "খোকী দিদিমণি এসেছিল, আর সেই চোট্টা বাবুটা এসেছিল! ওই বদ্‌মাসোয়া লিয়ে হোবে।"

মাণিক কিছু বলিল না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ফুটকী একহাত কয়লা মাখিয়া দরজার কাছে একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল। মাণিক কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। খানিক পরে শুনিল, ভোনাকে স তর্জন করিয়া বকিতেছে, "না গো না, অত নোলায় কাজ নেই! আর ডিম খায় না; হ্যাংলা ছেলে কোথাকার! মাণিকদার সঙ্গে আমি আড়ি করে দিয়েছি।"

তাহার আড়ির খবরটা মাণিক যদি ভুল করিয়া না পড়িয়া থাকে, তাই ভোনাকে ধরিয়া আনিয়া মাণিককেই যে খবরটা শুনান হইতেছে তাহা বুঝিতে মাণিকের দেরী হইল না। একটা সন্দেহের চাপে মনটা তাহার ক্লিষ্ট হইয়া থাকিলেও ফুটকীর ব্যবহারে সে তাহাকে না ডাকিয়া পারিল না। সে ডাকিল, ফুটকী শুনে যাও।"

ফুটকী খাটো চুলগুলা তুলাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "সক্কালবেলায় তোমার ডাকাডাকি শুন্‌বার আমার সময় নেই। আমার কাজ আছে; এত-গুলো রাক্ষসের ভাত জোগাতে হবে না?"

মাণিক বলিল, "হবে ত হবে! দরকারী কথা আছে শুনে যাও।"

ফুটকী যেন কতই অনিচ্ছাভরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মাণিক একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "ফুটকী, কাল দুপুরে কাকে সঙ্গে করে এনেছিলে!"

ফুটকী একটু চম্‌কাইয়া উঠিল; মাণিকদাকে বলিতে যে মিষ্টু বারণ করিয়া দিয়াছে। তাছাড়া মিষ্টুর কথা বলিতে তাহার নিজেরও ভাল লাগে না। ফুটকী বলিল, "কাউকে না। একাই এসেছিলাম। কেন আমি লিখ্‌তে পারি না ভেবেছ? নিজেই লিখেছিলাম।"

মাণিক ভাবিয়া পাইল না, মিষ্টুকে আনিয়া থাকিলে ফুট্‌কী কেন তাহা লুকাইতেছে। তাহার কি এই ব্যাপারে যোগ থাকা সম্ভব? না, চাকরটা নিজের দোষ এই উপায়ে পরের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিতেছে। সে বলিল, "না, তার জন্যে নয়। কতকগুলো টাকা পাচ্ছি না। কেউ যদি ভুল করে নিয়ে থাকে, তাই ভাব্‌ছি।" ফুট্‌কী মুখটা লাল করিয়া বলিল, "সত্যি নাকি? ওমা, কি হবে?"

সে আর দাঁড়াইল না। হন্‌-হন্‌ করিয়া সেখান হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল, মাণিক তাহার রকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সারাদিনের মধ্যে ফুটকীর আর দেখা পাওয়া গেল না। মাণিক একবার ভাবিল গিয়া খোঁজ করিবে। কিন্তু পুলিশের মত আজকার দিনে বাড়ীচড়াও হইতে তাহার লজ্জা করিল। সে-কাজে-অকাজে যতবার বাহিরে যাওয়া-আসা করিল, ততবারই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিল, কি জানি যদি ফুটকী আসিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, অথবা যদি চাকরটা তাহাকে ঘরে ঢুকিতে না দিয়া থাকে।

গলির মধ্যে ভোনা ধূলায় একলা বসিয়া মুঠা মুঠা ধূলা গায়ে মাখিতেছিল ও চাল-ডালের খুদ কি কাঁকর-বালি যাহা পাইতেছিল, তাহাই খুঁটিয়া খুটিয়া মুখে পুরিতেছিল। আজ তাহাকে আগ্‌লাইবার কেহ নাই। দুনী ও কুনী দুই-টুক্‌রা শুক্‌নো রুটি হাতে করিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছিল, মাণিককে দেখিয়াই পলাইয়া গেল। মটুকা একটা গলাভাঙা বোতলে তেল কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, সেও যেন কোনোপ্রকারে মাণিকের চোখ এড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মাণিক যখন বিছানায় শুইয়া বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন হঠাৎ কে যেন তাহার দরজা ঠেলিল। মাণিক ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল মনে হইল যেন ফুট্‌কী বাহির হইতে ডাকিতেছে, "মানিক-দা, দরজাটা খোল।" এমন মিহি গলায় ফুট্‌কী কখনো ত ডাকে না। মাণিক অবাক হইয়া গেল। খানিক পরে বলিল, "দরজা খোলা আছে, ঠেলে এস।"

কি রকম যেন চোরের মত চুপি চুপি ফুট্‌কী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার গতিতে হরিণ-শিশুর মত সে চাঞ্চল্য নাই, কথায় হাসির সে উচ্ছ্বাস নাই, চোখের দৃষ্টিতে শরতের আলোর মত সে দীপ্তি নাই; একদিনে কে যেন তাহার ফুটন্ত প্রাণ দুই পায়ে দলিয়া দিয়াছে। মাণিক উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ফুট্‌কী, কি হয়েছে ভাই? এত রাত্রে কেন?"

ফুট্‌কী হঠাৎ ঝাঁপাইয়া আসিয়া মাণিকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মাণিক-দা, আমি মিছে কথা বলেছিলাম। বাবা মিছে কথা বলে, দাদা মিছে কথা বলে, তবে আমি কেন বল্‌ব না? মিষ্টু পাজিটা চুপি চুপি এসেছিল আমার সঙ্গে।"

মাণিক বলিল, "এত রাত্রে না বলে কাল সকালে বল্‌লেই ত হত।"

ফুটকী গলার স্বর নামাইয়া, বলিল, "ওরে বাবা, সকালে যে আমাকে বন্ধ ক'রে রাখবে! আজ সারাদিন আমায় বন্ধ করে রেখেছিল। মাণিক-দা, মিষ্টুটা বড় লক্ষীছাড়া ও তোমার টাকা চুরি করেছে, আমি বুঝতে পেরেছি। ওটাকে বলেছিলাম তাই আমাকে হাত-দুটো বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছিল, কেবল বুড়ো আঙুল-দুটো মাটিতে ঠেকেছিল। উঃ এমন মেরেছে জান না। আবার বাবাকে বলেছে আমি নাকি বদ্‌ ছেলেদের সঙ্গে মিশি। বাবা আমাকে তার উপরে বিছুটি দিয়ে মেরে সারাদিন ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছিল। বলেছে, "কোথাও বেরোতে পাবি না।" রাত্তিরে খাবার সময় ছেড়ে দিয়েছিল। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই দরজা খুলে পালিয়ে এসেছি।" ফুট্‌কী হঠাৎ নিজের পা দুইটা ধরিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "মাণিকদা তোমার সেই ভাল ওষুধটা দাও না ভাই; পায়ে বড় ব্যথা, গায়ে বড় জ্বালা। আমি হাঁটতে পারছি না।"

মাণিক তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া ওষুধ পাড়িয়া ফুট্‌কীর হাতে পায়ে লাগাইতে বসিল। তাহার সর্বাঙ্গে উঁচু উঁচু হইয়া সারি-সারি কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। দুষ্টু দুষ্টু হাসি-হাসি মুখখানা একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে।

পাহাড়ে-ঝরণার মত দুরন্ত মেয়েটির এমন চেহারা দেখিয়া মাণিকের চোখে জল আসিল। মাণিক বলিল, "চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি। তা না হলে জান্‌তে পার্‌লে আবার তোমায় ওরা শাস্তি দেবে।"

ফুটকী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, "মাণিকদা, তোমার মালা আছে?"

মাণিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন রে?"

ফুটকী বলিল "তা হ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে। আমাকে আর যেতে হবে না। আমি ওখানে যাব না, আমার ভয় করে। মিষ্টুটা আমাকে মেরে ফেল্‌বে। বলেছে, যদি আমার নাম করিস্‌ তবে খুন ক'রে ফেল্‌ব।"

মাণিক বলিল, "আচ্ছা, মিষ্টুকে নাই বা বল্‌লে এ-সব কথা। সে কেমন খুন করে, আমি দেখে নেব। তারপর একদিন আমি ভাল মালা কিনে আন্‌ব। আঁধার ঘরে বিয়ে হবে না, অনেক আলো জেলে ভাল করে বিয়ে হবে।"

শ্রীসীতা দেবী

বনিয়াদী ঘর

অনন্ত গুহ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন গুহ-বংশের অচলা লক্ষ্মী রীতিমত চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। এককালে দেশে তাহাদের বংশের খ্যাতি এবং ধনের খ্যাতি সমানই ছিল, কিন্তু অনন্তের পিতামহ নানাপ্রকার লাভজনক ব্যবসায়ের ফন্দি করিয়া বিস্তর টাকা-কড়ি লোকসান করিয়া বসেন। তাঁহার পুত্র আদিনাথ আবার হইলেন অতি হিসাবী। যেখানে এক পয়সা খরচের প্রয়োজন তিনি সেখানে আধ পয়সা খরচ করিতেন। কিন্তু এত করিয়াও ভাঙ্গন-ধরা কূল রক্ষা পাইল না। অনন্ত বড় হইয়া দেখিল তাহার পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যে ভাঙা বসত-বাড়ী, সামান্য কিছু জমি-জায়গা, এবং বিপুল বংশ-মর্য্যাদা।

অনন্তের মা এই ভাগ্যবিপর্যয়ে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার মত হইলেন। যে ঘর চিরদিন দাস-দাসীর কলরবে মুখরিত, আজ তাহা নীরব। তাঁহাকে নিজের কাজ নিজে করিতে হয়, সারাদিন ছেলে ট্যাকে করিয়া ঘুরিতে হয়। ইহাতে তাঁহার অশান্তির শেষ ছিল না। এই অশান্তির ভাগ স্বামীকেও দিতে তিনি ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু আদিনাথ সহজে বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কেবল হাসিয়া বলিতেন, "গিন্নী, যে ছেলে বইতে এত কাতর হচ্ছ সেই ছেলেই আবার লক্ষ্মীকে বয়ে আনবে। ওর কুষ্ঠি দেখলে না? ওকে ভাল করে মানুষ করতে পারলে আর ভাবনা নেই।"

অনন্তকে মানুষ করিতে চেষ্টা যথেষ্টই করা হইল। তাহার মায়ের দু'চারখানা গহনা যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া বাড়ী বাঁধা দিয়া তাহার কলিকাতায় পড়িবার খরচ জোগান হইল। ভবিষ্যতে এই ভাঙা বাড়ীর বদলে নূতন বাড়ী এবং মায়ের দুচারখানা গহনার বদলে এক গা গহনা যে তাহাকে নিজের কৃতিত্বে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সে-বিষয়ে অনন্তের সন্দেহ ছিল না। পড়াশুনা, খাওয়া এবং ঘুমানোর অবকাশে টাকা রোজগারের কত ফন্দিই যে তাহার মাথায় ঘুরিত তাহার ঠিকানা নাই। ছুটিতে বাড়ী আসিলেও, মায়ে-পোয়ে কেবল এই আলোচনাই হইত।

মা বলিতেন, "এই তুই বি এ, টা পাশ করে নে না। তখন দেখিস, কেমন ঘর থেকে বউ আনি। সমস্ত বাড়ী সাজিয়ে আস্‌বাব, মেয়ের গা সাজিয়ে গহনা, আর থলি ভরা টাকা যে বাপে দিতে না পারবে, সে যেন আমার ছেলের দিকে না তাকায়।"

ছেলে বিনয় করিবার চেষ্টা করিয়া বলিত, "হাঁ, তোমার ছেলের জন্যে কে এত দিতে যাবে? ভারি ত বি-এ পাশ! আজকাল কলকাতায় এক গলিতে দশ-বারোটা করে বি-এ পাশ বসে থাকে।"

মা বলিতেন, "তা না হয় আছে, কিন্তু সকলের বংশ কি তোদের মত? এ বংশে একটা ছেলে জন্মানোও যা, ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা থাকাও তা। এর কম নিয়ে এ বাড়ীতে কোনো বউ আসেনি, জানিস্? তোর দাদামশায়ের ব্যবসা ফেল পড়ল কিসে? আমার বিয়ে দিতে গিয়ে না? কিন্তু এর জন্যে একটা হায় হুতাশ মুখ দিয়ে কখনো কেউ শোনে নি তাঁর। কাজের মত কাজ করে গেছেন।"

অনন্ত মায়ের কথা বিশ্বাস করিত। কাজেই নিজেকে বহুমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করা তাহার অভ্যাস হইয়া গেল।

বি-এ পাশ যথাসময়েই সে করিল। তখন মাতা মহালক্ষ্মী চারিদিকে ঘটক-ঘটকী লাগাইয়া দিলেন। মেয়ের বাপের টাকার থলি যেন তাহারা আগে দেখে, পরে অন্য সব কিছুর খোঁজ।

বাংলা দেশে কনের দুর্ভিক্ষ কোন দিনই নাই, যেমন ফরমাস কর, কোথাও না কোথাও পাওয়া যাইবে। কাজেই ধনবান কন্যার পিতার সন্ধান অনেকেই মিলিতে লাগিল।

এক জায়গায় কথাবার্তা চলিতে লাগিল। মেয়ে দেখিতে মন্দ নয়, বয়স তেরো-চৌদ্দ। মহালক্ষ্মী বলিলেন, "তার মানে ষোল-সতেরো, একেবারে ধাড়ী হয়ে গেছে যে। এত বড় মেয়ে বাগ মানান শক্ত। শেষে ছেলেটাকে না পর করে দেয়।"

আদিনাথ বলিলেন, "এ বংশের ছেলে কখনো স্ত্রীর আঁচল ধরে চলে, শুনেছ? দেনাপাওনায় যদি না ঠেকে ত মেয়ের বয়সের জন্যে ঠেকবে না।"

মেয়ের পিতা রাজী হইয়া গেলেন। মহালক্ষ্মী আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। ক্ষমতা থাকিলে বিবাহের দিনটাকে তিনি হিড় হিড় করিয়া কাছে টানিয়া আনিতেন। তাহা যখন সম্ভব নয়, তখন তিনি পণের টাকা হাতে পাইবামাত্র

কি কি গহনা গড়াইবেন, তাহার কল্পনাতেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। কর্তা যে বলিয়াছিলেন তাহা সত্যই হইতে চলিল। এই ছেলেই আবার লক্ষ্মীকে ঘরে আনিবে। মেয়ের বাপ পাঁচ হাজার টাকা নগদ এবং গহনাগাঁটি দান-সামগ্রীতে আরো পাঁচ হাজার দিতে রাজী হইয়াছে। তাহার মেয়ে ঐ একটিই, কাজেই তত্ত্ব-তালাশ ভাল করিয়াই করিবে।

কিন্তু মানুষ গড়ে, বিধি ভাঙেন। কার্যতঃ যাহা ঘটিল, তাহার সঙ্গে মহালক্ষ্মীর কাল্পনিক চিত্রের বিশেষ কিছু মিলিল না। নির্দিষ্ট দিনে ঘটা করিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া, একদল বরযাত্রী লইয়া আদিনাথ ছেলের বিবাহ দিতে বাহির হইয়া গেলেন। মহালক্ষ্মী প্রতিবেশিনীদের লইয়া জমকাইয়া গল্প করিতে এবং বউভাতের আয়োজন করিতে বসিয়া গেলেন। বংশের উপযুক্ত ভাবে বৌভাত করিয়া সব মাগীকে দেখাইতে হইবে যে, মরা হাতীও সওয়া লাখ।

বিবাহ, বাসি-বিবাহ হইয়া গেল, বউ লইয়া ছেলে আজ বাড়ী ফিরিবে। আত্মীয়-স্বজনে ঘর গম্ গম্ করিতেছে। বধূকে অভ্যর্থনা করার আয়োজন যাহাতে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়, সেদিকে মহালক্ষ্মী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর সারাক্ষণ সপ্তমে চড়িয়াই আছে। বাহিরে রসনচৌকী বসিয়াছে, তাহাদের বাঁশীগুলা থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, আবার নীরব হইতেছে। বধূ গৃহপ্রবেশ করিলে তখন পূর্ণ উদ্যমে বাজাইবে।

মহালক্ষ্মীর বাপের বাড়ী হইতে তাহার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী একটি মেয়ে লইয়া আসিয়াছে, আর বড় কেহ আসে নাই।

ননদে ভাজে কথা হইতেছিল।—"হাঁ ঠাকুরঝি, বউ নাকি দেখতে বিশেষ সুন্দর হয়নি ?"

মহালক্ষ্মী গরম হইয়া উঠিলেন, "কোন্ চোক্‌খাকী এ কথা বলেছে গা? তারা গিয়ে দেখে এসেছে ?"

ভাজ বলিল, "অমন কত কথা ওঠে, তাতে রাগ করলে চলে কি? অনেক দেবে থোবে শুনেছে কি না, তাই ভাবছে মেয়ের নিশ্চয় কোনো খুঁৎ আছে।"

ইহাতে মহালক্ষ্মীর রাগ আরো বাড়িয়া গেল। খুব ঝাঁজিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন গো, আমার ছেলে কি ফ্যালনা ? তাকে দেওয়া যায় না পাঁচ হাজার টাকা পণ ? কত বড় বংশ ওদের। এমন বনেদী ঘর এ অঞ্চলে আর একটা আছে ? পদ্মিনীর মত মেয়ে, দশ হাজার টাকা পণ এ ঘরে লোকে সেধে

দেবে। কেন,আমার ছেলের বিয়েই চোগখাকীরা দেখ্ছে, এ বাড়ীর আর কারো বিয়ে দেখেনি ? এ ঘরে কমটা নিয়ে কোন বাপের বেটী ঢুকেছে ?"

এমন সময়ে বাহিরে মহাশব্দে বাজনা বাজিয়া ওঠাতে বকাবকি, রাগারাগি সব থামিয়া গেল। সকলে উৰ্দ্ধশ্বাসে বউ দেখতে ছুটিল।

বউ তোলা, বরণ করার গোলমালে মহালক্ষ্মীর স্বামীকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার সুবিধা হইল না। বউ দেখিতে বিশেষ ভাল নয়, তবে কুৎসিতও কিছু নয়। ছেলের মুখ বড় ভার ভার ; মহালক্ষ্মী ভাবিলেন, বোধ হয় বউ খুব সুন্দরী না হওয়াতেই ছেলে বিরক্ত হইয়াছে। মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, মেয়েমানুষের রূপ আর ক'দিন ? দুটি তিনটি কোলে হইলেই পদ্মিনী এবং চাষানীর তফাৎ কিছু থাকে না। ধর না তাঁর নিজের কথা।

পাড়া-প্রতিবেশী যখন বউ দেখিয়া, মিষ্ট-মুখ করিয়া বিদায় হইল, তখন মহালক্ষ্মী একটু অবসর পাইলেন। শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন স্বামী গম্ভীর মুখে শুইয়া আছেন। একটা কিছু অশুভ আশঙ্কা করিয়া মহালক্ষ্মীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী গো, অমন করে শুয়ে পড়লে যে ?"

আদিনাথ বলিলেন, "শুন্লেই ত চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। কিন্তু আমি বলি, লোকের কাছে নিজেদের বোকামী প্রকাশ করে লাভ নেই, চেপে যাওয়াই ভাল।"

মহালক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, তাই বল আগে।"

আদিনাথ বলিলেন, "পণের টাকা পাইনি।"

মহালক্ষ্মীর আপাদমস্তক যেন জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তবে ও উনুনমুখী বৌ নিয়ে এলে কি করতে ? বর উঠিয়ে আন্তে পারলেনা ?"

আদিনাথ বলিলেন, "কই আর পারলাম ? কনের বাপের অসুখ, হাতে ধরে কাঁদতে লাগল, তিন মাসের মধ্যে টাকা দেবে প্রতিজ্ঞা করল। না যদি দিতে পারে, মেয়ে নিয়ে যাবে, আবার আমরা ছেলের বিয়ে দিতে পারব, এ-কথা শুদ্ধ নিজের মুখে বল্লে। কি আর করি, নেহাৎ কশাইয়ের মত ছেলে তুলে আন্তে পারলাম না। বড় বংশের চাল বজায় রাখতে গেলে অনেক সময় ঠকতেও হয়। গহনা দান-সামগ্রী যা দেবে বলেছিল, তা ঠিকই দিয়েছে।"

মহালক্ষ্মী চড়া গলায় বলিলেন, "তুমি দান সামগ্রী নিয়ে ধুয়ে খেও। বেটার

বউ এক গা গয়না পড়ে বেড়াবে, দেখে ত আমার সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে যাবে। হাতের শাঁখা বাদে আর সব বেচে ছেলেকে পড়িয়েছি, ভেবেছিলুম ছেলে মানুষ হলে সব হবে। কিন্তু এমন বোকা তুমি! ছি ছি, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে। ঐ মিথ্যুক, জোচ্চোরের বেটীকে আমি কালই ঝাটা মেরে বিদায় করে দেব!"

আদিনাথ একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এত তাড়া কিসের? তিন মাস পরে টাকা না দেয়, যত পার ঝাটা মের এখন। আমি কথা দিয়ে এসেছি, কথা রাখতে হবে।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "ওরা কথা রেখেছে যে আমরা রাখব?"

আদিনাথ বলিলেন, "এ অঞ্চলে আমাদের ব্যবহার দেখে অন্য সকলে চাল-চলন শিখেছে, আমরা কারো দেখে শিখিনি!"

যতই তর্জন-গর্জন করুন কর্তার অমতে মহালক্ষ্মী বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মনকষাকষির ভিতর একরকম করিয়া বউভাত হইয়া গেল। বউ নিজের অবস্থা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিল, কিন্তু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ভিন্ন তাঁহার উপায় ছিল না। বাপের বাড়ী অনেক কান্নাকাটি করিয়া চিঠি লিখিল, তাহারা যেন এবার কথা রক্ষা করেন, না হইলে তাহার ললাটে অশেষ দুর্গতি আছে।

কিন্তু দুর্গতি জিনিষটা অধিকাংশ বাঙালীর মেয়ের ভাগ্যেই জন্মক্ষণ হইতে বেশ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জোটে, নববধূ ললিতাও বঞ্চিত হইল না। অনন্ত তাহাকে খুব বেশী যন্ত্রণা না দিক অত্যধিক আদরও কিছু করিত না। যাই হোক, ললিতা তাহার অনাদরটা গায়ে তত মাখিত না। কারণ ইহার মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা আদর মিশান থাকিত। শাশুড়ীর বাক্যবাণগুলিই হইত সব চেয়ে গুরুপাক, কিন্তু চোখের জল ফেলা ছাড়া বালিকার আর কোনো উত্তর ছিল না। শ্বশুরের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্কই ছিল না। বিনাপণে যে বউ ফাঁকি দিয়া তাঁহাদের বনিয়াদী বংশে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে তিনি মনে মনে বউ বলিয়া স্বীকারই করিতে পারিতেছিলেন না, কাজেই নীরবে উপেক্ষা প্রদর্শন করা ভিন্ন তিনিও আর কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ব্যাপার কিন্তু এইখানেই থামিল না। তিন মাসের পর টাকার বদলে খবর আসিল যে, ললিতার বাবার যায় যায় অবস্থা। টাকা সামনের বছরে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে যেমন করিয়া পারেন দিবেন, সম্প্রতি ললিতাকে যেন দয়া

করিয়া একবার পাঠাইয়া দেওয়া হয়, ছোট মেয়েটিকে দেখিবার জন্য বাপের প্রাণ অত্যন্তই অস্থির হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদে এ বাড়ীতে শোকের তুফান উঠিল না।

"নিয়ে যাক্ মিন্সে মেয়েকে, চিরদিনের জন্য নিয়ে যাক্।" মহালক্ষ্মী বধূকে ঝাঁটা মারিয়া বাহির করিবার জোগাড় করিতেছিলেন, নিতান্ত আদিনাথের বনিয়াদী চাল বজায় রাখার জেদে ললিতা রক্ষা পাইল। অনন্ত হাঁ না কিছুই বলিল না। বাপ মায়ের সুপুত্র সে, তাঁহাদের উপর কথা বলিতে পারে না। অশ্রুসিক্ত মুখে তাহার স্ত্রী যখন সত্য সত্যই বিদায় হইয়া গেল, তখন তাহার বুকের ভিতরটা একবার মোচড় দিয়া উঠিল বটে, কিন্তু শ্বশুর তাহাকে কি রকম ঠকাইয়াছে মনে করিতেই তাহার মনটা আবার কঠিন হইয়া উঠিল।

অনন্তকে বেশী দিন বিরহ-যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইল না। তাহার দ্বিতীয়া পত্নী মেঘমালা শীঘ্রই আসিয়া ঘর আলো করিয়া বসিল। এ মেয়েটি ললিতার চেয়ে দেখিতে ভাল। একবার উপসর্গ হইয়া যাওয়ায় অনন্তের দর কিছু কমিয়া গিয়াছিল, তবু সে নিতান্ত মন্দ পাইল না। এবারের শ্বশুর দেনা-পাওনা লইয়া কোন প্রকার গোলমাল করিল না। মহালক্ষ্মী মনের সুখে গহনা গড়াইয়া লইলেন। মেঘমালার প্রতি তাঁহার চিত্ত বেশ প্রসন্নই হইয়া উঠিল। মেয়েটির জন্ম নীচু বংশে হইলে কি হয়, ভাল শিক্ষা পাইয়াছে। শাশুড়ীকে দেবার মত ভক্তি করে। দিন একরকম ভালই কাটিতে লাগিল। অনন্ত সুপারিশের জোরে ব্যাঙ্কে কাজ পাইল এবং হিসাবের জোরে ক্রমেই টাকা জমাইয়া তুলিতে লাগিল। বাপ মা বাঁচিয়া কাজেই স্ত্রীকে কলিকাতায় আনিতে পারিল না। সপ্তাহে এক-দিন বাড়ী গিয়া গার্হস্থ্যের স্বাদ লাভ করিয়া আসিত, বাকি ছ'টা দিন মেশের বন্ধুদের সাহচর্যে কাটাইয়াই সুখী থাকিত।

ললিতার খোঁজখবর কেহ লইল না, তাহারাও কোনো খবর দিল না। লোক মুখে তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। কালেভদ্রে অনন্তের মনের এক কোণে কোমল একখানি মুখ এবং জলভরা দুটি চোখের স্মৃতি এক-আধবার জাগিয়া উঠিত, কিন্তু খুব বেশী আমল পাইত না।

মেঘমালা যে অত্যন্তই পয়া সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। গুহ-বংশের পড়তির দশা কাটিয়া গিয়া, আবার উঠতির দিন আসিয়া পড়িল। মহালক্ষ্মীর গহনা হইল, বসতবাড়ী মেরামত হইয়া রং ফিরাইয়া একেবারে নূতন মূর্তি

ধারণ করিল। দাসদাসী আবার ফিরিয়া আসিল। মহালক্ষ্মীর পাড়া-প্রতিবেশীর চালচলন এবং ভাল-মন্দের চর্চা করা ছাড়া কোনো কাজই রহিল না। তাহার ক্ষুরধার রসনা এবং অখণ্ড অবসরের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত থাকিত, কখন কাহার উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িবে, কিছুই বলা যায় না।

রবিবারে অনন্ত বাড়ী আসিলেই দেখিত, মা দুই চারিটি প্রতিবেশীকে লইয়া সামাজিক বিচারালয় খুলিয়া বসিয়াছেন। আসামীরা সকলেই অনুপস্থিত, কিন্তু তাহাতে বিচারকর্ত্রীদের উৎসাহের কোনোই অভাব দেখা যাইতেছে না। সকলের প্রতিই তাঁহারা দণ্ডবিধান করিতেছেন।

অনন্ত সময় এবং অর্থ, উভয় সম্বন্ধেই অত্যন্ত হিসাবী। এত সময়ের অপব্যয় দেখিলে তাহার গা গিস্‌গিস্ করিত, কিন্তু ভরসা করিয়া মাকে কিছু বলিতে পারিত না।

একদিন আর থাকিতে না পারিয়া কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলিল, "মা, ঐ বুড়ীগুলোর কি আর কাজ নেই কিছু? সারাক্ষণ দেখি তোমার কাছে বসে ভ্যান্ ভ্যান্ করছে। তোমার ত কাজকর্ম্মও আছে।"

মহালক্ষ্মী মস্ত একটা হাই তুলিয়া, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া বলিলেন, "কি আর কাজ বাছা? একটা নাতিপুতিও ঘরে হল না যে কোলে করে সময় কাটবে? তুই আমার একমাত্র ছেলে, বিয়ের ত তিন বছর হতে চল্‌ল, কই কিছু ত দেখি না?"

অনন্তের নিজের মনের এ বিষয়ে একটু সংশয় জাগিয়া উঠিতেছিল, মায়ের কথায় তাহার মনটা একান্তই ভার হইয়া উঠিল। মেঘমালা সেদিন অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীর মুখে হাসি ফুটাইতে পারিল না।

কলিকাতায় আসিয়াও অনন্ত মায়ের আক্ষেপোক্তিটা ভুলিতে পারিল না সত্যই ত এতদিন হইয়া গেল, একটা সন্তানও হইল না। হইবেই না নাকি? তাহা হইলে ত সর্বনাশ। এত বড় বংশ লোপ হইয়া যাইবে। নিরপরাধিনী প্রথমা পত্নীকে বর্জন করারই এই শাস্তি হইল নাকি? হয়ত ছেলে না হওয়ার জন্য আবার তাহাকে বিবাহ করিতে বাবা মা বলিবেন। বেচারী মেঘমালা, মেয়েমানুষের অদৃষ্ট বড় খারাপ। শাস্তি তাহারা ক্রমাগতই পাইতেছে কিন্তু দোষ অধিকাংশ স্থলে অদৃষ্টের, তাহাদের নহে।

আরো দু'চার বছর দেখা যাক্, মেঘমালার বয়স অল্পই। মা বাবা মত করিলে, এবার তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবে, ভাল ডাক্তার দেখাইবে

চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে করাইবে। আচ্ছা, ললিতাকে আবার আনা যায় না! না, মেঘমালা কখনও সতীনের ঘর করিতে রাজী হইবে না। কিন্তু সতীন তাঁহার অমত সত্ত্বেও হয়ত আসিয়া জুটিবে। তাহা হইলে যেটি আছে, সেইটিই আসুক না, অন্য আর একটির কি প্রয়োজন? ললিতা বাঁচিয়া আছে কিনা, কোথায় আছে খোঁজ লওয়া দরকার।

এ সব কথা অবশ্য অনন্ত মনে মনেই রাখিত, মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিত না। কিন্তু মেঘমালা বেশ বুদ্ধিমতী, স্বামীর মনে যে একটা ভাবনা সারাক্ষণই লাগিয়া আছে তাহা সে বুঝিতেই পারিত। ভাবনাটা যে কিসের তাহা বুঝিতেও তাহার দেরী হইল না, কারণ অনন্ত যতই চুপ করিয়া থাক না কেন, তাহার শ্বাশুড়ী চুপ করিয়া থাকার পাত্রী মোটেই ছিলেন না। তাঁহার আক্ষেপ আজকাল সময়ে অসময়ে খুব প্রবল ভাবেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাগা, তাবিজ, মাদুলি, যেখানে যাহা পাইতেছেন সব নির্বিচারে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন এবং বধূর অঙ্গে চাপাইতেছেন। দেখিয়া শুনিয়া মেঘমালারও মন অত্যন্ত দমিয়া গেল।

হঠাৎ আদিনাথ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দিন কতকের মত মেঘমালার ছেলে না হওয়ার আলোচনাও থামিয়া গেল। অনন্তকে একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিতে হইল, কারণ বাড়ীতে এমন কেহ নাই যে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা বুঝিয়া-সুঝিয়া করিবে।

গ্রামটি বেশ বড়, স্কুল আছে, হাঁসপাতাল আছে, পাশ করা ডাক্তারও একজন আছে। প্রথমে তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা চলিতে লাগিল। আদিনাথ দু' একদিন একটু ভাল থাকেন, আবার অসুখ বাড়ে, আবার কমে। সপ্তাহ খানেক এইভাবেই কাটিয়া গেল।

একদিন সকাল ডাক্তার অনন্তকে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন অনন্তবাবু, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। আপনার বাবা বৃদ্ধমানুষ, ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এখানে থাকলে তিনি সারবেন না এমন কথা আমি মোটেই suggest করছি না, কিন্তু বুড়োমানুষের বেলা extra careful হলেও ক্ষতি নেই। আপনি যদি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চান, ত এই বেলা যান। নইলে বেশী দেরী হলে হয়ত নাড়ানাড়ি করাই শক্ত হবে!"

অনন্ত অত্যন্তই দমিয়া গেল। ডাক্তারবাবু যতই চাপা দিবার চেষ্টা করুন, সে বুঝিতেই পারিল যে রোগ সাজ্যাতিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার

ক্ষমতায় আর কুলাইতেছে না। সেইদিনই এক বন্ধুর কাছে বাড়ী ঠিক করিতে টেলিগ্রাম করিল, নিজে ছুটিল ষ্টেশনে গাড়ী রিজার্ভ পাওয়া যায় কিনা দেখিতে। বউ, মা, সকলকেই লইয়া যাইতে হইবে, কারণ মহালক্ষ্মী না গিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না, এবং বউকে এখানে একলা রাখা যায় না। বাপের বাড়ী পৌঁছাইয়া আসিবারও সময় নাই। তাছাড়া রোগীর সেবার জন্যও তাহাকে খানিকটা প্রয়োজন।

সৌভাগ্যক্রমে গাড়ী বাড়ী দুই-ই পাওয়া গেল। পাল্‌কীতে রোগীকে চড়াইয়া, ঘোড়ার গাড়ীতে মাকে ও বউকে লইয়া অনন্ত যাত্রা করিল। পিছনে গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া তাহাদের জিনিষপত্র আসিতে লাগিল। এ দুঃখের ভিতরও থাকিয়া থাকিয়া অনন্তের মনে হইতে লাগিল, "এক সঙ্গে একরাশ টাকা খরচ হয়ে গেল।"

কলিকাতায় পৌঁছিয়া আদিনাথের চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হইল না। কিন্তু বৃদ্ধের আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। আর দিন দিন ভুগিয়া তিনি বনিয়াদী বংশের সকল বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। মরিবার আগেও আক্ষেপ করিয়া গেলেন, নাতির মুখ দেখিলেন না বলিয়া। মেঘমালার মনে মৃত্যুশোকের উপরে আরো একটা কি যেন আসন্ন বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

মহালক্ষ্মী ত কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিলেন। কোনো কিছুতেই তাঁহার আর সান্ত্বনা রহিল না, জগৎ একেবারে তাঁহার কাছে বিস্বাদ হইয়া গেল। অনন্ত বলিল, "চল মা, গাঁয়েই ফিরে যাই, এখানে থাকার আর কি দরকার?"

মহালক্ষ্মী প্রবল আপত্তি করিলেন, "ও বাড়ীর দিকে আর আমি তাকাতে পারব না রে। সব চোকখাকীদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, এক গা গহনা পরতাম বলে তাদের চোক টাটাত, এবার আমায় দেখে চোখ জুড়বে। তাদের কাছে এ পোড়ামুখ আর দেখাবো না রে।"

অনন্ত বলিল, "বাড়ীঘর সব ভূতের বাথান হয়ে উঠবে যে? এমন করলে কি চলে মা? আমাদের পোড়া কপাল, তাই বাবা চলে গেলেন, কিন্তু তবুও ত সংসার করতে হবে? বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করলে চলবে না মা।"

মহালক্ষ্মী একটু শান্তভাবে বলিলেন, "তুই-ই আমার ধনসম্পত্তি বাবা, তুই বেঁচে থাকলে ঢের। কার জন্যে ও সব যক্ষির ধন আগলাতে যাব? তোর ত

ছেলেপিলে কিছুই হল না। আমরা গেলে বাড়ীঘর সব মুখপোড়া জ্ঞাতিরাই ত ভোগ করবে? তাদের জন্যে আর বাড়ী সাজিয়ে রাখতে হবে না, তার চেয়ে আমাদের চোখের সামনেই ভেঙে চুরে যাক।

অনন্তের বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। সত্যই ত। কাহার জন্য সে এত করিয়া টাকা জমাইতেছে, বিষয় বাড়াইতেছে? তাহার ঘর ত নিঃসন্তান শ্মশান হইয়াই রহিল।

রাত্রে মেঘমালা বলিল, "হাঁ গা, কি ঠিক করলে? এখানেই এখন থাকা হবে নাকি।"

অনন্ত বলিল, "কি যে করি কিছু ভেবেই পাচ্ছি না। বাবার শ্রাদ্ধটা অন্ততঃ দেশে গিয়ে করতেই হবে, তারপর মা নিতান্ত রাজী না হন, ত এই-খানেই থাকার ব্যবস্থা করিতে হবে। সেটা একদিক দিয়ে ভালই, তোমাকে এখানে নিয়ে আসবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। এর পর তোমায় একটু ডাক্তারটাক্তার দেখাতে হবে।"

মেঘমালা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, ছেলে হচ্ছে না বলে?"

অনন্ত বলিল, "ওটা নিতান্ত কিছু হাসির কথা নয়। আমি মা-বাপের একমাত্র সন্তান, আমার যদি ছেলেপিলে না হয় তাহলে ত বংশই লোপ পেয়ে যাবে। সেটা কি সামান্য ব্যাপার? আমাদের বংশ একটা যা তা বংশ নয়।"

মেঘমালা বলিল, "এতদিন যখন ছেলে হল না, তখন ডাক্তার দেখালেই কি আর হবে? তুমি না হয় আর একটা বিয়েই কর।"

কথাটা সে খানিকটা ঠাট্টার ছলে এবং খানিকটা স্বামীর মন বুঝিবার জন্যই বলিয়াছিল। বলিয়াই স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। অনন্ত খুব গম্ভীর ভাবেই বলিল, "তা অদৃষ্ট যদি তেমনি হয় অবশেষে তাও করতে হতে পারে।" মেঘমালার মুখে আর কথা জোগাইল না।

অনন্তের ভাবনার সীমা ছিল না। আদিনাথের মৃত্যুসংবাদ দিতে ললিতার বাপের বাড়ী লোক পাঠান হইয়াছিল। তাহাতে জানা গেল পরিবারের কেহই আর এখন এ গ্রামে বাস করে না, বসতবাটি ভাঙিয়াচুরিয়া পড়িয়া আছে। কর্তা, গৃহিণী মারা গিয়াছেন, ছেলেরা কার্যগতিকে ভারতবর্ষের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোথায় যে কে আছে তাহার খোঁজই পাওয়া গেল না।

অনন্তের মন দমিয়া গেল। ললিতাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে অনেক দিক দিয়াই সুবিধা হইত। আর একটা বিবাহ করিলে বন্ধুবান্ধব মহলে তাহার অখ্যাতির সীমা থাকিবে না। তাহারা ত প্রয়োজনটা বুঝিবে না, উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইবে। দুই স্ত্রী বাঁচিয়া, এমন বরকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বিশেষ কেহই উৎসাহ দেখাইবে না, যতই ভাল ঘরের ছেলে হোক না কেন। নিতান্ত কোনো কারণে যাহার বিবাহ হইতেছে না, এমন মেয়েই সে পাইবে। কিন্তু মেঘমালার মত রূপবতী, গুণবতী স্ত্রী ফেলিয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার বউ লইয়া ঘর করাও খুব সুসাধ্য ব্যাপার হইবে না। মেঘমালারই বা গতি কি হইবে? মনের দুঃখে সে একটা সর্বনেশে কাণ্ড না করিয়া বসে। ললিতাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে এক ঢিলে অনেকগুলি পাখী মারা যাইত। অখ্যাতির বদলে যথেষ্ট সুখ্যাতিই হইত, অনন্তের নিজের বিবেকও তুষ্ট হইত। আর মেঘমালারও নূতন সতীন বিবাহ করিয়া আনা অপেক্ষা, পুরানো সতীনকে ফিরাইয়া আনাই বেশী পছন্দ করিত, কারণ ইহার দাবী তাহারও আগের। ললিতা আছে জানিয়াই মেঘমালার মা বাবা বিবাহ দিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারও খুব বেশী আপত্তি করিতে পারিতেন না। ললিতা মেয়েটি চমৎকার, রূপসী না হউক অনন্তের পক্ষে দুই বউকে একসঙ্গে ঘর করিতে রাজী করাও নিতান্ত অসম্ভব না হইতে পারিত। কিন্তু ললিতার কোনো খোঁজই মিলিল না। একদিন নিতান্ত অপমান অনাদর করিয়া যাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আজ তাহার সাদর অভ্যর্থনার জন্য ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেও সে আর ফিরিল না। ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী মানুষের মেলায়, সেই বালিকা কোথায় যে হারাইয়া গেল কোনো সন্ধান রাখিয়া গেল না।

দেশের বাড়ীতে গিয়া পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া মা এবং বউকে লইয়া অনন্ত আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। দিন আগেরই মতন কাটিতে লাগিল। অনন্ত মেঘমালার চিকিৎসার জন্য মুক্তহস্তে টাকাকড়ি খরচ করিতে লাগিল, মহালক্ষ্মীও অদম্য উৎসাহে মাদুলি, কবচ, অব্যর্থ মহৌষধ প্রভৃতি জোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেঘমালার আশা দিনের দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

তবু স্ত্রীর বয়স অল্পই, বলিয়া অনন্ত একেবারে হাল ছাড়িল না। আরো বছর দুই-চার দেখা যাক, তাহার পর মেঘমালাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহার

অনুমতি লইয়া, আবার বিবাহই করিতে হইবে। মেঘমালার বিন্দুমাত্রও অনাদর সে করিবে না, সেই গৃহিণী থাকিবে, নূতন বৌ তাহার পায়ের নীচে থাকিবে।

ইদানীং মহালক্ষ্মীও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর নামে তিনি হাড়ে চটিয়া উঠিতেন, কাজেই কিছুকাল তাঁহার চিকিৎসাই হইল না।

একদিন কিন্তু বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। অনন্তও বাড়ী নাই, কাজে গিয়াছে, চাকরটাও খাইয়া দাইয়া বেড়াতে বাহির হইয়াছে, ফিরিবে সেই বেলা চারিটায়। বাড়ীতে লোকের মধ্যে পীড়িতা শাশুড়ী, সন্ত্রস্তা বধূ এবং একটা বুড়ী ঝি।

শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া মেঘমালার ত ভয়ে হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ঝিকে বলিল, "ওরে কাউকে ডাক, শীগ্‌গির ওঁকে কোনো রকমে খবর দিক।"

ঝি বলিল, "কাকে ডাকব বৌমা? দুপুরে কেই বা ঘরে বসে আছে, সব আপন আপন কাজে গেছে।"

মেঘমালা আকুল হইয়া বলিল, "তবে কি হবে?" ঝি বলিল, "এক কাজ করি বৌমা, গলির মোড়ে বড় রাস্তার উপর একজন মেয়ে-ডাক্তার থাকে, খুব পশার তার, তাকেই ডেকে আনি।"

মেঘমালার ধড়ে প্রাণ আসিল, বলিল, "তাই যা শীগ্‌গির দৌড়ে যা। টাকা উনি এলে পাঠিয়ে দিলেই হবে।"

বৃদ্ধা ঝি যথাসম্ভব দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল। মিনিট পনেরো কুড়ির ভিতর আধুনিক সাজে সজ্জিতা একটি যুবতীকে লইয়া সে ফিরিয়া আসিল। ঝিয়ের হাতে ছোট একটি হ্যাণ্ড ব্যাগ।

মেঘমালাকে দেখিয়া লেডী ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "কার অসুখ? কি অসুখ? আপনার ঝি ভাল করে কিছুই বলতে পারল না।"

মেঘমালা বলিল, "আপনি এই ঘরে আসুন। অসুখ আমার শাশুড়ীর।"

লেডী ডাক্তার ভিতরে ঢুকিল। মেয়েমানুষ একে, তাহাতে অল্পবয়স্কা, মুখখানিও কোমল। দেখিয়া মহালক্ষ্মীর ভালই লাগিল, কাজেই অন্য ডাক্তারের বেলা যেরূপ প্রবল আপত্তি করিতেন এখন সে-সব কিছুই করিলেন না। যুবতী তাঁহাকে নিপুণভাবে পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিয়া ব্যাপার বুঝিয়া লইল। তাহার পর

বুড়ী ঝিকে নিজের বাড়ী পাঠাইয়া দরকারী ঔষধাদি সব আনাইয়া লইল, এবং ঘণ্টাখানিক পরিশ্রম করিয়া, মহালক্ষ্মীকে খানিকটা সুস্থ করিয়া বিদায় হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, বাড়াবাড়ি হইলে তাহাকে আবার খবর দিতে সে না থাকিলেও বাড়ীতে দু'চারজন নার্সও থাকে, তাহারা আসিয়া সাহায্য করিবে।

মেঘমালা বলিল, "উনি বাড়ী এলেই আপনার 'ফি'-এর টাকা পাঠিয়ে দেব।"

লেডী ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "তার জন্যে কোনো তাড়া নেই, যখন হয় দেবেন।" সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মেঘমালা শাশুড়ীর কাছে ফিরিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বউমা ক'টা বাজল গা খোকার আসবার সময় হয়নি।"

অনন্ত সেদিন বেশ খানিকটা আগেই আসিয়া পৌঁছিল। মেঘমালা ছুটিয়া গিয়া বলিল, "যাক্ বাঁচলাম, আগে এসেছ বেশ করেছ। মা ত যাচ্ছিলেন আর একটু হলে। ঝি বুদ্ধি করে মোড়ের কাছ থেকে এক লেডী ডাক্তার ডেকে আনল তাই রক্ষা। দেখবে চল বড় ছটফট করছেন। ডাক্তারকে কিন্তু 'ফি' দেওয়া হয়নি, তুমি এলে পাঠিয়ে দেব বলেছি।"

অনন্তের নিজের শরীর হঠাৎ বড় খারাপ লাগাতে সে আপিস হইতে ছুটি লইয়া আসিয়াছিল। এখন মায়ের অসুখের খবরে আর সব ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিতে ছুটিল।

মহালক্ষ্মী ছেলেকে দেখিয়া বলিলেন, "এসেছিস? মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে যে।"

অনন্ত বলিল, "আমার মুখের ভাবনা পরে ভেব। নিজে ত শুনছি যেতে বসেছিলে। এখন দেখলে ত চিকিৎসা না করার ফল।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "বুড়ো ত হয়েছি, আর কতকাল বাঁচব? তোকে রেখে এখন মানে মানে যেতে পারলে বাঁচি।"

অনন্ত বলিল, "তা এই লেডী ডাক্তারই দেখুক না হয়। আর কাউকে ত তুমি কাছে আসতে দেবে না। কাছেই থাকে শুনলাম, যখন দরকার আসতে পারবে।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "তা ডাক। মেয়েটা বেশ, কার মত যেন দেখতে, ঠিক করে মনে এল না।"

অনন্ত বাহির হইয়া গেল। মেঘমালাকে বলিল "গা টা কেমন জ্বর জ্বর করছে, এখন আর কিছু খাব না। একটু শুয়ে থাকি।"

মেঘমালা বলিল, "হয়েছে তা হলেই। এখন মাকে দেখি না, তোমাকে দেখি? কথায় বলে বিপদ কখনও একলা আসে না।"

অনন্ত বলিল, "কি আর করা যাবে? অসুখ তো কেউ ইচ্ছে করে বাধায় না? হলে উপায় কি?"

সত্যই তাহার বেশ পাকাপাকি জ্বর আসিল। মেঘমালা বেচারীর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, কাহাকে যে সামলায় তাহার ঠিক নাই। শাশুড়ীর সেবার ভার ঝিয়ের উপর দিলে তিনি চটিয়া যান, অথচ স্বামীর রোগশয্যা ছাড়িয়া তাহার নড়িতেও ইচ্ছা হয় না।

অনন্ত উভয়সঙ্কট দেখিয়া বলিল, "এখন আর টাকার ভাবনা ভাবলে চলে না। তোমার মিস্ মিত্রকে ডেকে একটা নার্স ই আনাও মায়ের জন্যে। ও বুড়ীটা কিছু গুছিয়ে করতে পারে না বলে মা চটে যান।"

মেঘমালা ঝিকে দিয়া আবার ডাক্তার মিস্ মিত্রকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি আসিলে নার্সের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া, তাড়াতাড়ি স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল। একলা থাকিলে অনন্ত বড়ই মুষড়াইয়া পড়িত।

লেডী ডাক্তার গিয়া মহালক্ষ্মীর বিছানার পাশে বসিল। তিনি বলিলেন, "এস বাছা এস, একদিন দেখেই তোমার উপর মায়া পড়ে গেছে। তোমার নাম কি বলত? ডাক্তার বলে ত আর মেয়েমানুষকে ডাকা যায় না?"

লেডী ডাক্তার বলিল, "আমার নাম লতিকা মিত্র।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "বে থা হয়নি বুঝি? এই কাজ নিয়েই আছ? চোখে অত বড় চশমা যে? চোখ খারাপ নাকি?

মিস্ মিত্র বলিল, "হ্যাঁ খারাপই বটে। আপনি আজ আছেন কেমন?" সে আর মহালক্ষ্মীকে গল্পের অবকাশ না দিয়া কাজের কথা পাড়িয়া বসিল।

মেঘমালা এমন সময় আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন খোকা কেমন আছে, বৌমা?"

মেঘমালা ম্লানমুখে বলিল, "ফের ত বিকেল হতেই জ্বর উঠছে?"

লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, "রোজই এই রকম হয় নাকি?"

মেঘমালা বলিল, "হ্যাঁ, এত ওষুধ খাচ্ছেন কিছুতে ত কিছু হচ্ছে না।"

লেডী ডাক্তার বলিল, "অনেক দিনের জন্যে changeএ চলে যান। এ স
অসুখের প্রধান চিকিৎসাই হাওয়া বদ্‌লানো। সহরে এখন ওঁর থাক
উচিত নয়।" মহালক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনারও বাইরে গে
উপকারই হবে।"

মহালক্ষ্মী বলিলেন, "আমার উপকার মাথায় থাক বাছা, ছেলের অসু
শুনে অবধি গায়ের রক্ত জল হয়ে গেছে। তাকে রেখে যেতে পারলেই আমা
ঢের। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ঐ গুঁড়াটুকু আমার সম্বল" বুড়ী ঝি আসিয়
লতিকাকে বলিল, "একটি খোকা এসে আপনাকে ডাকছে মা।"

লতিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা যাই এখন। নার্স আ
কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব।"

মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকাটি কে? তুমি ত বিয়েও করিনি?"

লতিকা কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, একটি ছেলেকে পালন করেছি, সেই
আর না দাঁড়াইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মহালক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "এ সব খ্রীষ্টান ছুঁড়ীদের বিশ্বাস নেই
কার পেটে যে কি থাকে বলা শক্ত।"

অনন্তের অসুখ সারিবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তাহার ডাক্তা
অবশেষে তাহাকে মাস-ছয়ের জন্য পাহাড়ে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

অনন্ত একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। রোগ যে তাহার কি, অন্ততঃ কি
যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইবে, তাহা সে একরকম বুঝিতেই পারিয়াছিল। গুহ-বং
তাহার সঙ্গেই অবসান হইবে, এই দুঃখটাও মৃত্যুভয়ের মধ্যে থাকিয়া থাকি
তাহাকে খোঁচা দিতে লাগিল।

মেঘমালা আসিয়া বলিল, "দেখ মা বল্‌ছিলেন কি, তাঁর ঘরটায় হাওয়া বে
বেশী, তোমায় সেইখানে নিয়ে যেতে। তিনি তবু এধার ওধার ঘোরেন, তু
ত এই এক জায়গাতেই আছ।"

আপত্তি করিবার মত জোরও যেন অনন্তের ছিল না। সে শুধু বলি
"আচ্ছা।"

চাকরবাকরকে ডাকিয়া এ ঘরের জিনিষপত্র, আসবাব, সব ওঘরে চাল
করিয়া দেওয়া হইল।

সকালে মেঘমালা রান্নাঘরে স্বামীর পথ্য তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত ছি

নন্ত একলা শুইয়া ভাবিতেছিল, আর ক'টা দিন তাহার বাকি আছে কে নে? মাতার, স্ত্রীর কি ব্যবস্থা সে করিয়া যাইবে, কে তাহাদের দেখিবে?

হঠাৎ পায়ের শব্দে চিমকিত হইয়া দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল। এ ? প্রেতমূর্তি না মানুষ?

মেয়েটিও ঘরে ঢুকিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, এ ঘরে মা ছিলেন না?"

অনন্ত বলিল, "হ্যাঁ, কাল বিকেল থেকে আমি এখানে এসেছি। কিন্তু পনি কে? আমার চোখের ভুল কিনা জানি না। তুমি কি ললিতা?"

মেয়েটি চোখের চশমাটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এক কালে ছিলাম বটে। খন আমি মিস্ লতিকা মিত্র, লেডী ডাক্তার। তোমার মা কোথায় বল। কে দেখে যাই।"

অনন্ত বলিল, "কি আশ্চর্য! মা তোমায় এতদিন চিন্‌তে পারেন নি? াজ ত তুমি তাঁর কাছে আস্‌ছ।"

ললিকা বলিল, "তিনি কি আমার মুখের দিকে কোনদিন ভাল করে চেয়েছলেন? প্রথম যেদিন তোমাদের ঘরে পা দিলাম, সেদিন কেবল একবার। ারপর ত নাক অবধি ঘোমটা টেনে থাকতাম, কে আমায় দেখতে আসত? াল দিতেই তোমার মা ব্যস্ত থাকতেন। তা ছাড়া দশ বছরে মানুষের চেহারা রে বদলায়। চোখেও সর্বদা আমি নীল চশমা দিয়ে রাখি।"

এমন সময় বছর আট নয়ের একটি ছেলে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, দেখ মা, তুমি কি রকম ভোলা, ব্যাগ ফেলেই চলে এসেছ।"

ললিতা ব্যাগ লইয়া বলিল, "যা, যা, সব তাতে সর্দারি! তোকে কে াসতে বল্‌চে? বাড়ী যা।"

অনন্ত বাধা দিয়া বলিল, "ওকে থাকতে দাও, একটা ভাল করে দেখি। লিতা, এ ছেলে কার?"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া জান্‌লা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল। অনন্ত াট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "বলিল, কেন ওকে লুকিয়ে রেখেছিলে? জান একটি ছেলের অভাবে আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হতে বসেছে। মরতেও ারছি না আমি নিশ্চিন্ত হয়ে।"

ললিতা বলিল, "পরের জীবন ব্যর্থ করবার আগে এক মিনিটও ত তোমরা ভাব নি?"

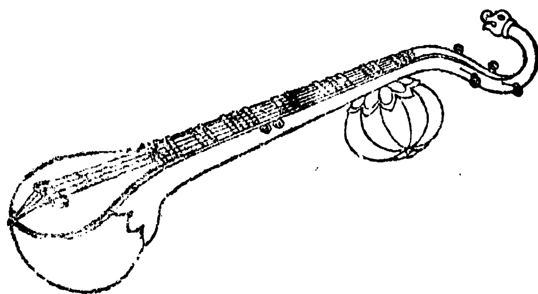
অনন্ত বলিল, "তার শাস্তি ঢের হয়েছে। এখন তুমি ফিরে এস, ছেলেকে আমায় দাও।"

ললিতার মুখ হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কে বললে ও তোমার ছেলে? ওকে আমি কুড়িয়ে মানুষ করেছি।"

অনন্ত বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

ললিতা বলিল, "হয়ত বলছি। কিন্তু সত্যি মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারবে না তুমি।"

এই বলিয়া সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুরাশা

দার্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালে আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট্ এবং আপাদমস্তক ম্যাকিণ্টশ্ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয় পর্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্য আর তো ভালো লাগে না, শব্দ-স্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণী-মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমনীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসঙ্কুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে—অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ,—কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে-রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মত আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম গৈরিক বসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিন-সঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জনতার ভারে ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম—এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মত আরম্ভ হইল, পর্বতশৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে, ইহা যে কখনো চর্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিন্‌কালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম —"কে তুমি, তোমার কি হইয়াছে?"

প্রথমে উত্তর দিল না—মেঘের মধ্য হইতে সজলদীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম, "আমাকে ভয় করিয়ো না, আমি ভদ্রলোক।"

শুনিয়া সে হাসিয়া খাষ্ হিন্দুস্থানীতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয়-ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জা-সরমও নাই। বাবুজি, এক সময় আমি যে-জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চালচলন সমস্তই সাহেবী, কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন? ভাবিলাম, এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যত নাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মত সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি! অবশেষে কৌতূহল জয়লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন্ কোন মুল্লুকে এবং নবাব গোলাম কাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কি দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না,—কিন্তু ভাবিলাম রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে!

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ কর, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ তাঁহাকে পূর্বে কস্মিন্‌কালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াসা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্টকণ্ঠে দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে!"

দেখিলাম রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলাম কাদের

খাঁর পুত্রী নুরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা নুর উলমুল্‌ক আমাকে দার্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্তী-অনতিউচ্চ পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল হইতে ম্যাকিণ্টশ্‌ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মত শুনিতে হয়—পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝর-প্রপাতধ্বনি এবং কালিদাস-রচিত মেঘদূত কুমার-সম্ভবের বিচিত্র সঙ্গীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ-কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বুট্ এবং ম্যাকিণ্টশ্‌ পরিয়া ক্যাল্‌ক্যাটা রোডের ধারে কর্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্রে উপবেশন পূর্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব করিতে পারে, এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সে-দিন ঘনঘোর বাষ্পে দশদিক্ আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোনো বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি,এক নববিকশিত বাঙালী সাহেব, দুই জনে দুই খানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুইখণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম—এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারো দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল ?"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, "কে এ-সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এত বড় প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘের অন্তরাল করিয়াছে ?"

আমি কোনরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম—কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা ত কীট মাত্র!"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান্ এবং বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোনো স্থানের কোনো নবাব-পুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে ; যদি ফরমায়েস করেন তো বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম—"বিলক্ষণ। ফরমায়েস কিসের। যদি অনুগ্রহ করেন তো শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে !"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এম্‌নিভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিয়াছিলাম—বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবিসাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্বরের মত সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোনোকালে জানা ছিল না ; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাট্‌বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল—সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল—পিতা ইতস্তত করিতেছিলেন এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহি লোকের সহিত সরকার বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনো শুনি নাই—শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ-ভাষা আমিরের ভাষা—এ যে-দিনের ভাষা সে-দিন আর নাই—আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব নিরলঙ্কার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈল-নগরী দার্জিলিঙের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল-সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেত-প্রস্তর-রচিত বড় বড় অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণ-ঝালর-খচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুর-প্রসর জামা পায়জামা কোমরবন্ধে বক্র তরবারী, জরীর জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ,—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ ; সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারী-কণ্ঠের সমস্ত সঙ্গীত যেন একেবারে এক মুহূর্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে জোড়করে ঊর্দ্ধমুখে নবোদিত সূর্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজন গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

আমি মুসলমান-বালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্মসঙ্গত উপাসনাবিধিও জানিতাম না; তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং অন্তঃপুরের প্রমোদভবনেও ধর্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধ করি স্বাভাবিক ধর্মপিপাসা দিয়াছিলেন। অথবা আর কোনো নিগূঢ় কারণ ছিল কি বলিতে পারি না।—কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার শ্বেত সোপান-তটে কেশরলালের পূজার্চনাদৃশ্যে আমার সদ্য সুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ তনুতরুণ দেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমান-দুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল, সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত—দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম পার্বন উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া বলিতাম তুই 'কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না?' সে জিভ কাটিয়া বলিত 'কেশরলাল ঠাকুর কাহারো অন্নগ্রহণ বা দান-প্রতিগ্রহ করেন না।'

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনোরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন লুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্বপুরুষের কেহ একজন একটি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন—আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহার পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্য সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেব-দেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম—শুনিয়া সেই অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দু-জগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইত। মূর্তি প্রতিমূর্তি, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম, অগুরুচন্দনমিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্ম-বেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন অতি বিস্তীর্ণ অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত—আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দু-সংসার আমার বালিকা-হৃদয়ের নিকট একটি পরম রমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহী লোকের লড়াই বাধিল। আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, 'এইবার গো-খাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর-একবার হিন্দুস্থানে হিন্দু-মুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'

আমার পিতা গোলাম কাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজ জাতিকে কোনো একটি বিশেষ কুটুম্ব সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, 'উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না—আমি কোম্পানি বাহাদুরের সহিত লড়িব না।'

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মত সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে

বলিলেন, 'নবাব সাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।'

পিতা বলিলেন, 'সে-সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।'

কেশরলাল কহিলেন, "ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।'

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না—কহিলেন, 'যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।'

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত কিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ্ এবং পুরাতন তরোয়ালগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন—এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুর্তি গোরা লইয়া আকাশে ধূলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলাম কাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ-সংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার কথায় উহারা ভাঙা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারী-হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মত বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারো দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধূলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চীৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার

বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত—কিন্তু সেদিন স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম—খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল,—সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনার তীরে আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকি-নন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পন করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম—আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উদ্বেল হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল—এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম—শুনিলাম, নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'জল'।

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বাম চক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনার জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর জল দিব?' কেশরলাল কহিলেন 'কে তুমি?' আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, 'অধীন আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা।'—মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যুকালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ-সুখ হইতে আমাকে আর কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বেইমানের কন্যা, বিধর্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম নষ্ট করিলি!' এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপালদেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন—আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী—প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি—তখনো বাহিরাকাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই—সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে—আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।"

আমি নির্বাপিত-সিগারেট এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম, কি ভাষা শুনিতেছিলাম, কি সঙ্গীত শুনিতেছিলাম জানি না—আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না—হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম—"জানোয়ার।"

নবাবজাদী কহিলেন—'কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম—"তা বটে। সে দেবতা।"

নবাবজাদী কহিলেন—"কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্র চিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!"

আমি বলিলাম—"তাও বটে!"—বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাব-পুত্রী কহিতে লাগিলেন—"প্রথমটা আমার বড় বিষম বাজিল। মনে হইল বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম—হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর, তোমার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাব-দুহিতাকে ভূলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কি মনে করিল বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোনো

ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল ;—তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম—সে নীরবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল—এবং বহু কষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়া নৌকা বাঁধা ছিল। পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল—নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্য স্রোতে গিয়া ক্রমশ অদৃশ্য হইয়া গেল—আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐক্যতান মৃত্যুর গান গাহিল ;—সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম সুন্দর শান্ত শীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও-বা কাশবন, কোথাও-বা মরুবালুকা, কোথাও-বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও-বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।"

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোনো কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল—"ইহার পরে ঘটনাবলী বড় জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি!—কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কি উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়।

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু তাহা কাল্পনিক ;—একবার বাহির হইয়া পড়িলেই একটা চলিবার পথ থাকেই। সে পথ নবাবী পথ নহে, কিন্তু পথ—সে-পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখা-প্রশাখাবিভক্ত, তাহা সুখে দুঃখে বাধা বিঘ্ন জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাব-দুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না—হইলেও সে-সব কথা বলিবার উৎসাহ আমার নাই। এককথায়, দুঃখ কষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতসবাজির মত যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না—আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের সেই চরম সুখের আলোকশিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি—আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।"

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম ; এখানে তো কোনো মতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলাম,—"বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।"

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস্ হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙিত না কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান—সেইটেই একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোনো মতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈঋর্তে, বজ্রপাতের মত মুহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়া, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দ স্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ

তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত—আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্মান্তিক উদ্বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূর দূরান্তর হইতে যে-সকল বীরমূর্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবী-বেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে তীর্থে তীর্থে মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি—কোথাও কেশরলালের কোনো সন্ধান পাই নাই। দুই একজন যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, 'সে হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে।' আমার অন্তরাত্মা কহিল—'কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই। সেই ব্রাহ্মণ সেই দুঃসহ জ্বলদগ্নি কখনো নির্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন দুর্গম নির্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্দ্ধশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।'

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে—মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে-কথার কোনো উল্লেখ নাই—তাহার একমাত্র কারণ, তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে,—কারণ, তৎপূর্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি—কিন্তু সে-কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই যে দেখিয়াছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম—ব্রাহ্মণ নির্জন স্রোত বহিয়া নিশিদিন কোন অনির্দেশ মহা রহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে—তাহার

ঙ্গী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোনো আবশ্যক নাই, সেই নির্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ;—আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম—কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে —ভুটিয়া লেপ চাগণ ম্লেচ্ছ—ইহাদের আহার ব্যবহারে আচার বিচার নাই— ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চনাবিধি সকলি স্বতন্ত্র ;—বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম আমার তরী তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কি বলিব! শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়—সে-কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কি ব্যাখ্যা করিব!

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জিলিঙে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।"

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দেখিলেন?"

নবাবপুত্রী কহিলেন, "দেখিলাম বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়া-পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী লইয়া ম্লান বস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।"

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম একটা সান্ত্বনার কথা অবশ্যক। কহিলাম —"আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে?"

নবাবকন্যা কহিলেন—"আমি কি তাহা বুঝি না? কিন্তু এতদিন আমি কি মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র? আমি

জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলো বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম? হায় ব্রাহ্মণ, তুমি ত তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাসলাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব?"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নমস্কার বাবুজি?"—

মুহূর্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল—সেলাম বাবু সাহেব!" এই মুসলমান-অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণ ভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোনো কথা না বলিতেই সেই হিমাদ্রি-শিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকা রাশির মধ্যে মেঘের মত মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাব-বালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদগদ একাগ্র মূর্তি দেখিলাম—তাহার পরে এই দার্জিলিঙে ক্যালকাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্নহৃদয়ভারকাতর নৈরাশ্য মূর্তিও দেখিলাম—একটি সুকুমার রমণী দেহে ব্রাহ্মণমুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষ-জনিত বিচিত্র ব্যাকুল সঙ্গীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দু ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ ঝলঝল করিতেছে —ঠেলা গাড়ীতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাঙালীর গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম—এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম ভূরিপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম—সেই মুসলমানব্রাহ্মণী, সেই বিপ্রবীর সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই সত্য নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষুধিত পাষাণ

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন সকল গোপন মৎলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your newspapers.' আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকমসকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষ্যে কখনো বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েৎ আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান, বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনোরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়েসফিষ্ট্ আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীটির সহিত কোনো এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে; কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা কিছু। তিনি এই অসামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তিবিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন; আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কিছু খুসি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায়

ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কি ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম-সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক ও মজবুৎ লোক দেখিয়া প্রথমে বরীচে তুলার মাশুল আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ্ জায়গাটি বড় রমণীয়। নির্জন পাহাড়ের নীচে বড় বড় বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত "স্বচ্ছতোয়া"র অপভ্রংশ) উপল-মুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মত পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেতপ্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপাদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে —নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা মামুদ্ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জনস্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকর-শীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মর-খচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার-কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল্ গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই, শাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না —এখন ইহা আমাদের মত নির্জ্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল-কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরাণী করিম খাঁ আমাকে প্রাসাদে বাস করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, ইচ্ছা হয় দিনের বেলা থাকিবেন, কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে, কিন্তু রাত্রে এখানে

থাকিবে না। আমি বলিলাম, তথাস্তু। এ বাড়ীর এমন বদ্‌নাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণপ্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ঙ্কর ভারের মত চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজকর্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব নেশা আমাকে ক্রমশ আক্রমণ করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মত আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহ-রসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যেদিন সচেতন ভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি, সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোনো কাজ ছিল না। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম-কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে;—ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙীন্ হইয়া উঠিয়াছে;—এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বন-তুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়া-যবনিকা পড়িয়া গেল;—এখানে পর্বতে ব্যবধান থাকাতে সূর্যাস্তের সময় আলো-আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম;—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া

আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোন মূর্তি ছিল না, তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও এই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শতধারার মত সকৌতুকে কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে এবং সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মত আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে এক প্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের, কি আনন্দের, কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল ভালো করিয়া দেখি কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট করিয়া শোনা যাইবে,—কিন্তু একান্ত মনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মনে হইল আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে—ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমট্ ভাঙ্গিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে এক সঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল

হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেম্‌নি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড় আশঙ্কা হইল, যে হঠাৎ বুঝি নির্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন; আমি বেচারা তূলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম, ভালো করিয়া আহার করিতে হইবে;—শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুর ঘৃতপক্ক মস্‌লা-সুগন্ধি রীতিমত মোগলাই খানা হুকুম্ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দিত মনে, সাহেবের মত সোলাটুপি পরিয়া নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া গড়্‌ গড়্‌ শব্দে আপন তদন্ত-কার্যে চলিয়া গেলাম। সেদিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না, কিন্তু মনে হইল আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল, সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম!

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটী অতি বৃহৎ। তিন সারি বড় বড় থামের উপর কারুকার্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে! এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতাভরে অহর্নিশি গম্‌গম্ করিতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল—যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পলাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে

আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখনো বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুনঠুন্‌ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক ৺ অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চারশো টাকা বেতন পাই, আমি সোলার টুপি এবং খাটো কোর্তা পরিয়া টমটম্‌ হাঁকাইয়া আপিস্‌ করিতে যাই—এ সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনি আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে আমি ৺অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমুকনাথ বটে, ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোনো মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, আমি বরীচের হাটে তুলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চারশো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসীন প্রদীপ্ত ক্যাম্প টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগ্‌লাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত আরালী পর্বতের ঊর্দ্ধদেশে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটী যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতি তুচ্ছ ক্যাম্প খাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল কালেক্টরকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া

দেখিতেছিল,—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম;—ঘরে যে কোন শব্দ হইয়াছিল—তাহা নহে, কোনো যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসঙ্কুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোনো লোককেই দেখিলাম না; তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল কে একজন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোনো কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ আঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষ-প্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ড শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনিময়, বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত এবং সে সকল ঘরে আমি কখনো যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে সংযত নিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথায় :যাইতেছিলাম, আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সংকীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেত প্রস্তররচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্বাপিতদীপ সঙ্কীর্ণ পথে কোন এক সঙ্কটসঙ্কুল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দার সম্মুখে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ পরা একটি ভীষণ কাফ্রী খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে! দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙাইয়া পর্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য-গালিচা পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটিপরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপী মখ্‌মল আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের একপার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিক পাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশপাতী, নারাঙ্গী এবং আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে একটি ছোট পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিত বক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চম্‌কিয়া জাগিয়া উঠিল—তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চম্‌কিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্‌খাটের উপরে ঘর্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি—ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগ্‌লা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যূষের জনশূন্য পথে "তফাৎ যাও" "তফাৎ যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের একরাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রির ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত-ক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম—আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের

বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ, মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতী খাটো কোর্তা এবং আঁটো প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখ্‌মলের ফেজ্‌ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া বহু যত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড় কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোনো এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কি যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্তের মধ্যে—এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারি জাফ্‌রান্‌ রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে চক্রশীর্ষ জরির চটিপরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লালটুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতিরাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় বড় আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহাজাদার মত সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল ;—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল

চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগ তীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ-কটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধাভিমুখে আবর্তিত করিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিভাইয়া দিত;—আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিত নেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কানের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারম্বার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদক বেষ্টনে আমার সর্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্ণে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সঙ্কল্প করিলাম—কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না—কিন্তু সেদিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবী হ্যাট এবং খাটো কোর্ত্তা ঝুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তানদীর বালী এবং আরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্ত্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দায় পর্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সেদিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্ত্তা এবং সাহেবী হ্যাট্ পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেই দিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার

গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর!

আমি কে! কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমান কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন্ দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদসাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল! সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম, কি ঐশ্বর্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুরি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে; শাহেন্ শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষ্যাফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগ্‌লা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হ্যায়, সব ঝুঁট্ হ্যায়!" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে; চাপ্‌রাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেই দিনই আমার

জিনিষপত্র তুলিয়া আপিস ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরাণী করীম্ খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম—মনে হইতে লাগিল এখনি কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামৎও আমার কাছে বেশি কিছু বোধ হইল না—যাহা কিছু বর্তমান, যাহা কিছু আমার চারিদিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমরা কাছে অত্যন্ত দীন, অর্থহীন, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম টম্‌টম্ ঠিক গোধূলি মুহূর্তে আপনিই সেই পাষাণ-প্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জনা চাহিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি, বলি, হে বহ্নি! যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মারিবার জন্য আসিয়াছে! এবার তাহাকে মার্জনা কর, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, ভস্মসাৎ করিয়া ফেল।

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সেদিন আরালী পর্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। জলস্থল-আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মত পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড় বড় ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস্-ঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ

অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনো সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনো ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই, কাহাকে সান্ত্বনা করিব? এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার? এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে। পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়।"

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এই ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ঐ মেহের আলিও আমার মত এক সময় প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যূষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহের আলি, ক্যা ঝুঁট্ হ্যায়রে?"

সে আমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়!"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মত আপিসে গিয়া করীম খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, ইহার অর্থ কি আমায় খুলিয়া বল।

যাহা কহিল তাহার মর্ম এই, এক সময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড

ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মত খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই?

বৃদ্ধ কহিল, একটি মাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্বে ঐ গুল্‌বাগের একটি ইরাণী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয়বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনা ঘটে নাই।

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল—গাড়ী আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ী আসিয়া পড়িল। সে গাড়ীর ফার্ষ্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই "হ্যালো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড্ ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল—গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষ্যে আমার থিয়সফিষ্ট্ আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

-শেষ—

লেখক পরিচিতি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দেশবরেণ্য শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভার মনোহারিত্বে আমরা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার কথা প্রায়শঃই বিস্মৃত হই। কিন্তু এই তীক্ষ্ণধী শিল্পী যে কত বড় একজন গল্প-কথক, কুশলী গদ্য-লেখক —রেখাঙ্কন ব্যতীত শব্দাঙ্কনের যাদুও যে তাঁর কি ভাবে করায়ত্ত, তার সীমা এখনও যথাযথ নির্ণীত হয় নি। নানা শব্দের সংমিশ্রণে, নিজস্ব অপূর্ব ভঙ্গীতে বক্তব্যকে রূপদান করে রসের মায়াজাল সৃষ্টি করতে তাঁর জুড়ি নেই। মননশীলতার দিক থেকে বা বাস্তবকল্পনাশ্রয়ী মনকে তাঁর রচনা খুব বেশি নাড়া না দিলেও, বর্ণনাভঙ্গীর দিক থেকে তাঁর আলেখ্য রূপে রঙে চিত্তের রস-চত্বরে অপূর্ব এক মায়াজাল সৃষ্টি করে। তাঁর রচিত 'আলোর ফুলকি' 'রাজ-কহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'ঘরোয়া' বা 'ভারত শিল্প' যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই উপর্যুক্ত বক্তব্য সমর্থন করবেন। 'ঘরোয়া' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'কী চমৎকার তোমার বিবরণ—শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠলো।...এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে এ রস দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে—এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে।' উপন্যাস প্রবন্ধ ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল কল্পনা কখনো অলৌকিককে আশ্রয় করে গল্পের মধ্যে রস পরিবেশন করেছে, আবার কখনও বা উদ্ভট কিছু একটা করে রূপকের সাহায্যে অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছে। রূপকথা অথচ রূপকথা নয়, বলার ভঙ্গী উপকথা ধরণের অথচ ঘটনা বাস্তব, এমন গল্পও অবনীন্দ্রনাথ অনেক লিখেছেন যা 'ভারতী'র পাঠকগোষ্ঠী আজও বিস্মৃত হন নি। তাঁর 'কোটরা', 'তোরমান', 'জন্তু-সভা' ও এই গ্রন্থের 'হীরা-কুনি' নামক ক্ষুদ্র গল্পটিও এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১ সালে জোড়াশাঁকোর ঠাকুর পরিবারে অবনীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৯১২ সালে সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ও সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টস্ নামক প্রাচ্য

শিল্প-শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতষ্পুত্র এবং বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী"র সর্বাধ্যক্ষ। শিশু ও কিশোরদের জন্যও অবনীন্দ্রনাথের বহু রচনা শিশু-সাহিত্যে অসামান্য দান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।.

অন্নদাশঙ্কর রায়—হাই-ইন্‌টেলেক্‌টুয়্যাল বলতে যা বোঝায় অন্নদাশঙ্কর হচ্ছেন তাই। বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তাদীপ্ত তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে মনের সমারোহ ও প্রাণের উৎসব সর্বত্র জাজ্বল্যমান। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে একটা বৃহত্তর পরিবেশের পরিচয় মেলে, চিন্তারাজ্যের বহু গূঢ়ৈষণার সম্মুখীন হতে হয়। জীবনের খণ্ড সমস্যা, বৃহত্তর সমস্যা, সামাজিক ঘূর্ণিপাকে নিত্য কতরূপে রূপায়িত হচ্ছে, নর-নারীর মনের-গহ্বরে নিরন্তর যে সব চিন্তা খেলা করে চলেছে, অন্নদাশঙ্কর তাঁর লিপিনৈপুণ্যে ও বলশালী প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে তা উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল আখ্যান অপেক্ষা তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের মানসতা ও বিশ্লেষণী আলাপ-আলোচনাই প্রধান হয়ে উঠে, মূল ঘটনার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে পাঠককে। অন্নদাশঙ্করের রচনা ঠিক অন্তঃপুরচারী আবেগ-প্রধান নয় বলেই সাধারণ পাঠকের কাছে তার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব হয়ে ওঠেনি সর্বক্ষেত্রে। তবু তাঁর অভিজ্ঞতা পুষ্ট মন সদর ও অন্দর দুয়েতেই নিত্য-বিহারী। সদরের সার্বজনীনতার সঙ্গে অন্দরের যোগসূত্র স্থাপনে তাঁর সক্রিয় মন এক এক সময় এমনই প্যাটার্ণ সৃষ্টি করেছে যে, কনোসিউয়ূর মাত্রেই সেখানে থমকে দাঁড়াবেন। তাঁর রচনা-কৌশলের মৌলিকতা হচ্ছে আগাগোড়া নূতনত্বের সাহায্যে পাঠকের চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখা এবং শুচিগ্রস্ত সংকীর্ণতার বাইরে গিয়ে ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ বিকশিত করা। সর্বত্রই এ ব্যাপারে তিনি যে সার্থক তা বলছি না, তবুও তাঁর সংলাপ, চরিত্র ও ভঙ্গী. ঋদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্য-সৃষ্টির স্বাক্ষর। অন্নদাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'তারুণ্য', ১৯২৮ সালে যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি আই. সি. এস পরীক্ষার ছাত্র। গল্প উপন্যাস ব্যতীত কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রবন্ধ রচনাতেও অন্নদাশঙ্কর বিশেষ পারঙ্গম। সম্প্রতি 'সত্যাসত্য' নামক পাঁচ খণ্ডের একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস তিনি শেষ করেছেন। সম্ভবত ১৩৩৯ সালে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ নামে প্রকাশিত হয়। 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা', 'অসমাপিকা —উপন্যাস; 'প্রকৃতির পরিহাস'—গল্প; 'ইশারা', 'জীবনশিল্পী', 'আমরা'—

প্রবন্ধ; 'পথে-প্রবাসে'—ভ্রমণকাহিনী ও 'একটি বসন্ত', 'কামনা পঞ্চ-প্রদীপ', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাখি' ও 'নূতনা রাধা' প্রভৃতি কবিতা তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যা বর্ধিত করেছে। উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বরে অন্নদাশঙ্করের পৈতৃক বাসভবন হলেও, তিনি ঢেঙ্কানাল রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৪ সালের ১৫ই, মার্চ। বর্তমানে বিচার বিভাগে জিলা জজের পদে যদিও নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তবুও অত্যন্ত সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে থাকেন এবং গান্ধীর অহিংস মতবাদের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তাঁর 'তিনটি প্রশ্ন' নামক গল্প (টলষ্টয়ের অনুবাদ) আনুমানিক ১৩২৬-২৭ সালে 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। অন্নদাশঙ্করের বর্তমান গ্রন্থ-সংখ্যা প্রায় কুড়িখানির উপর।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—পূর্ববর্তী যুগের গতানুগতিকতা থেকে ভাব ও ভাষাগত বহু সাংস্কারিক বন্ধনকে মুক্তি দিয়ে এবং বাহ্যিক আস্তিক্যের বিকৃত রূপকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে 'কল্লোল'এর যুগে সাহিত্যের পরিবেশে যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তার ভেতর থেকেই ঘটে অচিন্ত্যকুমারের আবির্ভাব। যতদূর মনে পড়ে 'কল্লোল'এর 'বেদে' এবং 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত 'দুইবার রাজা' নামক গল্প দুইটিই তৎকালীন রসিকসমাজে তাঁর পরিচিতির ক্ষেত্রে প্রশস্ত ও ক্ষমতাশালী লেখকের পরিচায়ক হিসাবে প্রখ্যাতি লাভ করে। অচিন্ত্যকুমারের রচনার মধ্যে যা সুস্পষ্ট, সংক্ষেপে তা হচ্ছে ল্যাণ্ডোরের 'আষ্টিরিটি', টুরইগনীভের 'ট্রান্স লিউসেন্স' এবং জোলার ন্যায় বাস্তব সমাজ চিত্রকে যথাযথ চিত্রিত করার একটা ব্যাপক প্রচেষ্টা। কিন্তু আর্ট যতটা বাস্তবতা দাবি করে অচিন্ত্যকুমার ক্ষেত্রবিশেষে তার মাত্রাকেও অতিক্রম করে 'ইন্টেলেক্ট'কেই প্রাধান্য দেন সবচেয়ে বেশি। ভাবাবেগের কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণে এলেও, লেখক তাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করার পক্ষপাতি এবং এটা বোধ হয় তাঁর অতিমাত্রার বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মননক্রিয়ারই ফল। তাঁর পূর্বাপর গল্পগুলির মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা পরিস্ফুট তা হচ্ছে একটা মানসিক-সংগ্রাম ও সমাজ-জীবনের প্রতি তাঁর সদরদ দৃষ্টিভঙ্গী। বর্তমানের বহু লেখক যেমন বহুক্ষেত্রে সমাজ-জীবনের বাহ্যিক আবরণটাকেই তাঁদের গল্পের বিষয়সর্বস্ব কল্পনা করে নিত্যতা লাভে বঞ্চিত হন, অচিন্ত্যকুমার তাঁদের সগোত্রীয় নন; তিনি অন্তঃদৃষ্টির দ্বারা ও হৃদয়বৃত্তির স্বচ্ছতায় সকল বস্তুরই অন্তস্তলে প্রবেশ করে প্রায় প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞানের দ্বারাই চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনার বিন্যাস করেন। তাই কোথাও তাঁর রচনা

অস্বাভাবিক ও অপ্রাসঙ্গিক বলে পাঠকের বিরক্তির কারণ হয় না। তবে অচিন্ত্যকুমারের মনের একটা অহংসর্বস্ব ভাব তাঁর রচনার মধ্যে প্রায়শঃক্ষেত্রেই উপলব্ধি করা যায়। এই অন্তঃর্মুখী বলিষ্ঠ অহম্‌সত্তা কখনো কখনো বহিঃর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী হয়ে সকলপ্রকার সতর্কতা ও সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও চরিত্রগুলির প্রতি সমদরদী হবার অন্তরায় ঘটায়, আবার কখনো কখনো বিভিন্ন বিশ্লেষণের কূটতর্কে নিরসতা থাকলেও নৈরাশ্যকর বিপর্যয় ঘটতে দেয় না। বর্তমানে অচিন্ত্যকুমারের গল্পের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য যেন একটা বিশেষ পরিধির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলে মনে হয়, এবং সেখানেই সৌন্দর্যবিলাসীর চেয়ে বুদ্ধিবিলাসী অচিন্ত্যকুমারকেই দেখা যায় বেশি করে। অতিমাত্রার আবেগে যেমন অনেক হেতুহীন অপ্রয়োজনীয় কথা মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি অতিমাত্রার সংযত ও কঠিন হলেও আবার সাহিত্য মানুষের মনের রসানুভূতিতে ঘা দেয় না। অচিন্ত্যকুমারের ব্যক্তিগত জীবনেও আশ্চর্যরকম double self-এর সন্ধান পাওয়া যায়। একদিকে কখনো তাঁকে মনে হয় অত্যন্ত সুরসিক, আলাপপ্রিয়, দিলখোলা মানুষ; আবার কখনো মনে হয় অত্যন্ত নিরস, অলঘুস্বভাব গম্ভীর মানুষ এবং এমনই স্পষ্টবক্তা যে অপ্রিয়সত্যও মানুষের মুখের উপর ছুঁড়ে মারতে তিনি দ্বিধা করেন না। গবর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগে থাকার দরুণ মনটা তাঁর অত্যন্ত বিচারশীল এবং সমস্ত জিনিসেরই লাভ-লোকসান ক্ষতিয়ে দেখার পক্ষপাতি। অচিন্ত্যকুমারের আবৃত্তিপটুতা তার সাহিত্য-প্রতিভা ব্যতীত আর এক বিশেষ গুণ। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত এবং বন্ধুবৎসল্য। খেলাধূলার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় অচিন্ত্যকুমার নানা ধরণের গল্প-উপন্যাস যা লিখেছেন, তার মধ্যে 'সঙ্কেতময়ী 'টুটা-ফুটা' থেকে 'প্রথম প্রেম' 'কাকজ্যোৎস্না' 'ডবল ডেকার' পর্যন্ত একট পর্যায়ের নিশানা মেলে; তারপর 'পলায়ন' 'প্রজাপতয়ে' 'যতনবিবি' পড়ে সম্পূ অন্য পর্যায়ে। ভাষাকে ভাবের অনুরাগী করে নূতনত্ব প্রকাশে অচিন্ত্যকুমার সকল সময়েই সচেতন। শব্দনির্বাচনও তাঁর স্বকীয়তার একটি বিশেষ নিদর্শন কবিতা ও অনুবাদেও অচিন্ত্যকুমারের হাত পাকা। 'অমাবস্যা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী' তাঁর উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি। 'সোভিয়েট গল্পের' মধ্যে অনুবাদব অচিন্ত্যকুমারের নিদর্শন পাওয়া যায়। লেখকের পৈতৃক বাসস্থান ফরিদপুরে হলেও ১৯০৩ সালে নোয়াখালিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৯১৮ সাল

থেকেই কলিকাতায় বসবাস করতে থাকেন। ১৯৩১ সালে অচিন্ত্যকুমার বাংলা গবর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগে নিযুক্ত হন, এবং উক্ত সময় থেকেই বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অনুরূপা দেবী—স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবীর জন্ম হয় ১২৮৯ সালে কলিকাতায় তাঁর মাতুলালয়ে। বাল্য-জীবনে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য পিতামহের নিকট শিক্ষালাভ করেন। বিবাহের পর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় লাভের স্বযোগ হয়। প্রথম জীবনে পিতা ও পিতামহের প্রেরণাই তাঁর সাহিত্য-সাধনার পথকে স্বগম করে দিতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। প্রথম দিকে অনুরূপা দেবী নানা ধরনের প্রবন্ধ রচনা ও সংস্কৃত কবিতার বহু পদ্যানুবাদ করেন। ১৯০৯ সালে "ভারতী" পত্রিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' প্রকাশিত হয়। পূর্বে যদিও তিনি বহু কবিতা গল্প রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির নিদর্শন আজ আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। প্রথম দিকে "ভারতী"তে তাঁর 'পোষ্যপুত্র' নামক উপন্যাসখানি প্রকাশিত হলেও, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালে এবং পরবর্তীকালে 'বাগ্‌দত্তা', 'জ্যোতিঃহারা', 'মন্ত্রশক্তি', 'চিত্রদীপ', 'উল্কা', 'রাঙাশাখা' এবং 'মহানিশা' প্রকাশিত হয় ক্রমন্বয়ে। এছাড়া আরও বহু গ্রন্থ তাঁর সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ বহুল প্রচারিত হয়েছে। তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে মেরুদণ্ড করে তারই পারিপার্শ্বিকে, প্রাচীনাদর্শে অনুপ্রাণিত নর-নারীর ভিড় দেখা যায় তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থের মধ্যে। তবে ঘটনা-বিন্যাসের একটা আশ্চর্য-রকম ক্ষমতা লেখিকার রচনার মধ্যে লক্ষ্যণীয়। 'জোয়ার ভাঁটা', 'পথের সাথী' এ ব্যাপারে বিশেষ প্রীতি-উৎপাদক। উপন্যাসের তুলনায় অনুরূপা দেবীর ছোট গল্পের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫ সালে তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ১৯৪১ সালে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক দানে সম্মানীত করেন। এছাড়া গত ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'লীলা লেকচারস্' প্রদানের সম্মান লাভ করেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বহু গ্রন্থের লেখক প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ স্বনামখ্যাত হলেও, শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল হিসাবে তাঁর আর আর একটি বিশেষ পরিচয় ও মর্যাদা আছে। 'যমুনা'র সাহায্যে শরৎচন্দ্রের

রচনাকে তিনিই প্রথম লোকচক্ষুর গোচরীভূত করেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করছি এই কারণে যে, প্রথম দিকে যে রচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই সন্দিহান ছিলেন, যার সাহিত্যিক উৎকর্ষতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোন চেতনা ছিল না, তারই রস উপলব্ধি করে এই উপেন্দ্রনাথই শরৎচন্দ্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। সত্যিকার রসবেত্তা না হলে, রসের উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে, এই বিচার কখনই সম্ভব নয়। উপেন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যেই এই রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্য, যেন জীবনের সর্বাঙ্গীণ সুষমার অভিব্যক্তি। জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাজ্ক্ষা, ক্ষুদ্রতা-দীনতার রূপ রস নিয়েই ত' সাহিত্য—সেখানে সমাজনীতি, রাজনীতি, দলগত বিষমতা, বিরোধ, খণ্ডতা, স্বাভাবিক ভাবে যদি আসে ক্ষতি নেই—তা না হ'লে কষ্টকল্পিত আধুনিক হবার যথেচ্ছাচারে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া যে সম্ভব নয়, উপেন্দ্রনাথ যেন তারই স্মারক। সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি বিশ্ব-মনের রঙ দিয়ে দেখেছেন —বিপুল সংসারের রহস্যময় জীবনলীলাকে দেখেছেন সুশৃঙ্খল স্বতঃস্ফূর্তির মধ্যে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এ কথায় তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী, যেখানে কবি বলছেন, 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুসঙ্গিক এবং ক্ষণস্থায়ী।' অবশ্য এই ধরণের আনুসঙ্গিক বহু বিষয়ও উপেন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করলেও, ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক উত্তেজনার তিনি পরিপন্থী। তাই বর্তমান গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য জিজ্ঞাসিত হ'লে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষার গল্প-উপন্যাসের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। তবে সাময়িক ঘটনা এবং অবস্থার ছাপ একটু মাত্রাতিরিক্ত ভাবে তার গায়ে এসে লাগছে এবং উপন্যাস সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে ইতিহাসের বুলি আওড়াচ্ছে।' উপেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে অসুন্দর ও অকল্যাণের স্থান অল্প। তাঁর নর-নারী অদম্য প্রলোভনের মধ্যে ভয়ঙ্কর মানসিক ও সাংসারিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সমস্ত সর্বনাশকে জয় করে বহুক্ষেত্রে আনন্দের দ্বারদেশে এসে পৌঁছেচে লেখকের বক্তব্যের জোরে নয়—শ্রেষ্ঠতম হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণায়। তাঁর ভাষা ও আঙ্গিক প্রাক্‌ধর্মী হলেও অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সরল ও হৃদয়গ্রাহী। প্লট রচনায় তাঁর দক্ষতা অসাধারণ বলে এবং মূলতঃ তার রচনার মধ্যে গল্পাংশই প্রধান বলে, সেগুলির চিত্র ও নাট্যরূপ দেওয়া সহজসাধ্য হয়। বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও ঋজু ব্যবহার

জীবীর-মতই তিনি শান্ত ধীর অথচ যুক্তির অকাট্যতায় মর্মঘাতি। এর উপর উপেন্দ্রনাথের শ্লেষ, অলঙ্কার ও অর্থ-তাৎপর্যের অসাধারণ মাত্রাজ্ঞান বিশেষ লক্ষণীয়। তাঁর 'রাজপথ', 'ছদ্মবেশী', 'বিদুষীভার্যা', 'অভিজ্ঞান' প্রভৃতি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন। উপন্যাস গল্প ব্যতীত প্রবন্ধ, কবিতা এবং সমালোচনাও উপেন্দ্রনাথ বহু লিখেছেন। বারো বৎসর বয়সে 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকায় 'সন্ধ্যা' নামক একটি কবিতা তাঁর জীবনের প্রথম রচনা এবং সম্ভবত ১৯১২ সালে প্রকাশিত 'সপ্তক' নামক গল্প-গ্রন্থখানিই তাঁর প্রথম গ্রন্থ। সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে উপেন্দ্রনাথ অধুনালুপ্ত মাসিক 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন, এবং এই পত্রিকার সাহায্যে এক নবতম সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। উপেন্দ্রনাথের বর্তমান গ্রন্থ-সংখ্যা প্রায় ষোলখানি এবং তন্মধ্যে অধিকাংশেরই ২য় ও ৩য় সংস্করণ হয়েছে। মানুষ হিসাবে উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সুরসিক, সদালাপী ও বিচক্ষণ। সাহিত্য ও শিল্প ব্যতীত সঙ্গীত সম্বন্ধেও উপেন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় এবং কেবলমাত্র আকর্ষণ নয়, সুর-তাল-লয় বজায় রেখে সুকণ্ঠে সঙ্গীতও তিনি করতে পারেন। উপেন্দ্রনাথ বয়সে প্রবীণ হলেও, মনে আজও তার বার্ধক্য স্পর্শ করে নি। এখনও হেসে-খেলে, সভা-সমিতিতে উপস্থিত হয়ে, গল্প-গুজব করে নিজেকে তিনি নবীনের মতই প্রফুল্ল রেখেছেন। ২৬শে অক্টোবর ১৮৮৩ সালে ভাগলপুরে উপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। একাকী পথ চলতে চলতে চিন্তাবিলাস উপেন্দ্রনাথের জীবনের এক বিশেষ আকর্ষণ।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরগুপ্তের 'এতো ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গ ভরা' কথার যাথার্থ প্রমাণে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রস গাঢ় হলে যে দানা বাঁধে, প্রবীণ বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সেই অকৃত্রিম হাস্যরসেরই দানা আমাদের সরবরাহ করেছেন। বর্তমানে এই হাস্যরসের পরিধি নানাভাবে নানাদিকে ব্যাপকতা লাভ করেছে, এবং তার অধিকারী হিসাবে নানা জন আজ এখানে স্থান গ্রহণ করেছেন। হাস্যরসকে নিতান্ত গোপাল ভাঁড়ীয় ভাঁড়ামি থেকে আভিজাত্যের মর্যাদায় তুলে ধরতে, হাস্যরসকে ব্যঙ্গরস করে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে, এবং পরিহাস কৌতুককে আধুনিক রুচির,

টাইপের, স্টাইলের, সিচুএসেনের ও সাস্‌পেন্সের সংমিশ্রণে সত্যিকার হাসিতে পরিণত করতে পরিহাসাকুশল পরশুরাম, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও পরিমল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাস্যরসাত্মক লেখায় এদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে, নিজস্ব ভঙ্গী আছে, ভাষাকে আখ্যায়িকার যোগ্য বাহন করে তোলার ক্ষমতা আছে। কিন্তু কেদারবাবুর স্বাতন্ত্র্য তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব। ঘটনায় রস কম হলে কথায় রস ঢেলে এবং কথায় রস না পেলে ঘটনার মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত টাইপ এনে, তিনি এমন সব প্রহসন-পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, যা রসিকজনকে ত বটেই, এমন কি অরসিকজনকেও অট্টহাসি হাসিয়েছে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে আধুনিক সভ্যতার দেঁতো-হাসি বা কাষ্ঠ-হাসির স্থান নেই। তাঁর নন্দীশর্মা ছদ্মনামে 'কাশীর কিঙ্কিং' ও 'ভাদুড়ী মশাই'কে এবং তস্য গিন্নীকে যাঁরা চেনেন তাঁরা এ কথার সমর্থন স্বপক্ষে এক মত হবেন। আর একটি জিনিস যেটি কেদারবাবুর রচনার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে, তাঁর হাস্যরস একেবারে নিছক গার্হস্থ্য; রাজনীতি, দর্শন, গভীর চিন্তাশীলতা বা যুক্তির জাল দিয়ে তিনি গল্পকে ভিন্নমুখী বা পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করেন নি। তাঁর মজলিশি কথা বলার ধাঁচ-ধরণ নির্মল হাস্যরসের উদ্রেক করে, উদ্দীপনা জাগায় ও উত্তেজিত করে মনকে। তাঁর 'আই হ্যাজ' 'কোষ্ঠির ফলাফল', 'আমরা কি ও কে' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্যে রসিকসুলভ মনের পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে তিনি তিনবার সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁর 'স্মৃতিকথা' ও 'নমস্কারী' নামক হালের গ্রন্থ দু'খানিও তাঁকে স্পষ্ট জানবার ও চেনবার মুকুর হিসাবে সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভের অধিকারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগৎতারিণী স্বর্ণ-পদক দানে সম্মানিত করেন। তিনি 'সংসার দর্পণ' এবং ১৩২৮ সালে কাশী থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসজ্যোতি' নামক দুখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রবন্ধ রচনাতেও কেদারবাবু সিদ্ধহস্ত। তাঁর ১৩১০-১১ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'চীন প্রবাসীর পত্র' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'চীনের স্মৃতি' উপর্যুক্ত মত সমর্থনে সাহায্য করবে। ১২৬৯ সালে ২৪ পরগণার দক্ষিণেশ্বর গ্রামে কেদারবাবুর জন্ম হয়।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নানা দিক থেকে চারুচন্দ্রের সাহিত্যিক নিষ্ঠ

বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি একাধারে গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, সংবাদিক, সমালোচক ও বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক। ১২৮৩ সালে মালদহ জিলার চাঁচল গ্রামে চারুচন্দ্রের জন্ম হয়। অল্পবয়স থেকেই বাংলা-সাহিত্য এবং সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং পরবর্তীকালে সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ ও নিষ্ঠাই তাঁকে যশস্বী ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র করে তোলে। কিছুকালের জন্য তিনি "ভারতী"র সম্পাদক এবং 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসাবে "প্রবাসী" পত্রিকার 'মরমের কথা' নামক গল্পটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্পের দিক থেকে চারুবাবুর গল্পগুলি বেশীর ভাগ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হতে দেখা গেলেও তা পাঠককে আকৃষ্ট করে বহু ভাবে। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্রগঠনে বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষণীয় এবং বহুক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকার প্রতিকৃতি প্রায় অবিকল ও সঠিক। ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকের পক্ষে এটি একটি বিশেষ গুণের কথা। বৈদেশিক গ্রন্থগুলিকে ভাষান্তরিত করে, সম্পূর্ণ দেশজ আবহাওয়ায় রূপান্তরিত করে তুলতেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। 'যমুনা পুলিনে ভিখারিণী' সেদিক থেকে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যায়। তাঁর লেখা 'পরগাছা', 'হাইফেন', 'বন-জ্যোৎস্না', 'মুক্তিস্নান','স্রোতের ফুল', 'চোর কাঁট', 'নষ্টচন্দ্র' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আজও বহু পাঠককে আনন্দ দেয়। গল্প ও উপন্যাস ব্যতীত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী ও অন্যান্য বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি যা রচনা করেছেন, তা তাঁর শ্রমশীলতা ও বিজ্ঞতার নিদর্শন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা ও দীর্ঘ দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অধ্যাপনা করেন। বিশ্বভারতীর সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস' চারুবাবুর আর একখানি গবেষণামূলক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জলধর সেন—প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে জলধর সেনের সঙ্গে যাঁদের পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন যে এমন নিরহঙ্কারী, অমায়িক, বন্ধুবৎসল, আন্তরিকতাপ্রবণ মানুষ সচরাচর নজরে পড়ে না। বয়সের সঙ্গে, সুনামের সঙ্গে বা কর্মক্ষেত্রে মর্যাদাবৃদ্ধির সঙ্গে স্বভাবতই মানুষের মেজাজ যে একটু অবস্থান্তর লাভ করে, জলধর সেনের সঙ্গে আলাপ-

পরিচয়ে তার ইঙ্গিত কোন রকমেই পাওয়া যেত না, পরন্তু তাঁর সহজাত সারল্যে শিশু-মনেরই আভাস থাকত সুস্পষ্ট। তাঁর এই চরিত্র-মাধুর্যই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার চেয়ে, সাহিত্যামোদী জন-সাধারণ্যে ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কাছে তাঁকে পরম প্রিয় আপনার জন এবং 'দাদা' পদবাচ্য করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন সকলের 'দাদা', বিশেষ করে সাহিত্যিকদের দাদা ত' বটেই। যে কোন সভা-সমিতিতে সভাপতি হিসাবে, বক্তা হিসাবে এবং এমন কি সাধারণ শ্রোতা হিসাবেও নিমন্ত্রণ রক্ষায় তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হতেন না—নিতান্ত স্বাস্থ্যের অবস্থা তাঁকে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত না হলে। বাংলা-সাহিত্যের বহু সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর সংস্রব ছিল ঘনিষ্ঠ। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের 'রবিবাসর'এর তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ। অর্দ্ধশতাব্দীর বেশি সময় জলধর দা' নানা ভাবে বঙ্গ-ভারতীর সেবা করে গেছেন। মিষ্টি কথায়, সুরসিকতায়, প্রাণের বেদনায় তাঁর গল্প উপন্যাসগুলি একটা শান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। 'বিশু দাদা' ও 'অভাগী'র মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যা মানুষের মানস-জীবনের অটুট প্রতিচ্ছবি। উপন্যাস গল্পের কথা বাদ দিয়ে, জলধর দা'র ভ্রমণ-কাহিনী এক অপূর্ব সৃষ্টি। সকল অবস্থা ও বয়সের মানুষকেই তাঁর 'হিমালয়' আশাতীত আনন্দ দেয়। ভ্রমণ-কাহিনীকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদায় তুলে প্রথম দিকে তিনি যতটা প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, তার পূর্বে আর কেউ বোধ হয় ততটা খ্যাতি লাভ করতে পারে নি। 'হিমালয়'এর পর 'পথিক' এই পর্যায়ের নাম করা বই। ১২৬৮ সালে নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে জলধর সেনের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে 'গ্রামবার্ত্তা' নামক একখানি পত্রিকার তিনি সম্পাদকতা করেন, এবং পরবর্ত্তী জীবনে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' 'হিতবাদী' এবং তৎপরে আমরণ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। জলধর সেন যৌবনে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে হিমালয় অঞ্চলের বহু দুর্গম স্থান ভ্রমণ করেন, এবং এই প্রত্যক্ষদর্শনই বোধ হয় তাঁকে ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার প্রেরণা দেয়। ১৯২২ সালে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে তাঁকে একবার বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। এই সংবর্ধনা উৎসবে জলধর সেন যে কথাগুলি বলেন, সেগুলিই তাঁর উদারতা ও বিনয়াবনত মহান্ হৃদয়ের উপযুক্ত পরিচয়। তিনি বলেন, 'আমি সাহিত্যিক নই, আমি সাহিত্যিকগণের

সেবক। আমার ধর্ম সেবা এবং সেবা করিয়াই আমি ধন্য হইয়াছি।'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—কঠিন নিরস পোড়-খাওয়া মানুষ তারাশঙ্কর; অভিজ্ঞতার ঘা খেয়ে খেয়ে যেন ইস্পাত হয়ে গেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে কঠোর তীক্ষ্ণতা—মানুষের অন্তস্থলকে স্পর্শ করে। কথার ভঙ্গীতে নিদারুণ আত্মপ্রত্যয়, মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে তাঁর দেরি হয় না। আপাতঃ পরিচয়ে সদালাপী না মনে হলেও, আত্মম্ভরি নয়; ঘনিষ্ঠতায় সহৃদয়তার পরিচয় মেলে। এক কথায় সমাজ-সচেতন জাতীয়তাবাদী তারাশঙ্কর। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের, পরিবর্তনশীল সমাজের বিভিন্ন অবস্থার—অনাদৃত, অলক্ষিত, অপাঙ্‌ক্তেয় ও অভিশপ্ত মনের প্রলয়ঙ্কর সমারোহ দেখা যায় তারাশঙ্করের মধ্যে। তাঁর দর্শন প্রগতিমুখী, তাঁর মনন যুগধর্মী। বিভিন্ন সময়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও মনোবৃত্তিক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে বিভিন্ন পরিবেষ্টনী সৃষ্টি হচ্ছে, বিষয়বস্তু পরিবর্ত্তন হচ্ছে এবং,—বুদ্ধিজীবী মানুষকে যে আজ কঠিন ভাবে যুঝতে হচ্ছে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে এবং মনোবেগের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তারা যে হয়ে পড়েছে পরস্পরবিরোধী এবং ফলে সাহিত্যে আজ আদর্শের স্থান সঙ্কীর্ণ ও আবেগের গন্ধ উবে গিয়ে, তৈরি হচ্ছে এক নূতন ধরনের সাহিত্য—যার গতি হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিক প্রাধান্যের দিকে—তারাশঙ্করের রচনার পারম্পর্য লক্ষ্য করলে ইহাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ফিউডল বা বুর্জোয়া সমাজের বহুবিধ ভাঙন থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সিনিসিজিমকেও তিনি অতিক্রম করে সমষ্টি-জীবনের প্রাণস্বরূপ নিম্ন-গণজীবনকেও স্পর্শ করেছেন। এবং এই অভিব্যক্তি, বিপ্লবের স্বয়ংক্রিয় নিয়মের মতই তাঁর সাহিত্যের মধ্যে জনগণের মানসভূমিকে নাড়া দিয়েছে। সাহিত্যকে যথাযথ সমাজের চিত্র আখ্যায় আখ্যাত করলে, তারাশঙ্করকে তার শ্রেষ্ঠ আধুনিক চিত্রকর বলা যায়। সমাজের উপরের ফ্যাশানকে বিশেষ আমল না দিয়ে, তার ভিতরের প্যাশানকেই তিনি আর্টে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মতই তাঁর রচনা ও দৃষ্টিভঙ্গী তীক্ষ্ণ ও বক্তব্য স্পষ্ট। রসের চমৎকৃতির চেয়ে তাঁর বিষয়ের চমৎকৃতিই বিস্ময়-লক্ষণের ভেতর দিয়ে

আমাদের আনন্দ দেয় বেশি। দেশ-কাল ও জাতির জীবনেতিহাসে, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমন একটা ঔদার্যপূর্ণ অভিব্যক্তি—সত্য মিথ্যা, কল্যাণ অকল্যাণ, ন্যায় অন্যায়ের এমন একটা সুষ্ঠু পক্ষপাতশূন্য বিচার গভীরতর হৃদয়-ভূমিতেই সম্ভব। নিছক স্বাতন্ত্র্যবিলাসী ভাববাদীর আদর্শ তাঁর যে নয়, 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তা স্বীকার করবেন। তাঁর 'জলসাঘর', ডেকাডেন্ট জমিদার বংশের বিস্ময়কর চিত্রের জন্য বাংলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী। জমিদার সম্প্রদায়ের মনোভাব 'কালিন্দী'তেও বিশেষ পরিস্ফুট। অন্য ধরনের গল্পও তারাশঙ্কর বহু লিখেছেন যার মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। 'অগ্রদানী' 'বেদেনী', 'বোবা কান্না' 'দিল্লীকা লাড্ডু', 'স্থলপদ্ম' প্রভৃতি গল্প ও গল্পগ্রন্থের মধ্যে বহু-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তথাকথিত আধুনিকদের প্রগতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে যে দুর্গতির লক্ষণ দেখা যায়, তারাশঙ্করের রচনা তার ব্যতিক্রম। তাঁর বলিষ্ঠ প্রাণস্পন্দনের সাড়া ও দূরদৃষ্টি আশ্চর্য রকমে সার্থক। 'রসকলি' গল্পগ্রন্থ সেদিক থেকে তাঁর সার্থক রচনা, এবং প্রথম রচনা হলেও, ১৩৩৪ সালে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করে। এই গল্পটি 'কল্লোল'এ প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ধাত্রীদেবতা,' 'দুই পুরুষ' ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা 'মন্বন্তর'ও তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৮৯৮ সালে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জন্ম হয়। ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি একবার কারাবরণ করেন।

দীনেন্দ্রকুমার রায়—বর্তমান পাঠক-সমাজে দীনেন্দ্রকুমার ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক হিসাবে যতটা পরিচিত, তাঁর অন্য বহুবিধ রচনার সহিত পাঠক সে ভাবে পরিচিত নয়। দীনেন্দ্রকুমার ছিলেন একনিষ্ঠ সাহিত্যানুরাগী, এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করে গেছেন। 'সাধনা', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর নানা সাহিত্য চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে পল্লীচিত্র অঙ্কনে তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় এবং পল্লীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সংযোগ যে কত নিবিড় ছিল, রচনাদির মধ্যে বহুলাংশে তারই ইঙ্গিত মেলে। শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর যে কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যেও জীবনবোধের সঙ্গে গল্প বলা

সরস ভঙ্গীমা তৎকালীন পাঠক সমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গল্পের আঙ্গিকের দিকে দীনেন্দ্রকুমারের যেমন একটা সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তেমনি প্রথম দিককার গল্পকার হিসাবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাঁর গল্পের মধ্যে শব্দের যথাযথ ব্যবহারাভাব কোথাও অকারণ ভাব-বিরতির কারণ ঘটায় নি। উপমা ও রসিকতাপটুত্বও ছিল দীনেন্দ্রকুমারের রচনার অন্যতম গুণ। বিদেশী ডিটেকটিভ্ উপন্যাসের প্রবর্তনা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, এবং সে সৃষ্টিতে তিনি সত্যিই কীর্তিমান। প্রথম যুগে পাঁচকড়ি দে ডিটেকটিভ্ উপন্যাস রচনায় হাত দিলেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর গ্রন্থগুলি সে ভাবে সমাদৃত হয় নি, যে ভাবে পরবর্তীকালে আপামরসাধারণের মধ্যে দীনেন্দ্রকুমারের সাস্‌পেন্স বহুল 'রহস্য লহরী সিরিজে'র গ্রন্থগুলির চাহিদা হয়েছিল। বর্তমান সময়ে অন্যান্য অনেকের মধ্যে এই ধরণের প্রচেষ্টা দেখা দিলেও, দীনেন্দ্রকুমার তাঁর এই নিজস্ব বিভাগে এখনও বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ডিটেকটিভ্ উপন্যাসের মধ্যে তাঁর 'চীনের ড্রাগন' শিক্ষিত রসিক সমাজেও বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাঁর অনুবাদ যে কত সরস ও স্বচ্ছ ছিল 'নেপোলিয়ানের জীবনচরিতে' তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৭৬ সালে দীনেন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৫০ সালে স্বগ্রাম মেহেরপুরে (নদীয়া) তাঁর মৃত্যু হয়। শেষ জীবন পর্যন্ত দীনেন্দ্রকুমার 'বসুমতী'র সহিত নানা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং উক্ত পত্রিকাতেই মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তাঁর এক আত্মজীবনী রচনা করেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—আদর্শবাদের প্রভাবে এদেশীয় সাহিত্যের আসর যখন সমাচ্ছন্ন, তখন উগ্র-বস্তুত্রান্তিকতা নিয়েই নরেশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। রোমান্টিসিজিমের বিরুদ্ধে সাহিত্যিকে ভিন্নমুখী করার প্রচেষ্টায় প্রথম দিকে তিনি শুচিগ্রস্ত সঙ্কীর্ণতার বাইরে গিয়ে বহু লেখা লিখেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে রসাভাস ঘটায় শেষ পর্যন্ত সংযত হয়ে অন্যপথ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সাহিত্যের আসরে এক সময় নরেশচন্দ্রকে নিয়ে ভীষণ আন্দোলন এবং 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে নরেশবাবুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'শুভা'কে একেবারে প্রলয়কারী বলা চলে এবং এই গ্রন্থখানিই তৎকালীন সমাজহিতৈষী সাহিত্যিকদের আলোচনার

বিষয় হয় সবচেয়ে বেশি। বর্তমান কালের আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন সাহিত্যিকদের রচনাতে তৎকালে প্রথম দিকে যে কুরুচি ও দুর্নীতির বন্যা দেখা দিয়েছিল,—সাহিত্যের সেই দৃষ্টিভঙ্গীই নরেশবাবুর বয়স ও পাণ্ডিত্যের গুণে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সংযত করে তুলতে সাহায্য করে। অপরাধ-বিজ্ঞান বা উচ্চাঙ্গের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসকে বাস্তব-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করার কৌশলেও নরেশচন্দ্রকে অগ্রণী বলা যায়। পরবর্তীকালে তাঁর বহু রচনার মধ্যে এই জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছোট গল্প অপেক্ষা নরেশবাবুর উপন্যাসের সংখ্যাই অধিক। এবং সেগুলি একত্রে প্রায় পঞ্চাশের উপর। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সর্বহারা', 'অগ্নি সংস্কার', 'শাস্তি', 'সতী', 'মেঘনাদ' 'প্রহেলিকা', ও 'অভয়ের বিয়ে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়, 'খেয়ালের খেসারত' নামক গ্রন্থের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন 'বংশধর' লেখকের আর একটি বিশেষ আকর্ষণীয় গ্রন্থ। অবহেলিত বার্ধক্য জীবনের বহু জীবন্ত চিত্র এই গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। অনেকে এই গ্রন্থখানিকে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের আলেখ্য বলে কল্পনা করেন, কিন্তু ইহা সত্য নয়। প্রথম জীবনে বিনা নামে নরেশবাবুর 'দ্বিতীয় পক্ষ' ও 'পাগল' নামক দু'একটি গল্প, সম্ভবতঃ (১৯১৬-১৭) সালের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয় এবং স্বনামে 'ঠানদিদি' নামক প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'নারায়ণ' পত্রিকায় এরও পূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে নরেশবাবুর তেরো বৎসর বয়সে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দাসী' নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেইটিকেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসাবে ধরা যায়। উক্ত সময়ের কাছাকাছি শৈলেশ মজুমদার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে নরেশবাবুর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গোড়ার দিকে কবিতা লেখাতেও নরেশবাবুর হাত ছিল তাঁর বহু গ্রন্থের মধ্যে ছন্দবদ্ধ কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি তাঁর নিজেরই রচনা নরেশচন্দ্র আবাল্য ক্রীড়ামোদি এবং বলিষ্ঠ দেহাধিকারী। কথাবার্তা মনের দিক থেকে তাঁকে উদারপন্থী বলে ধারণা জন্মায়। সাহিত্য সম্পর্কে অনুরাগ তাঁর আজও অম্লান। নিজে খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী হয়ে পেশার জটিল তথ্যসমূহের মধ্যে ডুবে থাকলেও, আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে তিনি বিশেষ ওয়াকিফ্‌হাল এবং এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চধারণা পোষণ করেন এমন কি, আমাদের বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টিকে ইউরোপের যে কোন দেশের

সাহিত্যসৃষ্টির অপেক্ষা ন্যূন চিন্তা করা ত' দূরের কথা, পরন্তু বহুলাংশে উচ্চাঙ্গের প্রতিপন্ন করতেও তিনি কুণ্ঠিত নয়। ১২৮৯ সালের ১৮ই বৈশাখ বগুড়া শহরে ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের জন্ম হয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—অত্যল্পকালের মধ্যে সাম্প্রতিক খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিস্ময়জনক ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে, এবং তা যে তাঁর স্বকীয় ক্ষমতাবলেই সম্ভব হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি! মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ তাঁর 'উপনিবেশ' নামক উপন্যাস এবং 'বীতংশ' ও 'ভাঙা বন্দর' নামক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বে তাঁর নামের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের বোধ হয় খুব বেশি পরিচয় ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তাঁর বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, এবং বৈচিত্র্যে অভিনব ও ঐতিহ্যে জীবন্ত রচনাশক্তি অবিসংবাদীভাবে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর লেখক হিসাবে সমাদর দিয়েছে। তাঁর গল্পগুলির বিষয়বস্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাঠকের মনকে এমন একটা পরিবেশের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে, যা তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন রূপ-চিত্রের চমক দেয়, তাকে চিন্তান্বিত করে তোলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনার মধ্যেই আছে একটা ঐতিহ্যমুখী মনের পরিচয়; জাতীয় প্রগতির দিক থেকে যার মূল্য অনস্বীকার্য। তাঁর সূক্ষ্ম মানসিক অবলোকন, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও চরিত্র চিত্রণের নিপুণতা স্থানবিশেষে অত্যন্ত বিস্ময়কর। বাস্তব সাক্ষ্যের বিপক্ষ, বিশ্বজনীন আদর্শের ব্যতিক্রম ও চিরাচরিত কোড্-না-মানা তাঁর কোন কোন গল্পও আশ্চর্য্যরকমভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে মূল সত্য প্রেরণার জোরে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে পরিচিত হ'লেও, তাঁর আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের আদিবাস বরিশাল জিলায় হলেও, ১৩২৫ সালে দিনাজপুরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে সিটি কলেজে বঙ্গ-সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। নারায়ণবাবুর সাহিত্যসাধনা প্রথম দিকে 'দেশ' ও অধুনালুপ্ত 'বিচিত্রা'য় আরম্ভ হয় এবং কাব্যচর্চ্চার মধ্যে দিয়েই হয় তাঁর সূত্রপাত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'উপনিবেশ' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব), 'তিমির-তীর্থ', 'বীতংস', 'ভাঙা-বন্দর', ও 'দুঃশাসন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'দেশ' পত্রিকার পাতায় তাঁর প্রথম গল্প "নিশীথের মায়া" প্রকাশিত হয়।

'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' নামক উপন্যাসখানি লেখকের মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। নারায়ণবাবু অত্যন্ত শান্তস্বভাব ভদ্র প্রকৃতির নিরহঙ্কার মানুষ। কিন্তু আলাপ-আলোচনায় তীক্ষ্ণ মেধা ও চিন্তার গভীরতা বেশ বোঝা যায়। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের এমন কোন রচনা নেই যার চরিত্র, এমন কোন কবিতা নেই যার পঙক্তি তাঁর স্মৃতিকে ফাঁকি দিয়েছে। নারায়ণবাবু অত্যন্ত নিঃসঙ্গতাপ্রিয়,এবং নিজের সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—বাংলা গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে পূর্বাচার্যদের মধ্যে প্রভাতকুমারের আবির্ভাব এক সমারোহের ঘটনা। আইডিয়ালজিমের আওতায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ মধ্যবিত্তদের নিয়ে, নতুন সুরে ও সত্যনিষ্ঠায় আদর্শকে রসলোকে পৌঁছে দেবার এক নতুন সোরগোল তুলেছিলেন প্রভাতকুমার। তৎকালীন আর্টের আরশিতে আমরা জীবনের যে প্রতিচ্ছবি দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, তা থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে —ভিন্ন ভঙ্গী নিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে গল্প বললেন তিনি। সামাজিক চেতনা, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও চটকদার সরস কথায়, ক্লান্ত মনকে এক বিপুলতর আনন্দে জাগিয়ে তুললো প্রভাতকুমারের গল্প। এক কথায় প্রভাতকুমার ছিলেন নিছক নির্মলতার উপাসক; সরস সৎসাহিত্যের প্রচারক। তাঁর গল্প বলার ধাঁচ-ধরন সম্বন্ধে অনেকে তাঁর উপর মোঁপাসার প্রভাব পড়েছিল বলে বিশ্বাস করেন এবং সেটা অলীকও নয়, কিন্তু তা'হলেও, রুচি-বিগর্হিত বা ইন্দ্রিয়ের স্থূল আনন্দকে তিনি কোন দিনই সাহিত্যে প্রশ্রয় দেন নি। গল্পকার হিসাবে প্রভাতকুমারের সাহিত্যের সরসতা, মানসিক অবলোকন, পরিবেশের ব্যাপকতা ও চরিত্রগুলির চাকচিক্য আজও অম্লান আছে। প্রধানতঃ রস-রচনার দিকে প্রভাতকুমারের ঝোঁক দেখা গেলেও, করুণ রসসৃষ্টিতেও তাঁর হাত ছিল পাকা। সেদিক থেকে তাঁর আদরিণী নামক গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রত্নমণি' নামক তাঁর অপর একটি গল্পও রুচি ও রসবোধের অভ্রান্ত পরিচয়। উপন্যাসও প্রভাতকুমার অনেকগুলি রচনা করেছেন বটে, কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা গল্প-রচনাতেই তাঁর রস-দৃষ্টি ও রস-সৃষ্টির পরিচয় পরিলক্ষিত হয় বেশি। 'ষোড়শী' ও 'গল্পবীথি'র মধ্যে তাঁর বহু উৎকৃষ্ট গল্পের সন্ধান মেলে। এছাড়া 'দেশী ও বিলাতী', 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'নবীন সন্ন্যাসী' এবং 'সিন্দুর কৌটা',

'সত্যবালা', 'গহনার বাক্স' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও আজ সাধারণ্যে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আছে। প্রভাতকুমার দীর্ঘদিন 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। ১২৭০ সালে প্রভাতকুমারের জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৩৩৮, সালে আটষট্টি বৎসর বয়সে। ব্যবহারিক জীবনে প্রভাতকুমার ছিলেন ব্যারিষ্টার। এই কাজে প্রথম দিকে তিনি রংপুরে পরে গয়ায় আইন-ব্যবসা করেন। কিছুকাল কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইনের অধ্যাপকও ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী—এক দিকে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ঔজ্জ্বল্য ও অপর দিকে প্রভাতকুমারের গল্পের সরসতা বাংলা-সাহিত্যের মজলিশ যখন সরগরম করে রেখেছে, তখন একদিন প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা' নূতন প্রথা ও নূতন রূপসৃষ্টির সাহস নিয়ে রসিকসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তী-কালে তাঁর 'নীললোহিতের আদিপ্রেম', 'অনুকথা সপ্তক', 'ঘোষালের ত্রিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা গল্প-সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি, এবং একথা অস্বীকার্য যে তার সাহিত্য-সৃষ্টিতে তিনি একমেবদ্বিতীয়ম্। মূলতঃ গল্পের মধ্যে সর্বপ্রকার ভাবাবেগ প্রকাশের তিনি সর্বপ্রকার বিরোধী হলেও, গল্প বলার নিজস্ব ভঙ্গীমায়, রেখার দৃঢ় ও নিপুণ টানে এবং হিউমারের সূক্ষ্ম স্পর্শে তাঁর গল্পগুলি সর্বত্রই প্রাঞ্জল ও রসঘন হয়ে পাঠককে মুগ্ধ করেছে। আজ যেখানে আধুনিক বিচারের মাপকাঠিতে গল্প কতটা রিয়লিষ্ট, মনস্তত্বমূলক বা বৈজ্ঞানিক হ'ল আমরা বিচার করতে বসি,—সেখানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয়ের প্রেম-কাহিনী বর্জিত, অতি তুচ্ছ ঘটনা বা অলীক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত গল্পগুলিও কি করে সত্যের মত খাঁটি হয়ে, মানুষের মনকে রসান্বিত করে সার্থক হয়ে উঠল চিন্তা করা যায়, তখনই উপলব্ধি হয় সত্যকার আর্টিষ্টের কৃতিত্ব। তাঁর 'ট্রাজিডির সূত্রপাত' নামক গল্প যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও অনন্যসাধারণ সৃজনীশক্তির কথা স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'গল্প-সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করেছেন। অভি-জ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যথা, গাঁথা হয়েছে ভাষার শিল্পে।' গল্প-সাহিত্য ব্যতীত প্রবন্ধ-সাহিত্যেও প্রমথ চৌধুরীর দান অতুলনীয়। সাহিত্যক্ষেত্রে 'বীরবল' নাম গ্রহণ করে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস,দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের জটিল তথ্য সমূহকে এমন সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে প্রকাশ করেছেন যার তুলনা সত্যই

বিরল। তাঁর রুচিস্মিত কথ্য-বাক্য ও বক্তব্যকে বাহুল্যবর্জিত বাস্তবিক্ করে প্রকাশ করার বাহাদুরীই 'বীরবলি ভাষা' নামে বঙ্গ-সাহিত্যে অভিহিত।

পরশুরাম—পরশুরাম যে সুপণ্ডিত রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম তা আজ আর সাধারণ্যে অবিদিত নয়। অসাধারণ নিয়মানুগ, অলঘুস্বভাব, স্বল্পবাক এই কর্মীপুরুষের রসিকসুলভ ব্যাঙ্গ-হাস্যরসাত্মক সাহিত্যিক প্রতিভা যেন অকল্পিত ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। গভীর রসজ্ঞান এবং মানুষের হর্ষ-বিষাদ সম্বন্ধে সদরদ দিগ্দর্শন না থাকলে, সাহিত্যে এমন উৎকৃষ্ট রঙ্গরসের অবতারণা করা কখনই সম্ভব নয়। এই রসজ্ঞান, এই যুক্তিশাসিত ব্যাঙ্গরস, মুমূর্ষু বাঙালীর জাতীয় জীবনকে উজ্জীবিত করার উপায়স্বরূপ হয়েই যেন 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন'-এর ভিতর প্রকাশিত হয়েছে। পরশুরামের শ্লেষাত্মক হাস্যরস সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং এসৃষ্টিতে তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। এই বিভাব বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের আদি ও বিষাদরসের বিষাক্ত আবহাওয়াকে এবং জীবনযুদ্ধের ধক্কায় দুর্বহ নৈরাশ্যবাদী মনকে যে বহুলাংশে বিমুক্ত করে তা'তে আর সন্দেহ নেই। তাছাড়া হাস্যরসের মধ্যে জীবনের যে প্রচ্ছন্ন প্রসার ও নিজেকে লঘুবোধ করার মন্ত্রগুপ্তি রয়েছে এসম্বন্ধেও বোধ হয় মতান্তর হবে না। সেদিক থেকে পরশুরামের রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে অবিমিশ্র আনন্দরসের উপঢৌকন। মনের সর্বগ্রামকেই তিনি স্পর্শ করেছেন রমাত্মক হিতং মনোহারিচ দুর্লভং বচনের দ্বারা। অবান্তর প্রসঙ্গ, পুনরুক্তি বর্জ্জিত, বাক্‌বাহুল্যের আড়ম্বরশূন্য অথচ স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে লাগসই বাক্য প্রয়োগের নিপুণতায় রসাস্বাদনে অমোঘ হয়ে তাঁর 'কচিসংসদ', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'চিকিৎসা সংকট', 'লম্বকর্ণ' বঙ্গ-সাহিত্যের হাস্যরসভাণ্ডারে অতুল সম্পদ হয়ে আছে। 'কজ্জলীর' মধ্যে 'দক্ষিণরায়' ও 'স্বয়ম্বরা' যাঁরা একবার পড়েছেন, এ গল্প সম্বন্ধে তাঁদের স্মৃতিভ্রংশ হওয়া অসম্ভব। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প পড়তে পড়তে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি তাঁর (হাস্যরসের) উজ্জ্বল ভাষা, শব্দের গমক, সানুরাগ পর্যাবেক্ষণশক্তি ও সহজ ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে আশ্চর্য রকম অবস্থাসৃষ্টির কৌশল আমাদের চমক লাগায়, কাণ্ডজ্ঞানকে মার্জিত করে এবং এমন একটা পরিবেশের

মধ্যে• পরিচালিত করে, যেখানে তাঁর গল্পের ঘটনা অবস্থা ও মানুষদের সঙ্গে যুগপৎ আমরাও চলতে থাকি নিজস্ব সত্তা হারিয়ে। পরশুরামের দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-সচেতন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, মন বিজ্ঞানী এবং প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যমূলক। লঘু হাস্যরসাত্মক গল্পগুলির মধ্যেও কোন কোন বক্তব্যকে প্রচ্ছন্নভাবে, রসাত্মক প্রক্রিয়ায় ফেলে তিনি রসাল স্বভাবোক্তি করে তুলেছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের রসশালায় 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' রসরাজ রাজশেখর বসুকে চিরকাল স্মরণীয় করে রাখবে। এই সাহিত্যপ্রতিভা ছাড়া আমরা তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের ও পরিশ্রমের পরিচয় পাই, আধুনিক বঙ্গ-ভাষার অভিধান 'চলন্তিকা', ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'ভারতের খনিজ' নামক গ্রন্থের মধ্যে। সমালোচনা-সাহিত্য ও প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর মনীষিতার পরিচয় পর্যাপ্ত। আধুনিক বানান-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর প্রচেষ্টা সর্বাগ্রগণ্য। তাছাড়া জনসাধারণের নিকট ইহা অজ্ঞাত নয় যে, বাংলা লাইনোটাইপের আক্ষরিক রূপদান ও প্রচ্ছন্ন হস্তে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিকালকে প্রাণৈশ্চর্যে সাফল্য মণ্ডিত করা তাঁর অসাধারণ কীর্তির পরিচয়। এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভা ও প্রকৃতিগত সদ্গুণাবলী স্বল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি বহু পরিশ্রমে, সরস হৃদয়গ্রাহী গদ্যে তিনি বহু শত পৃষ্ঠার একটি 'বাল্মীকি রামায়ণ' সমাপ্ত করেছেন। পদ্য রচনাতেও রাজশেখর বাবুর ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ নূতন উপভোগ্য বস্তু। গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, ভারতের খনিজ, চলন্তিকা ব্যতীত মেঘদূত ও লঘুগুরু নামক তাঁর আরও দু'খানি গ্রন্থ আছে। ১২৮৭ সালে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী—অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাকেও সার্থক গল্প ক'রে তোলার মধ্যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আঙ্গিকের অভিনবত্ববর্জিত, গুরুত্বহীন আখ্যানবস্তুও যে পাঠকের হৃদয়গ্রাহ্য হতে পারে, এবং perfect story-telling বলতে যা বোঝায়, 'ভারতী'র সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর রচনায় সে গুণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ আতর্থী মহাশয়ের রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাস্যরসাবেগ পরিলক্ষিত হলেও, করুণরস পরিবেশনেও

তাঁর যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় মেলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালসা, মনস্তাপ ও মানসিক ক্লিশতির চিত্রই তার নায়ক-নায়িকার চিত্তবৃত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রীড়মান দেখা যায় এবং যথাক্রমে সেই সব মনোজ্ঞ ভাবতরঙ্গ নিয়েই তিনি গল্পের মধ্যে যাতায়াত করেছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ১৯২৬-২৭ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁর 'নিশির ডাক', 'মঙ্গল মঠ' এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়। 'সঙ্কল্প', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' ও 'বসুমতী' পত্রিকাতে তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। গল্প ও উপন্যাস লেখক হিসাবেই প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর নাম হলেও, অনুবাদ ও প্রবন্ধও গোড়ার দিকে তিনি কিছু কিছু লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'রুষ-সাহিত্যের ধারা' নামক একটি প্রবন্ধ তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশেষ নিদর্শন। 'বাজিকর' নামক গ্রন্থখানি তাঁর গল্প-সংগ্রহ হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'ঝড়ের পাখী', 'চাষার মেয়ে', 'অচলপথের যাত্রী', 'অরুণা', 'দুই রাত্রি' ও 'প্রবাসী' নামক উপন্যাসগুলির নাম পাঠকরা আজও নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন নি। মধ্যে বহুকাল সাহিত্য-জগৎ থেকে চলচ্চিত্র জগতে লেখক স্থানান্তরিত হলেও, তাঁর সাহিত্যরসপিপাসু মন আবার সাহিত্যক্ষেত্রে তাকে ফিরিয়ে এনেছে এবং তাঁর 'মহাস্থবির জাতক' নামক গ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যে এক নবতম যুগের নির্দেশ দিয়েছে। এই গ্রন্থখানি জীবনস্মৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ কথা-কাহিনীর স্মারকস্তম্ভ হিসাবে বর্তমান সাহিত্য-জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে যেমন জীবনের বহু সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে, 'মহাস্থবির জাতক'এর মধ্যেও তেমনি বিবৃত হয়েছে জীবনের বহু উপাদেয় কাহিনী। অধিকন্তু 'শ্রীকান্ত'র গুরু-গম্ভীর, দার্শনিক সুরের বদলে, 'মহাস্থবির জাতকে' আমরা পাই একান্ত আন্তরিকতার সুর। মনের গোপন ও গহন কোনে যে কথা লুকানো থাকে তাকেও লেখক অকপটে ব্যক্ত করেছেন এই গ্রন্থের মধ্যে। এমন 'confidential way of putting things', জীবন-দর্শনের এমন ঔদার্যপূর্ণ দৃষ্টি—অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে জীবনের গোপন কাহিনী অকপটে প্রাণ খুলে ব্যক্ত করার মত সাবলীল ও সরস এমন ভাষাভঙ্গী তখনই প্রকাশ পায় যখ মানুষ নিন্দা প্রশংসার উর্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে শেখে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জীবনের বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও মনকে মুক্ত বিহঙ্গের মত জীবন-রহস্যের সর্বস্তরে নিয়ে বেড়ানোর বর্ণোজ্জ্বল অকৃত্রিম বিবৃতি, 'মহাস্থবির

জাতক'এর প্রথম খণ্ডেই যে চরিতার্থতা লাভ করেছে তা সত্যই অপূর্ব। জীবনকে বহুরূপে না দেখলে, জীবনে নানারূপ রসবোধের উপলব্ধি না হলে, সাহিত্যে এ সরসতা আনা সহজসাধ্য নয়। ১৮৯০ সালের ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম হয়। তাঁর জীবন সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক 'মহাস্থবির জাতক'এর মধ্যেই তাঁর জীবনতথ্যের বহু সন্ধান পাবেন। সুদর্শন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বন্ধুবৎসল ও রসিকসুলভ আলাপ-আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। অনর্গল বাক্‌পটুতায় তাঁর জুড়ি অল্প এবং বয়সের তুলনায় তাঁর চাপল্য যৌবনসুলভ ও সরসতা অম্লান। বাল্যকাল থেকে জীবজন্তু পালনে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল এবং ভ্রমণ ব্যতীত এটিকেই তাঁর জীবনের অন্যতম খেয়াল হিসাবে গণ্য করা যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র—প্রেরণার তাগিদে বা সৃষ্টির প্রেরণায় রচনা এবং উপর্যুপরি অনুরুদ্ধ হয়ে পেশাদারি রচনার মধ্যে পার্থক্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য প্রখ্যাত গল্পকারদের রচনার মধ্যেও প্রায়শঃই বৈশিষ্ট্যের অভাব ও অবস্থার বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়—একটা নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ডার্ড বা সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সহজাত বুদ্ধির দৌড়ও কোন কোন ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি যে না করে তা নয়, কিন্তু বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করতে এবং বাইরের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মনকে শৃঙ্খলানুবর্তী করতে যে সময় লাগে তার পূর্বে যখনই গল্প-কারদের গল্পরচনায় মনোনিবেশ করতে হয়, তখনই রচনার মধ্যে বহু বিকৃতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি নজরে পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা সেদিক থেকে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই তাঁর গল্পের অসম্পূর্ণতা বা সমতা-বিপর্যয় ঘটতে দেখা যায় এবং সে দিক থেকে রচনার স্বল্পতাই তার অন্যতম কারণ কিনা কে জানে! বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন শক্তিমান্ সাহিত্যিকের যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন লেখকের মধ্যে তা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বর্তমান এবং অধিকন্তু বুদ্ধি ও আবেগের নিখুঁত ব্যালেন্স, সাহিত্যে, বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস সাহিত্যে, যে রম্যতা সৃষ্টি করে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার নিখুঁত শিল্পী। অতিশয়োক্তি বর্জিত বর্ণনা, নিরাড়ম্বর বিন্যাস, চরিত্রগুলির প্রতি আন্তরিকতা ও জীবনকে বিচিত্রভাবে সবিশেষ আস্বাদন করার সাধনা ব্যতীত এই ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে অপূর্ব অন্তরঙ্গতাই তাঁর গল্পকে জীবন্ত ও জমজমে করে তোলে। ওস্তাদ তীরন্দাজের দৃষ্টি তাঁর, এবং সে দৃষ্টিতে মানুষের মনের নিভৃত

কোনের খুঁটিনাটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। একদেশদর্শীতা কোথাও তাঁকে স্পর্শ করে নি এবং তাঁর ভাষা ভাবের অদ্ভুত অনুগামী। চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে এবং সেখানে তিনি এমনই স্বচ্ছন্দবিহারী যে জটিল মানসিক রহস্যও কোথাও পাঠকের হর্ষবৃদ্ধির অন্তরায় ঘটায় না। 'পুতুল ও প্রতিমা' এবং 'নিশীথ নগরী'র মধ্যে এমন বহু নিদর্শন ও জীবন-সংসারের বহু দুর্লভ চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 'শৃঙ্খল' ও 'বেনামী বন্দরের' গল্পগুলির মধ্যেও তাঁর বিচারবুদ্ধি-শাসিত প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মনের আন্তরিক আলেখ্য ফুটে উঠেছে। নিজের সৃষ্টিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, সুন্দরের প্রতি অনুরাগ ও আস্থাবহ রীতি-কৌশল ব্যতীত 'সংসার সীমান্তে', 'কেশবানন্দের তিরোধান' ও একেবারে হালফিলের 'তেলেনিপোতা আবিষ্কার' নামক গল্প রচনা কখনও সম্ভব নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহু গল্পের মধ্যেই বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, গঠণধারার স্বকীয়তা ও উচ্চাঙ্গের শিল্পকার্য নজরে পড়ে। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে ড্রফট্‌ম্যানশিপের সঙ্গে আছে অদ্ভুত রঙের জ্ঞান। এমন অনুরাগপূর্ণ তুলির আঁচড় ও রঙের খেলা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পূর্বে বাংলা গল্পকারদের রচনাতে এমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেনি বলেই মনে হয়। প্রথম দিকে শৃঙ্খলবিধি অতিক্রান্ত উগ্র-বস্তুতন্ত্রবাদ প্রচারে উন্মুখ যে ক'জন লেখক 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল,—তাঁদের মধ্যে থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভ্যুত্থান ঘটলেও ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মতো ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই তাঁর একমাত্র লক্ষ ছিল না—তিনি দেখা দিলেন ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে আমাদের বুদ্ধিকে উজ্জ্বল্য দান ও হৃদয়কে তৃপ্তি দিতে। চিরস্থায়ী হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসকে তিনি নাড়া দিলেন —সানুরাগ, সুসংলগ্ন, সর্বাঙ্গসুন্দর আধুনিক রচনা-কৌশলের ভিতর দিয়ে। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'পাঁক'-এর মধ্যেও বৈশিষ্ট্যের সূচনা দেখা যায়। বাংলা দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও বহুদিন সাংবাদিক জীবনযাপন করতে হয়, এবং নানাভাবে বহু পত্রিকার সম্পাদন ও সহঃসম্পাদকতা করেন তিনি। 'কালি-কলম', 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী' 'সংবাদ', 'নবশক্তি','কবিতা', 'রংমশাল' (ছেলেদের) প্রভৃতি পত্রিকাগুলি উক্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। কবি হিসাবেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের খ্যাতি সর্বজনবিদিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' ও দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সম্রাট' বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বহু গ্রন্থের সংস্করণ হয়েছে এবং বিশে

লিখিত কয়েকটি গল্প ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের জন্ম রচনাতেও প্রেমেন্দ্র মিত্র সিদ্ধহস্ত। ১৯০৪ সালে বারানসীতে লেখকের জন্ম হয় এবং শিক্ষালাভ করেন ঢাকা ও কলিকাতায়। বলিষ্ঠ খর্বাকৃতি এই মানুষটির বাচনভঙ্গী অত্যন্ত মধুর এবং মন অত্যন্ত আন্তরিকতাপ্রবণ। মানুষের মনে আঘাত দিতে সহজেই তিনি কুণ্ঠিত হন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চোখের দৃষ্টিতে একটা অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য ও এমনই মাদকতা আছে যা মানুষকে আকর্ষণ করে অত্যন্ত সহজে। বর্তমানে সাহিত্য অপেক্ষা ছায়াচিত্র শিল্পের প্রতিই তাঁর অনুরাগ বেশি বলে মনে হয়। কয়েকটি গ্রন্থের পরিচালনা কার্যও তিনি সম্পাদন করেছেন।

প্রবোধকুমার সান্যাল—যাযাবর, ভবঘুরে, ভ্রাম্যমাণ প্রবোধকুমার। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার অফুরন্ত নেশায় পাগল। ঘরের আগল ভেঙে, পরিচয় থেকে অপরিচয়ে, জানা থেকে অজানায়, অসীম কৌতূহলে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন দিগ্বিদিক। শব্দে-গন্ধে-স্পর্শে যেখানে যা কিছু পেয়েছেন, দেখেছেন, সুন্দর অসুন্দর—উৎসবমত্ত মানুষের প্রেমের পুলক, আরণ্যিক লালসার উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা,—জরাজীর্ণ জীবনের বীভৎস ফাটল, বুভুক্ষিত মানুষের নারকীয় রূপ—যা কিছু আশা, লালসা আর করুণার ছবি যেখানে যা পেয়েছেন, দেখেছেন, সংগ্রহ করেছেন মনের এ্যালবামে—তাঁর বীলয়ান্ দুই বাহু দিয়ে জড়িয়েছেন তাদের সবাইকেই। উত্তেজনার জোয়ারে কোনটাকেই মিথ্যা বলে, অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিতে পারেন নি, কোনটাকেই পরিহার করেন নি—কারণ এ সবই যে তাঁর চাক্ষুষ উপলব্ধ, নিতান্ত প্রাকৃত। কিন্তু এতো পেয়েও, এতো দেখেও, প্রবোধ-কুমারের হৃদয়বৃত্তি যেন অতৃপ্ত। ঘটনার এতো বাস্তবিকতা সত্ত্বেও প্রাকৃতিকতার বদলে ভাবুকতা, ইন্‌টেলেক্টের বদলে ইমোসন তাঁকে যেন াচ্ছন্ন করে রেখেছে। এবং এই রহস্যই তাঁর আবেগ-জীবন্ত রচনার প্রাণ এবং এই প্রাণশক্তিই আমাদের স্পর্শ করে, বিস্ময়বিহ্বল করে, আনন্দ দেয়। সেই কারণে রবীন্দ্রনাকেও একদিন বলতে হয়েছিল, 'প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' পড়লুম। পড়ে তার রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোনটাকেই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে-পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।' ঘটনা ব্যতীত ভাষার এক বিশেষ রোমান্টিক মনোহারীত্ব

আছে প্রবোধকুমারের। উচ্ছ্বাসে-আবেগে মধ্যে মধ্যে তা মাত্রাজ্ঞান-বিবর্জিত হলেও মানুষের মনকে প্রসন্ন করে। জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে তিনি গল্প রচনা করলেও, তাকে সমগ্র ভাবে দেখবার একটা চেষ্টা দেখা যায় প্রবোধকুমারের মধ্যে। রুচিজ্ঞানে সংকীর্ণ মনোভাবের তিনি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। উৎকৃষ্ট তত্ত্বকথা কিছু বলুন আর না বলুন, সমাজসমস্যা ও সামাজিক মানুষের বিপুল, দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়, দুঃখ-মধুর জীবনসমস্যা নিয়ে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যের মধ্যে। জনসাধারণের প্রিয় লেখক হিসাবে প্রবোধকুমারের সমাদর অন্যান্য ক্ষমতাশালী লেখকদের সমপর্যায়ভুক্ত। প্রবোধকুমারের জীবন বহু-বৈচিত্র্যে পূর্ণ। নানা দুঃখ কষ্ট ও কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এঁর প্রথম জীবন কাটে। এক সময় সৈন্য ও ডাক বিভাগেও ইনি চাকরি করেন, কিন্তু স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রবোধকুমারের চাকরির ধাত নয় বলেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সব কাজেই তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। ১৩৩৭ সালের কাছাকাছি মাসিক 'বিজলী'ও 'স্বদেশে'র সঙ্গে এবং 'কল্লোল'-এর সঙ্গেও প্রবোধকুমারের বিশেষ যোগ ছিল। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি একত্রে প্রবোধকুমারের গ্রন্থসংখ্যা দু'তিন জন সংখ্যা-গরিষ্ঠ গ্রন্থ লেখকের সমগোত্রীয়। ভ্রমণ কাহিনীকে কাব্যাত্মক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা এবং তাকে প্রত্যক্ষ রূপ দান একমাত্র প্রবোধকুমারের দ্বারাই সম্ভব হতে দেখা যায়। সেদিক থেকে তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে' বাংলা-সাহিত্যে অমরতার দাবি করে। ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর আরও কতকগুলি বই আছে যথা—'ইতস্ততঃ', 'দেশ দেশান্তর'। 'অরণ্যপথ'ও উক্ত পর্যায়ের গ্রন্থ হলেও, তার মধ্যে গল্পাংশ আছে। এছাড়া তাঁর গল্প-সংগ্রহ—'অঙ্গার','চেনা ও জানা', 'অঙ্গরাগ', 'শ্যামলীর প্রেম' 'নিশিপদ্ম', 'অবিকল', 'আগ্নেয়গিরি'—উপন্যাস, 'প্রিয় বান্ধবী', 'আঁকা বাঁকা' 'নদনদী', 'তরুণীসঙ্ঘ', 'নবীন যুবক' 'দিবাস্বপ্ন' ও 'মল্লিকা' নামকরা। কলিকাতায় প্রবোধকুমারের জন্ম হয় ১৯০৭ সালে। তাঁদের আদি বাস ফরিদপুরে।

বুদ্ধদেব বসু—বাংলা-সাহিত্যের লেখক হিসাবে অত্যন্ত তরুণ বয়সে যাঁরা বহু আলোচিত হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু তাঁদেরই অন্যতম। কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার রচনাতেই বুদ্ধদেবের বিশেষ কৃতিত্ব দেখা যায়। "কল্লোল"এর যুগে বর্তমানের খ্যাতিমান অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি যে ক'জন

সাহিত্যিক সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন নিজেদের বৈশিষ্ট্যে, বুদ্ধদেব বসুও ছিলেন সেই লেখক গোষ্ঠীরই একজন। তাঁর 'শাপভ্রষ্ট' ও 'বন্দীর বন্দনা' প্রভৃতি কবিতা প্রথমে "কল্লোলে"ই প্রকাশিত হয় এবং তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'সাড়া', এবং প্রথম কবিতা গ্রন্থের নাম 'বন্দীর বন্দনা'। ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় বুদ্ধদেব বসু জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষালাভ করেন ঢাকায়। "সাড়া" ১৩৩৫ সালে 'প্রগতি' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন বুদ্ধদেব বসু নিজেই। উগ্র আধুনিকতায় 'সাড়া' সত্যিকার সাড়া এনে দেয় তৎকালীন পাঠক সমাজে এবং রুচিবাগীশদের কাছে গ্রন্থখানি অপাঙ্‌ক্তেয় হিসাবে গণ্য হয়। গোড়া থেকেই বুদ্ধদেব প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতী এবং উক্ত যুক্তির উপর নির্ভর করেই তিনি কাব্য-সাহিত্যের সাধনা করে চলেছেন। মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের মনের অসীম আকুতি, প্রাণের অস্ফুট ভাবরাজির মুখর প্রকাশ, নানা রূপে রঙে আর তুলির তীব্র ছোঁয়ায় বহু বিচিত্র চিত্র আমরা দেখতে পাই বুদ্ধদেব বসুর অল্প বয়সের রচনার মধ্যে। পরবর্তীকালে তা একটি বিশেষ বলিষ্ঠ ষ্টাইলগুণযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে এবং সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার আসন পায়। বুদ্ধদেবের বিশ্লেষণী মন পাঠকের অন্তস্তলকেও নাড়া দেয়। তাঁর রচনার মধ্যে সরসতা যেমন উপচে পড়ে, চরিত্রগুলির উপর থাকে তেমনি প্রাণঢালা সমবেদনা। সাংস্কৃতিক সমাজধারার সদসৎ ছাপ, তার পরিবেশের আবহাওয়া, জটিলতা ও আদর্শ তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ কোন বালাই না রেখেই প্রকাশ পেয়েছে সর্বত্র এবং এ ব্যাপারে তাঁর মনের সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সবলতা সর্বত্রই লক্ষণীয়। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি 'কবিতা' নামক একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করে চলেছেন এবং রিপন কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করে নিজস্ব পুস্তক-প্রকাশন ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছেন। 'যেদিন ফুটল কমল', 'বাসরঘর', 'লালমেঘ', 'সূর্যমুখী', 'রাধারাণীর নিজের বাড়ী', 'অসামান্য মেয়ে', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি',. 'মিসেস্ গুপ্ত', 'বন্দীর বন্দনা', 'কঙ্কাবতী' 'সমুদ্রতীর' প্রভৃতি উপন্যাস গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধগুলি বুদ্ধদেব বসুর রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত ভাবে বুদ্ধদেব বাবু একটু লাজুক প্রকৃতির বিনম্র স্বল্পভাষী মানুষ।

বনফুল—উপন্যাসের মত ছোট গল্পের পরিধি বিস্তৃত নয়। ছোট গল্প লেখকের ইচ্ছাস্বাতন্ত্র বহুলাংশে সীমাবদ্ধ এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত তার ব্যাপ্তির ক্ষেত্রও প্রশস্ত নয়; সে কারণ, ছোট গল্প লেখকের মনঃসমীক্ষণ বিষয় নির্বাচন ও অবধি-বোধের প্রকৃষ্ট জ্ঞান থাকার প্রয়োজন সর্ব প্রথমে। 'বনফুলে'র কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি নানা ধরণের রচনার মধ্যে ছোট গল্প তার ছোটত্ব নিয়ে অদ্ভুত রকমের সার্থক। অল্প পরিসরের মধ্যে এমন রসঘন ঠাস-বুনোন অন্য লিপিকারদের হাতে ঠিক তেমন ভাবে ওতরাতে দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় বনফুলের হাতে। কোথায় কাঁচি চালাতে হবে, ঠিক কোনখানটিতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন, এ ব্যাপারে বিচক্ষণ চিকিৎসকের মতই তিনি কঠোর। ব্যবহারিক জীবনে ডাক্তারীর অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই ব্যালেন্স জ্ঞান সাহিত্যে এসেছে কিনা কে জানে! রচনার অফুরন্ত শক্তি বনফুলের আর একটি বিশেষ গুণ। নানা ধরণের লেখা অজস্রভাবে তিনি লিখে চলেছেন, এবং সেগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে রসোত্তীর্ণ। বনফুলের মধ্যে পিউরিটান মনোভাব নেই, আবার উগ্রপ্রগতিপন্থীদের জীন্দাবাদও নেই। রসের পাকে, মনের পরিপক্কতায়, দেশ ও দেশজ মানুষের মানসিক অবস্থা ও ঘটনাকেই তিনি গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন নানা ভাবে। বনফুলের রচনায় নতুনত্বের চমকানির চেয়ে নক্সা-কাটার জেল্লা আছে বেশি। তাঁর চরিত্রগুলির ঠসক-ঠমক একটু ভিন্ন ধরণের এবং তাদের কথা বলার ভঙ্গীও স্বতন্ত্র। স্বল্প পরিসরের মধ্যে তারা বোঝায়, বোঝে কিন্তু ক্ষেত্র প্রশস্ত হলেই তাদের দিয়ে কার্যত বড় কিছু একটা গড়ে তোলা যায় না, বা তারা গড়ে তোলে না। সেই জন্যে তাঁর 'জঙ্গম' বিরাট উপন্যাস অপেক্ষা 'বিন্দুবিসর্গ', 'তৃণখণ্ড', 'দশ ভাণ' নামক ছোট গল্প গ্রন্থগুলি বেশি উপভোগ্য। বিশেষ করে 'কবচ', 'শিককাবাব' '১৩ই শ্রাবণ' 'বনফুলের গল্প', 'বনফুলের আরো গল্প' প্রভৃতি গল্প ও গল্প গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি সর্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। নাটকে আমাদের দেশে সাধারণতঃ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীরই প্রভাব বেশি হলেও, সমাজ-চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা কিছুদিন থেকে ভালোই চলেছে; কিন্তু আধুনিক ভঙ্গীমায় ঘটনাকে যতটা সম্ভব প্রামাণ্য হিসাবে সঠিক রেখে মধুসূদন, বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে বনফুল

যে নূতনত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা জাতীয়-সাহিত্যে একান্তই অবিনাশী। এ-ব্যাপারে তাঁর চিন্তাশীলতা ও পরিশ্রম সক্রিয় আধুনিক মনেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কাব্যচর্চার ভিতর দিয়ে বনফুলের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম সূচনা হয়। ১৯১৮ সালে প্রবাসীতে তাঁর একটি ছোট কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যানুরাগী পিতা-মাতার আগ্রহে তিনি বিশেষ উৎসাহিত হন এবং 'মালঞ্চ', 'পরিচারিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে থাকেন। সামান্য এক পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় গল্প যে হৃদয়গ্রাহী হওয়া সম্ভব, বনফুলের পূর্বে এ প্রচেষ্টায় কেউই যেন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বনফুলের আসল নাম, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়; আসল পেশা ডাক্তারী এবং লেখার নেশা অসাধারণ। এ ছাড়া রান্না ও বাগানের সখও তাঁর অত্যন্ত বেশি। বনফুলের জন্ম ১৩০৬ সালে পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে হলেও, তাঁদের আদি বাস হুগলী জেলার শিয়াখালায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রকৃতির অপূর্ব মসীচিত্র 'পথের পাঁচালী'র আবির্ভাবে কি অপূর্ব সমারোহ, তুমুল আলোড়নই না দেখা দিয়েছিল সাহিত্যরসিকদের মধ্যে। সভা-সমিতিতে, ছাত্রমহলে, রসিক-সমাজে সবার মুখেই ঐ এক কথা, 'পথের পাঁচালী' পড়েছেন? হুহু করে বই বিক্রির দিন যদিও তখন ছিল না, তবুও প্রায়ই লোকের হাতে হাতে, পথে-প্রবাসে 'পথের পাঁচালী' ঘুরত-ফিরত, আলোচিত হত। বিভূতি-বাবুকে যারা চিনতো, এমন অনেক শহুরে সাহিত্যিক এই গ্রাম্য লোকটির আচম্কা সৌভাগ্যে হিংসে করত; আর যারা চিনতো না, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ পেত এই সৌভাগ্যবান লোকটিকে দেখার জন্যে। সত্যিই বাংলা-সাহিত্যে ঠিক একখানি বই লিখে সে সময় এমন গৌরব আর কেউ যে লাভ করেন নি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এর কারণ ছিল অনেকগুলি; এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। মোটের উপর নিশ্চিন্দিপুরের দুর্গা ও অপুর বাল্য-জীবনের কাহিনীর সঙ্গে পল্লীশ্রীর এমন নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এমন অবিকৃত চিত্র অঙ্কিত হ'ল এবং তার মধ্যে এমন বিস্ময়রাজ্য প্রকাশ পেল যা পল্লীলক্ষ্মীর কৃপায় বিভূতিবাবুর ভাগ্যলক্ষ্মীকে পৌঁছে দিল সমৃদ্ধ অবস্থায়। তারপর এলো 'অপরাজিত', 'মৌরীফুল'। সকলের মধ্যেই পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের বিশেষ আত্মীয়তার সানুরাগ প্রকাশ। মনের গভীরতায় না হোক, প্রাকৃতিক

বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে, অদৃষ্টপূর্ব পরিবেশের মধ্যে, কাব্যধর্মী মন তাঁর খেলা করছে প্রদীপ্ত সারল্যে। ভাব-বিপ্লব, আদর্শ-বিভ্রাট বা জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের গুরুভারে বিমর্ষ হয়ে পড়ে নি তাঁর রচনা। ব্যাক্তিগত চরিত্রের মত অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের তারা। অতি-বিশ্লেষণ বর্জিত, নাতি অলঙ্কার বহুল, অনায়াস উপভোগ্য তার ভাষা। তাঁর 'মেঘমল্লার' গ্রন্থের 'উমারাণী' গল্প যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর লিপিকুশলতার তারিফ করবেন। আসল কথা বিভূতিবাবুর সমগ্র রচনার মধ্যে উত্তেজনার স্থান অল্প; শান্ত স্নিগ্ধ তাদের রূপ, বহুক্ষেত্রেই পড়তে পড়তে চোখে ঘুম এনে দেয়। একটা বৃহৎ কিছুর সন্ধান না দিলেও, একটা প্যাটার্ণ তৈরি করে, আনন্দ দেয়—রসের কাজের সার্থকতায় নৈরাশ্য সৃষ্টি করে না। অবস্থা-বিপর্যয়ে প্রথম জীবনে বিভূতিবাবুকে নানা কার্যের মধ্যে নানা স্থানে ঘুরতে হয় স্কুল মাষ্টারী, জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজারী থেকে নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য তিনি করেছেন এবং কিছুকাল নিছক ভ্রাম্যমান হিসাবে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে, চট্টগ্রামের অরণ্যাবৃত পর্বতে পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছেন শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে। অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পক্ষপাতি বিভূতিভূষণ। তাঁর মন রসিকতা-প্রিয় এবং ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা জমাতে তিনি বিশেষ পারঙ্গম ১৩০৩ সালে ২৪ পরগণার মুরাতিপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও, পৈতৃক বাস যশোহর জেলার বনগ্রামে। তাঁর 'পথের পাঁচালী'র নানা সংস্করণ হয়েছে এবং 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'যাত্রাবদল', 'নবাগত,' ও 'তৃণাঙ্কুর' নামক বইগুলি পাঠক মহলে খ্যাতিলাভ করেছে। 'আরণ্যক' তাঁর আর একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'অনুবর্তন' ও 'দেবযান'-এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। 'উপেক্ষিতা' নামক গল্পটি বিভূতিবাবুর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম রচনা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এক বিশেষ শ্রেণীর লেখক। সমাজ ও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও যে হাস্যরসের স্থান আছে, এবং হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, বহুলাংশে বিভূতিবাবু সেই ঘটনাগুলিকেই নিপুণতার সঙ্গে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন এবং তাতে বহু ক্ষেত্রেই সাফল্যলাভ করেছেন। কোন কোন গল্পে এই হাস্যরসের সঙ্গে শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত সেগুলিকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে।

অতি তুচ্ছ সামান্য ঘটনাকেও অনাড়ম্বর অল্পকথায় রসান্বিত করে তোলা লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বর্তমানে অন্যান্য ধরনের গল্পও তিনি কিছু কিছু লিখেছেন এবং উপন্যাসও লিখেছেন কয়েকখানি। কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা গল্পের সংখ্যাই তাঁর বেশি এবং সেগুলিই বিশেষভাবে রসিকসমাজে সমাদৃত হয়েছে। নাটক রচনাতেও বিভূতিবাবুর হাত আছে এবং এ ব্যাপারে তাঁর 'বিশেষ রজনী' উল্লেখ করা যায়। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বিভূতিবাবুর আর একখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থ। এঁটিকে যদিও উপন্যাস বা জীবনীর কোন একটি বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবুও এটি উপন্যাসের মতই উপভোগ্য এবং জীবনীর মত বিচিত্র। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেই লিখেছেন, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জীবনা নয়, যদিও অস্বীকার করা চলে না যে ইহাতে জীবনীর উপকরণ প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান।' এই গ্রন্থের দুই খণ্ড ইতি মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ ব্যতীত বিভূতিবাবুর 'বরযাত্রী,' 'বসন্তে', 'বর্ষায়', 'শারদীয়া', 'নীলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নামকরা এবং সেগুলির বহু সংস্করণ হয়েছে। নীলাঙ্গুরীয় গ্রন্থখানি ছায়াচিত্রেও রূপান্তরিত হয়েছে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ'। বর্তমানে বিভূতিবাবুর গ্রন্থসংখ্যা প্রায় কুড়িখানি। বিভূতিবাবু অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি এবং তাঁর স্বভাব শান্ত ও মধুর এবং তাঁর এমন রুচিস্মিত আন্তরিক ব্যবহার সচরাচর নজরে পড়ে না।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—'ভারতী' মাসিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও লেখক হিসাবে তৎকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। নানা ধরনের রচনায় তাঁর হাত ছিল যেমন মিষ্টি তেমনি ছিল তাঁর রসবোধ। হাস্য-রসাত্মক রচনাতেও তাঁর হাত যে কত পাকা ছিল পুরাতন 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'ঘুমের ব্যাঘাত' নামক একটি গল্পই তার বিশেষ নিদর্শন। এ ছাড়া 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'দুই পরিচ্ছেদ' ও এই গ্রন্থে মুদ্রিত 'মুক্তি' নামক গল্পটি থেকেও পাঠক তাঁর সাবলীল, ও স্বচ্ছ ভাষা ও তরবেতর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাবেন। রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য-সম্প্রদায় সম্পর্কে মণিলালের উৎসাহ ছিল অত্যধিক এবং নাটক ও বিশেষ করে সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্টতা ছিল

সব চেয়ে বেশি এবং এক সময় তাঁর গীতিনাট্য 'মুক্তার মুক্তি' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। উক্ত নাটকের সঙ্গীত তিনি নিজেই রচনা করেন এবং সঙ্গীতগুলিই ছিল ঐ নাটকের বিশেষ প্রাণবস্তু। নাটকে এ ধরনের কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীত, কথা ও সুর ইদানীন্তন কালেও বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'মহাপ্রলয়' নামক একটি নাটিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকে 'নাচঘর' নামক পত্রিকা প্রকাশ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যান্য উদ্যোগীদের অন্যতম। এছাড়া 'হসান্তিকা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকাও তাঁদের সমসাময়িক কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। কবিতা, গান শিশুদের জন্যেও বহু রচনা তিনি লিখেছেন। 'জাপানী ফানুষ','কায়াহীনের কাহিনী' শিশু-সাহিত্যে মণিলালের দু'খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শিশুদের জন্য লেখা ১৩২৭-২৮ সালের 'মৌচাকে' প্রকাশিত 'হরতনের গোলাম' নামক তাঁর একটি রচনার কথা আজও মনে পড়ে। ব্যক্তিগত ভাবে মণিলাল খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক হলেও, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি তাঁর দিলখোলা আন্তরিকতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অত্যন্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন, সৌখিনতা-প্রিয় ও সুপুরুষ ছিলেন মণিলাল। অল্প বয়সেই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং তারপর তিনি আর বিবাহ করেন নি। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে মোহনলাল সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। মণিলাল সুবিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ১২৯৫ সালে মণিলাল জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৩৩৬ সালে।

মণীন্দ্রলাল বসু—'রমলা'র আকস্মিক আবির্ভাব মণীন্দ্রলালকে আশ্চর্যরকমে একদিন প্রখ্যাত করে তুলেছিল, যেমন তুলেছিল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর 'পথের পাঁচালী'। গল্প-উপন্যাসের এমনি এক একটা সময়কে সাহিত্যিক রেণায়াসাসের খণ্ডাংশ বলা যায়। উচ্চ-নিনাদিত চিন্তার গভীরতা না থাকলেও, বক্তব্য বড় না হলেও, রচনা যেখানে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে, তাকে সম্মোহন করে—রসের প্লাবনে অবগাহিত পাঠক যখনই সমস্ত শ্রান্তি, ক্লান্তি, অবসাদ, বিস্মৃত হয়ে সুখের আমেজে শান্তির কল্পলোকে গিয়ে পড়ে, তখনই ত' লেখকের রচনার সার্থকতা। বক্তব্য বড় হ'ল কি না হ'ল সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সেটাই বিচার্য নয়, আসল বিচার সাহিত্য কতটা রসোত্তীর্ণ হ'ল তাই নিয়ে। 'রমলা' মণীন্দ্রলালের রসোত্তীর্ণ সার্থক রচনা বলেই

লোকচিত্তকে তা প্রভাবিত করেছিল এবং আংশিক ভাবে কিছুদিন সমসাময়িক সাহিত্যকেও। 'রমলা'র মধ্যে রসের দানা আকীর্ণ ছিল পরিপূর্ণ ভাবে। শুধু 'রমলা' কেন মণীন্দ্রলালের সমগ্র রচনার মধ্যেই এই রসধারার ফল্গু প্রবাহিত দেখা যায়। ঘটনাকে এবং ঘটনা-সংলগ্ন নরনারীকে সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি দেখেন, তাতে অভাবিত রূপকল্পনাই আসুক বা কোন অবাস্তব চিত্রই অঙ্কিত হোক,—ভাবের অগাধ প্রাচুর্যে তা প্রাণস্পর্শী হয়ে মনের রস-কন্দরে আবেগ জাগাবেই। সাহিত্য রোমান্টিসিজিম-ধর্মীই হোক আর রিয়ালিজিম-ধর্মীই হোক, মানব-জীবনের বা মানব-চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত যখন নয়, তখন সম্পূর্ণ আবেগ-বর্জিত কখনই তার পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। মণীন্দ্রবাবুর গল্পের লঘু গতি, ভাষার মনোহারিত্ব ও আবহাওয়া সৃষ্টির নূতনত্বই তাঁর গল্পের প্রাণৈশ্বর্য। তাঁর মিষ্টি হাতের তিন সৃষ্টি আলৌকিক কাহিনীগুলিও 'কল্পলতা'র মধ্যে যা স্থান পেয়েছে, তাও কল্পনার চাকচিক্যে সরস হয়ে উঠেছে। 'মালতী' উক্ত গ্রন্থের একটি পাশ্চাত্যদেশের জীবনধারা ও সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কিছু কিছু প্রভাব লেখকের রচনার মধ্যে দেখা যায়। ১৩২৭ সালে মণীন্দ্রলালের 'অরুণ' নামক একটি গল্প 'প্রবাসী' পত্রিকার গল্প-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করে। ছোটগল্পের বই হিসাবে তাঁর 'মায়াপুরী', 'সোনার হরিণ', 'রক্ত কমল' ও 'কল্পলতা' এবং উপন্যাস হিসাবে 'স্বপ্ন', 'জীবনায়ন', 'সহযাত্রিণী' ও 'রমলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩০৪ সালে মণীন্দ্রলাল কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ললিতকলা সম্বন্ধে মণীন্দ্রলালের আকর্ষণ বাল্যাবধি। বিশেষতঃ চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর গভীর নিষ্ঠা ও জ্ঞানবিস্তৃতি যে কত উচ্চাঙ্গের তার পরিচয় মেলে ইউরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালা সম্পর্কে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে। এ ধরনের প্রবন্ধ শিল্পীমন ছাড়া অন্যের হাতে এত সরস প্রাঞ্জল হয়ে উঠত না। মণীন্দ্রলাল সুপুরুষ এবং অবসর সময় গ্রন্থ পাঠেই আনন্দ পান সবচেয়ে বেশি।

মনোজ বসু—যে সময় বর্তমান খ্যাতনামাদের কয়েকজন উগ্র-আধুনিকতার আঘাতে সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তরুণদের শ্রদ্ধা ও আলোচনার পাত্র হয়ে ওঠেন, সে সময় মনোজ বসু শান্ত, সংযত ও স্বল্পনামী। উগ্র-আধুনিকতা, মনস্তত্বের জটিল দ্বন্দ্ব বা প্রগতির অন্তরালে

প্রতিক্রিয়াপ্রবণ মানুষের মন নিয়ে তিনি বিশেষ নাড়া-চাড়া করতেন না— সাধারণ সুখ-দুঃখ প্রেম-ভালবাসাই ছিল তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু এবং সেগুলির বলার মধ্যে ছিল বৈচিত্র্য ও সংযমের পরিচয়। এই সংযম ও কল্পনাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রথম আমরা পাই তাঁর 'বনমর্মর'-এর মধ্যে। এবং এই গ্রন্থের লিপিকুশলতাই অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁকে খ্যাতনামাদের সমগোত্রীয় করে দেয়। 'বনমর্মর'-এর 'রাত্রির রোমান্স' নামক একটি বিশেষ গল্প ও তাঁর পূর্বকালীন প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যেই অনিবার্য ভাবে বিশুদ্ধ রোমান্টিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে সামান্য কয়েক বছর থেকে তাঁর রচনা আশ্চর্য রকম ভাবে একটা বাঁক নিয়েছে, এবং সেটা এতই স্পষ্ট ও আকস্মিক যে স্বভাবতঃই নজরে পড়ে। তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আধুনিক সমস্যা ও চিন্তাধরার ইঙ্গিত মেলে। সমান-অধিকারবাদ সমস্যা, আধুনিক সামাজিক সমস্যা, রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা তাঁর মনের উপর এমন তীব্র ভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁর শান্ত সমাহিত, সংযতভাব ক্ষুণ্ণ করে রসের ব্যালেন্সকেও যেন টলিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়। লেখকের বর্তমান গল্পের বিষয়বস্তু ও সমস্যা আধুনিক হলেও বেশির ভাগ পরিবেশই গ্রাম্য। বাল্যকাল যাঁদের গ্রাম্য-জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে কেটেছে মনোজ বসু তাঁদেরই একজন। ১৩০৮ সালে যশোহর জেলার ডাঙ্গাঘাটা নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং বাগের হাট ও কলিকাতায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতাই ছিল মনোজ বসুর উপজীবিকা। বর্তমানে সে কার্যে অবসর গ্রহণ করে নিজে পুস্তক-প্রকাশের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। লেখকের বর্তমান গ্রন্থ প্রায় পনেরো খানি। 'নরবাঁধ', 'দেবী কিশোর', 'বনমর্মর, 'পৃথিবী কাদের' 'সৈনিক', 'ভুলি নাই' প্রভৃতি কতকগুলির কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে। 'দুঃখ নিশার শেষে' দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। উক্ত গ্রন্থের 'দ্বীপের মানুষ' একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গল্প। 'ভুলি নাই' নামক গ্রন্থখানিতেও মনোজ বসুর আধুনিক মনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নাটক রচনাতেও লেখকের হাত আছে। 'প্লাবন' ও 'নূতন প্রভাতের' মধ্যে তার নিদর্শন মেলে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—নিছক বুদ্ধির প্রক্রিয়ায় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে চাক্ষুষ করবার ইন্দ্রজাল মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় যেমন প্রত্য

এমন আর সচরাচর নজরে পড়ে না। আবেগকে অবদমিত করে স্বতঃবৃত্তির দ্বারা যুক্তিবাদকে তিনি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অনুভব কোথাও অভিক্রান্তিদুষ্ট নয়, প্রতিবেশ কোথাও কল্পনাপ্রসূত নয়। তার সামর্থ্যের প্রতি তিনি সর্বদা সজাগ। তাঁর বিশ্লেষণ কোথাও গোলমাল সৃষ্টি করে নি। মনের সমস্ত অলিতে-গলিতেই তাঁর দখল এতো পাকা যে, অনাবিষ্কৃত স্থানেও তাঁর পদচ্যুতি ঘটে ক্বচিৎ। প্রভাব-ধর্ম বলতে যা বোঝায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে স্পষ্টতঃ তারই ইঙ্গিত মেলে। স্থিত্যন্তরকালে সমাজ-জীবনের যে অবস্থান্তর ঘটে এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনে তারই ফলস্বরূপ যে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী ; যথা : উচ্ছৃঙ্খলতা, বুদ্ধিভ্রংশ, অমার্জনীয় প্রগল্ভতা এবং অতি-চেতন ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি মানুষের জীবন-নাট্যেরই নানা ব্যত্যয়, সহানুভূতিক অবলোকনে তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, এবং এ ব্যাপারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিরল। মনের নিভৃত-কোণে, বিশেষ করে নারী-মনঃসমীক্ষণে তাঁর বিস্তৃতির পরিলেখ করা কঠিন। স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁর দশা-সৃষ্টির প্রয়োগপটুতা বিস্ময়কর। অবস্থা সৃষ্টি ও চরিত্র-চিত্রণে দেশ-কাল-পাত্র গৌণ, রেখে গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে মুখ্যতঃ তিনি এমন কিছু একটা তুলে ধরেন, যা মনের জড়িমাকে নাড়া দেয়, সীমাকে টানে অসীমের দিকে, অপ্রাসঙ্গিককে প্রাসঙ্গিক করে তোলে—এক কথায় পাঠক একটা আকর্ষণের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খায়। 'বৌ' গল্পগ্রন্থের মধ্যে, 'সরীসৃপ' এর মধ্যে, 'ভেজাল'এর মধ্যে, 'হলুদ পোড়া'র মধ্যে এর নিদর্শন বহু পাওয়া যায়। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিহাস', 'অহিংসা', 'চতুষ্কোণ' প্রভৃতি সমগ্র রচনার মধ্যেই বামমার্গীয় চিন্তাধারা,—ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা, নিষ্ক্রিয় মন ও স্বৈরিতার উপর চোখ বুলিয়েছে। রচনার মধ্যে তাঁর মানসিক ব্যাধিতি গৌরবেরই বাহন হয়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে মনে হয় উদারনীতির সমাজতন্ত্রবাদী তিনি। সংস্কার-শাসিত প্রতিবেশ ভেঙে যাবার পরের যে অবস্থা তারই চিত্রকর—বর্তমানের সঙ্গে পা ফেলে চলেছেন সমান তালে—নৈরাশ্যবাদ এসেছে কিন্তু ঝেড়ে ফেলেছেন সঙ্গে সঙ্গে। ভবিষ্যতের চিন্তা নেই তাঁর মধ্যে—শুধু বর্তমান নিছক জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ বর্তমান। মাণিকবাবুর জীবনও এই। যতটুকু আছ, বেঁচে আছ অনুভব কর ; এই হ'ল তাঁর আদর্শ। নিজের সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন বলে মনে হয় না। মন বহিঃমুখী অবজেক্টিভ্। মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ দেখে বেড়াচ্ছেন,

অবকাশ মত ভরে নিচ্ছেন নিজের মনে। কত বৈচিত্র্য এখানে—এখানেই ত' মুহূর্তে মুহূর্তে চলেছে দিবারাত্রির কাব্য। মাণিকবাবুর দেহের বলিষ্ঠতার সঙ্গে মনের বলিষ্ঠতার সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁর কথা বলার একটা বিশেষ ধরণ আছে বটে, কিন্তু তা থেকে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায় না,—তাঁর লেখায় যা পর্যাপ্ত। তাঁর সাহিত্যিক জীবন খুব বেশি দিনের নয়। মাত্র ১৩৩৫ সালে 'আতসী মামী' নামক তাঁর একটি গল্প 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়। মাণিকবাবুর পৈতৃক বাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে হলেও১৯০৮ সালে ডুম্‌কায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৪০ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস, 'জননী' প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিরুদ্ধযুক্তির অবতারণার দ্বারা মীমাংসা দর্শন যেমন সত্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করে থাকে, রস-বিচারক তেমনি দ্বন্দ্বাত্মক বিষয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা একটা নির্দিষ্ট মীমাংসায় পৌঁছিবার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু বিষয় যে ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বাত্মক নয়, জ্যামিতিক সিদ্ধান্তের মতই যা স্বতঃসিদ্ধ বিরুদ্ধযুক্তির অবতারণা সে ক্ষেত্রে একান্তই নিরালম্ব। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা সেইরূপ যুক্তিতর্কের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বন্দ্বাতীত বিষয়। তাঁর সৃজনাকাশ চেতনায় প্রাণবন্ত—শাশ্বত জীবনের সঙ্গে অবিযুক্ত জীবনাংশের প্রতি প্রাণকণায় তিনি নির্বিবাদবিহারী। তাঁর দৃষ্টি যেরূপ জ্ঞান বিজ্ঞানে বীক্ষণে ধ্যানে অননুকল্প, তাঁর চিন্তা সেইরূপ দৃষ্ট অদৃষ্ট ভূলোক দ্যুলোকেই সচৈতন্য। তাঁর ধ্বনি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতিধ্বনি নয়, তা প্রত্যাক্ষানুভূতির পূর্বস্বাদ দানেও পূর্ণকাম। বিশ্বহৃদয়ের গতিবেগে তাঁর হৃদয়বেগে সব সময়েই অগ্রবর্তী। তাঁর কল্পলোকের বিশালতা রসোৎপত্তির অফুরন্ত উৎস, রসানুকূল শব্দসৌষ্টব ও রসৈক অন্তদৃষ্টি প্রজ্ঞা প্রখর ও প্রকৃষ্টতায় সর্বদেশ প্রকীর্তিত। এ হেন মহামানবের সম্যক আলোচনা এই অল্প পরিসরের মধ্যে যে নিতান্তই অসম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীতে যে মুষ্টিমেয় মানুষের আবির্ভাব ইতিহাসের চিরস্মরণী ঘটনা, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম ক্ষণজন্মা দিব্যপুরুষ। সমগ্র বিশ্বমানবে মনকে পুলকিত, উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত করতে—একাধারে কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীত শিল্প বিজ্ঞানে—সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের গুণাধিকারী হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি একচ্ছত্রাধিপ। সমগ্র মানুষের মনোজগৎকে রূপে-রসে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এম

ভাবে উজ্জীবিত করা, মানব জাতির অগ্রসরণের পথকে এমন ভাবে উন্মুক্ত করা, বিশ্বানুভূতির সন্ধানে মানুষের মনে এমন ভাবে আকুলতার উন্মেষ করা—সর্বকালের সর্বমানুষের ন্যায় ধর্মকর্মের উপর এমন ঔদার্যপূর্ণ দৃষ্টি, এমন সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা ও কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা' কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে বহু যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও মেলা শক্ত। আমরা ভারতীয়রা এবং আমাদের ভারতবর্ষ আজ তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁর কাব্য ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে শব্দ প্রয়োগের কলা-কৌশল, তাঁর সাহিত্য-রীতি, পদ-বিন্যাস, অলঙ্কার, ধ্বনি ও রস সবই যেন স্বতঃস্ফূর্তিতে শতপথিকের মানসে শতদলের সন্ধান দেয়—চিত্তগৃহে জ্বেলে ধরে জ্ঞানের প্রদীপ। তাঁর সাহিত্য আধুনিক সৃষ্টির প্রতিভূ এবং জাতির মনীষা মেধা আজ তাঁর প্রভাবে সমাচ্ছন্ন। সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর জীবন ও দর্শনের বহুবিধ দিক ও কাব্য-সাহিত্যের বিশদতা নিয়ে শতাধিক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এবং নিজেও তিনি সুদীর্ঘ জীবন ধরে অবিশ্রামে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সমালোচনা যা রচনা করেছেন তার অসামান্যতা অবিস্মরণীয় ও অনন্যসাধারণ। এমন কি তাঁর পত্র-সমূহও সাহিত্যের বিশেষ পর্যায়ভুক্ত হয়ে আমাদের নানা বিষয়ে জ্ঞানোন্মেষের সহায়ক হয়েছে—তিনি যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফলিয়েছেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও যে "রোগশয্যা" রচনা করেছেন, তা একান্তই অবিনাশী—সাহিত্যে অক্ষয়কীর্তির স্বাক্ষর। খণ্ডভাবে গল্প-সাহিত্য তাঁর আর এক মহীয়ান্ কীর্তি। এই গল্প-উপন্যাসের মধ্যে এমন সব অপ্রত্যাশিত কৌতূহলপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, যা বহুক্ষেত্রেই বুদ্ধি-পন্থী পাঠককে করেছে বিভোর আর ভাব-পন্থী পাঠককে বুদ্ধির প্যাচে করেছে বিভ্রান্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যে কথিত ব্যাপারকে গৌণ করে, অকথিত আবহকে করেছেন তিনি প্রধান; আবার কোথাও বা অলীক লোকাতীতকে বাস্তিক সত্য করে, আদর্শকে করেছেন প্রতিষ্ঠিত—আনন্দ-বিস্ময়ের অপার মহিমা নিয়ে তিনি খেলা করেছেন তাঁর 'ল্যাবরেটারি'তে। সম্ভব অসম্ভাব্যের 'শেষ কথা' কোনোটি তাই নিয়ে ভাবিয়ে, ভাষার ইন্দ্রজালে গল্পকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন অপরূপ সৃজনেচ্ছায়। কখনও কখনও পরিবেশকে করেছেন কাব্যময় পূর্ণ রোমান্টিক, আবার কখনও বা রুদ্রের ভয়ালরূপে রুক্ষ হতে চেয়েছেন,—নাড়া দিয়েছেন সমাজের তলদেশে, ঐতিহ্যের অভিজাত্যে, সতীত্বের শাখা-সিঁদুরে। কিন্তু এমনি সব ক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যধর্মী মন যেন

কোথায় বিনম্রতা দেখিয়াছে তলেতলে। তাঁর 'তিন সঙ্গী'র মধ্যে তিনি এমন অনেক ভাববস্তুর সমবিব্যাহারে গল্প বানিয়েছেন যা ভোর বেলার ভৈরবী আর পড়ন্ত বেলার পূরবী, দুয়ের ক্ষেত্রেই, রসসৃষ্টিতে, মানুষের মন-সংবেদনের উদ্দীপক হয়েছে। গভীর পরিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা ব্যতীত এ-ধরণের বাস্তব পরিদৃশ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাঁর 'গল্পগুচ্ছের' মধ্যে প্রথমেই আদর্শের স্বচ্ছ প্রকাশ নজরে পড়ে। প্রকাশের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ তাঁর মনের প্রসারতা ও মানসিক অবলোকন। জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি ও আখ্যান বৈচিত্র্যও বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিষয়বস্তুতে ইদানীন্তন সমাজ-চেতনার ছাপ নিয়ে, চিরন্তন আনন্দের আবহ সৃষ্টি করেছে—সার্বজনীনতার গৌরব প্রকাশ পেয়েছে। 'কাবুলিওয়ালা', 'একটি আষাড়ে গল্প', 'বিচারক', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নষ্ট নীড়' 'পোষ্ট মাষ্টার' প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে উপর্যুক্ত লক্ষণের হদিস মেলে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ, নাটক ও প্রবন্ধাদির কথা বাদ দিয়ে গল্প-উপন্যাসের মধ্যে বিচিত্র গল্প, গল্প সপ্তক, কথা চতুষ্টক, গল্পসল্প, কর্মফল শেষের কবিতা, চার অধ্যায়, দুই বোন, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি চোখের বালি, রাজর্ষি, বৌ ঠাকুরাণীর হাঠ প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর বর্তমানতা দেখা যায়, যার প্রত্যেকখানির সমালোচনা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর কাব্য ও সাহিত্য সাধনার নানা দিক বিশ্লেষণ করে বহু মনীষী বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখেছেন। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ শচীন সেন, ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, অজিত চক্রবর্ত্তী, বিশ্বপতি চৌধুরী, ডাঃ সরসীলাল সরকার, ডাঃ সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত। আগ্রহশীল পাঠক এঁদের গ্রন্থ থেকে বহু তথ্যের সন্ধান পাবেন। এ ছাড়া বিশ্বকবির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে, তাঁর স্বরচিত 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' ব্যতীত—ঘরোয়া, নির্বাণ, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, কেরাণি রবীন্দ্রনাথ, সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ও মংপুতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্দর্ভ থেকেও পাঠক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে এমন সব তথ্য অবগত হতে পারবেন যা তাঁদের আশাতীত আনন্দিত ও উৎসাহিত করবে। ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়, এবং ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট রাখী-পূর্ণিমার দিন তাঁর তিরোভাব ঘটে।

রবীন্দ্র মৈত্র—এমন অনেক মানুষ অত্যল্পকালের জন্যে পৃথিবীতে াসেন, যাঁদের আগমন ও প্রত্যাগমন তাদের ক্রিয়া-কলাপের পক্ষে নিতান্তই কিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্র মৈত্রের অকাল তিরোধান সে কারণ আজও আমাদের াছে অত্যন্ত ক্ষোভের হয়ে আছে। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁদেরই তাঁকে জানবার যোগ হয়েছিল, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে তাঁর বহু গুণান্বিত কর্মময় জীবন স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্য দুয়েরই প্রয়োজন ছিল জাতীয়-জীবনে। জীবনাদর্শে সাহিত্যাদর্শে এমন তুল্য নিষ্ঠা কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি ছিলেন নিষ্কাম প্রেমিক, নৈষ্ঠিক স্বদেশসেবক, শক্তিমান কর্মী ও চিন্তাশীল সাহিত্যিক। রার্থে আত্মোনিয়োগ করেছিলেন তিনি সর্বতোভাবে। সাহিত্যে হাসি- কান্নার দু'টি প্রধান বিভাগেই যদিও তাঁর রচনা সার্থক হয়ে উঠেছিল, তবুও যার একটি পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে থাকত শাণিত রবারি বা তীক্ষ্ণ সূচের মত অব্যর্থ ব্যঙ্গমিশ্রিত আঘাত। সমাজের অন্তর্নিহিত, বেরুদ্ধ বহুবিধ যন্ত্রণাতে প্রলেপ দিয়েছেন তিনি হাস্যরসের সরস ধারায়— শ্রুকে মুছিয়ে দিয়েছেন অনাবিল আনন্দে। আবার 'হাস্য শুধু আমার খা, অশ্রু আমার কেহই নয়' বলে, যেখানে দুঃখ-বেদনাকে টেনে এনেছেন, সখানে মূর্ত্য হয়ে উঠেছে তারই জীবন্ত প্রক্রিয়া—পাঠকের চোখ অনিবার্য গবে স্বজল হয়ে উঠেছে সেখানে। জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে সত্যিকারের অন্তরঙ্গতা না থাকলে, অনুভূতির এমন প্রাণবন্ত প্রকাশ কেবল নঃকল্পিত লিখন-মাধুর্যে সম্ভব নয়। তাঁর 'উদাসীর মাট', 'ত্রিলোচন কবিরাজ' থার্ড ক্লাস' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আজও বিস্মৃত হন নি। 'আনন্দ- বাজার পত্রিকা'য় 'দিবাকর শর্মা'র টিপ্পনীগুলির সরসতা ও তীক্ষ্ণতার কথা এখনও বহুদিন পাঠকের মনে জেগে থাকবে। 'মানময়ী গার্লস্কুল' ছায়াচিত্রে যে সার্থকতা লাভ করেছিল, তা যে রবীন্দ্র মৈত্রর সার্থক রসবোধের গুণেই তাতে আর সন্দেহ কি! রবীন্দ্র মৈত্রের পৈত্রিক বাস ফরিদপুরের নাতুরিয়া গ্রামে। কিন্তু ১৩০৩ সালে রংপুরে তাঁর জন্ম হয় এবং মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে বিচিত্রসৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরন্ত আনন্দে, যেমন

অন্তরের সঙ্গে তারা খুসী হয়েছে এমন অন্য কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি।' বিশ্বকবির এই বাণীর মধ্যেই শরৎ-সৃষ্টির সমস্ত গুণাবলী প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য যতই নৈর্ব্যক্তিক হোক লোকত্তর যখন নয়, তখন সমাজ-জীবনের অবিকল প্রতিমূর্তি তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক এবং প্রগতিমুখী কোন স্রষ্টার লেখনীতে তা রূপ নেওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমাজ-জীবনের বাইরের কাঠামোর চেয়ে, সামাজিক মানুষের হৃদয় রহস্যের গভীর তলদেশে ডুব দেওয়া এবং সেখান থেকে অভিজ্ঞ ডুবুরীর মত সূক্ষ্মতম মণিমাণিক্য সংগ্রহ করে নিখুঁত মণিহার গাঁথার মত প্রকৃত গুণী কোন জাতির জাতীয়-জীবনে কচিৎ সংঘটিত ঘটনা, এবং সেদিক থেকে বাঙলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্র এক বৈপ্লবিক আবির্ভাব। সেদিন মনের অলিতে-গলিতে পড়ে গেল কোলাহল, টোলে-চণ্ডিপণ্ডপে আরম্ভ হ'ল ভালো-মন্দের বিচার,—প্রাচীন সংস্কৃতির ভিত উঠল টলে! শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধের তর্ক উঠল, উত্তেজনার সাড়া পড়ে গেল দিকে দিকে—কেউ বললে, এ যে সমাজ-সৃজনকে জলাঞ্জলি দিলে; কেউ বললে, এ বৈনাশিকটা এলো কোত্থেকে! নানান বৈপরীত্যে, বৈসাদৃশ্যে সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল—সজোরে ঘা মারলে যেন কে বুড়িয়ে যাওয়া জীর্ণ ঘুণধরা দরজায়—ভেঙে চৌচির হয়ে পড়ল সব! তারপর তারই ভেতর থেকে নবারুণের স্নিগ্ধজ্যোতিতে দৃষ্ট হ'ল নবজগৎ—যেন নব জীবনের সাক্ষাৎ পেলুম আমরা। স্বপ্নালু মন্থরতা থেকে জীবনক্রিয়ার নিত্য-পুলক যেন জেগে উঠল আমাদের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর আগমনী গেয়েছিল যেমন ভবিষ্যপ্রেমিক ফরাসী ফিউটুরিষ্টরা, তেমনি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিলিপিতে অনুরণিত হ'ল ভবিষ্যতের বাস্তব-রাগিণী। বর্তমানকেও অতিক্রম করলেন তিনি। সাধারণ্যে বোধগম্য, গণিতের মন কষে মেজে নর-নারীর মনকে তিনি দিগ্বিজয়ী করে দিলেন শাশ্বত সত্যতায়—দৃষ্টিকে চালিত করলেন উন্নীত দিব্যধামে। সমাজ-সচেতনের প্রতিযোগিতায় এতবড় প্রতিভা সত্যিই বিরল। তাঁর স্বকীয়তা স্বেচ্ছাচার নয়, খামখেয়ালী নয়—তাঁর আনন্দবর্দ্ধন স্বাভাবিক; বিশ্লেষণকে বিশুদ্ধ-চৈতন্যের কষ্টিপাথরে ঘষে মেজে মানুষদের দিয়ে তিনি এমন সব কথা বলালেন, যার বাইরে নান্যপন্থা। তাঁর অনুগামীদের তিনি লক্ষ্য করেন নি, তাঁরই অনুগমন করেছে অনেকে তাঁর, এবং সেইখানেই

রৎচন্দ্রের সর্বৈব সার্থকতা। কিন্তু তবু তাঁর ললাটলিপিতে নৈরাশ্যের স্বাক্ষর ঌল, যার জন্যে দেশের অনেকেই তাঁর এই বৈপ্লবিক যাত্রাকে কল্যাণেরই বলে ফেলেছিলেন। জীবন দর্শনে, মানসিক অবলোকনে, বিশেষ রে প্রীতি, প্রেম ও স্নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অন্তর্ভেদী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও মবেদনা বিশেষ অনুভূতিসাপেক্ষ। সাহিত্যে বাস্তবতা বা ব্যাপকভাবে ধরলে র্তমান অতি-কথিত গণ-সাহিত্যের তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। তাঁর াল্লীসমাজ', 'শেষ প্রশ্ন', 'নব বিধান', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি রচনার ধ্যে বাস্তবিক সমাজ-চিত্রের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ও মৌলিক জড়তাকে ধাক্কা য়ে সামাজিক চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলার নিদারুণ প্রচেষ্টা দেখা যায়। তেরো বৎসর বয়সে প্রথম শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সূচনা দেখা দেয় এবং ৮৯৪ সালে তিনি 'কাশীনাথ' রচনা করেন। বাইশ থেকে চব্বিশ বৎসরের ধ্যে 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচিত হয়। তাঁর প্রথম মুদ্রিত 'মন্দির' মিক গল্প (১৩০৯ সালে) কুন্তলীন পুরস্কার পায় এবং 'বড়দিদি' প্রথম উপন্যাস সাবে 'ভারতী'তে (১৩১৪ সালে) এবং 'যমুনা'তে সর্বপ্রথম রচনা 'বোঝা' মিক গল্প প্রকাশিত হয়। বৈপ্লবিক উপন্যাস হিসাবে (১৩২৯ সালে) ঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত 'পথের দাবী' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রৎচন্দ্রের এক অপূর্ব দান। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এ ধরনের প্রচেষ্টায় রৎচন্দ্র সম্পূর্ণ একক। রাজনৈতিক কারণে গবর্ণমেণ্ট বইখানি বাজেয়াপ্ত রে এবং পরবর্তীকালে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। গল্প, উপন্যাস ব্যতীত রৎচন্দ্রের সাহিত্য ও রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তাঁর দেশপ্রীতি বলিষ্ঠ মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৮৩ সালে হুগলী জেলার বানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। জীবনের বহুদিন নানা দুঃখ-দারিদ্র অসচ্ছলতার সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল বলে, ভাগ্য-বিড়ম্বিত লখক-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর দরদ ছিল অসাধারণ। ১৯০৪ সালে নিঃসম্বল বস্থায় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যান এবং ১৯১৩ সালে রেঙ্গুন থেকে ফিরে শিবপুরে সবাস করতে থাকেন। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-সংখ্যা অপেক্ষা বিক্রয়-সংখ্যা ত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তাঁর কোন কোন গ্রন্থের কুড়ি পঁচিশটি সংস্করণ য়েছে এবং অধিকাংশই ছায়াচিত্রে রূপায়িত ও ষ্টেজে অভিনীত হয়েছে। ৩৪৪ সালের ২রা মাঘ শরৎচন্দ্রের তিরোভাব ঘটে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—শৈলজানন্দের জনপ্রিয়তা অকস্মাৎ একদিন আমাদের চমক্ লাগায়। সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবী রসিককে একপাশে রেখে, যে ঘটনাবহুল বিশ্লেষণ-বিরল লেখা জনসাধারণকে আকর্ষণ করে, শৈলজানন্দের রচনার মধ্যে সেটিই হচ্ছে প্রধান। জটিলতা সৃষ্টি করার পক্ষপাতী তিনি নন। এ ছাড়া তার গল্প-উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস হচ্ছে, গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি এমন একটি স্তরকে আশ্রয় করেছিলেন, যারা সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক, সব দিক থেকে ছিল চাপার নীচে, এবং সেখানকার অজানা অচেনা নর-নারীকে এমন বিচিত্র-প্রত্যয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, যার চিত্রালঙ্কার মনের অলিন্দে এক অসামান্য আনন্দ সৃষ্টি করে। এই আনন্দই সাহিত্যে রস বস্তুর বর্তমানতার সাক্ষ্য। কষ্টকল্পিত থিওরি বা বাদীয় প্রভাব মুক্ত তাঁর স্বাভাবিক প্রকাশ, বিষয়-বিষয়ীর এমন সম্মেলন—সার্বিক উপভোগ্যতার সম্যক নিদর্শন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, কোল ভীল, সাঁওতাল, কুলি মুটে মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে থেকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার গল্পের উপজীব্য। সামাজিক জীবনের বহু দুঃখ-দৈন্য, প্রেম-বিরহের চিত্রও তার গল্পের মধ্যে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে মানুষকে কাঁদিয়েছে হাসিয়েছে। 'নারী-জন্ম' গ্রন্থের মধ্যে তার পূর্বকালীন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পের উদাহরণ পাওয়া যায়। শৈলজানন্দের সমগ্র রচনার মধ্যে বিজ্ঞানী মন অপেক্ষা দরদী শিল্পী মনের পরিচয়ই সর্বত্র পরিস্ফুট—বুদ্ধির দৌড়ের চেয়ে অন্তরের বেগই তাঁর সাধকতার নিদর্শন। ১৩০ সালে বর্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামে শৈলজানন্দ জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁদের পৈতৃক বাস বীরভূম জেলার রূপসীপুর গ্রামে। বাল্যকাল থেকে জীবনের বহুলাংশ তার নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটায় সাহিত্যের মধ্যেও তিনি উপেক্ষিত, উৎপীড়িত, দরিদ্র, অসহায় গ্রাম্য নর-নারী সম্বন্ধে দরদী হয়ে ওঠেন। 'কালি-কলম', 'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে শৈলজানন্দ প্রথম জীবনে সংযুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে 'সাহানা', 'ছায়া' প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদনা করেন। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'ঝোড়ো হাওয়া' সে সময় বিশেষ সমাদর লাভ করে। শৈলজানন্দের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তাঁর লিখনশক্তি ছিল অফুরন্ত। দশ বারো বছর পূর্ব পর্যন্ত অত্যল্প কালের মধ্যে অজস্র রচনার দ্বারা বাংলা

সাহিত্যকে তিনি গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে, 'খরস্রোতা', 'আকাশ কুসুম' 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী', 'অনাথ আশ্রম', 'নন্দিনী', 'অভিশাপ', 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতিগুলি বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। বর্তমানে শৈলজানন্দ সাহিত্য-জগৎ থেকে অপেক্ষাকৃত সরে দাঁড়িয়ে, পরিচালক হিসাবে ছায়াচিত্র জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভ করেছেন। এবং তাঁর স্বরচিত কয়েকটি গল্পের চিত্র সিনেমা দর্শকদের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। শৈলজানন্দের সুন্দর হস্তাক্ষর একটি দর্শণীয় বস্তু।

শান্তা দেবী—কেবল মাত্র গল্প-উপন্যাস লেখিকা হিসাবে নয়, অন্যান্য বহুবিধ রচনা সম্পর্কেও দেশের স্বল্পসংখ্যক লেখিকার মধ্যে শান্তা দেবীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শ্রদ্ধেয় 'প্রবাসী' সম্পাদক সুপণ্ডিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতমা কন্যা হিসাবে পিতৃদত্ত মণীষা তাঁর মধ্যে নানা ভাবে প্রকাশ দেখা যায়। ইংরেজী রচনা, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ও সাংবাদিকতায়ও তাঁর কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রামানন্দবাবুর জীবনকালে সাত-আট বৎসর 'প্রবাসীর' সহঃসম্পাদক হিসাবে তিনি কর্মরত ছিলেন এবং নিয়মিত নানা বিষয়ে উক্ত পত্রিকার তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জাপান ভ্রমণ, কাশ্মীর, ভ্রমণ পশ্চিম-ভারত ভ্রমণ ও মহেন জো দাড়ো প্রভৃতি ভ্রমণ-কাহিনীগুলি এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি সমস্তই 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং দেশ-দেশান্তরের বহুবিচিত্র কাহিনী ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকের জ্ঞানান্বেষে সাহায্য করে। তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবনের এই সাহিত্যের মধ্যে শিল্পীদৃষ্টি বিশেষ পরিস্ফুট। অন্তরের গভীরতায় দেশ-কাল-পাত্রের একটা নিবিড় সংযোগ ও রুচিস্মিত ভাষার মাধুর্যে সে গুলি পাঠকের প্রত্যক্ষ দর্শনের সহায়ক হয়ে উঠেছে। শান্তা দেবী প্রধানতঃ গল্প-উপন্যাস লেখিকা হলেও, প্রবন্ধ-সাহিত্যের উপর তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় এবং মহিলা লেখিকাদের মধ্যে এই ধরণের বিশেষ গুণ কম নজরে পড়ে। প্রথম দিকে 'শনিবারের চিঠি'তে ও 'প্রবাসীতে' তিনি 'মঙ্গলচন্দ্র শর্মা' নাম ধারণ করে সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সে গুলি রসিক-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। শান্তা দেবীর রচনা

মূলতঃ নৈতিক আদর্শবাদের সমর্থক। এবং সে আদর্শ দেশ কাল নিরপেক্ষ নয়। হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে, ভারতের মাটির সঙ্গে ও নর-নারীর মনের মূল সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর মানসিক অবলোকন সম্বন্ধ হয়ে সাহিত্যে রূপ নিয়েছে—কোথাও তিনি হয়েছেন নিরাভরণা আবার কোথাও নিরুপমা। তাঁর 'শোক ও সান্ত্বনা,' 'দুহিতা' 'সিঁথির সিঁদুর', 'বধূ বরণ', 'জীবন দোলা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি গার্হ্যস্থ জীবনের বহু হাসি-অশ্রুর উজ্জল চিত্রে চিত্রিত। জীবনের বহু সমস্যাও এদের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। তাঁর ভগ্নী সীতা দেবীর সহযোগিতায়ও তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজীতে 'Tales of Bengal. 'Garden Creeper' এবং বাংলায় 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ও 'রামানন্দ এবং অর্দ্ধশতাব্দীর বাংলা' উক্ত গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জন্যও তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। কলিকাতায় ১৩০১ সালে শান্তা দেবীর জন্ম হয়। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক ও প্রবন্ধকার ডাঃ কালিদাস নাগের পত্নী।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের দান অসামান্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠায়, পদমর্যাদায় ও ধনৈশ্বর্যেও তাঁদের তুলনা হয় না। এই একই পরিবারে রাজা, মহারাজা, মহর্ষি, কবি, শিল্পী ও বহু গুণাবলীর যে নিদর্শন পাওয়া যায় অন্যত্র তা বিরল। সুধীন্দ্রনাথ এই বংশেরই একজন খ্যাতনামা লেখক, কবি ও প্রবন্ধকার। ঠাকুরবংশের বহু জনই প্রথম দিকে তাঁর সম্পাদিত 'সাধনা'র সাহায্যে সাহিত্যে মর্যাদা লাভ করেন। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা' প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১২৯৮ সাল হইতে ১৩০১ সাল পর্যন্ত প্রথম তিন বৎসর এই মাসিক পত্রিকাখানি তিনিই সম্পাদনা করেন। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা উক্ত পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই প্রকাশিত হতে থাকে। এরূপ শোনা যায় যে, সুধীন্দ্রনাথের রসবোধের উপর রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং বহু সময় সাহিত্য সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের যুক্তিকে তিনি সমর্থন করে নিতেন। সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনা কালে 'সাধনা'র মধ্যে আমরা ঋতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের বহু জনের রচনার নিদর্শন পাই, এবং সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যানুরাগই এদের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সহায়ক হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে তিনি

'কিরূপে গল্প তৈরি হয়', 'ভাষা শিখিবার হদিস', প্রভৃতি যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়েছিলেন, তা থেকে তাঁর সাহিত্য নিষ্ঠার পরিচয় মেলে। কবিতা ও গল্প ব্যতীত প্রবন্ধও সুধীন্দ্রনাথ বহু লিখেছেন যার মধ্যে তাঁর অনুভূতির গভীরতা ও সমাজ-সচেতন মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিজে উচ্চ-জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও, প্রজাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না, তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে তিনি বহু আলোচনা করেছেন। সমাজ ও ধর্মে অন্যায় অত্যাচার তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না এবং স্বাধীন মনোভাব নিয়ে প্রায়ই সেগুলির উপর কষাঘাত করতেন প্রবন্ধাদির মধ্যে। তাঁর লিখিত 'ধর্মে বণিকবৃত্তি', 'সমাজের ভিত্তি' 'বুনিয়াদি জমিদারের অধঃপতন', 'স্বাধীনতা', 'বাল্য বিবাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উক্ত মতবাদের উপযুক্ত স্বাক্ষর। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই 'প্রসঙ্গ' নামক তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছে প্রকাশিত হয়। কবিতা ও গল্প সুধীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তা তাঁর 'চিত্ররেখা', 'মঞ্জুষা', 'করঙ্ক' ও 'চিত্রালি' নামক গল্প সংগ্রহে এবং 'বৈতালিক, দাসী' ও 'দোলা' নামক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে। 'করঙ্কে'র মধ্যে 'কাসিমের মুরগী' সুধীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। মধ্যে 'পোড়ারমুখী' নামক গল্পটির নামও বিশেষ উল্লেখ করা যায়। এই সংগ্রহের 'চিত্রালি'র মধ্যে পাঠক উক্ত গল্পের পরিচয় পাবেন। 'সোরাব রোস্তাম' 'সহধর্মী' 'ঋণশোধ', 'পরিণাম', দুঃখের বোঝা', 'দাদা' প্রভৃতি গল্প গুলিও তৎকালীন পাঠকদের সবিশেষ আনন্দ দান করে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা ছিল ঝরঝরে এবং ভাব ছিল গভীর। গল্পের মধ্যে ব্যথা-বেদনা ও দুঃখসৃষ্টির দিকে তাঁর একটা ঝোঁক দেখা যায়। 'মায়ার বন্ধন' নামক একখানি উপন্যাসও সুধীন্দ্রনাথ রচনা করেন। ১৮৮৫ সালে সুধীন্দ্রনাথের জন্ম হয় এবং ১৯২৯ সালের ৭ই নবেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—অনেকের মতে, প্রাচীন সমালোচকরা বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই, সাহিত্য কেবলমাত্র ব্যক্তি মনেরই সৃষ্টি। কথা একবারে মিথ্যা না হলেও, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তার একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। নিজে স্রষ্টা হলেও, কালের ও সমাজের প্রভাবে নীতিপ্রবণতা ছিল তাঁর মধ্যে এত বেশি যে নীতি-বিগর্হিত কোন কিছুই সাহিত্যে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বংশপরম্পরায় সচল সামাজিক কাঠামোকে খাড়া করে রাখারই তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। সমাজের মধ্যে

যে অতি নৈতিকতা প্রশংসা পেয়ে আসছিল সাহিত্যেও তার পদচ্যুতি ঘটলে তিনি চম্‌কে উঠতেন—বিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের রূপান্তরও যে অবশ্যম্ভাবী একথা ভাবতে পারতেন না। এবং এই কারণেই অনেক রচনাকে তিনি অপাঙক্তেয় করেছিলেন, উপযোগিতা অস্বীকার করে। কেবলমাত্র সাহিত্য কেন, সে সময় সামাজিক ও ব্যক্তিগত বহু ব্যাপারেও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সাহিত্যশাসন অনেককেই তটস্থ করে রাখত, এবং এক কথায় তাঁর সময় তিনি ছিলেন সাহিত্যের শায়েস্তা খাঁ। সাহিত্য সম্বন্ধে সমাজপতির নিষ্ঠা ছিল অনন্যসাধারণ। বাংলা সাহিত্যের নবযুগে অল্পসংখ্যক যে ক'জন প্রথম ছোটগল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন, সুরেশচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাল্য-কাল থেকেই বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখা দেয় এবং বিশ বৎসর বয়সেই 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামক একখানি পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেন উক্ত পত্রিকাই পরবর্তীকালে 'সাহিত্য' নামে অভিহিত হয়। কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ সমালোচনাই তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল না; ব্যঙ্গরচনা ও রসিকতার সাহায্যে ব্যক্তব্যকে স্পষ্ট হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টাও ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রথম দিকে 'সমাচার দর্পণ' নামক পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয় এবং ইংরেজীর ছায়াবলম্বনে কিছু কিছু রচনাও তাঁর প্রকাশিত হয়। 'সাজি' নামক ছোট গল্পের বইয়ে তাঁর গল্প-প্রতিভা আমরা প্রথমে পাই। 'ভারতবর্ষে' তাঁর 'ছিন্নহস্ত' নামক এক খানি অনূদিত উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তাঁর 'বাঘের নখ', 'কমলা' ও 'প্রাইভেট টিউটার' নামক গল্পগুলি তৎকালে বিশেষভাবে পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়। সম্পর্কে, সুরেশচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র। নদীয়া জেলার আঁশমালী গ্রামে তাঁর পৈত্রিক নিবাস হলেও, কলিকাতায় ১৮৭০ সালে সমাজপতি জন্মগ্রহণ করেন

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—প্রায় অর্ধশতাব্দী বৎসর পূর্বে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় যে কয়েকজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গল্প-লেখকদের আমরা সন্ধান পাই, সুরেন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম। প্রধানতঃ নির্মল হাস্যরসের অবতারণা ও শ্লেষই ছিল তাঁর বহু গল্পের বিষয়বস্তু। সে সময়, অন্যান্য গল্পও তিনি এমন কতগুলি লিখেছিলেন, যার মধ্যে আধুনিক সংস্কারমুক্ত মনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসর পূর্বেকার 'সাহিত্যে' প্রকাশিত 'অবশেষে' নামক সুরেন্দ্রনাথের একটি গল্প এই যুক্তির

সমর্থনে বিশেষ সাহায্য করে। উক্ত গল্পে নায়ক কিষণলাল ও নায়িকা সরলার কথোপকথন ও বর্ণনার মধ্যে এক স্থানে দেখি, 'সরলা কিষণলালের বক্ষে মুখ লুকাইল,' অন্যত্র 'কিষণলাল সাদরে সরলার কেশে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল', এবং অপর একস্থানে 'আলুলায়িত রুক্ষ কেশ গুচ্ছে গুচ্ছে হেলিয়া কোচখানির অর্দ্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—প্রভৃতি পঙক্তির মধ্যে সাহসিকার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' যে বৎসর 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরই উক্ত পত্রিকায়, 'যামগাঁর বরযাত্রী' নামক সুরেন্দ্রনাথের আর একটি গল্প বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। 'সবিরাম জ্বর' এবং 'বাজে খরচ' নামক গল্প দু'টি যারা পড়েছেন, আজও তাঁরা নিশ্চয়ই ভোলেন নি। ভাষার উপর সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এবং তা ছিল সম্পূর্ণ বঙ্কিমী প্রভাবে সমাচ্ছন্ন, সমাসবহুলও গুরুগম্ভীর। ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ জ্ঞান ছিল এবং নিজে তিনি সুকণ্ঠে সঙ্গীতও করতে পারতেন। বহুকাল ভাগলপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে তিনি সমাসীন ছিলেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—১৮৮৪ সালে সৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম হয় এবং ১৯০৪ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় গল্প রচনা করে সৌরীন্দ্রমোহন প্রথম পুরস্কার প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেন। প্রধানতঃ 'ভারতী' সাহিত্যিক-চক্রেরই সমসাময়িক লেখক ইনি। সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি গল্প সে সময় এর খ্যাতিলাভে বিশেষ সহায়তা করে। ১৩১৬-২১ সাল পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত সৌরীন্দ্রমোহন 'ভারতী'র সম্পাদনে সহযোগিতা করেন এবং ১৩২২-৩০ সালের মধ্যে কিছুদিন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'ভারতী'র সম্পাদনা করেন। মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় কয়েক বৎসর নানা ধরনের রচনা সম্ভারে উক্ত পত্রিকাকে সৌরীন্দ্রমোহন বিশেষভাবে পুষ্ট করেছেন। 'কাজরী', 'আঁধি, 'রাঙা মাটির পথ', প্রভৃতি শতাধিক উপন্যাস, লাখটাকা, যৎকিঞ্চিৎ প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ, কবিতা ও গান এবং ছেলেমেয়েদের জন্য বহু গল্প উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন এবং বর্তমানেও নিরবকাশে লিখে চলেছেন। এদিক থেকে সৌরীন্দ্রমোহনের সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও অফুরন্ত রচনাশক্তি সত্যই প্রশংসার্হ। জটিলতা বর্জিত চিত্রবিন্যাস, ছোটখাটো সমস্যা, নানা ধরনের নর-নারীর সুখ দুঃখ, প্রেম-বিরহের ভিতর দিয়েই সহজভাবে তিনি তাঁর

গল্প-উপন্যাসের পথ করে নিয়েছেন এবং সে পথসৃষ্টিতে তার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে।

সীতা দেবী—বিখ্যাত সাংবাদিক 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই কন্যা সীতা ও শান্তা দেবীর প্রথম পরিচয় মেলে 'প্রবাসী' পত্রিকার সাহায্য। এরা উভয়েই উক্ত পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সীতা দেবী স্বামী সুধীরকুমার চৌধুরী নিজেও একজন কবি এবং সাহিত্যরসিক। ১৮৯৫ সালে কলিকাতায় সীতা দেবীর জন্ম হয়। প্রায় চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে সীতা দেবীর প্রথম গ্রন্থ 'হিন্দুস্থানী উপকথা' প্রকাশিত হয়। এমন চমৎকার কাহিনী পূর্ণ সচিত্র উপহার গ্রন্থ বাংলা ভাষায় তখন খুব অল্পই ছিল। গ্রন্থখানির বহু সংস্করণই সাধারণ্যে তার সমাদরের স্বাক্ষর ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে তাঁর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'পরভৃতিকা' 'মহামায়া', 'রজনীগন্ধা', 'ছায়াবীথি' 'বজ্রমণি', 'সোনার খাঁচা', 'তিনটি গল্প', 'আলোর আড়াল', 'ক্ষণিকের অতিথি' 'মাটির বাসা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সোনার খাঁচা'য় প্রেম ও ত্যাগের যে অপূর্ব চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, আদর্শানুগত মনে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাঁর এই গ্রন্থখানি ইংরেজীতে অনূদিত হয়। সীতা দেবী তাঁর ভগ্নী শান্তা দেবীর সহযোগেও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'সচিত্র নিরেট গুরুর কাহিনী', 'সচিত্র আজব দেশ', তাদের মধ্যে বিশেষ নামকরা। সীতা দেবী আবাল্য রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভক্ত এবং 'পুণ্যস্মৃতি' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবন্ধ রচনায়ও সীতা দেবীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ তাঁর সচেতন মনের বিশেষ নিদর্শন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় এবং চিত্রশিল্পে অনুরাগিণী।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী—সাংবাদিকের সঙ্গে সাহিত্যিকের বাহ্যিক কোন যোগ না থাকলেও অন্তরের যেন একটা যোগ থাকে। সাধারণতঃ বহু সাংবাদিককে সাহিত্যিক এবং বহু সাহিত্যিককেও সাংবাদিক হতে দেখা যায়। সরোজকুমারের সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন সেদিক থেকে অবিমিশ্রভাবে জড়িত। তাঁর সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত এবং উভয়েই সমভাবে চলেছে সুদীর্ঘ দিন ধরে। ... পক্ষেও এটি যেমন একটি বিশেষ গুণ, সাংবাদিকের পক্ষেও

একটি। 'আত্মশক্তি', 'নবশক্তি', 'বৈকালী', 'নায়ক', 'বাংলার কথা', ী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ১৯৩০ সালে 'নবশক্তির'র সম্পাদক হিসাবে বার কারাবরণও করেন। ব্যক্তিগতভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থকে সরোজকুমারের স্বাদেশিক মন তাঁকে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ও নীষীদের সংস্পর্শে আনে। সুভাষচন্দ্রের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং ভাষচন্দ্রই তাঁকে 'আত্মশক্তি'তে সম্পাদকীয় বিভাগের কার্যে নিযুক্ত করে দেন। উক্ত সময় 'আত্মশক্তি'তে এবং নিরুপমা বর্ষস্মৃতিতে তাঁর 'রমানাথের ডায়েরি' এবং 'তিন পুরুষের কাহিনী' নামক দু'টি গল্প প্রকাশিত হয়। রমানাথের ডায়েরি'টি খ্যাতি অর্জন করে এবং সাহিত্যরসিকদের ধ্যে বিশেষ আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে 'বন্ধনী' নামক একখানি উপন্যাস যদিও তিনি রচনা করেন এবং গল্পও যদিও কয়েকটি প্রকাশিত হয় টে, কিন্তু কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'শৃঙ্খল' নামক উপন্যাসখানিই তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রখ্যাত করে তোলে। সরোজকুমারের সমগ্র চনার কিয়দংশকে বাদ দিলে, অবশিষ্ট অংশ তাঁর পল্লীমুখীন, শান্ত, রাজাত্যবোধক বিশিষ্টতাই নজরে পড়ে সবচেয়ে বেশি। পল্লীচিত্র অঙ্কনের য ধারায় শরৎচন্দ্র বিপ্লবপন্থী, সেক্ষেত্রে সরোজকুমার রক্ষণশীল, আধুনিকতার বিরোধী। তাঁর ট্রিলজির 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহ-কপোতী' ও 'সোমলতা' এর বিশেষ প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। 'মনের গহনে' এবং 'ক্ষণ বসন্ত'র গল্পগুলিও পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য 'আকাশ ও মৃত্তিকা' এবং 'শতাব্দীর অভিশাপ' পেক্ষাকৃত ভিন্ন পর্যায় পড়ে। এদের মধ্যে প্রলয়ঙ্কর কিছু না থাকলেও, যুগতিক একমুখীনতা থেকে এরা মুখ বদলেছে। ১৯০৩ সালে হাজারিবাগে সরোজকুমারের জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক বাসভবন মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রামে। বাল্যকাল থেকে সরোজকুমারের মন অত্যন্ত কাব্যধর্মী এবং কবিতাও উক্ত সময়ে তিনি কিছু কিছু লিখেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য মার্জিত স্বচ্ছ ভাষার মত তিনি নিজেও মার্জিত রুচিসম্পন্ন, শান্ত সদালাপী ও প্রিয়বাদী। সংযত সাংসারিক পুরুষের যে সব গুণ থাকার প্রয়োজন সরোজকুমারের মধ্যে তার সবগুলিই বর্তমান মনে হয়।

সুবোধ ঘোষ—মানুষের প্রাচীন ইতিহাসে ধর্মের প্রভাব যতখানি র্মরতা দেখিয়েছে, বর্তমানে রাজনীতি তার চেয়েও উচ্চ-নিনাদে ব্যক্তব্যকে

প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বক্তব্য বড় হলেই সাহিত্য সর্বদা হয়ে ওঠে না; সে বড় হয় তার রসোত্তীর্ণতার লক্ষণে। সে জন্য রাজনৈতিক হোক, সমাজনৈতিক হোক, বা যে কোন আদর্শের প্রেরণাতেই আত্মপ্রকাশ করুক—পরিস্রুত সাহিত্যরসে কতটা মনজয়ী হয়ে উঠল সেইটাই বিচার্য বিষয়। সুবোধ ঘোষের রচনার মধ্যে প্রায় সমস্ত প্রকার বিষয়কেই আশ্চর্যভাবে রসোত্তীর্ণ করে তোলার প্রযত্ন দেখা যায়। অবশ্য চুল-চেরা বিচারে সকল ক্ষেত্রেই তিনি যে অনিবার্য স্বার্থকতা লাভ করেছেন তা বলছি না, কিন্তু তাঁর বস্তুকেন্দ্রিক বিজ্ঞাননির্ভর রোমান্স, সুদৃঢ় [illegible] মতবাদ, মনোবৈজ্ঞানিকের গূঢ়ৈষণা, ক্রমানুভাবকতা, মনের উপপথ-বিহার এবং সর্বাপেক্ষা বিষয়বস্তু নির্বাচনে দিগ্দর্শন ও শব্দঝঙ্কার অত্যন্ত স্বল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে সর্বজন পরিচিত করেছে। সুবোধ ঘোষের গল্পের অবধিবোধ কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম বলে মনে হলেও, আঙ্গিক অভিনব সমাজ ও জীবনের ব্যর্থতার এমন অকৌটিল্য প্রকাশ সচরাচর নজরে পড়ে না। লেখকের রচনার মধ্যে বর্তমান স্থিত্যন্তরকালে বিজ্ঞানী মনের সংবেদনা নানা রূপতত্ত্বে বাস্তব তথ্যের অভিসংকেত বহন করে এনেছে—মানসিক ও সামাজিক বিকারের বহু আলোক্তি প্রবুদ্ধ করেছে আমাদের জ্ঞানকে। তাঁর গল্পের প্রকৃতি ও পুরুষ সাধারণ-দৃষ্ট ষ্টিরিওটাইপ নয়—intellectual honesty তাঁর মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর 'ফসিল' গল্প এবং উক্ত নামীয়-গ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে বহু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গল্প 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লেখক সম্বন্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সমাজ-বিজ্ঞানে বিপরীত স্বার্থের সংঘাত কি ভাবে সদ্ভাবে এসে দাঁড়ায়, 'ফসিল' গল্পের মধ্যে তার বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়। 'গোত্রান্তর'কুশলী শিল্পী প্রতিভার আর একটি নিরিখ। 'পরশুরামের কুঠার' নামক গ্রন্থের মধ্যে এমনি বহু নৈপুণ্যের উপমা দেওয়া যায়। 'ন তস্থৌ', 'তমসাবৃতা' 'নির্ব্বন্ধ', উক্ত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট গল্প। তাঁর আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প 'শক থেরাপী'। বাংলা-সাহিত্যের আসরে, শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীদের পঙ্ক্তিতে সুবোধবাবুর নাম এই একটি গল্পের জন্যই সন্নিবদ্ধ হয়ে থাকবে। 'শুক্লাভিসার'-এর গল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশক্ষেত্রে লেখকের জাতীয়তাবাদী মনের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়, এবং 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে উক্ত গ্রন্থে জাতীয়

…ার স্বপক্ষে তিনি তার মতবাদকে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বস্পষ্ট …র প্রকাশ করেছেন। উপন্যাস অপেক্ষা গল্পের প্রাচুর্য ও প্রাণৈশ্বর্যই বহুবিচিত্রতায় সুবোধ ঘোষের প্রসিদ্ধি কীর্তন করে। জীবনে ভূয়োদর্শন তা না থাকলে, নরনারীকে অন্তর ও বাহিরের সঙ্গে বহু …নিষ্ঠতা না থাকলে রচনার মধ্যে এমন রহস্যলোক সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুবোধবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাতেও এ ধারণা স্বীকৃত হয়। এই শিষ্ট মানুষটির কথাবার্তার মধ্যে দেখা যায় কঠিন স্পষ্টবাদিতা। সব বিষয়েই তার অল্পবিস্তর জ্ঞান, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপ্রকাশিত থাকলেও, প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ পায়। মানুষ যে অবস্থার সঙ্গে এই নিত্য-নৈমিত্তিক সমাজ অবস্থার …তিকে নিরন্তর বদলাচ্ছে—ভদ্র-অভদ্রে উচ্চ-নীচে, ধনী-দারিদ্রে মিলিত হচ্ছে বিষাদ-হর্ষে,—এমনি সব মানসিক বোধের তিনি পক্ষপাতী। প্রথম পরিচয়ে নিজেকে তিনি ধরা দেবার বিশেষ সুযোগ না দিয়ে নূতন আগন্তুককেই চিনে নেন বেশি করে। অনেক সময় নিজের বিশিষ্ট্যগুলিকে লুকিয়ে আগন্তুকের মনে অন্য ইম্‌প্রেশন জাগিয়ে তোলেন। বর্তমানে সময়ে 'আনন্দ বাজার পত্রিকার' সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯০৯ সালে হাজারিবাগে সুবোধ ঘোষের জন্ম হয়।

হেমেন্দ্রকুমার রায়—প্রধানতঃ 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে যে সকল সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, হেমেন্দ্রকুমার তাদেরই অন্যতম। নানা প্রকারের রচনার ভিতর দিয়ে হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্য-সাধনা ক্রমপরিণতি লাভ করে ইদানীন্তনকালে যদিও তিনি বহুলাংশে কিশোর বয়স্কদের সাহিত্য-রচনাতেই নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে অবিসংবাদী-ভাবেই যদিও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তবুও পরিণতদের জন্য অন্যান্য বহুবিধ রচনাও তিনি লিখে থাকেন। অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্য-সাধনা সুরু হয় এবং 'বসুধা', 'জন্মভূমি' 'নব্য-ভারত', 'মানসী ও মর্মবাণী' ও 'ভারতী' প্রভৃতি তৎকালীন পত্রিকায় এবং বর্তমান সময়েরও বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় চোদ্দ বছর বয়স থেকে তিনি গল্প, কবিতা, উপন্যাস, সঙ্গীত, শিল্প, নাটক ও নাট্য-সমালোচনা প্রভৃতি নানা ধরণের রচনা তিনি লিখে আসছেন। প্রসাদ রায় নাম ধারণ করে প্রাচীন 'ভারতী'র 'চয়ন'-এর মধ্যে তার বিভিন্ন বিষয়ের সচিত্র নিবন্ধগুলিও তৎকালীন পাঠকদের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণের কারণ হয়। 'আমার কাহিনী' নামক তাঁর প্রথম গল্প

'বসুধা'য় প্রকাশিত হয়। প্রথম ছোট গল্প-সংগ্রহের নাম 'পশরা' ও, পরবর্তী উপন্যাসের নাম 'আলেয়ার আলো' ; এছাড়া 'যৌবনের গান' ও ও খৈইয়াম নামক কাব্যগ্রন্থ দু'খানিও তাঁর খ্যাতির ক্ষেত্র প্রসারিত ক ওয়াগ্‌নার সম্পাদিত বাংলা গল্পের জার্মান সংকলনে সে সময়কার অনে সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমারের 'গোলাপ ফুল', 'চোর', 'কুসুম', নামক কয়েকটি স্থান পায়। নাটক ও সঙ্গীত রচনা এবং চিত্র-সমালোচনাতেও লেখকের ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। 'নাচঘর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর কৃতি বিশেষ পরিচয় মেলে। রঙ্গমঞ্চের প্রতিও হেমেন্দ্রকুমারের আকর্ষণ আবাল তার গ্রন্থ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। স্থূল ঘটনা সরস লেখায় এবং উৎকণ্ঠাসৃষ্টির আশ্চর্য ক্ষমতায় হেমেন্দ্রকুমা বহু রচনা সকলশ্রেণীর পাঠককেই মুগ্ধ করে। শিশুদের জন্য রচিত তাঁ গ্রন্থগুলির বহু সংস্করণ হয়েছে, এবং বাংলাদেশের যে কোন শিশু-সাহিত্যিকে রচনা অপেক্ষা সমাদর লাভ করেছে বহুগুণে। ১৮৮৮ সালে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নামক স্থানে হেমেন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

—বিশু মুখোপাধ্যায়

